প্রস্তুতিপর্ব

বিশেষ সংখ্যা

সুকুমার রায়

সম্পাদনা

অনুপম মজুমদার   আশীষ লাহিড়ী

সহ-সম্পাদনা

সিদ্ধার্থ ঘোষ   সলিল বিশ্বাস   প্রাবৃট দাসমহাপাত্র

নামলিপি

শোভন সোম

প্রচ্ছদ

সত্যজিৎ রায়
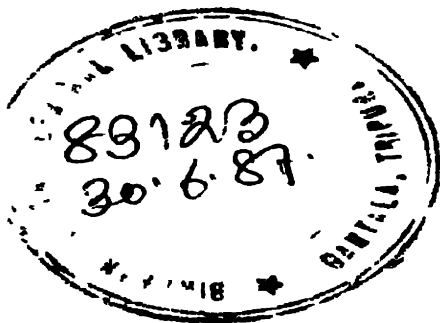
দাম : চব্বিশ টাকা

আমাদের কথা

সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা এবং গবেষণার যে ধারাটি এতদিন বয়ে এসেছে আমাদের দেশে, তার সংকীর্ণতা ও অগভীরতা সম্বন্ধে সচেতন হবার সময় এসেছে এখন। পূর্বসূরীদের সফল ও অসফল প্রয়াস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা সত্যানুসন্ধানের সেই পথটি গ্রহণ করতে প্রয়াসী, যা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস-চেতনার দীর্ঘ সদর রাস্তা, গোঁড়ামির কানাগলি নয়।

আমাদের কথা/প্রস্তুতি (প্রস্তুতিপর্ব) অক্টোবর ১৯৭৩

বিশেষ সংখ্যা ঃ সুকুমার রায় (৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭—১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২৩)

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে যাঁরা সবথেকে 'লিবারেল আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ' ছিলেন, সুকুমার রায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান-পরিশীলিত রসসত্তার মধ্যে প্রায় কোথাওই কোনো অমানবিক মূল্যবোধের ছায়াপাত ঘটেনি। আমরা মনে করি, তাঁর সত্যিকারের দায়বদ্ধতা ছিল একেবারে মৌলিক যে-জীবন, যে-মানবিকতা তার প্রতি।

১৯২৩-এর ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যাঁর জীবন শেষ হয়ে গেল, তাঁর পক্ষে এই উপলব্ধি সে-যুগে অভাবনীয় বলা চলে। বিশেষত তিনি ছিলেন সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চকোটির মানুষ, নানান স্বার্থের গোলকধাঁধায় মৌলিক মানবিক জীবনবোধটুকু হারিয়ে ফেলাই ছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তা ঘটে নি। তার একটা কারণ সম্ভবত এই যে সামাজিক মর্যাদায় অভিজাতশ্রেণীভুক্ত হলেও রায়চৌধুরী পরিবারের মধ্যে কতকগুলি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল। মুৎসুদ্দি-সংস্কৃতি অধ্যুষিত যে যুগে লেখাপড়া শিখে ব্যারিস্টার কিংবা আই. সি. এস. হওয়া ছিল অভিজাত বাঙালীদের লক্ষ্য সেই যুগে উপেন্দ্রকিশোর রায় আপন উদ্যোগে ও গবেষণায় মুদ্রণ-প্রযুক্তির জগতে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন। এবং সেটা নিছক বড়োলোকের খেয়াল ছিল না, তাঁর স্বাধীন জীবিকাও উপার্জিত হতো ঐ U. Roy & Sons নামক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান থেকে। এই ঐতিহ্য সুকুমার রায়েও পরিবাহিত। গড়পড়তা অভিজাত, শিক্ষিত বাঙালীর তুলনায় সুকুমারের দেখবার চোখটা আলাদা হওয়ার একটা কারণ তাঁর এই ক্ষুদে-বুর্জোয়া শ্রেণীপরিচয়েই নিহিত।

এ ব্যাপারটা আশ্চর্যের যে গড়পড়তা ভদ্রলোক বাঙালীর তুলনায় এমন আলাদা হওয়া সত্ত্বেও সুকুমার রায় উক্ত বর্গের কাছে আজও এমন জনপ্রিয়। কোনো পরমপুরুষের অলৌকিকতা, মধ্যবিত্ত সেন্টিমেন্টের সুড়সুড়ি, কিংবা জগৎজোড়া খ্যাতির উপর নির্ভরশীল নয় তাঁর এই বিপুল জনপ্রিয়তা। ঘটনাটা ভেবে দেখবার মতো, বাংলা সাহিত্যে এরকম ঘটনা দুটি ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

অবশ্য একথাও সত্যি, বাঙালী ভদ্রলোকেরা সুকুমার রায়কে শুধু ভালোই বেসেছেন, তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করেন নি। নইলে বিশ্ববিদ্যালয়-গবেষণার অতিপ্রজ ক্ষেত্রেও সুকুমার-গবেষণার এমন আকাল কেন?

আসলে সুকুমারের ঐ যে ছেলে-ভুলোনো ছদ্ম-আবরণ, যার মোহ আশৈশব আবিষ্ট করে রেখেছে আমাদের, সেটি সরিয়ে ভিতরের প্রজ্ঞালোকে প্রবেশের কাজটি অতি দুরূহ—আমাদের বিজ্ঞান-সন্ত্রস্ত পল্লবগ্রাহী মন যতটা দুরূহতার চাপ সহ্য করতে পারে তার চেয়েও দুরূহ। কারণ কেবল রূপদক্ষতাতেই নয়, মননের ব্যাপ্তি ও গভীরতায়ও সুকুমার তুলনাহীন।

সুকুমারের সক্রিয় সাহিত্যচর্চার কালটি ছিল ভারতের ইতিহাসে এক দুঃসময়—সব সংগীত ইংগিতে থেমে যাওয়ার সময়। দুরাশা, আশাভঙ্গ, বিশ্বাসঘাতকতা ও পরাজয়ের কাল। তীব্র নৈরাশ্যে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুকুমার নিজেও। সে-নৈরাশ্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যে ধরণের সচেতনতা থাকা দরকার তা ছিল না তাঁর। তিনি বিপ্লবী ছিলেন না। 'সন্দেশ'-এর পাতায় জোয়ান অব আর্কের জীবনী লিখলেও কোনো ভারতীয় শহীদের নামোল্লেখ করেন নি কখনো। এ সবই সত্যি। কিন্তু এই দুঃখজনক দুর্বলতা সত্ত্বেও শিল্পী হিসেবে তিনি আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় এই কারণে যে শিল্পরচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রায়শই সেই অন্ধকার যুগের অন্তঃসারটিকে উন্মোচন করে দিতে পেরেছেন।

গণতান্ত্রিক মানবিক মূল্যবোধের প্রতি সুকুমার রায়ের দায়বদ্ধতা, তাঁর মননের বিজ্ঞান-মার্জিত দীপ্তি, তাঁর 'স্বর্তমানতা', তাঁর সীমিত কিন্তু প্রখর বাস্তববোধ, এবং এই অনন্য প্রতিভার প্রতি আমাদের লজ্জাকর উপেক্ষা—এ সব কিছুই 'প্রস্তুতিপর্ব'কে প্ররোচিত করেছে সমগ্র সুকুমারকে আবিষ্কারের দুঃসাধ্য কাজে প্রয়াসী হতে।

সঠিক অর্থে 'সমগ্র সুকুমার' এখানে আলোচিত হলো না। তাঁর ব্যক্তিত্বের এমন কয়েকটি দিক ছিল যেগুলি সাধারণ সাহিত্য-পাঠকের কাছে যতখানি বিস্ময়কর ততটাই ভীতিপ্রদ। যেমন typography, ব্লক তৈরী, রঙিন ছবি ছাপা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা চিন্তার দিকটি।

বলা দরকার, সুকুমার রায় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এখন খুব সহজসাধ্য নয়। তাঁর অকালমৃত্যুর পরে U. Roy & Sons-এর হাতবদল ও অবলুপ্তির ফলে তাঁর পাণ্ডুলিপি ও মূল ছবিগুলির হদিশ পাওয়া যায় না। 'সুকুমার সমগ্র' ধরণের যেসব গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে সেগুলোর কোনোটাই সুকুমারের সমস্ত রচনার সংগ্রহ নয়। এমনকি তার সঙ্গে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রবন্ধ' জুড়ে দিলেও নয়। তার বাইরে ছড়িয়ে আছে তাঁর অনেকগুলি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ, যা ছাপা হয়েছিল, 'তত্ত্বকৌমুদী', 'তত্ত্ববোধিনী' ও 'প্রবাসী' পত্রিকায়। Penrose Annual-এ দুটি প্রবন্ধ এবং সম্ভবত Process Engraving Monthlyতে দু একটি চিঠিপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। 'সন্দেশ'-এর পাতায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর তৈরী অনেকগুলি ধাঁধা ও হেঁয়ালি ছাড়াও দু একটা গল্প ও নিবন্ধ সুকুমারের লেখা (যা কোনো 'গ্রন্থাবলী'তেই স্থান পায় নি) বলে অনুমান করার সঙ্গত কারণ আছে।

একথা সকলেরই জানা যে সুকুমার কখনো ছবি আঁকার পাঠশালায় যান নি। অথচ ছবি আঁকা—মূলত সচিত্রকরণের ব্যাপারে একধরণের স্বভাব-দক্ষতা তাঁর ছিল। 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত তাঁর আঁকা সচিত্রকরণের অর্ধেকেরও বেশি আজ অজ্ঞাত। এছাড়া 'প্রবাসী'তে তিনি শুধু 'ভাবুকসভা'র ছবি আঁকেন নি, অন্য লেখকের লেখায় সচিত্রকরণও শুরু করেছিলেন ছাত্রাবস্থায় (যেমন, ১৩১৭এর 'প্রবাসী'তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'নবীন সন্ন্যাসী' উপন্যাসের ছবি এঁকেছিলেন সুকুমার)।

সুকুমার রায় একজন বড়ো ফোটোগ্রাফার ছিলেন এবং বিলেতের Royal Photographic Societyর ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। অবশ্য তাঁর আগে ১৮৯৮ সালে মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই সম্মান অর্জন করেন (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বর্তমান সংখ্যায় 'উহ্যনাম পণ্ডিতের সোজা কথা' প্রবন্ধটি ছাপা হয়ে যাওয়ার পরে তথ্যটি আমরা জানতে পারি)। কিন্তু সুকুমার রায়ের তোলা ও 'প্রসেস' করা কোনো ফোটোগ্রাফ আজ আর পাওয়া যায় না। এমনকি তিনি কোন কোন ছবি পাঠিয়ে F R P S সম্মান পান সে-সব তথ্য R P S-ও দিতে পারে নি।

সুকুমারের একমাত্র ডায়রির অংশবিশেষ এখানে প্রকাশিত হলো। ডায়রির আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত কিছু তথ্যও কয়েকটি প্রবন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। এই অমূল্য ডায়রিটির সম্পূর্ণ পাঠ এবং সুকুমারের সমস্ত চিঠিপত্র অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া উচিত। সুকুমার রায় সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণায় পৌঁছনোর পক্ষে এগুলি অপরিহার্য।

সংখ্যাটি প্রকাশ করার ব্যাপারে কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, নিমাই ঘোষ, তীর্থ দাশগুপ্ত, সুবীর দাশগুপ্ত এবং সমস্ত বিজ্ঞাপনদাতা ও ইম্প্রেশন সিন্ডিকেটের কর্মীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ দুজনের কাছে: শ্রীসত্যজিৎ রায় ও শ্রীমতী নন্দিনী গুপ্ত।

'সন্দেশ' পত্রিকার যে-বাঁধানো ফাইলটিতে সুকুমার তাঁর লেখাগুলি সংশোধন করেছিলেন সেই ফাইল, সুকুমারের আঁকা বিভিন্ন ছবির মূল আর্ট-ওয়ার্ক এবং তাঁর ডায়রি দেখার ও ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন শুধু নয়, বহু মূল্যবান তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন সত্যজিৎ রায়।

আর সুকুমার রায়-সংক্রান্ত যা কিছু এখনো সিগনেট প্রেস-এর সংগ্রহে আছে তার সবকিছুই নন্দিনী গুপ্ত আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। বস্তুত তার খুব অল্প অংশই আমরা এই সংখ্যায় ব্যবহার করতে পেরেছি।

সুকুমার রায় যেহেতু প্রায়-অনালোচিত এক ব্যক্তিত্ব তাই এ সংখ্যার লেখা-নির্বাচনে কোনো নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের বদলে আমরা চেয়েছি বরং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটুক, আলো এসে পড়ুক বিভিন্ন কোণ থেকে। সমস্ত লেখকই এই সংখ্যায় লিখেছেন সাগ্রহে এবং লেখা তৈরি করতে পরিশ্রম করেছেন যথেষ্ট। ফলে কৃতজ্ঞতা জানানো বাহুল্য। বদলে অভিযোগ এইটুকু যে লেখাগুলি সময়মতো না পাওয়ায় ঠিকমতো বিন্যাস করা গেল না। তাই সূচীপত্রে আমাদের মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখাগুলি যে-ক্রমে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল সেইভাবে সাজিয়ে দেওয়া হলো।

সংখ্যাটির প্রস্তুতিপর্বে আমরা এমন দুজন মানুষকে হারিয়েছি যাঁরা এই সংখ্যাটির জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। সুশোভন সরকার (১৯. ৮. ১৯০০ - ২৬. ৮. ১৯৮২) এবং নীলিমা দেবী (১১.১১. ১৯০৩ - ৩০.৭. ১৯৮২)-র হাতে সংখ্যাটি তুলে দিতে পারলাম না, এটা আমাদের দুর্ভাগ্য।

সবশেষে বলা দরকার, শ্রীঅবনীরঞ্জন রায়ের তত্ত্বাবধান ছাড়া এ সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

সূচীপত্র

ক্রোড়পত্র

আশীষ লাহিড়ী কর্তৃক ইম্প্রেশন সিন্ডিকেট ২৬/২এ তারক চ্যাটার্জী লেন কলকাতা-৫ থেকে মুদ্রিত ও ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট-৭৩ থেকে প্রকাশিত।

আশীষ লাহিড়ী

হযবরল : অসংগতির উনিশবিশ

অসংগতিই যেকোনো হাসির প্রাণবস্তু। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের গোড়ায় ঔপনিবেশিক কলকাতার ভদ্রলোক-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণের মধ্যে যে অসংগতি ছিল, 'হযবরল'-য় তাকেই নিজস্ব ধরণে রূপ দিয়েছেন সুকুমার রায়। আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব মানুষের ভাবনাচিন্তায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে, তার সঙ্গে প্রথাসিদ্ধ ভাবনাচিন্তার অসংগতিও তাঁর বিজ্ঞান সংস্কৃত মনকে আলোড়িত করেছে।

সুকুমার রায়কে বিশেষভাবেই 'সাবালকপাঠ্য' বলে মনে হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর। তিনি অবশ্য ছন্দমিলের অসামান্য কারুকৃতিতে, চরিত্রসৃষ্টির প্রোজ্জ্বল সাফল্যে, কচিৎ কবিকল্পনার মনোহারিত্বের মধ্যেই সুকুমারের সাবালকত্বের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু সুকুমার রায় যে স্বীয় যুগের অনেক শ্বেতশ্মশ্রুর চাইতে ঢের বেশি সাবালক ছিলেন আরো অনেক বড়ো, অনেক মৌলিক একটা কারণবশত, এই সত্যটা কেন জানিনা তার চোখ এড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধরণে সুকুমারের মহত্ত্বের সূত্রটি ধরিয়ে দিয়েছিলেন। 'সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি,' 'ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা'য় চমৎকৃত রবীন্দ্রনাথ আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল, সেই জন্যই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।'[১] বস্তুত যে গুণে সুকুমার বাংলা সাহিত্যের পল্লবগ্রাহী পরিবেশে এমন আশ্চর্যরূপে বিশিষ্ট, সেটি ঐ বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য। ঐ গুণ ছিল বলেই আগাপাশতলা বাঙালী এই সাহিত্যকার কখনো শিকার হননি বাঙালী ভাবালুতার। বরং গড়পড়তা ভদ্রলোক বাঙালীর মূর্তিমান প্রতিষেধক বলতে যা বোঝায় তিনি ছিলেন তাই।

কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য নয়, রবীন্দ্রনাথ একথাও বলেছেন যে সুকুমার 'তার বৈপরীত্য'কে দেখাতে পেরেছিলেন 'খেলাচ্ছলে'—বালকের মতো করে। একদিকে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য, অপরদিকে বালকের ক্রীড়োচ্ছল স্বাভাবিকতা—এই দুটির সমন্বয় ঘটেছিল বলেই এমন প্রগাঢ়ভাবে সাবালক মননের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও শিশু বা কিশোর-সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর সাফল্য এমন চূড়াস্পর্শী।

যে-কোনো যুগপর্বের শিশুর মধ্যে সেই সময়ের চরিত্রটি তার 'স্বাভাবিক সত্যতা'য় (natural veracity) প্রতিফলিত হয়।[২] মার্ক্সের এই কথাটি সুকুমার-কৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে। সুকুমার তাঁর একান্তই পরিণত মনের কথাগুলি বলেছিলেন বালকের 'মতো' করে, বালক 'সেজে'। সেই অমল-চোখ আয়ত্ত করে নিতে পেরেছিলেন তিনি, তাই বহির্বাস্তবের ঘটনাজাল ভেদ করে সময়ের চরিত্রটিকে ধরতে পেরেছিলেন তার স্বাভাবিক সত্যতায়। উপকরণ-বিরল স্বাভাবিকতায় সমৃদ্ধ শিশুজগতের নিয়মকানুনগুলো রপ্ত করে নিতে পেরেছিলেন

বলেই সবল প্রত্যয়ে এ-কথা ঘোষণা করতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি যে পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়ের প্রাথমিক সরলতাই 'সবার চাইতে ভালো'। এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে তিনি সহজেই দেখতে পেয়েছিলেন কীভাবে তাঁর পরিপার্শ্বের মানুষেরা স্বাভাবিক, মৌলিক মানবিকতার ভিত্তিভূমি থেকে বিযুক্ত, অসংলগ্ন হয়ে পড়েছে। এই অসংলগ্নতা, এই বৈপরীত্যেরই রূপকার সুকুমার।

তার অর্থ এ নয় যে সুকুমার-রচনার প্রত্যেকটি অসম্ভব উদ্ভট ঘটনাই একটি করে সুনির্দিষ্ট বাস্তব ঘটনার সচেতনভাবে নির্বাচিত রূপক। কিন্তু এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে সমসাময়িক সমাজ-পরিপার্শ্বে স্থাপন করে বিচার করলে তবেই তাঁর উদ্ভটের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্ফুট হতে পারে। তাঁর রচনা উদ্ভট হতে পারে, অর্থহীন কখনোই নয়। "সুকুমার...উদ্ভট কথা লিখেছেন এন্তার, কিন্তু অর্থহীন একটিও নয়। মানে না থাকলে রস চোঁয়াবে কোন পথে? কান অবধি পৌঁছে থেমে যাবে" (লীলা মজুমদার, 'দেশ', ২০ ৩. ৮২)। আসলে শিল্পীর চেতনায় অনেক কিছুই কাজ করে যায় শিল্পীর সচেতন মনের অগোচরে, অনেক কিছুই নির্ভর করে তাঁর স্বভাবের ওপর। কিন্তু এই স্বভাবও তো আকাশ থেকে পড়া কিছু নয়, শেষ বিচারে তারও তো উৎস নিহিত থাকে ব্যক্তি ও সমাজের টানাপোড়েনের মধ্যে। সুতরাং আপাত-স্বয়ংক্রিয় এই প্রক্রিয়ার সামাজিক উৎস-সন্ধান আমাদের অবশ্য-কর্তব্য।

তাঁর পরিপার্শ্বের মানুষদের কথা বলেছি। শেষ-উনিশ সদ্য-বিশ শতকের শিক্ষিত মানুষ তাঁরা—ভদ্রলোক। ঔপনিবেশিক অস্তিত্ব এই ভদ্রলোক-সমাজের ভাবনাচিন্তা আচারআচরণের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক, অসংগত স্ববিরোধিতার জন্ম দিয়েছিল। তাঁদের কাছে যে-আচার, যে-ভাবনা ছিল একান্ত স্বাভাবিক, ঐ পাঁউরুটি-আর-ঝোলাগুড়ের "স্বাভাবিক সত্যতা"র মাপকাঠিতে তা আজগুবি, অসংগত। কেন রাজনীতি সম্পর্কে 'প্রকৃতিগত অনীহা' থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে বারবার সেই অনধিকারচর্চা করতে হয়েছে, তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "belonging to an unfortunate country, born into an abnormal situation, we find it so difficult to avoid their outbursts"। ঐ "born into an abnormal situation" কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আর 'situation'-টা কী অর্থে 'abnormal'? শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের ভাবনাকল্পনামেধা তখন ছেয়ে রয়েছেন মহামান্য ইংরেজ বাহাদুর। ইংরেজ বুর্জোয়াদের কাছ থেকে শেখা বিদ্যা, মূল্যবোধ নতুন মনোজগতের দ্বার খুলে দিয়েছে। অথচ পায়ের নীচে যে মাটি, চোখের সামনে যে বাস্তবতা, তার সঙ্গে ঐ সদ্যোলব্ধ বুর্জোয়া মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। আধুনিক আইন, বিচারব্যবস্থা, বিজ্ঞান, দর্শন এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে প্রবলভাবে অসংলগ্ন এখানকার উনিশশতকী বাস্তবতা। অথচ এই অসংলগ্নতা সম্পর্কে বাঙালী ভদ্রলোকেরা বহুকাল পর্যন্ত ছিল অচেতন। স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগীর মতো, মনের মধ্যে বাস্তব-বিচ্ছিন্ন নিজস্ব যুক্তি ও মূল্যবোধের কাঠামো গড়ে নিয়ে সেই কাঠামোর মধ্যে অতি স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাদের। সেই অর্থেই situationটা abnormal।

এই দ্বৈতসত্তার ব্যাপারটা, এর অপরিসীম ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার দিকটা সুকুমারের শিল্পচৈতন্যে ধরা পড়েছিল। ঐ সভ্য, ভদ্র, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর বাঙালী পরিপার্শ্বটাকে, তার অস্বাভাবিকতাকে তুলোধোনা করবার জন্য তিনি তাই গড়ে নিলেন তাঁর nonsense-এর আড়াল।

মনের গঠনে কোথাও একটা সহজাত বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর, যা আবাল্য তাঁকে সোজা জিনিষটাকে সোজা করেই দেখতে শিখিয়েছে। বুয়র যুদ্ধে (১৯০৩) ইংরেজের জয়ে বাঙালী ভদ্রজনেরা যখন পরম উল্লসিত, দেখাদেখি বাড়ির ছোটোরা যখন আনন্দে উচ্ছল, তখন কিশোর সুকুমার ধমক দিয়ে বলেছিলেন, 'নিজেরা মাটিতে পড়ে মার খাচ্ছিস, আর অন্যের মার খাওয়া দেখে হাসছিস?' এই হাসির মধ্যে যে স্বাভাবিক লজ্জাটা আছে, সেটা সুকুমারের কাছে খুব স্বাভাবিক ছিল না। এবং এই অসংগতিটা বালক সুকুমারের চোখে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছিল। অথচ, এর পাশে, তুলনা করা যাক ২৯ বছর বয়স্ক সুশিক্ষিত, প্রতিভাবান এক কবির এই মন্তব্যটি:

> তোমরা আপন রক্তপাত করিয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছ...। আমাদের মধ্যে এ আশা কোথা হইতে জন্মিল যে তোমাদের ঐ মহিমান্বিত রাজপ্রাসাদের উচ্চ সোপান আমাদের পক্ষে অনধিগম্য নহে? (১৮৯০)

লেখকের নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কী অদ্ভুতরকম গম্ভীর, স্বাভাবিক প্রত্যয়সিদ্ধ সুরে কথাটা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, যেন ভারতবাসীর চোখে বৃটিশের 'আপন' রক্তপাতের মাধ্যমে ভারতবর্ষ দখল করার ব্যাপারটা বাস্তব তথ্য হিসেবে একান্তই স্বতঃসিদ্ধ।

কিংবা একেবারে অন্য মেরু থেকে আর একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতো উত্তুঙ্গ প্রতিভা নয়, নিতান্তই সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকী মানসিকতার একটি প্রতিফলন ঃ

> আমাদের কামরার সামনে দুধারে দুটো সিঁদুর মাখানো মাটির কলসী ও ছোট ছোট কলাগাছ দিয়ে মঙ্গলঘট বসানো হয়েছে। লেডিজ কমিটি প্রত্যেককে এক একটি করে ব্যাগ দিয়েছিলেন...মহিলারা দেছেন বিপুল আনন্দ সেই দানই সেদিন ছিল আমাদের পাথেয়।...গাড়ির বাঁশি বাজল। গাড়িতে উঠছি এমন সময়ে একটি বাঙালী মেয়ে মধুর কণ্ঠে বলে উঠলেন—"ভিক্টোরিয়া ক্রস আনা চাই কিন্তু।" ('সৈনিক বাঙালী', এম বি সি.)।

উপলক্ষ্য? বৃটিশ-অধিকৃত ভারতবর্ষের বাঙালী তরুণ প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশের হয়ে প্রাণ দেবার সুযোগ পেয়েছে। তাই এই উচ্ছ্বাস। অভিলাষ অতি মহৎ—'বাঙালী ভীরু' এই অপবাদ ঘোচাতে হবে। আশ্চর্যের অথবা অসংগতির—ব্যাপার এই যে প্রত্যক্ষ শত্রু বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিয়ে সে অপবাদ ঘোচানোর কথা তাঁরা ভাবতে পারলেন না, বরং এই ভেবে বৃটিশ প্রভুদের প্রতি অভিমান করলেন যে 'মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষ থেকে শিখ, পাঠান, গুর্খা, মারাঠা পাঠান এবং রাজপুত প্রভৃতি সৈন্যরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে সাম্রাজ্য রক্ষার কাজে সহজেই নিযুক্ত হতে পেরেছিল, কিন্তু বাঙালীর স্থান স্বভাবতই তাতে ছিল না' (ঐ, পৃঃ ৯৯)। এই যে বিচিত্র inversion of logic, গভীর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের শত্রুর জন্য প্রাণ দিতে পারার সুযোগ পেয়ে আহলাদে আটখানা হয়ে যাওয়া—ঠিক এই বাস্তবতা অন্তর্লীন অসংগতিটা সুকুমারের বিজ্ঞান-সংস্কৃত স্বজ্ঞায় (intuition) ধরা পড়ে গিয়েছিল; ছেলে বয়সে যেমন, পরিণত বয়সেও তেমনি।

সুকুমারের চোখে ভদ্রলোকদের বাস্তব আচরণের এই অস্বাভাবিকতাটা ধরা পড়ে যাচ্ছে, কারণ একেবারে সাধারণ—তাই যথার্থ—মৌলিক মানবিক অস্তিত্বের মাপকাঠিতে পরিপার্শ্বকে বিচার করে দেখেছিলেন তিনি। তাঁর রচনায় দেখি কুট উদ্ভটের ভাবনায় তলিয়ে গিয়ে 'রাজা' যখন গলদঘর্ম তখন 'রোগা এক ভিস্তিওলা', কিংবা 'বৃদ্ধ নাজির', এগিয়ে এসে সমস্যার সমাধান করে দেয়। মুশকিল-আসান মানুষগুলি প্রায়ই ভদ্রলোকী চৌহদ্দির বাইরের বাসিন্দা। কোনো অর্থেই ভদ্রলোক নয় তারা—ভিস্তিওলা, মাঝি কিংবা জমাদারের মতো 'ছোটলোক'। মাঝির তত্ত্বানভিজ্ঞতা দেখে "বাবু" ধিক্কারের ভাষা খুঁজে পান না, বলেন মাঝির জীবনের বারো আনাই ফাঁকি। তারপর নৌকা উলটে গেলে "মূর্খ মাঝি বলে, মশাই, এখন কেন কাবু? বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোরো পিছে, তোমার দেখি জীবনখানা ষোল আনাই মিছে।" 'তেজিয়ান' কবিতায় 'রাগে গজগজ্ জুতো মচ্‌মচ্' বাঙালী সাহেবটি অবশেষে জব্দ হয় 'ঝাড়ুবর্দার হারুসর্দার'-এর ময়লা তোলার বালতিতে পদাঘাত করতে গিয়ে।

দেখতে পাচ্ছি, অতি সাধারণ, সাদামাটা, একেবারে মৌলিক জীবনকে নিয়ে তাঁর কারবার। ভদ্রলোকিয়ানার কলুষমুক্ত 'স্বাভাবিক' মানুষরাই সেই মৌলিক জীবনকে আঁকড়ে আছে—তাঁর nonsense-এর জগতে এই মানুষগুলিই প্রবল common sense-এর অধিকারী। আচরণ ও ভাবনার অসংগতি পুঁথিপড়া ভদ্রলোকদেরই কুলক্ষণ। পাগলা ষাঁড়ে তাড়া করলে প্রথম কাজ হচ্ছে ছুটে কোনো নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেওয়া জীবনের এই সহজ স্বাভাবিক বোধ এঁদের নেই; এঁরা তখন 'কেতাব' খুলে উত্তর খুঁজতে থাকেন এবং না পেয়ে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হন। সকলেই এঁরা জীবনের নিজস্ব গতি থেকে, মৌলিক বাস্তবতা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়েছেন। সুকুমারের উত্তল লেন্সের বিশ্লেষণে তাই এঁদের কাণ্ডকর্ম সবই উল্টো হয়ে ধরা পড়েছে।

হ য ব র ল

ভদ্রলোকী কালচারের প্রধান অবলম্বন সাজানো কথা, তৈরি-করা কৃত্রিম মূল্যবোধ। কৃত্রিম জীবনবিচ্যুত মূল্যবোধের জঞ্জাল কীভাবে সহজ জীবনের ভিত্তিমূলটাকেই নড়বড়ে করে তোলে

তা সুকুমারের অসংখ্য রচনায় অসংখ্যবার ব্যক্ত হয়েছে। এর চূড়ান্ত উদাহরণ বোধহয় পাওয়া যাবে 'হযবরল'-তে, যেখানে একটি লোকের গাড়ুর নাম পরমকল্যাণবরেষু, আর ছাতার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। নিতান্তই বাস্তব এই বর্ণনা। ঋষি, গুরুদেব, অপরাজেয় কথাশিল্পী, এশিয়ার মুক্তিসূর্য, মহানায়ক ইত্যাদি শব্দের বুদবুদ ছাড়া মন ওঠে না আমাদের।

একটি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সুকুমার আসলে ফিরে পেতে চাইছেন বেঁচে-থাকার সেই প্রাথমিক মৌলিক সরলতা যাকে তাঁর ভদ্রলোকী পরিপার্শ্ব জলাঞ্জলি দিয়েছে। Negation of the negation-এর উদাহরণ বলা যেতে পারে এ-কে : জীবনের মৌলিক বাস্তবতাকে negate করছে ভদ্রলোকী অস্তিত্ব ; তাদের সেই negationকে পুনরায় negate করলেন সুকুমার ; এই দ্বিতীয় negation-এর ফলে মৌলিক বাস্তবতা সম্পর্কে পাঠকের চেতনার মান উচ্চতর স্তরে উন্নীত হলো।

'হযবরল' 'সন্দেশে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২-এর মে থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এর পটভূমিটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে অল্পকাল আগে। ঘটে গেছে জালিয়ান-ওয়ালাবাগের ঘটনা (১৯১৯)। শুরু হয়ে প্রত্যাহৃত হয়ে গেছে অসহযোগ আন্দোলন। ব্যক্তিগত জীবনেও এক চরম সংকটের মুহূর্ত পার হয়ে এসেছেন সুকুমার। প্রশান্ত মহলানবিশকে লিখিত 'একান্ত ব্যক্তিগত' এক পত্রে (১৯২০) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি জানিয়েছেন যে তাঁর বিশ্বাসের ভিত্ নড়ে গেছে। চারপাশে তাকিয়ে আনন্দ, অমৃত, ভূমার কোনো চিহ্ন তাঁর চোখে পড়ছে না। তমসা থেকে জ্যোতির্লোকে যাওয়ার কোনো লক্ষণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, যদিও ওপর-ওপর একটা সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। সমাজের ছাত্রশাখার একদা-উৎসাহী সম্পাদক সুকুমার 'ছাত্র সমাজে'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

কিন্তু শুধু এটুকুই নয়। আরো একটি বিষয় 'হযবরল'-র পটভূমি বর্ণনায় নিতান্ত অপরিহার্য। সুকুমার রায় হালফিল বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখে চলতেন। সব অর্থেই তিনি ছিলেন বিজ্ঞানের ছাত্র। আপেক্ষিকতার 'বিশেষ' তত্ত্ব (১৯০৫) এবং 'নির্বিশেষ' তত্ত্বের (১৯১৬) যুগান্তকারী অভিঘাত তাঁর বিজ্ঞান-সংস্কৃত সংবেদী মনে আলোড়ন তুলেছিল, তুমুল কিছু দার্শনিক প্রশ্ন জাগিয়েছিল। নিউটনীয় যান্ত্রিকতায় সাজানো বিশ্বজাগতিক মডেলের কার্যকারিতায় সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রবন্ধগুলির মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। বিশেষত, ১৯২১ সালে আইনস্টাইন নোবেল প্রাইজ পাওয়ায়, একথা অনায়াসেই অনুমান করা যায় যে 'হযবরল'-র রচনাকালে এই নতুন চিন্তা তাঁর মননে প্রবলভাবে জাগরূক ছিল। 'হযবরল'-র অনেকগুলি প্রসঙ্গকে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্য ছাড়া বোঝা যায় না। ঐ তত্ত্বের কয়েকটি দিককে, বিশেষত সময়-সম্পর্কিত ধারণাকে তো খুব সরাসরি প্রয়োগ করেছেন সুকুমার। প্রাসঙ্গিক এই দিকগুলি হলো :

(১) গতি বাড়লে চলমান ঘড়ির দোলন-হার কমতে থাকে বলে মনে হয় ;

(২) কোনো একটা system-এ যে ঘটনাবলী একই সময়ে ঘটছে বলে পর্যবেক্ষকের কাছে প্রতীয়মান হয়, অপর কোনো system-এ অবস্থিত পর্যবেক্ষকের কাছে সেই ঘটনাবলী একই সময়ে ঘটছে বলে প্রতীয়মান না-ও হতে পারে ;

(৩) Physical যুক্তিবিচারে সময়কে পরম বলে আর স্বীকার করা যায় না— কারণ তাকে মাপা সম্ভব নয়, তাই বিভিন্ন system-এ অবস্থিত পর্যবেক্ষকদের সকলের পর্যবেক্ষণই সমানভাবে সঠিক।

(New Columbia Encyclopedia, 1975)

কাল পরম নয়, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধের মতো কালও একটা মাত্রা। যে মানদণ্ডে আমরা বিশ্বচরাচরকে, নিজেদেরকে মাপছি, মূল্যমান তৈরি করছি, তাও আপেক্ষিক—পরম বা অলংঘ্য নয়। System-এর পরিবর্তন ঘটলে পর্যবেক্ষণও বদলে যাবে। একমাত্র আলোকের গতি ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কোনো কিছুকেই পরম বলে আপাতত ভাবা যাচ্ছে না। সুকুমার রায়ের ভাষায় : "বিজ্ঞান যে আপাতস্থায়িত্বকে নিত্য নামে অভিহিত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা গতিশক্তির কোনোরূপ মীমাংসা পাইনা। বিশেষত আজকাল পরমাণু সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার মধ্যে একান্ত

অনিত্যতার যে-সকল প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা হারাইয়া, এখন কোনো কিছুকেই নিত্য বলিতে সাহস পায় না। গতির কেন্দ্রে পরমাণু, পরমাণুর মধ্যে সূক্ষ্মতর গতি, বিজ্ঞানের অন্বেষণ এইরূপ চক্রের মধ্যেই ঘুরিতেছে" ('চিরন্তন প্রশ্ন')। ভর (mass) আর শক্তি (energy), বস্তু আর চৈতন্য, এগুলো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ বলে আর ভাবা যাচ্ছেনা। সামাজিক-রাজনৈতিক-দার্শনিক-নৈতিক-ছকটাও বদলে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য ন্যায়পরতার, মানবিকতার প্রতি বিশ্বাস প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভাঙতে শুরু করেছে। নিখুঁত যান্ত্রিক নিয়মে, মসৃণ গতিতে চলমান, ছিমছাম সাজানো পৃথিবীর মনোগত ছবি ভেঙে চুরমার। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক উপলব্ধিকে এই সমাজ-রাজনৈতিক বাস্তবতার উপলব্ধির সঙ্গে মিশিয়ে একাকার করে এক অপরূপ শিল্পসুষমায় রূপ দিলেন সুকুমার, যিনি ইতিমধ্যে কালাজ্বরে আক্রান্ত, মৃত্যুপথযাত্রী।

'হযবরল'-র একেবারে শুরুতেই আমাদের common sense-কে,[8] অর্থাৎ স্বীকৃত যুক্তি-কাঠামোকে একেবারে তছনছ করে দিয়ে রুমাল হয়ে যায় বেড়াল। এবং সেই বেড়াল নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলে ঃ

> বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।

এই মুহূর্তে যে বেড়াল, পরমুহূর্তে সে চন্দ্রবিন্দু, পূর্বমুহূর্তে সে ছিল রুমাল। কাকে বলব বেড়াল, আর কাকে চন্দ্রবিন্দু ; কোন্ ব্যাকরণের নিয়মে কী কী অক্ষর দিয়ে কেন হয় চশমা, এর কোনোটারই হিসেব আমাদের স্বীকৃত যুক্তি-কাঠামোয় আর মিলছে না।

একটু পরেই প্রশ্ন ওঠে, গেছো দাদার দেখা কোথায় পাওয়া যাবে। এতদিন, অর্থাৎ প্রাক্-আপেক্ষিকতা যুগে জানা ছিল, যাঁর বাড়ি মতিহারি তাঁর দেখা মিলবে মতিহারিতেই। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, গেছো দাদার দর্শনপ্রত্যাশী ব্যক্তিটি মতিহারি পৌঁছতে পৌঁছতে গেছো দাদা চলে যাবেন রামকিষ্টপুর—এবং এই লুকোচুরি খেলা চলতেই থাকবে। গেছো দাদার অবস্থান মতিহারিতে—এটা এমন একটা তথ্য যার সত্যতা নির্ভর করছে কোন্ system-এ দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষক এই পর্যবেক্ষণ করছে তার ওপর। বেড়ালের system আর 'আমি'র system এক নয়, তাই দুয়ের হিসেব মেলেনা—

> আমি বললাম, তা হলে তোমরা কি করে দেখা কর ? বেড়াল বলল, সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে দাদা কোথায় কোথায় নেই ; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে ; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে, সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে।...

অর্থাৎ পরম সত্য বলে, অপরিবর্তনীয় 'তথ্য' বলে কিছু থাকছে না ; সত্যতা, এমনকি বলা যায় 'তথ্য'-ত্ব ব্যাপারটাই কেবল এক-একটা system-এর সীমাবদ্ধতার ভেতরেই গ্রাহ্য।

এটা একটা মাত্রা। এর অপর মাত্রাটি সমাজ-বাস্তবতার। গেছো দাদা কে ? তার কথা উঠল কেন ? গেছো দাদা সেই ব্যক্তি যে 'বেজায় গরম'-রূপ সমস্যার সমাধানের পথ বাতলাতে পারে। কিন্তু কোথায় সে ? কোথায় গেলে দেখা মিলবে তার ? তার জন্য আকুতি প্রকাশ করা যায় শুধু, পৌঁছনো যায় না তার কাছে। সমাজের যে 'গভীর গভীরতর অসুখ' তার নিদান আছে যে-মুশকিল আসানের কাছে, যার কথা সকলেই বলছে নিজ নিজ system-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সে কোথায় ?

কাল যেহেতু অন্যনির্ভর, আপেক্ষিক একটা মাত্রা, তাই কোনো একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে যেটা সত্য, পরমুহূর্তে, কালের মাত্রা বদলে গেলে, সেটা আর সত্য থাকছে না।—

> আমি বললাম, তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয়না ? এখন কেন ? কাক বলল, তুমি যখন বলেছিলে, তখনো পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তা হলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।

শুনে 'আমি' তার এতদিনকার পরমতত্ত্ব-বিশ্বাসী যুক্তিতে বলে ঃ

> এমন আনাড়ি কথা তো কখনো শুনিনি। সাত দুগুণে যদি চোদ্দ হয়, তা সে সব সময়েই চোদ্দ। একঘন্টা আগে হলেও যা, দশদিন পরে হলেও তাই।

দুটো যুক্তি-কাঠামোর বিরোধটা খুব স্পষ্ট।

বস্তুত একটা স্তর অব্দি 'হযবরল'-রচয়িতার প্রধান উদ্দেশ্যই যেন এই common sense-জাত যুক্তিকাঠামোর অপ্রতুলতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। ভাবতে অবাক লাগে যে এমন জটিল বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক ভাবনাকে এমন আশ্চর্য মজার মোড়কে মুড়ে তিনি পরিবেশন করতে পেরেছেন। 'হযবরল'-য় প্রকাশিত ভাবনাচিন্তার যে অতল গভীরতা, তাকে কোথাও বাধা দেয় না এর আপাত-ছেলেমানুষীর আবরণ। তাই নিছক মজা হিসেবে ছোটোরা যেমন এ-কে উপভোগ করতে পারে, তেমনি, একই সঙ্গে, ঐ মজা থেকে এতটুকু বঞ্চিত না হয়েই, এর বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক গভীরতা ভাবিয়ে তোলে আমাদের। এতবড়ো কৃতিত্বের অধিকারী বাংলা ভাষায় আর কেউ নেই সেটা হলফ্ করেই বলা যায়; পণ্ডিতজনেরা বলতে পারবেন অন্য কোনো ভাষায় এর তুলনা আছে কিনা।

কিন্তু যুক্তি-কাঠামোর বিরোধ শুধু বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক স্তরেই নয়। সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকেও চিরন্তন বলে আর কিছু থাকছে না। সুকুমারের সেই আশ্চর্য চিঠি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি "চিরন্তন" ধারণাগুলিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন, ঘোষণা করছেন যে তাঁর "cherished illusion"-গুলো ভেঙে যাচ্ছে। অর্থাৎ কিছু সামাজিক মূল্যবোধের অবমূল্যায়ন ঘটছে। কিছুর আবার মূল্য বাড়ছে কি?

সময়ঃ মূল্যবোধের সংকট

Alice in Wonderland-এ Mad Hatter-এর ঘড়িতে সময় জানা যায় না, কেবল দিন জানা যায়। তাদের আজব দেশে সময় কাটে দিনের মাপে, ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ডের মাপে নয়। নষ্ট করার মতো সময় সভ্য সমাজের নেই; পক্ষান্তরে আজব দেশে সময় থেমে আছে, 'নদীর স্রোতের মতো' তা 'বহিয়া যায়' না। 'It's always six o'clock now', সময়ের সঙ্গে ভাব করতে পারলে সময় তোমার বশংবদ হয়ে কাজ করবেঃ সকাল ন'টায় পড়তে বসার কথা, কিন্তু ঘড়িতে দেখাবে দেড়টা—তখন খাবার সময়। সময় মেপে চলা, সময়কে কাজে লাগানো, যার অর্থ মুনাফা বাড়ানো—পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের এই ethos নিয়ে ঠাট্টা করা হয়েছে Alice-এ।

'হযবরল'-তে এই জিনিষটাই একটু অন্য চেহারা নিয়ে এসেছে। 'আমি'দের দেশে "সময়ের দাম নেই" শুনে হিসাব-রক্ষক কাক "ভারি অবাক হয়ে যায়"। U. Roy and Sons-এর পরিচালক সুকুমার রায়চৌধুরী ভালো করেই চিনতেন এইসব কেজো লোকেদের, যাদের কাছে Time is Money; হাসিগল্প করা, ঠাট্টা করার অপর নাম যাদের কাছে সময় নষ্ট করা। কাক তাই মহা খাপ্পা হয়ে বলে ওঠেঃ

> আমাদের বাজারে সময় এখন ভয়ানক মাগ্যি, এতটুকু বাজে খরচ করার যো নেই। এই তো কদিন খেটেখুটে চুরিচামারি করে খানিকটা সময় জমিয়েছিলাম, তাও তোমার সঙ্গে তর্ক করতে অর্ধেক খরচ হয়ে গেল।

মানুষের জীবন ভীষণ ধরাবাঁধা, বর্ণহীন, একমাত্রিক, মানবিক উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে। বাজে খরচের কোনো সুযোগ থাকছে না মানুষের। নিজের খণ্ডিত, কর্তিত জীবন-বোধের মানদণ্ডে মানুষকে মাপছে মানুষ—মানুষের use-value-টুকুই কেবল নিচ্ছে। যে-ফিতে দিয়ে অকাজে অতিব্যস্ত "এখন তেরো" বছর বয়সী বৃদ্ধ 'আমি'কে মাপে, তার লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে সবই ছাব্বিশ ইঞ্চি হয়ে যায়। খণ্ডিত-চৈতন্য মানুষ সামাজিক মানুষকে তার পূর্ণ তায় দেখতে পায়না, সব মানুষকেই মাপা হয় ঐ ছাব্বিশ-ঝাঁচিতে ফিতেয়।

একদা কিন্তু ফিতেটাতে সব লেখাই ছিল, এখন "উঠে গিয়েছে"। প্রাক্-পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত অন্ধকার সত্ত্বেও একথা ঠিক যে মানবিক সম্পর্কগুলো সেখানে এমন একমাত্রিক ছিল না, কেবল টাকা আনা পাইয়ের হিসেবে, কেবল use-value হিসেবেই মানুষের মূল্য নিরূপিত হতো না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পরবর্তী যে বাঙালী সমাজ, তাকে পুরোনো অর্থে সামন্ততান্ত্রিক বলা চলে না, সামন্তসমাজের মানবিকতার দিকটি সেখানে লুপ্ত, হতমান; তার পরিবর্তে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থ-কেন্দ্রিক মূল্যবোধের শিকার হয়েছে ঐ সমাজ। কিন্তু সমস্যাটা এখানেই থেমে নেই, তার ডালপালা ছড়িয়েছে অনেক দূরে, অজস্রবিধ স্ববিরোধিতায়। বিকলাঙ্গ মুৎসুদ্দি-পুঁজিতন্ত্রের দাপটে পুরোদস্তুর বুর্জোয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে উঠতে পারেনি সে সমাজে, অপরদিকে "a caricature of British

landlordism"-এর দৌলতে এক নয়া-সামন্তশ্রেণী শক্ত আসন গেড়ে বসেছে। পুঁজিতান্ত্রিক অর্থ-কেন্দ্রিক মূল্যবোধে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও সমাজ বুর্জোয়া চারিত্র্য অর্জন করতে পারেনি, অপরদিকে পুরোনো সামন্তসমাজের মানবিকতা অবলুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও সামন্তীয় পিছুটান কাটানো সম্ভব হয়নি। উভয় ব্যবস্থার নেতিবাচক দিকগুলির শিকার হয়েছে সমাজ। কাজেই মূল্যবোধের সংকটে ভুগছে ভদ্রলোকেরা। অবস্থাটা প্রকৃত অর্থেই একটা হযবরল। আবারও মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের খেদোক্তি : born into an abnormal situation একদা তিনিও তো হাহাকার করে উঠেছিলেন : "সমগ্র মানব তুই পেতে চাস, এ কী দুঃসাহস।"

সংখ্যার ছাপ দিয়ে মানুষকে মাপার প্রসঙ্গে অবধারিতভাবে এসে পড়ে 'রক্তকরবীর' ৪৭ফ আর ৬৯ঙ'র কথা। তফাৎ এই, সেখানে সরাসরি শোষক-শোষিত সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এসেছে ঐ সংখ্যায়ন; আর এখানে ভদ্রলোকী পরিমণ্ডলের নিজস্ব মূল্যবোধের সংকটটিকেই উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে।

মূল্যবোধের এই সংকটের আরেকটি অভিব্যক্তি হলো চির-প্রচলিত myth-এর ব্যবহার-অযোগ্যতা, অনুপযোগিতা। কাক যতক্ষণ হিসেবে ব্যস্ত, বুড়ো ততক্ষণ "একটি চমৎকার গল্প" বলে। চরিত্রগুলি রূপকথার : রাজা, রাজকন্যা, পক্ষীরাজ, মন্ত্রী, রাক্ষস। কিন্তু ভদ্রলোকী জীবন সরে এসেছে সেই ভিত্তিভূমি থেকে যা ঐ উদার সরল রঙের অমরাবতীর স্রষ্টা। তাই রূপকথার মধ্যেও এসে পড়ে গুলিসুতোর মতো নেহাৎ গদ্যময় প্রসঙ্গ, একদা পরাক্রমশালী রাক্ষস আজ ছোটো ছেলের মতো খাট থেকে পড়ে যায়, 'ন্যাজ' কাটা যায় পক্ষীরাজের, এমনকি রাজার পারিষদদের মধ্যে কেবল ডাক্তার নয়, থাকে মোক্তারও। সুতরাং ওখানে আমাদের—ভদ্রলোকদের—আশ্রয় নেই। ঐতিহ্যবাহিত myth, যা উৎপাদনশীল মানুষের সৃষ্টি, তা আজ উপযোগিতা হারিয়েছে আমাদের কাছে। ওটা আমাদের গবেষণার সামগ্রী, মূল্যবোধের সংকট থেকে পরিত্রাণের আশ্রয় নয়।

ইতিমধ্যে কাক্কেশ্বর তার হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে শুরু করেছে। সত্যি বলতে কী, এই ব্যাপারটার সঙ্গে বাস্তবের যোগ এতই প্রত্যক্ষ যে এটা আর উদ্ভটের স্তরে থাকেনি। "হিসাবী ও বেহিসাবী, খুচরা ও পাইকারী সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করিয়া" থাকে কাক্কেশ্বর। খুচরা, পাইকারী ইত্যাদি নিতান্তই ব্যবসায়িক শব্দের পাশাপাশি "বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া" কথাটির বৈপরীত্য লক্ষণীয়। "গণনা" যে কেবল টাকা-আনা-পাইয়ের গণনা নয়, কোষ্ঠী কিংবা ভাগ্যগণনাও বটে, সেটা বলা বাহুল্য। তথাকথিত জ্যোতিষ "বিজ্ঞান" নিয়ে যে বুজরুকিটা চলে তার প্রধান উপজীব্য হচ্ছে কথার খেলা। এইসব "বৈজ্ঞানিক" যুক্তির মধ্যে থেকে অসম্ভবের উপাদানটি চয়ন করে নিয়ে তাকে বহুগুণিত করে দেখিয়েছেন সুকুমার : "আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ, কান কট্‌কট্‌ করে কিনা, জীবিত কি মৃত ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই" ক্যাটালগ পাঠাবে কাক্কেশ্বর। লোকঠকানোর এই ব্যবসায়ে উচ্চবর্ণীয়দের একচেটিয়া অধিকারে ভাগ বসাতে এসেছে কিছু তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তিরা। তাই কাক্কেশ্বরের সাবধানবাণী : "আমরা সনাতন বায়সবংশীয় দাঁড়িকুলীন, অর্থাৎ দাঁড়কাক। আজকাল নানা শ্রেণীর পাতিকাক, হেঁড়েকাক, রামকাক প্রভৃতি কাকেরাও অর্থলোভে নানারূপ ব্যবসা চালাইতেছে। সাবধান!" এই ভাষা ও বক্তব্য আজও আমাদের অতিপরিচিত।

আইনের ধোঁয়াশা

কই ভাবে, কথার ধোঁয়াশায় ঢাকা আরেকটি জগতের অবাস্তবতাকে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন সুকুমার : আইনের ভাষা। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অর্থহীনতায় পর্যবসিত কতকগুলো শব্দ আইনের আশ্রয়। সোজা সরল সত্যটাকে কত বেঁকিয়ে, কত জটিল করে বলা যায় তার চমকপ্রদ নিদর্শন আইনের ভাষা—বিশেষ করে ফারসী থেকে চলে-আসা শব্দ-সমন্বয়ে গঠিত বাংলা আইনের ভাষা। কাক্কেশ্বরের হিসেবে এইরকমেরই শব্দগুলিকে at random সাজিয়ে এই কথা-ব্যবসায়কে চাবকেছেন সুকুমার। বুড়ো যখন বিরক্ত হয়ে বলে :

এসব কি লিখেছ আবোল তাবোল?

কাক তখন স্পষ্টই কবুল করে :

ওসব লিখতে হয়। তা নাহলে আদালতে হিসেব টিকবে কেন? ঠিক চৌকস মতো কাজ করতে গেলে গোড়াতে

এসব বলে নিতে হয়।

যে-হিসেবটা 'চৌকস মতো' করবার জন্য কাক এসব লিখল, সেটা কী ?—

সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা / ২॥ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।

মানদণ্ডগুলো ওলোটপালোট হয়ে গেছে। যা দিয়ে মানুষ মানুষকে মাপতে পারে, মূল্যবোধ গড়তে পারে, সেই মাপকাঠি-গুলো আর ঠিক নেই।

আইন সম্পর্কে সুকুমারের তির্যক ভাবনার গুরুত্ব আমাদের কাছে খুবই বেশি মনে হয় আরেকটা কারণে। যে-কয়েকটা সম্মোহের (illusion) ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা, তার অন্যতম হলো আইন বা বিচার-ব্যবস্থার পরম ন্যায়পরতা। বুর্জোয়া আইন নাকি মানুষে মানুষে ভেদ করে না, তা নাকি বাস্তবের শ্রেণীভেদের ঊর্ধ্বে। খাঁটি বুর্জোয়া সমাজেও এ ভাবনা নিছক সম্মোহই ; আর সুকুমারের প্রত্যক্ষ পরিপার্শ্বে, যা কেবল আপতিকরূপেই বুর্জোয়া, যার গভীরে খরস্রোতে খেলা ক'রে চলে সামন্ততান্ত্রিক-কতা, সেই সমাজের ক্ষেত্রে তো এটাকে এমনকি গ্রহণযোগ্য সম্মোহ বলে ধরে নেওয়ারও যৌক্তিকতা ছিল না। অথচ ঐ আইন, ঐ বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাঙালী শিক্ষিতদের মোহ কী প্রবল। সুকুমার যেহেতু তৈরি করা ধারণার আরোপিত মানদণ্ডে জগৎজীবনকে দেখতেন না, দেখতেন তার স্বাভাবিক সত্যতায়, জীবনের নিজস্ব গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, তাই ঔপনিবেশিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচার-ব্যবস্থা, আইন ইত্যাদির সীমাবদ্ধতার দিকটা ধরে ফেলতে তাঁর একটুও কষ্ট হয়নি।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, ভদ্রলোক বাঙালীর কাছে আইন ছিল পেশা হিসেবে সবচেয়ে লোভনীয়। সাহিত্যশিল্পে, রাজনীতিতে আইন ব্যবসায়ীদের প্রকোপ ছিল ব্যাপক। এটা একদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সচেতনভাবে পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার অবধারিত পরিণাম, অপরদিকে তখনকার সামাজিক অবস্থার স্পষ্ট প্রতিফলন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণামে, বিশেষত "১৮১৯ সালের অষ্টম রেগুলেশন অনুযায়ী যখন মধ্যস্বত্বগুলিকেও জমিদারী স্বত্বের মতো পাকা বিধিসম্মত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তখন থেকে"[৫] মধ্যস্বত্বভোগীদের এক শেষহীন সারি তৈরি হতে থাকে। এদের অন্তর্কলহও ছিল শেষহীন। এর স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল অসংখ্য মামলা মোকদ্দমায়। কাক্কেশ্বরের হিসেবের শব্দগুলি লক্ষণীয় : ইমারৎ, খেসারৎ, ওয়ারিশান, মালিক, দখলিকার স্বত্ব, নায়েব, সেরেস্তা, পত্তনীপাট্টা ইত্যাদি। ইংগিতটা খুবই স্পষ্ট।

হিজি বিজ বিজ

ভদ্রলোকী বাস্তবতার অস্বাভাবিকতাকে সবচেয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেয় হিজি বিজ বিজ। চরিত্রটি বহুমাত্রিক। অনেক কথা বলতে চেয়েছেন লেখক এর মধ্যে দিয়ে। প্রথমত এর নামটি। হিজি বিজি আর বিড়বিড়—এই দুটি শব্দের সংমিশ্রণে এসেছে হিজি বিজ বিজ। দুটি শব্দই নিরর্থকতা ও অস্পষ্টতা-বোধক। হিজি বিজ বিজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে তার সম্পর্কে যে বর্ণনা পাই তা এইরকম : "একটা জন্তু—মানুষ না বাঁদর, প্যাঁচা না ভূত, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।" ব্যাকরণ-না-মানা ট্যাঁশগরু, হাঁসজারু, বকচ্ছপ কিংবা রামগরুড়ের ভাবনাটাই খেলা করছে এখানে। স্বভাবের দিক থেকে অবশ্য সে রাম-গরুড়ের একেবারে উল্টো। সভ্যসমাজের নিয়মকানুন, ভদ্রতা-সহবৎ সব ভাসিয়ে দিয়ে সে উদ্দাম হাসে, ঐ হাসিটাই তার বৈশিষ্ট্য। উদ্ভট, অস্বাভাবিক কথা কল্পনা ক'রে ক'রে সে হাসে, হেসে হেসে "খামখা কষ্ট" পায়।

উনিশ শতকী ভিক্টোরিয় মাপাজোকা আদবকায়দার আদলে ব্রাহ্ম-সমাজের মানুষদের চলাফেরা, এঁদের সঙ্গে সুকুমার রায়ের ওঠাবসা। সাধারণ বাঙালীর মতো কাছাখোলা হাসি বা স্ল্যাঙের ব্যবহার তাঁদের কাছে ছিল অচিন্তনীয়। অথচ ভেতরে ভেতরে, গুণগতভাবে তাঁরা এতটুকুও আলাদা নন গড়-পড়তা ভদ্রলোক বাঙালীদের থেকে।[৬] এই সমস্ত অর্থহীন, মানবিক স্বভাববিরোধী আদবকায়দাকে সুকুমার মেনে নিতে পারেন নি। বাল্যকালের একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। একবার হাওয়া বদলাতে দার্জিলিং গিয়ে এক মাসীর পাল্লায় পড়েছিলেন সুকুমার। মাসী তাঁকে বিলিতি আদবকায়দা শেখাবেনই। পুণ্যলতা চক্রবর্তী লিখছেন : "শেষটায় দাদা বিদ্রোহ করল। অত্যন্ত বোকার মতো মুখ করে, হাঁ করে কুঁজো হয়ে এসে বসল, দুই হাতে মুঠো করে কাঁটা চামচ

খাড়া করে ধরে, খটাখট শব্দে খেতে আরম্ভ করল ঃ তাড়াতাড়ি খেয়ে অতি সন্তর্পণে কাঁটা-চামচ ঠিক করে ধরতে গিয়ে 'কি যেন কি করে' হাত-ফস্‌কে চামচ-কাঁটা এদিক-ওদিক ছিট্‌কে পড়ে গেল। সোজা হয়ে বসতে বলাতে, চেয়ারের দুই হাতলে ভর করে আস্তে আস্তে কষ্টেসৃষ্টে খাড়া হওয়া মাত্রই হঠাৎ 'কেমন করে যেন' পিছলে সড়াৎ করে টেবিলের নিচে চলে গেল আর চিবুকটা ঠকাস্‌ করে টেবিলে ঠুকে গেল।" সুকুমারের 'বিদ্রোহে'র ধরণটা লক্ষণীয়। নিজের আচরণের স্বাভাবিকতাকে বিপর্যস্ত করে তুলে তিনি আসলে মাসীর মেম-সাহেবিয়ানার অস্বাভাবিকতা ও অসংগতিকেই স্পষ্ট করে দিলেন। হিজি বিজ বিজের হাসির অস্বাভাবিকতা দিয়ে তিনি বিদ্রোহ করলেন চতুষ্পার্শের রামগরুড়-শাবকদের মানবিকতা-বিচ্যুৎ জগৎটার বিরুদ্ধে।

যেসব "অসম্ভব কথা" ভেবে ভেবে "খামখা" হেসে কষ্ট পায় হিজি বিজ বিজ, একটু তলিয়ে দেখলে সেগুলোর মধ্যে একটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। এরকম একধরণের অসংগতির, অসম্ভবের উপাদান যে শিক্ষিত বাঙালীর কাজ-কর্মের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল সেটা সুকুমারের শিল্পীচৈতন্যের কাছে স্পষ্ট ছিল। একহাতে কুল্‌পি থাকা সত্ত্বেও অন্য হাতের সাজিমাটিই খাচ্ছিল তারা ঃ শেক্‌স্‌পীয়র-শেলী-মিল্‌টন আউড়ে শেষ পর্যন্ত তারা সওদাগরি অফিসের খাতা পিষছিল। "নাইয়ে ধুইয়ে" সযত্নে টিকটিকি শুকোতে দেওয়ার মধ্যে বাবুসম্প্রদায়ের পায়রা-বুল্‌বুলি কালচারের ওপর কোনোই কটাক্ষ নেই একথা হলফ্‌ করে বলা যায় কি? কিংবা সেই আশ্চর্য 'চ্যাপ্টা পৃথিবী'-প্রসঙ্গ? এর দ্বারা নব বা অষ্টগ্রহের কলিশনে আচম্‌কা পৃথিবী লয় পাওয়ার জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্‌-বাণীর অভ্রান্ততাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হলো কি না, সেটা ভেবে দেখবার মতো। তাছাড়া সেই common sense-কে ঠাট্টা করার ব্যাপারটাও আছে। আমাদের চোখে-দেখা পৃথিবীটা তো চ্যাপ্টাই, নিছক চোখে দেখে কে বলবে যে আমরা একটা ঘুরন্ত বলের ওপর চলে ফিরে বেড়াচ্ছি? পৃথিবীটা 'যদি' চ্যাপ্টা হয়ে যায়, এই কথা ব'লে সুকুমার পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিলেন, পৃথিবীটা আসলে চ্যাপ্টা নয়, আমাদের চোখ যাই বলুক।

প্রসঙ্গত, হিজি বিজ বিজের নামবর্ণনা (আমার নাম—, আমার ভায়ের নাম—, আমার বাবার নাম ইত্যাদি) রবীন্দ্র-নাথের 'আর্য ও অনার্য' (১৮৮৫) ব্যঙ্গ-নাটিকাটিকে মনে পড়িয়ে দেয় ঃ

চিন্তামণি ঃ আমি আর্য—আর্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব।

অদ্বৈত ঃ আর্য জিনিষটা কী মশায়?

চিন্তামণি ঃ (বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে, আর্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা ৺নফরচন্দ্র কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা—

পুনরায়—

চিন্তামণি ঃ যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা ৺নফরচন্দ্র কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা—

হিজি বিজ বিজের কথা শেষ হতে না হতে আসে রাম-ছাগল প্রসঙ্গ, যে-রামছাগলের গলায় ঝোলানো বিজ্ঞপ্তি ঃ পি. এ. খাদ্যবিশারদ। "খুব চমৎকার ব্যা" করতে পারে বলে তার নাম ব্যাকরণ, আর "শিং তো দেখতেই পাচ্ছ"। মাত্র একজন বালক এবং হিজি বিজ বিজ তার শ্রোতা হওয়া সত্ত্বেও সে মহতী জনসভার যোগ্য উদাত্ত সম্বোধনে[৭] "হে বালক-বৃন্দ এবং স্নেহের হিজি বিজ বিজ" বলে বক্তৃতা শুরু করে, ব্যাখ্যা করে তার পদবী ঃ "ইংরিজিতে লেখবার সময় লিখি B. A. অর্থাৎ ব্যা। কোন্‌ কোন্‌ জিনিষ খাওয়া যায়, আর কোনটা কোনটা খাওয়া যায় না, তা আমি সব নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, তাই আমার উপাধি হচ্ছে খাদ্যবিশারদ।" বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার, এমনকি গবেষণার সামাজিক নিরর্থকতাকে, উক্ত শিক্ষা সম্পর্কে ভদ্রলোকদের অভিমানকে এর চেয়ে স্পষ্ট ক'রে আর কীভাবে ব্যঙ্গ করা যেত? বস্তুত, প্রায় আগাগোড়াই তাঁর উদ্দেশ্যকে আপাত-নিরীহ fun-এর আবরণে মুড়ে রাখলেও 'হযবরল'-র এই অংশে তাঁর ক্রোধ খুব প্রত্যক্ষ চেহারা পেয়ে গেছে। রামছাগলের এই হঠাৎ-ব্যাদানে তাই কোথায় যেন একটু তাল কেটে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বোঝা যায় যে তথাকথিত নির্মল বস্তুকলুষমুক্ত হাসি পরিবেশন করাটাই সুকুমারের শেষতম এবং প্রথমতম ইচ্ছা ছিল না।

ন্যাড়ার গান

ন্যাড়ার গানগুলি নন্‌সেন্স সাহিত্যের পরাকাষ্ঠা হিসেবে গণ্য হতে পারে। উপরি-স্তরের অর্থহীনতা, এবং গভীরশায়ী বিচিত্রমুখী ব্যঞ্জনা—সুকুমারীয় ননসেন্সের এই একান্ত বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এই গানক'টি।

ন্যাড়ার প্রথম গানের একটিই পদ : লাল গানে নীল সুর হাসি হাসি গন্ধ। ভারতীয় সংগীত-ঐতিহ্যে সুরের বর্ণ-কল্পনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। একেকটি রাগের সঙ্গে একেকটি বা কয়েকটি রঙের সম্পর্ক বহুকাল ধরেই শিল্পী-কল্পনায় স্বীকৃত। সুতরাং অ-পূর্বত্ব সেখানে নয়। একটা ইন্দ্রিয়ের বোধের সঙ্গে আরেকটা ইন্দ্রিয়ের বোধের যে মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে, সেটাই, এবং তার অপরূপ নিরর্থকতাই, আসল মজা। রবীন্দ্রনাথ যখন অবলীলায় লেখেন, "দিকে দিগন্তে যত আনন্দ / লভিয়াছে এক মধুর গন্ধ" কিংবা একলা ধুলোয় বসে-থাকা ছোটো মেয়ের ডালি সাজানোর দৃশ্য যখন তাঁর "চোখে বীণা" বাজায়, তখন হাসি পায় না আমাদের, ব্যাপারটাকে উদ্ভট মনে হয় না একটুও। কারণ এই মিশ্রণের উদ্দেশ্যটি, অর্থটি, তৎক্ষণাৎ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু লালরঙা গানের পদ, নীলরঙা সুর এবং হাসি-হাসি গন্ধ আমাদের তিনটি ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে তালগোল পাকিয়ে দিলেও তৎক্ষণাৎ কোনো একটা নির্দিষ্ট অর্থময়তায় পৌঁছে দেয় না। এটা আবছাভাবে ইংগিতবহ হয়ে ওঠে কেবল 'হযবরল'-র নিজস্ব পরিপ্রেক্ষিতে —যেখানে আমাদের চিন্তাচেতনা বোধবুদ্ধি মূল্যবোধের ওলোটপালটটাই একের পর এক উদ্ভট চিত্রকল্পমালায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলে।

"খুব নরম সুরে" গেয় "নাইনিতালের নতুন আলু"-র মধ্যে অবশ্য এই দীপ্তি নেই। অনুপ্রাসের ঝংকার এবং প্রসিদ্ধ আলুর সুসিদ্ধ স্বাদু নম্রতাকে সুরের ভাষায় অনুবাদ করার মধ্যে যে-রসবোধের প্রকাশ ঘটেছে তা মূলত রসনানির্ভর, একমাত্রিক। পরের গানটি কিন্তু অত নরম নয়, বরং বেশ শক্ত। শক্ত—অর্থাৎ দুর্বোধ্য, দুরূহ। তানকর্তবযুক্ত, জটিল তালের গান 'শক্ত'; পড়বা-মাত্র বোঝা যায় না, এমন কবিতাও 'শক্ত'। মহৎ শিল্পের রসোপলব্ধির জন্য অন্তরানুভূতির প্রগাঢ় গভীরতা প্রয়োজন, প্রয়োজন বড়ো-অর্থে শিক্ষা। যার জন্য দৈনন্দিনতা-ক্লিষ্ট common sense-এর আগড় ভাঙা সবার আগে প্রয়োজন। কিন্তু আধুনিক বৈশ্য সমাজের প্রভুদের তা অভিপ্রেত নয়। তাই গড়পড়তা শিক্ষিত ভদ্রলোক খুব গড়পড়তা মাপের ছাঁচে-ঢালা সুবোধ্য পণ্যই সুবোধ বালকের মতো গলাধঃকরণ করেন। তার বাইরে যা কিছু, যা কিছু আয়াস সহকারে উপলব্ধি করতে হয়, সেটাই তাঁদের কাছে 'শক্ত'। "শিক্ষিত" সমালোচকদের শিল্প-আস্বাদনও একই রকম সংবেদনহীন। ব্যাকরণ মিলিয়ে, শব্দের আক্ষরিক অর্থ ধরে ধরে, তালের মাত্রা গুণে গুণে, ঠিক রাগে ঠিক স্বর লাগল কিনা সেই হিসেব করে তবে এঁরা রসসৃষ্টির ভালো-মন্দ বিচার করেন। অসাড় এই যান্ত্রিকতার প্রতিভূ, বি. এ. খাদ্য বিশারদ উপাধিযুক্ত শ্রীযুক্ত ব্যাকরণ শিং-এর কাছে তাই "ঐ শিশিবোতলের জায়গাটা একটু শক্ত ঠেকল, তা ছাড়া তো শক্ত কিছু পেলাম না"। স্মরণীয়, আনন্দের "মধুর গন্ধের" সন্ধান পাওয়ার অপরাধে একদা ব্যঙ্গের কশায় জর্জরিত হতে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে। আনন্দের গন্ধের কথা তো কোনো ব্যাকরণে লেখেনা! ওরকম সৃষ্টিছাড়া শক্ত গান লেখা কেন!

ন্যাড়ার অন্তত দুটি গানের মধ্যে যে-আবহ তৈরি করা হয়েছে তা অতি ভয়ানক—যদিও মেজাজটা একেবারেই মজার। চামচিকে আর পেঁচারা আসবে, এই ভয়ে "মরবে ইঁদুর বেচারা, কাঁপবে ভয়ে ব্যাঙগুলো আর ব্যাঙাচি", আর দাঁতকপাটি লাগবে ছুঁচোর। যেন খবর এসেছে, জালিয়ানওয়ালার মাঠে সৈন্যসামন্ত নিয়ে আসছে ও'ডায়ার কিংবা হয়তো ধরপাকড় চালানোর জন্য আসছে প্রবলপরাক্রান্ত কোনো নতুন দমন-আইন। 'হযবরল' রচনার (১৯২২) অব্যবহিত আগে ভারতবর্ষে যে সন্ত্রাসের অবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, তারই দূরাগত ছায়াপাত ঘটেছে এখানে, এমন অনুমান সম্ভবত অসংগত নয়। একটু পরে আমরা আবার খবর পাই যে খ্যাঁতলা মাথা হ্যাংলা সজনেতলায় হাড়কচাকচ ভোজ মারছে আর মুণ্ডুঝোলা উল্টোবুড়িও মিন্সেগুলোর তুলতুলে মাংস খাবার রাক্ষুসে সংকল্প ব্যক্ত করেছে।

এমন একটা ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনে সজারু কিন্তু

আপত্তি করে কেবল এই ভেবে যে এর ফলে তার গিন্নীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে। অন্যের সুখদুঃখের প্রতি বীতস্পৃহ, অনীহ, আত্মতুষ্ট একশ্রেণীর ভদ্রলোকী মানসিকতার নিখুঁত প্রতিফলন পাই এখানে।

অথচ, শিল্পী সুকুমারের মুন্শিয়ানা এইখানে যে গানগুলিতে মজার ভাগে কোথাও খামতি নেই। ভয়ের চোটে জলচর ব্যাঙাচি এমন ঘামবে যে তার গায়ে ফুটবে ঘামাচি; দাঁতকপাটি লাগা সত্ত্বেও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটবে ছুঁচো। এই বিচিত্র কল্পনার "অভাবনীয় অসংগতি" উপভোগ করার জন্য পূর্বে বর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখার একটুও দরকার নেই। আর শব্দ-ভাঙা শব্দ-গড়ার যে খেলায় ওস্তাদ ছিলেন সুকুমার তারও অপরূপ নিদর্শনগুলির দেখা মিলবে এখানে। "হোঁৎকা" এবং "হাঁদাড়ে", "ভোঁপসা-মুখো ভ্যাপাটে"—ব্যাকরণ না-মানা এইসব অদ্ভুত শব্দই কি পরে রবীন্দ্রনাথের "পাঠশালার পেড়েভো"দের "আন্তারা ফুস্কুনিয়ে" দিয়েছিল?

বিচারপতি, তোমার বিচার

স্ত্রৈণ সজারুর গিন্নীর ঘুম ভেঙে যাওয়ার অজুহাতকে খুব একহাত নেয় হাদুড়গোপাল। নিরীহ, বেচারী, আত্মতুষ্ট ভদ্রলোক সজারুর তাতে মানহানি হয়, সে মামলা রুজু করে। যেটা ছিল ব্যাং, ইঁদুর আর ছুঁচোর জীবনমরণ সমস্যা তা রূপান্তরিত হলো তুচ্ছ ভদ্রলোকী মানরক্ষার সমস্যায়। এই মান যে পরে কচু, এবং অবশেষে কচুরিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, তার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে।

বিচারদৃশ্যের প্রথমেই আমরা দেখছি, সজারু কাঁদছে, "আর একটা শাম্লাপরা কুমির মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে আস্তে তার পিঠ থাবড়াচ্ছে।" 'শাম্লাপরা' কথাটিই বলে দেয় যে কুমির হচ্ছে উকিল। উকিল 'মস্ত একটা বই' দিয়ে মক্কেলকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বইটা যে আইনের বই, তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। আইন—বুর্জোয়া ন্যায়পরতার মূর্ত রূপ। আইনের পরম ন্যায়পরতার illusion দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে বিচারপ্রত্যাশীকে। সওয়াল শুরু হওয়া মাত্র উকিল আক্ষরিক অর্থে কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে। গোটা ব্যাপারটা যে ভণ্ডামি, সেটা গোড়াতেই পরিষ্কার হয়ে যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'আইনে'র বই থাবড়ে সজারুকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যাপারটি প্রতীকি তাৎপর্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মনে পড়ে যায় ককেশিয়ান চক্ সার্কল্-এর সেই দৃশ্যটি যেখানে "বিচারক" আস্তাক চেয়ারের ওপর আইনের মোটা বইটা পেতে তার ওপর চেপে বসে। ন্যায়বিচার প্রত্যাশা ক'রে, সমস্যা সমাধানের মানসে, অর্থাৎ আইনের পরম ন্যায়পরতার illusion-এ বিশ্বাস ক'রে যারা বিচারশালার দ্বারস্থ হয় তারা দেখতে পায় প্রকৃত সমস্যার সমাধান করাটা কারুরই মাথাব্যথা নয়ঃ উকিল সওয়াল করে সওয়ালের জন্যই, বিচারক ঘন অন্ধকার ছাড়া চোখে দেখতে পায় না—দিনের প্রখর আলোয় প্রত্যক্ষসত্য তার চোখে ধরা পড়ে না।

বাস্তব অবস্থা থেকে, বাস্তব সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, স্রেফ কথার জন্যই কথার জাল বুনে তৃপ্তি লাভ করার অসামান্য উদাহরণ কুমিরের সওয়ালঃ "এটা মানহানির মোকদ্দমা। সুতরাং প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে।" অতঃপর, নিছক 'মান' শব্দের ভিন্ন প্রয়োগের দৌলতে মান হয়ে যায় কচু এবং মহাসমারোহে তখন কচুর শ্রেণীবিভাগ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে চলে বক্তৃতা। পরে কাক যখন বিবরণী পেশ করে ততক্ষণে আবার কচু হয়ে গেছে কচুরি। এই পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে বেচারী সজারুর সমস্যার কোনো সম্পর্ক নেই।

চার আনা পয়সা দিয়ে সাক্ষী জোগাড় করার প্রসঙ্গে বাক্যব্যয় বাহুল্য মাত্র। তবে "সাক্ষীর কোনো মূল্য নেই" শুনে কুমির যখন "রেগে ল্যাজ আছড়িয়ে বলল, 'কে বলল মূল্য নেই? দস্তুর-মতো চার আনা পয়সা খরচ করে সাক্ষী দেওয়ানো হচ্ছে'" তখন তার আহত ন্যায়পরায়ণতার ভঙ্গিটি আমাদের খুব চেনা মনে হয়।

পয়সা পেয়ে সাক্ষ্য দিতে উঠেই যথারীতি হিজি বিজ বিজ "ফ্যাকফ্যাক করে হেসে ফেলল"। সাজানো সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কী বিপত্তি, তা মনে করেই তার হাসি। এর পরেই সেই বিখ্যাত নামকরণ-প্রসঙ্গ। কল্পনা করা যাক কোর্টের গুরুগম্ভীর পরিবেশঃ সম্মুখে সমাসীন ন্যায়ের অবতার বিচারক, মাননীয় আইনজীবীগণ বক্তৃতার জন্য অপেক্ষারত কিংবা বক্তৃতারত—সব মিলিয়ে একটা সমীহ-জাগানো আবহাওয়া।

অথচ এর অন্তরালে পুরো ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যের ওপর। সেই মিথ্যেটাকে চাপা দেবার জন্য কত কসরৎ, কত কৌশল। বিচারককে 'ধর্মাবতার', 'My Lord' বলতে হবে, উকিলকে বলতে হবে 'আমার পণ্ডিত বন্ধু', 'যাহা বলিব সত্য বলিব' বলে শপথ করে সাক্ষ্য দেবে সাক্ষী—এই পরিবেশে হিজি বিজ বিজ জানায় যে একটি লোক তার গাড়ুর নাম দিয়েছে পরমকল্যাণবরেষু আর ছাতার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। সে একথাও জানায় যে বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেওয়া মাত্র বাড়িটা ধসে পড়ে। অকিঞ্চিৎকর, ক্ষুদ্র জিনিসকে বিরাট বিরাট নাম দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করাটা ভদ্রলোকদের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই মিথ্যের ফানুসটাকে হাসির খোঁচায় ফাটিয়ে দিয়েছে হিজি বিজ বিজ। উলঙ্গ রাজাকে দেখে সত্যদ্রষ্টা শিশুর হাসির সঙ্গেই তুলনীয় দিন-কানা, নিদ্রাতুর বিচারককে দেখে তার হাসি। সে একথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেনি যে সব বিচারকই -অর্থাৎ গোটা বিচারব্যবস্থাটাই—ঐরকম, "তাদের সক্কলেরই চোখের ব্যারাম"। তারা কেউই দিনের আলোয় সত্যের নিঃসংশয় মূর্তিকে সহ্য করতে পারেনা।

আসামী গরহাজির

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, কার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেটা কেউ জানেনা। এবং সেটা না জেনেই বিচারক রায় দেবার জন্য প্রস্তুত। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি মুশকিল-আসান গেছো-দাদার হদিশ মেলেনি, অসহ্য গরম থেকে মুক্তির তিব্বতে পৌঁছনোর রাস্তা অজানাই থেকে গেছে। এখন এই বিচারদৃশ্যে আমরা দেখছি আমাদের দুর্দশার জন্য দায়ী কে, 'আসামী' কে, তাও আমরা জানিনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পেয়েছি বিয়ের আয়োজন প্রস্তুত, কেবল বর নেই। এখানে দেখছি, অভিযোগ আছে, ফরিয়াদী আছে, উকিল আছে, সওয়াল হয়েছে, বিচারক রায় দেবার জন্য তৈরী, কিন্তু এসব কার বিরুদ্ধে, কে আসামী, তা কেউ জানে না।

এক আশ্চর্য প্রতীকে সুকুমার আমাদের—এবং তাঁর নিজেরও—অসহায়তাকে প্রকাশ করেছেন। আমাদের সমস্যা আছে, আমরা তার সমাধানের পথ জানিনা। প্রচুর হাত পা ছুঁড়ি আমরা, তাতে করে সমস্যা মেটে না এতটুকুও; ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে করেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমরা, মূল শত্রু থেকে যায় আমাদের অগোচরে।

অবশেষে 'আসামী'র সন্ধান মেলে অবশ্য। চার আনা পয়সা দিয়ে যদি সাক্ষী কেনা যায়, এবং বিচারকের সামনে দাঁড়িয়ে সেই সাক্ষী যদি 'যাহা বলিব সত্য বলিব' বলে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে যায়, অর্থাৎ পয়সা দিয়ে যদি বিচার কেনা যায় তবে পয়সা দিয়ে আসামীই বা কেনা যাবে না কেন? মূল ব্যাপারটা তো পয়সা, ন্যায়-অন্যায়ের মূল্য নিরূপিত হয় পয়সার দ্বারা; তাই যদি হয় তাহলে সুকুমারের অসম্ভবের জগতে কে সাক্ষী, কে আসামী—সে বিচার গৌণ, পয়সা পাওয়া যাচ্ছে কিনা সেইটাই একমাত্র বিবেচ্য। ন্যাড়া তাই পয়সা পেয়ে আসামী হতে দ্বিধাবোধ করে না। আইন=ন্যায় –এই বিভ্রান্তিকর সমীকরণের বদলে সুকুমার আনলেন বাস্তবসম্মত নতুন সমীকরণ: আইন=পয়সা।

আদালতে গোলমাল বাধার পরই আস্তে আস্তে 'আমি'র স্বপ্ন ভাঙতে থাকে, যতক্ষণ না ছাগলের অর্থাৎ ব্যাকরণের মুখটা আস্তে আস্তে মেজোমামার মতো হয়ে যায়। এবং মেজোমামা 'আমি'কে ব্যাকরণ না-পড়ার জন্য শাস্তি দেন। ব্যাকরণ—ভদ্রলোকী জীবনযাত্রার code; সেইখানে আমাদের ফিরিয়ে আনেন সুকুমার। ব্যাকরণ না মানলে মেজোমামা-দের কানমলা খেতে হবে--এবং ভদ্রলোক-সমাজে মেজোমামা-রাই দলভারী।

উপসংহার

ভদ্রলোকী কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে অসংগতির উপাদান রয়ে গিয়েছিল, তার essence-টাকে ধরবার চেষ্টা করেছেন সুকুমার। এটা তাঁর ব্যক্তি-স্বভাবেরই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এরকম বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে তিনি সমর্থন করেছিলেন, 'সুন্দর গম্ভীর স্বদেশী গানও' লিখে-ছিলেন, কিন্তু এই স্বদেশী উন্মাদনার মধ্যে যে অসংগতিটুকু ছিল সেটাও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। পুণ্যলতা চক্রবর্তীর সাক্ষ্য "দাদা তাই ঠাট্টা করে গান লিখেছিল: 'দেশী-পাগলার দল'। তাতে দেশী জিনিসের বর্ণনা ছিল: 'দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি!' ঠাট্টা করলেও দাদাও হাসিমুখে

ঐসব মোটা জিনিস ব্যবহার করত।" লণ্ডনে কোনো অভিজাত বাঙালী মহিলা "কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে টাকা তুলতে ভারতীয় দেবদেবীদের নিয়ে একটা 'ট্যাব্‌লো' করেছিলেন . সুকুমার বৃটিশ মিউজিয়মে পড়াশুনো করে তার জন্যে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।" কিন্তু লক্ষণীয় এটাই যে "তার একটি প্যারডি করার কথা"ও তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভেবে ফেলেছিলেন (সুকুমার সমগ্র রচনাবলীর কল্যাণী কার্লেকর-লিখিত ভূমিকা)। আধুনিক জীবনে আমাদের পৌরাণিক myth-এর অসংগতি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। Myth ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি, 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। এইভাবে প্রতিটি স্তরেই তিনি আমাদের ভাবনার সঙ্গে আমাদের সামাজিক বাস্তবতার অসংগতি ধরিয়ে দিয়েছেন। সেই অর্থেই তাঁকে সমাজ-সমালোচক বলতে হবে। কিন্তু কোনো সংস্কারের লক্ষ্য বা আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না। কোনো একটা নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানে বা পক্ষ দল থেকে তিনি সাহিত্য রচনা করেন নি। সমসাময়িক ঘটনার অভিঘাত তাঁর রচনায় খুব সরাসরি পড়েনি, পড়েছে ঘুরপথে, তির্যক রাস্তায়। 'একুশে আইন' বা 'চোর পেত্নী'র মতো কবিতার পটভূমিতে অসহযোগের ধরপাকড়, জালিয়ানওয়ালাবাগের তাণ্ডব বা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে বিপ্লববাদীদের লাঞ্ছনার মতো ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু এগুলির সঙ্গে, ধরা যাক, শ্চেদ্রিনের 'এক আত্মদানকারী শশকের কাহিনী' বা সুইফ্‌টের A Tale of a Tub কিংবা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা'র তুলনা করলেই পার্থক্যটা ধরা পড়ে। এঁদের ক্ষেত্রে polarization-টা সুস্পষ্ট, এঁরা একটা নির্দিষ্ট অবস্থান বেছে নিয়েছেন, সুনির্দিষ্ট ঘটনার অভিঘাতে এঁরা আলোড়িত। এঁদের রচনার একটা তাৎক্ষণিক সংস্কারমূলক উদ্দেশ্য আছে। সুইফ্‌ট তো বলেই ছিলেন: "বিনোদন নয়, আমি চাই মানুষকে খোঁচা দিতে, অপমান করতে।" প্রায় একই কথা বলেছিলেন হুতোম: "নকসাখানিকে আমি একখানি আরসি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম; কারণ পূর্বে জানা ছিল যে দর্পণে আপনার মুখ কদর্য্য দেখে কোনো বুদ্ধিমানই আরসি-খানি ভেঙ্গে ফ্যালেন না, বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায়, তারই তদ্বির করে থাকেন। কিন্তু নীলদর্পণের হাঙ্গামা দেখে শুনে ভয়ানক জানোয়ারের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে সাহস হয় না; সুতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো...।" একথা স্পষ্টতই সুকুমারের নয়। এঁদের সামনে শত্রুর চেহারা খুব স্পষ্ট, এঁরা বোঝেন সমস্যার গুরুত্বতা কতখানি। বোঝেন বলেই শত্রুকে হাস্যকর ক'রে তুলে, তাকে অপমানিত ক'রে পাঠকের মনে বল সঞ্চার করেন। সুকুমারের সামনে শত্রু বলে স্পষ্ট কেউ নেই, 'আসামী' নেই। নিজের শ্রেণীর, নিজের পরিপার্শ্বের ভাবনাচিন্তার মধ্যে যে অসংগতিটুকু লক্ষ্য করেছেন, সেটুকুই তাঁর উপজীব্য। তার বাইরে তিনি যান নি।

এর তাঁর রচনায় নিছক মজার উপাদান কিছু কম নয়। ন্যাড়ার গান শুনে ছাগল "শিশিবোতলের জায়গাটা ছাড়া...শক্ত কিছু" খুঁজে পায় না; "নিঝুম নিশুত রাতে একা শুয়ে তেতালাতে" প্রিয়ার মুখচ্ছবি বা ভুমার ধ্যানের বদলে "খালি খালি খিদে পায় কেন রে?" "সেজোমামার আধখানা কুমিরে" খাওয়ায় "বাকি আধখানা"র করুণ মৃত্যুতে ব্যাকরণের বিলাপ;—ইত্যাকার অজস্র প্রসঙ্গে মজাটাই প্রাধান্য পেয়েছে, সন্দেহ নেই। এই 'মজা'র আবরণ রেখে সুকুমার রায় তাঁর ভদ্রলোকী পরিপার্শ্বের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এলেন।

এই বোঝাপড়াটা তাঁর শ্রেণী-অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে জরুরী ছিল। পরিবার, শ্রেণী, ব্রাহ্মসমাজ, বৃহত্তর সমাজ, বৃটিশ শাসন এই সব কিছুর সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল যুগপৎ ঘনিষ্ঠতার ও বিচ্ছিন্নতার। তাঁর সেই চিঠিটি থেকে একদিকে যেমন তাঁর মোহভঙ্গ, বিচ্ছিন্নতা ও অন্তর্বিদ্রোহের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি বেশ বোঝা যায়, এই বিদ্রোহ তাঁকে কোনো নতুন ইতিবাচক অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছে না। তাঁর মনে হয়েছে, "এই যুগের মানুষের আশার প্রদীপ নির্বাপিত" হয়ে গেছে, এ যুগের মানুষ "আশা করতে জানে না"। তাঁর সামনে শুধু "rampant, morbid out and out pessimism", তাঁর সমস্ত "cherished illusions" ভেঙে যাচ্ছে। চার-পাশের মানুষদের মতো মিথ্যে "আনন্দের কথা, optimism-এর কথা" আর বলতে পারছেন না তিনি। একথাও আমরা জানতে পারছি যে এই ভাবনা, পরিপার্শ্বের সঙ্গে এই বিচ্ছিন্ন-তার বোধ তাঁর "নতুন নয়, অল্পবয়স থেকেই এ চিন্তা রয়েছে"।

'হযবরল'-'আবোল তাবোল'-এর যিনি স্রষ্টা তাঁর কাছ থেকে একথা অবিশ্বাস্য মনে হয়, কিন্তু এ নির্মম সত্য। জীবন তাঁর কাছে শেষ পর্যন্ত "তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম"-এর মতোই নিরর্থক ?

এই "rampant, morbid, out and out pessimism"-এ আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে, শ্রেণীর সঙ্গে বাহ্যত তাঁর যোগ বিচ্ছিন্ন করেন নি—বা করতে পারেন নি। বাস্তব ক্ষেত্রে যে মিথ্যের মুখোশ তিনি ছিঁড়তে পারলেন না, সেই মুখোশ তিনি অপসৃত করে দিলেন তাঁর রচনায়; দেখিয়ে দিলেন, বালকের অবিকৃত মানবিক চোখে ঐ বয়স্ক ভদ্রলোকদের আচরণ কতদূর উদ্ভট, অসংগত। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে ভদ্রলোকদের চটালেন না তিনি, খোঁচা দেওয়া বা অপমান করার বদলে তাদের বিনোদনই করলেন। নইলে ঐ সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হতে হতো তাঁকে—কেবল মনের গহনে নয়, কার্যত, বাস্তবত। তাই ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে চরমতম অনীহা প্রকাশ করার পরেও ঐ সমাজেরই ইতিহাস তাঁকে লিখতে হলো অনিচ্ছুক, মলিন, অপটু পদ্যে। অথচ ঐ একই সময়ে, একই রোগশয্যায় শুয়ে, ঘনিয়ে-আসা 'আদিম কালের চাঁদিম হিমে'র শৈত্যপ্রবাহের মধ্যেই তিনি সৃষ্টি করে চলেছিলেন 'আবোল তাবোল'-'হযবরল'-র অনুপম রসরাজি। এই আপোসটা তাঁকে করতে হয়েছিল। জলের মধ্যে থেকে কুমিরের সঙ্গে মনে মনে বিবাদ বাধিয়েছিলেন তিনি—নিজেকে বাঁচানোর জন্য তাই ঐ 'মজার' আস্তরণটা গড়ে নিতে হলো।

সন্দেহ নেই, এইখানে থেমে যাওয়াটা তাঁর সীমাবদ্ধতা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এটা একজন মহৎ শিল্পীর সীমাবদ্ধতা। যুগের ক্ষুদ্রতা, গণ্ডিবদ্ধতাকে অনেক পরিমাণে ভাঙতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশা এতটা বেড়ে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেহেতু জীবনধারার ছাপই মূলত চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়, তাই শ্রেণীগত বাধাই অলংঘ্য হয়ে দাঁড়ালো সুকুমারের কাছে। দীর্ঘতর জীবনের অধিকারী হলে সে বাধা কাটত কিনা, সে জল্পনা নিরর্থক। তবু শ্রেণী-আরোপিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাঁর সার্থকতা এমন প্রবল, এমন অপ্রতিরোধ্য যে চোখ ধাঁধিয়ে যায় আমাদের; ঔপনিবেশিক কলকাতার লিলিপুটীয় পরিমণ্ডলে তাঁকে যেন ঠিক স্বীকার করা যায় না। আজও, আমাদের আধা-ঔপনিবেশিক ভদ্রলোকী অস্তিত্বের এক মূর্তিমান প্রতিষেধক সুকুমার রায়। হয়তো সেই ভয়েই নেহাৎ 'নাবালকদের লেখক' ছাপ মেরে তাঁকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দিয়েছি আমরা।

১। 'পাগলা দাশু'র রবীন্দ্রনাথ-লিখিত ভূমিকা।

২। Marx-Engels on Art and Literature. মস্কো, ১৯৭৬ পৃ: ৮৪।

৩। নেপাল মজুমদার, 'জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ,' ২য় খণ্ড, পৃ: ১৪০-৪১।

৪। Common sense সম্পর্কে এঙ্গেলসের একটি উক্তি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না—"নিজের ঘরের চার দেওয়ালের চৌহদ্দির মধ্যে পাকা কমন-সেন্স মশাই খুবই সম্মানিত ব্যক্তি; কিন্তু যে মুহূর্তে গবেষণার বৃহত্তর ক্ষেত্রে তিনি পা বাড়ান, তৎনই বিচিত্র সব বিপদ-আপদের মুখোমুখি হয়ে পড়েন..." (সমাজতন্ত্র : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক)। এটা স্বীকৃত সত্য যে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অবধারণ করার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা এই common sense।

৫। বিনয় ঘোষ, 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'।

৬। সম্মানিত ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিলেন কেউ কেউ। সুকুমার রায়েরই দাদামশাই দ্বারকানাথ গাঙ্গুলির নাম স্মরণীয়। স্বয়ং কুলি সেজে আসামের চা-বাগানে থেকে সেখানকার অমানুষিক শোষণ সম্পর্কে যিনি শিক্ষিতসমাজকে ওয়াকিবহাল করেছিলেন, এবং যাঁর প্রভাব সুকুমারের চরিত্রে ভালোমতোই পড়েছিল।

৭। বাঙালী ভদ্রলোকদের এটাও একটা বৈশিষ্ট্য। কেম্ব্রিজে পাঠরত জওহরলাল নেহরুর সাক্ষ্য: "আমরা একটি বসিবার ঘরে বিপিন পালকে অভ্যর্থনা করিলাম। সেখানে আমরা ১০/১২ জন উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তিনি এমন গর্জন করিয়া বক্তৃতা দিতে লাগিলেন যেন তিনি দশ সহস্র শ্রোতার সম্মুখে জনসভায় বক্তৃতা করিতেছেন। সেই প্রচণ্ড কণ্ঠস্বরের কোলাহলে আমি বুঝিতেই পারিলাম না তিনি কি বলিতেছেন" ('আত্মচরিত', সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুবাদ)।

সিদ্ধার্থ ঘোষ

উহ্যনাম পণ্ডিতের সোজা কথা

বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির যুক্তিশাসিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে সুকুমারের নন্‌সেন্সের সম্পর্কটি এ প্রবন্ধের আলোচ্য। সিরিয়াস প্রবন্ধ ও বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের সোজাকথায় সুকুমারের যে চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, তারই সূত্র ধরে তাঁর সৃজনধর্মী রচনাকে বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে।

উহ্যনাম পণ্ডিতের আবির্ভাব নন্‌সেন্স ক্লাবের ঘরোয়া হাতে-লেখা পত্রিকায়। দীর্ঘকাল পরে উহ্যনাম পণ্ডিতকে আবার দেখা গেল 'সন্দেশ'-এর পাতায় ১৩৩০-এ। 'বুমেরাং', 'মানুষমুখো' ও 'অদ্ভুত জীব'— উহ্যনাম পণ্ডিতের তিনটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণে ও ভাদ্রে আর সুকুমার রায়ের গানের পালা সাঙ্গ হল আশ্বিনে। লেখক-জীবনের প্রথমে ও জীবনের অন্তিম পর্বে সুকুমার উহ্যনাম পণ্ডিত নামে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কিন্তু 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত কয়েকটি তাত্ত্বিক আলোচনা বাদে প্রায় সর্বত্রই তিনি উহ্যনামা। সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যেই তিনি অনন্য ছিলেন, পরিচয় তাঁর গুপ্ত থাকেনি।

অনন্য সুকুমার যখন ছদ্মনামে, অনামে বা স্বনামে শিশু-কিশোর উপযোগী নিবন্ধ বা চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখেছেন, তখন তিনি খেয়ালরসের স্রষ্টা নন, সোজা কথার মানুষ।

১৯১৫-য় পিতা উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পর 'সন্দেশ' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন সুকুমার। খেয়াল-রসের রসিক তখন থেকেই নিয়মিত শিশু ও কিশোর মনের খাদ্য সরবরাহ করতে শুরু করেন। তাঁর কিশোরোপযোগী শিক্ষামূলক রচনা আয়তনে তাঁর সৃজনধর্মী সাহিত্যকর্মের সমান।

সুকুমারের নন্‌সেন্স নাবালক ও সাবালক জগতের মাঝখানের বেড়া ভেঙে ফেলে, তাঁর গড়া সৃষ্টিছাড়া জগতের চুলচেরা বেনিয়মের কড়াক্কড়ি ও বাড়াবাড়ি দেখে বাস্তব জগতের নিয়মনীতি নিয়ে দুর্ভাবনা জাগে। সরাসরি শিক্ষামূলক রচনা-গুলি থেকে সুকুমারের কল্পনার স্বভাব-দৌরাত্ম্যের পরিচয় না মিলুক, সামগ্রিক বিচারে এই 'নীরস' রচনাগুলিও গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, খেয়ালরসের স্রষ্টার পিছনে যে-পৃথিবীর মানুষ সুকুমার, 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য' ছিল যাঁর, তাঁকে চিনতে এই রচনাগুলি সাহায্য করে। বোঝা যায় কোন্ দিকে ও কাদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত ছিল, পৃথিবীর মানুষ সুকুমারের কৌতূহলী দৃষ্টির দিক্‌নির্দেশ পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে 'প্রবাসী' 'বিচিত্রা' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত গম্ভীর মেজাজের প্রবন্ধগুলি থেকে জানা যায় লৌকিক সুকুমার কি-কি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছিলেন। সুকুমারের এই বাস্তব-ভিত্তিক মনোজগতের মাটি দিয়েই গঠিত হয়েছে খেয়াল-খুশি-খাপছাড়ার কল্পলোক।

বাস্তব ও অবাস্তবের মধ্যে যোগসূত্রটি সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তিনি: "জগতে নিরবচ্ছিন্ন কল্পনার কোন-

অস্তিত্ব নাই। বাস্তবজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়াই, নেচারকে অবলম্বন করিয়াই, কল্পনার উৎপত্তি" (ভারতীয় চিত্রশিল্প)। তাঁর রচনায় তাই আজগুবি, উদ্ভট, অসম্ভব, যাই থাকুক না কেন মিথ্যার কোন স্থান নেই, "ভাব জিনিষটা বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির সহিত একটা অর্থহীন কলহ" বাধায়নি। তিনি জানতেন, "অবাস্তবকে কতকগুলি জ্ঞানত বাস্তবের রূপান্তর বা নূতন রকম সমাবেশ রূপেই ('ইন্‌ টার্ম'স অফ নোন রিয়ালিটিজ') আমরা কল্পনা করিয়া থাকি। সুতরাং 'অলৌকিক রসের অবতারণা' করিতে হইলে লৌকিকের জ্ঞানটা একটু বিশেষ মাত্রায়ই আবশ্যক" (ভারতীয় চিত্রশিল্প)।

লৌকিকের জ্ঞানটা সত্যি সত্যিই বিশেষ মাত্রায় ছিল সুকুমারের। সেটা শুধুই দুটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি, এস-সি পাশ করার বা গুরুপ্রসন্ন ঘোষ স্কলারশিপ্‌ লাভ করে ইংল্যাণ্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার স্কুল অফ টেক্‌নলজি' থেকে ফোটো-গ্রাফি ও ব্লক-নির্মাণ বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকারের সূত্রে বা রয়েল ফটোগ্রাফি সোসাইটির প্রথম ভারতীয় সদস্য হওয়ার সুবাদে আসেনি।

উনিশ শতকের বাংলার 'রেনেশাঁস' আন্দোলনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ধারা দুটিকে নিয়েই আমাদের যত গর্ব তত মতবিরোধ। এর বাইরে আর কোনো ধারার অস্তিত্ব নিয়ে গবেষকরা তেমন মাথা ঘামাননি। তাই 'নবজাগরণের' ইতিহাসে দ্বারকানাথ ঠাকুর শুধু 'প্রিন্স' ও কবিগুরুর বিলাসী ঠাকুর্দা রূপেই স্থান পেলেন, তাঁর যন্ত্রউদ্যোগের প্রয়াসের কথা ঠাঁই পেল না। দ্বারকানাথের পরের পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ যন্ত্রশিল্পকে বিদেশী সভ্যতার নখ ও দাঁত রূপে অচ্ছুৎ করে রাখেন কিন্তু ভাবের জগতে দাঁত ও নখকে বরবাদ করে দিলেও শান্তিনিকেতনের পার্থিব উন্নতির কাজে স্বয়ং রবীন্দ্র-নাথকে ট্র্যাক্টর, হাওয়া কল ইত্যাদির প্রচলন অনুমোদন করতে হয়েছিল, বসাতে হয়েছিল ছাপাখানা। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক অধ্যায় যন্ত্রকৌশল, তার ভূমিকাকে অস্বীকার ক'রে একটা সমাজের নবজাগরণ ঘটতে পারে না। এই প্রসঙ্গেই লক্ষণীয়, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে যে রায়চৌধুরী পরিবারের আসন ঠাকুর পরিবারের পরেই, তারও প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ ও চিত্রশিল্পী উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন গণিতে পারদর্শী, দক্ষ যন্ত্রকুশলী। হাফ্‌টোন্‌ ব্লক তৈরি করার জন্য তিনি নানা প্রকারের ডায়াফ্রাম তৈরি করেন এবং তাঁর নামানুসারেই পরিচিত হয় তাঁর তৈরি যন্ত্র 'রে-স্ক্রীন অ্যাডজাস্টার'। ব্লক নির্মাণে তিনি 'ডুয়োটাইপ' ও 'রে-টিন্ট' পদ্ধতির উদ্ভাবক। লণ্ডনের বিখ্যাত 'পেন্‌রোজেস্‌ পিকটোরিয়াল অ্যানুয়াল' পত্রিকায় ৫ম, ৯ম, ১১শ এবং ১৭শ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর টেক্‌নিক্যাল আলোচনাগুলি বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছিল। 'প্রসেস ওয়ার্ক অ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রোটাইপিং', 'দি ইংল্যাণ্ড প্রিন্টার', 'লে প্রসিদ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বিদেশী পত্রিকাও তাঁর কাজের স্বীকৃতি দিয়েছিল। 'সন্দেশ' পত্রিকার জন্মের সঙ্গে ব্লক-নির্মাতা ও মুদ্রক 'ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স' কোম্পানির সম্পর্ক ওতপ্রোত। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ভারতবর্ষে প্রসেস-শিল্প বিকাশের সূত্রপাত।

এই পরিবেশের কারণেই আশৈশব সুকুমারের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক উপকরণের মাখামাখি। ব্লক তৈরির জন্য ছবি তুলতে হবে, সেই ক্যামেরা, ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রিন্ট-করতে হবে, তার জন্যে কাচের ছাতওলা ডাকরুম। সাদা চৌকো চৌকো ডিশ আর অনেক শিশিবোতল যন্ত্রপাতির রাজ্যে সেখানে লাল কাঁচ শুধু ভূতুড়ে আবছায়াকে ছাড়পত্র দিত। তাঁর দিদিমা কাদম্বিনী গাঙ্গুলি আবার ডাক্তার। দিদিমার তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে অন্ধকারে দোল খেত আস্ত একটা মানুষের কঙ্কাল। পিসেমশাই হেমেন্দ্রমোহন বসু শুধু জগদীশ বসুর ভাগ্নেই নন, কলকব্জার পোকা। তাঁর ল্যাবরেটরিতে হাজার রকমের রঙবেরঙের শিশিবোতলে কুন্তলীন তেল, দেলখোশ সেন্ট ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে, কল টিপলেই ভশ ক'রে নল থেকে বেরিয়ে আসে সোডার জল। মার্বেল হাউসে রেকর্ডিঙের ঘরে গ্রামোফোনের আদিপুরুষ 'ফনোগ্রাফ'-এর রুটি বেলার বেলুনের মতো মোম-মাখানো লোহার সিলিণ্ডারের গায়ে পাকে পাকে এবড়ো-খেবড়ো দাগ কেটে বন্দী হচ্ছে হাসি কথা গান। তার ওপর হরেক রকম বাইসাইকেল আর মোটরগাড়ি নিয়েও তাঁর নাড়াচাড়া, কারবার। এই পরিবেশ বালক সুকুমারের মনকে বৈজ্ঞানিক উপাদান সরবরাহ করেছিল। যুক্তিনিষ্ঠ একটা মনের গঠনে সাহায্য করেছিল। পিতা স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারের দৃষ্টিকে টেলিস্কোপ মারফৎ প্রসারিত করে দিয়ে-ছিলেন গ্রহ উপগ্রহ থেকে গ্রহান্তরে।

সুকুমারের লেখা 'গ্যালিলিও'-র জীবনীতে পড়ি, "তিনি যে দিকে দূরবীণ ফিরান, যাহা কিছু দেখিতে যান সবই আশ্চর্য দেখেন। চাঁদের উপর দূরবীণ কষিয়া দেখা গেল, তার সর্বাঙ্গে ফোস্কা।" আবার 'সূর্যের কথা'য় সুকুমার লিখছেন, "জলের মধ্যে যেমন বুদ্‌বুদ্ ওঠে সূর্যের গায়ে তেমনি আগুনের ফোস্কা ওঠে আর ফেটে পড়ে।"

আর 'চলচিত্তচঞ্চরী'-তে ভবদুলাল বলছে, "ও দেব আশ্রমে একটা দূরবীণ আছে- তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্কা ফোস্কা মতন পড়ে যায়। বোধহয় থাউজ্যাণ্ড হর্স্-পাওয়ার, কি তার চাইতেও বেশি হবে।"

চাঁদ ও সূর্যের গায়ে 'ফোস্কা' দেখেছিলেন সুকুমার তাঁর লৌকিক চোখজোড়া শক্তিশালী দূরবীণে ঠেকিয়ে, তারপর কার্য কারণ সম্পর্কটি উল্টে দিতেই— অমন তেজী (powerful) একটা দূরবীণ তাক্ করার জন্যেই যেন অনর্থটা ঘটল, চাঁদের পিঠে সেই জন্যেই পড়ল 'অলৌকিক' ফোস্কা।

'বাস্তবের এই বস্তুলীলার তত্ত্বকথা' এইভাবেই রসের মাঝে মজে গেল। পিতার মতো সুকুমারের মধ্যেও সংস্কৃতি বিভক্ত হয়নি, শিল্পরস ও বিজ্ঞানরস এক খাতে বয়েছে। 'টু কাল্চার্স্' গ্রন্থে সি. পি. স্নো লিখেছিলেন, কেউ যদি বলে, সে শেক্সপীয়রের রচনা পড়েনি তবে তাকে বুদ্ধিজীবী গণ্য করা হয় না। কিন্তু আপনি হচ্ছে নিউটনের 'সেকেণ্ড ল অফ মোশান' না জানলেও বুদ্ধিজীবী আসনচ্যুত হয় না।

যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানসম্মত শক্তপোক্ত এক জোড়া ডানা ছিল বলেই সুকুমার অত অনায়াসে কল্পনার রাজ্যে উড়ে বেড়িয়েছেন-- অসম্ভব, অপ্রকাশিত, অজানা, অভাবনীয় ও অনির্বচনীয় দিয়ে অসম্ভবের জগৎ গড়েছেন। সৃষ্টির নিয়মকানুন জানতেন বলেই সৃষ্টিছাড়াদের দিয়ে তিনি তাঁর উল্টো নিয়মের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন।

পিতৃসূত্রেই সুকুমার অল্পবয়সে টেনিসেকাদের মতো ক্যামেরাও হাতে পান। ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও উপেন্দ্রকিশোরের স্মরণীয় অবদান। ফটোগ্রাফির প্রাথমিক যুগে খাড়া রেখা ও আড় রেখা একত্র ফোকাসে না হওয়ার ত্রুটি দূর করতে তৈরি হয়েছিল রেক্‌টিলিনিয়ার লেন্স বা সংশোধিত লেন্স বা সিমেট্রিক্যাল লেন্স। "বেক্-এর প্রস্তুত র‍্যাপিড রেক্‌টিলিনিয়ার লেন্সের নাম ছিল বেক-সিমেট্রিক্যাল লেন্স। ইহার প্রায় ২০ বৎসর আগে উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তাঁহার ৩৮১×৩০৫ মিলিমিটার (১৫×১২ ইঞ্চি) প্রসেস ক্যামেরায় ব্যবহৃত রস্-সিমেট্রিক্যাল লেন্সের কথা উল্লেখ করিয়াছেন" (অলোকচিত্রণ, পরিমল গোস্বামী, ভারতকোষ)। ছেলেবেলায় সুকুমারের ফটোগ্রাফির শখ দেখে লোকে নাম দিয়েছিল 'পাড়ার ফটোগ্রাফার'। পরবর্তীকালে তাঁর তোলা ফটো বিদেশের 'বয়েজ ওন ম্যাগাজিন' ও 'টাইম্স্' ইত্যাদি পত্রিকায় ছাপা হওয়ার কথা জানা যায় পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিকথায়। শুধু দৃশ্যবস্তুর যথাযথ প্রতিকৃতি গ্রহণ সুকুমারের শিল্পীমনকে তৃপ্ত করেনি। ফটোগ্রাফির যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতার কথা তিনি জানতেন কিন্তু নিরাশ হননি। 'ফটোগ্রাফী' নামে প্রবন্ধে লিখেছেন, "বিষয় নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা ও বিচার আবশ্যক এবং ফটোগ্রাফীর চক্ষে বিষয়টাকে কিরূপ দেখাইবে তাহাও জানা প্রয়োজন।... কোন সময়ে, কিরূপ আলোকে ও অবস্থায় ফটো লইলে মূল বিষয়টি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইবার সম্ভাবনা, কিরূপে অনাবশ্যক বিষয়ের আতিশয্যকে দমন করা যায়, সেগুলিকে বর্জন করিয়া, ছায়ায় ফেলিয়া বা ফোকাস করিবার সময় স্পষ্টতার ইতরবিশেষ করিয়া অথবা অন্য কোন উপায়ে কিরূপে তাহাদের প্রাধান্যকে সংযত করা যায় ইত্যাদি নানা বিষয়ে সম্যক বিচারশক্তি লাভ করা অনেক অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ।"

এটি ফটোগ্রাফী প্রসঙ্গে আলোচিত হলেও মূলত নন্দনতত্ত্বের সমস্যা। ফটোগ্রাফীর মতো ভাষারও জন্মগত সীমাবদ্ধতা আছে। সুকুমার নিজেই লিখেছেন, ভাষা "নির্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাব বিনিময়ের একটা সাঙ্কেতিক উপায় মাত্র" (ভারতীয় চিত্রশিল্প)। "আর সেই জন্যেই এক-একটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশরকম ভাষায় পঞ্চাশ দিক হইতে দেখা আবশ্যক হয়" (ভাষার অত্যাচার)।

এই পঞ্চাশ দিক থেকে দেখা, অভিনব দৃষ্টিকোণ গ্রহণ ক'রে পরিচিত জিনিষকেও নতুন রূপ দান করা, যাতে আটপৌরে অভ্যাস-নির্মিত শক্ত খোলাটা ভেঙে মর্মের শাঁস উপভোগ করা যায়, এ-শিক্ষা সুকুমার অল্পবয়সেই ক্যামেরা

হাতে নিয়ে পেয়েছিলেন। সৌন্দর্যসন্ধানী সুকুমার যেমন বাস্তবের 'যদ্দৃষ্টং' প্রতিচ্ছবি গ্রহণের মধ্যে ক্যামেরার সার্থকতা খুঁজে পাননি তেমনি সত্যসন্ধানী সুকুমার বাস্তবের নিছক অনুকরণজাত প্রতিলিপি রচনায় খুঁজে পাননি সাহিত্যের সার্থকতা।

বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাঁর পরিহাসপ্রিয় মনটাকে নানাভাবে রসদ জুগিয়েছে। বাংলা ভাষায় এক-একটি ক্রিয়াপদ কত রকম ফরমাশ খাটে তার পরিচয় পাই আমরা অবিস্মরণীয় সেই কবিতায় ঃ

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্ শুনে লাগে খট্‌কা---

ফুল ফোটে ? তাই বল ! আমি ভাবি পট্‌কা।

ফুল ফোটাকে শুধু শব্দে জব্দ করেন নি তিনি, নাজুক ফুল যে-ঘটনাটি সবার অলক্ষ্যে ঘটায় তা তিনি নিমেষের মধ্যে সাঙ্গ করতে বাধ্য করিয়েছেন। সুকুমার সত্যিই কিন্তু চট্‌পট ফুল-ফোটা দেখেছিলেন। 'বায়োস্কোপ' নিবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"ফুলগাছের টবে সবেমাত্র অঙ্কুর গজাচ্ছে, সেই অঙ্কুর থেকে গাছ হবে, সেই গাছ বাড়বে, তাতে কুঁড়ি ধরবে, তার পর ফুল ফুটবে—বসে বসে দেখতে গেলে কত দিন সময় লাগে। বায়োস্কোপে যদি তার ছবি তোল, এক-এক দিনে দশ বারোটা বা পঁচিশ ত্রিশটা করে—আর দেখবার সময় চট্‌পট্ দেখিয়ে যাও,—তাহলে দেখবে যেন চোখের সামনেই দেখতে দেখতে গাছ গজিয়ে বেড়ে উঠছে আর ফুল ফুটছে।"

'বায়োস্কোপ' নিবন্ধটি 'সন্দেশ'-এ ১৩২২-এর ভাদ্রে আর 'শব্দকল্পদ্রুম' কবিতাটি তার পরের মাসে মুদ্রিত হয়।

গল্পকথার সুকুমার রায় 'সন্দেশ'-এর ক্ষুদে পাঠকদের কাছে ডারউইনের জীবনী ও মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে 'সেকালের লড়াই' 'সেকালের বাঘ', 'সেকালের বাদুড়' ও 'ঘোড়ার জন্ম' প্রভৃতি নিবন্ধের মধ্যে বিবর্তনবাদ, 'মিউটেশান' ও 'ন্যাচারাল সিলেক্‌শান'-এর তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। 'সেকালের বাদুড়'-এ তিনি লিখেছেন, "মনে করো একটা জন্তু, তার সাপের মতো গলা, কচ্ছপের মতো পিঠ, কুমিরের মতো দাঁত, তিমির মতো ডানা আর গিরগিটির মতো মাথা—তখন তাকে কি নাম দিবে ? ...সেকালের যে জানোয়ারগুলাকে বাদুড় বলিতেছি তাহাদের মধ্যে আরো অদ্ভুত রকমারি দেখা যাইত। এক-একটাকে দেখিয়া মনে হয় যেন বাদুড় পাখি আর কুমিরে মিলিয়া খিচুড়ি পাকাইয়াছে।"

আবোলতাবোলের সেই হাঁসজারুদের নিয়ে লেখা বিখ্যাত কবিতাটির নামও 'খিচুড়ি'। ডারউইনের জীবনীতে তিনি প্রসঙ্গক্রমে ওস্তাদ মালীদের উদাহরণ দিয়েছিলেন, যারা ভালো ভালো গাছের কলম করবার সময়, ভালো গাছ,ভালো ফুল, ভালো ফল বেছে তাদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে পছন্দমতো গাছ বানায়। ওস্তাদ মালীদের এই কেরামতি-অনুপ্রাণিত সুকুমারও কি উদ্দেশ্যমাফিক খেয়ালরসের ফুল ফোটাবার জন্য ভালো ভালো শব্দের 'কলম' করেছেন, পছন্দমতো ভালো ধ্বনি, ভালো অর্থ বেছে নিয়েছেন ? ট্যাঁশগরু কি এমনই একটি 'কলম'-জাত ?

টেলিস্কোপ দিয়ে তাকানোর জন্য চাঁদের পিঠের ফোস্কা-গুলো চোখে পড়ল, না টেলিস্কোপ ফেরান হল বলেই চাঁদের পিঠে ফোস্কা পড়ে গেল ? কার্য—কারণের সম্পর্কটি নিয়ে এই গণ্ডগোল বাধিয়ে সুকুমার খেয়ালরসের অবতারণা করেছেন। কিন্তু বিজ্ঞানমহলেও সত্যিই সে-সময়ে কার্য-কারণ সম্পর্ক নিয়ে আলোড়ন দেখা দিয়েছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ নিউটনের তত্ত্বকে খারিজ না করলেও তার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করেছে। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সর্বদা ১৮০ ডিগ্রি হত, কিন্তু লোবাচেভস্কী প্রমুখরা প্রমাণ করে ছাড়লেন এটি সর্বপ্রসিদ্ধ নয়। লোরেনৎজ-এর তত্ত্ব দৈর্ঘ্যকে আর ধ্রুব, নিরপেক্ষ থাকতে দিল না, গতির সঙ্গে গতি অভিমুখে বস্তুর দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়, জানা গেল। বিজ্ঞান যখন শক্তি ও জড়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বেড়া তুলে নিশ্চিন্তে বসে ছিল তারই মধ্যে বিপ্লব। ঘটেছে পৃথিবীতে। কিন্তু তবু শক্তি আর জড়ের মধ্যে সে-ভেদরেখাটি শেষ পর্যন্ত টিকল না। বিশ্ব-জগতের সমস্ত কার্য-কারণের মধ্যে এযাবৎকাল স্থাপিত সরল জড়-যান্ত্রিক সম্পর্কটির ত্রুটি ধরা পড়ল। 'কোয়াণ্টাম তত্ত্ব' বা শক্তিকণিকাবাদ ও এই তত্ত্বানুসারে পরবর্তীকালের 'অনিশ্চয়তা তত্ত্ব' 'সম্ভাবনা তত্ত্ব' ইত্যাদিও কার্য-কারণ সম্পর্কের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করল। জড়বাদের মধ্যে অনির্দেশ্যতা একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি পেল। ১৯১৯-এ সূর্যের পূর্ণগ্রহণের সময় দূরবীক্ষণ-সংযুক্ত ক্যামেরায় ধরা পড়ল যে মাধ্যাকর্ষণ আলোক রশ্মিকে বেঁকিয়ে দিচ্ছে, আইনস্টাইনের

থাকতে পারে না যে শব্দতরঙ্গকে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গে রূপান্তরিত করা যায়। তাছাড়া আলোও নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে এই তরঙ্গের দৈর্ঘ্যভেদ অনুসারেই লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণকে আমরা তন্নভাবে অনুভব করি। বে নী আ স হ ক লা (বেগনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, কমলা ও লাল)—সাদা রঙ এই সাতটি বর্ণের সমষ্টি, আবার মৌলিক সুরও সাতটি, সা রে গা মা পা ধা নি। বর্ণ ও সুরের এই সংখ্যাগত সমতাও তাঁর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে থাকতে পারে, যেমন করে থাকতে পারে 'রাগমালা' চিত্রশ্রেণী।

স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোরও সুর ও রঙের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন 'সাধনা' পত্রিকায় 'সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা' নামক প্রবন্ধে : "ভাবিয়া দেখিলে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।...দুই বিষয়ের দুইটি মূল—শব্দ ও বর্ণ (আলোক), তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। ...সাত সুর ; সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার "সা রি গা ম"র স্থানীয়।...ছবি আঁকিবার সময় যে ভিন্ন ভিন্ন রঙ মিশ্রিত করিয়া স্বাভাবিক পদার্থের বর্ণের অনুকরণ করা হয়, তাহার অনুরূপ সঙ্গীতে কি আছে ? হারমনি তাহার অনুরূপ। আমাদের দেশীয় সঙ্গীতে যেমন হারমনি নাই, আমাদের 'পটো'-দিগের চিত্রেও তেমনি রঙ স্বাভাবিক হয় না। হলদে মানুষটি লাল কাপড় পরিয়া কালো রঙের গদা দিয়া সবুজ মানুষটিকে ঠেঙায়।"

সুকুমার রায়ের বৈজ্ঞানিক চেতনাই তাঁকে সচেতন করে তুলেছিল ভাষার উৎপত্তি, চরিত্র ও ব্যবহারবিধি সম্বন্ধে। শব্দ ও অঙ্কের মধ্যে একটা বড় মিল—উভয়েই সংকেত চিহ্ন, বিমূর্ত। "বস্তু বা ভাব ও তৎসূচক ভাষাগত সঙ্কেতের মধ্যে কোন সম্পর্ক বা সৌসাদৃশ্য দেখা যায় না।" গণিতের মতোই বর্ণ ও ধ্বনি যোগে ভাষা সৃষ্টির পিছনে ছিল ব্যবহারিক তাগিদ। সুকুমার লিখেছেন, ভাষা "কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাব বিনিময়ের একটা সাংকেতিক উপায় মাত্র" (ভারতীয় চিত্রশিল্প)। উদ্দেশ্যের কথা ভুলে, উপলক্ষ্যস্বরূপ বিমূর্ত বস্তুকে অভ্যাসবশত স্বয়ং-সিদ্ধ করে তুললে কী বিপত্তি বাধে সুকুমার তার রাশি রাশি উদাহরণ রেখেছেন তাঁর খেয়ালরসের জগতে। যেমন 'শব্দকল্পদ্রুম' নাটকে পড়ি—

> শ্রীশ্রীগুরু প্রসাদগুণে তত্ত্বদৃষ্টি লভি
> জগৎখানা ঠেকছে যেন শব্দে আঁকা ছবি
> শব্দ পিছে শব্দ জুড়ি চক্রে গাঁথি মায়া
> বাক্য ফিরে ছদ্মদেহে বিশ্ব তারি ছায়া।

বাক্যই বিশ্ব। ছায়ারূপ কিন্তু শ্রীশ্রীগুরুর কৃপায় বিশ্ব হয়ে গেল বাক্যের ছায়া। 'শব্দকল্পদ্রুম' নিছক রসিকতা নয়, কৌতুকরসের প্রবাহ সেখানে সাত্ত্বিক সত্য-অনুসন্ধানী। এই রচনারই সমকালে লেখা 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে যেন সুকুমার গম্ভীর হয়ে ধরা দিয়েছেন, "ভাষা যে নিজের অর্থ-গৌরবেই সত্য একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার।"

এখন যদি প্রশ্ন করা যায়, ভাষার কে বা কারা বা কেন অত্যাচারের কাছে মাথায় ভরে তার উত্তর প্রত্যেকে নিজের নিজের অভিজ্ঞতা অনুযায়ীই খুঁজে পাবে। লীলা মজুমদার লিখেছেন, "সুকুমার রায়ের রসরচনার স্রোত কাচের মত স্বচ্ছ...তাতে সূর্যের আলো পড়ে নানা রঙ ঠিকরোয় এবং যেসব চলায়মান প্রতিবিম্ব দেখা যায়, সেগুলি যেমন অন্য-লোকের ছায়াও হতে পারে, তেমনি দর্শকের নিজের ছায়াও হতে পারে।" এইখানেই সুকুমারের মৌলিক রসরচনার অসাধারণত্বের বীজ তিনি এক পরতের সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, যত পাঠক, তাঁর রচনায় তত পরত।

দেশের গতি, দেশের কণ্ঠ, জিহ্বা, ধিমু, মাথা ও শক্তি-স্বরূপ কোন্ শ্রেণীর নিশুদ্ধ জ্ঞানদাতা নীতিবাগীশদের ভাষা-সর্বস্বতায় স্বয়ং সুকুমার ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হয়েছিলেন সেটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

ইতিপূর্বে কার্য-কারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সুকুমারের সচেতনতা নিয়ে আলোচনা করেছি, এবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণে দেখি, কার্য-কারণ সম্পর্ক কেমন করে সম্পূর্ণ অহেতুকভাবে ভাষার অত্যাচারে বিপন্ন হচ্ছে : "বিজ্ঞানের এক-একটি সিদ্ধান্ত বা 'ল' আওড়াইয়া আমরা মনে করি খুব একটা কার্যকারণ-সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত
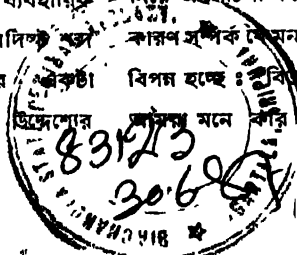
হইল। অমুক কাজটা অমুক 'ল' অনুসারে সম্পন্ন হইল; 'অ্যাকর্ডিং টু নিউটন'স্ থার্ড ল অফ মোশন,' নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সমান হইল। বলা বাহুল্য, আইনটার খাতিরে কাজটা নিষ্পন্ন হয় না" (ভাষার অত্যাচার)। এ যেন সেই টেলিস্কোপ ও চাঁদের পিঠের ফোস্কার মধ্যকার সম্পর্কের কথারই পুনরাবৃত্তি। 'ভাষার অত্যাচার', 'শিমে অত্যুক্তি', 'ভাবুক সভা' ইত্যাদি রচনার কাল থেকেই 'আবোল তাবোল'-এর অবিস্মরণীয় কবিতাগুলি প্রথম প্রকাশিত হতে শুরু করে। 'চলচিত্তচঞ্চরী' ও 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর রচনাকালও সম্ভবত তারই সমসাময়িক।

উদ্দেশ্য ভুলে উপলক্ষ্য-সর্বস্বতা—তা সে ভাষাক্ষেত্রে হোক, সমাজ জীবনে কি বিজ্ঞান-জগতে, সুকুমারের হাসি তাকে বিদ্ধ করেছে। 'জিপাসার ভয়' নিবন্ধে খিদিপ লিড্লিন মহানুভবতার কথা লিখেছেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাপ্ত সিডনি লিভেন মুখের জল অপরের হাতে তুলে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। সার 'এ্যাক ম্যাপ'-এ দেশি পণ্ডিতেরা সাধারণ মানুষের সামান্য মোটা ক'রে পাণ্ডিত্যের দৌরাত্ম্য করে তুলেছেন।

বিদ্রূপ বা শ্লেষ বা ব্যঙ্গবাণী নয় সুকুমারের সাহিত্যে, হাসি ও কৌতুকের কথাই। খেয়ালরস খেলে তিনি সহজ সন্ধান পেতেন। 'এই তো তার লেখার আসল কারণ হাতের হাওয়া'—নানান ধরনের গানের মানে কত লোক হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছেন। শাস্ত্রীয় আলোচনা ... টানাটানি, সেই রাড় বাস্তবের, অসঙ্গতির আলোচনা সুকুমার তাঁর নিজের রীতিতেই করেছিলেন।

বিদেশী দ্রব্য বয়কটের স্বদেশী যুক্তিও সুকুমারের সরস বাণের লক্ষ্যমুখে পড়েছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর বিদেশী জিনিস বয়কটের রাজনৈতিক আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন দেশের মানুষ। দিশি জিনিসের 'মার্কেট' তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু 'মার্কেট' তৈরি হলেও মার্কেটজাত হবার মত সামগ্রী কোথায়? রবীন্দ্রনাথের লেখায় স্বদেশী দেশলাই ও গামছা তৈরির সাধু ইচ্ছার পরিণতির কথা জানতে পারি আমরা। এই লগ্নেই ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ সুকুমারের 'নিধিরাম পাটকেল'। তিনি আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার করতে হলেই তাঁকে উত্তর মেরুতে, সেই ভয়ানক ঠাণ্ডার দেশে, যেখানে মানুষগুলো সব মরে যায়, সেখানেই যেতে হবে, এমন কি কথা! নিধিরাম-আবিষ্কৃত 'গন্ধবিকট তেল' কি কম চাঞ্চল্যকর? "সেই তেলের স্পর্শ গুণ! আমি নিজে মাখিনি বা খাইনি কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালার কে যেন বলেছেন যে সে ভয়ঙ্কর তেল। সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে দেড়দিনে আধহাত লম্বা গোঁফ বেরোয়!"

"দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশী", ('লাখধন বধ') স্বদেশী উদ্যোগের এই জাতের বহু ফসলের উল্লেখ আছে সুকুমারের লেখায়। 'ছায়াবাজি'-র ছায়া-ভরা একেবারে নতুন টাটকা দিশী ওষুধের দাম বড্ড শস্তা। কতকটা ওষুধ কোথায় লাগে তার কাছে। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ লক্ষ্মণের চেতনা ফেরার পর উপস্থিত সকলেই স্বীকার করেছে স্বদেশী ওষুধ না হলে এমনটা কখনোই হত না। 'নোটবই'-এ লেখা আছে ঝোলাগুড় সাবানে দেওয়া হয়, না পটকায়। এই যুগে খুব কাটতি হয়েছিল পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা 'হাজার জিনিস' নামে একটি বইয়ের। এইটি ওল্টালে সুকুমারের কথাতেই বলতে ইচ্ছে করে—

> সাবান কালি দাঁতের মাজন বাঁদর বাব সব কায়দাকেতা,
> পূজা পার্বণ তিথির হিসাব শ্রাদ্ধবিধি লিখছে হেথা।

সন্দেশ-সম্পাদক, শিক্ষক সুকুমার

স্বনামে বা ছদ্মনামে স্পষ্টবক্তা সুকুমারের নিবন্ধ ও প্রবন্ধগুলিকে খিড়কির দরজার মতো ব্যবহার ক'রে এতক্ষণ তাঁর খেয়ালরসের অন্দরের হালচাল অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে। এবার নিবন্ধগুলি নেড়েচেড়ে দেখা যাক।

বিবিধ বিষয়ে লিখলেও সুকুমারের পক্ষপাতের কথা নীচের বিষয়ানুগ নিবন্ধ বিভাগটি থেকে পরিস্ফুট হবে—

ক জীবনী—১৬টি

ক ১	ভৌগোলিক অভিযাত্রী	৫
ক ২	দেশপ্রেমিক	২
ক ৩	মানবতাবাদী	৪
ক ৪	দার্শনিক	১
ক ৫	উদ্ভাবক ও আবিষ্কারক	৭

(এর মধ্যে ৫টি নিবন্ধে পাঁচজনের জীবনী এবং 'পণ্ডিতের খেলা' ও 'সামান্য ঘটনা'য় সংক্ষেপে আট জনের অবদানের কথা আলোচিত হয়েছে।)

খ বিবিধ নিবন্ধ—১০৫টি

খ. ১ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান—৪৭

খ ১ ১	প্রাকৃতিক সম্পদ	৪
খ ১ ২	জীবন বিজ্ঞান	৪১
খ ১ ৩	উদ্ভিদ বিজ্ঞান	২

খ. ২ পার্থিব বিজ্ঞান—৩৭

খ ২ ১	পদার্থবিদ্যা	২
খ ২ ২	ভূগোল	৭
খ ২ ৩	শিল্পউদ্যোগ	৬
খ ২ ৪	বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও প্রচলন	২২

খ. ৩ জ্যোতির্বিজ্ঞান—৮

খ. ৪ ইতিহাস সভ্যতা ও সংস্কৃতি—১৩

গ. মজার খেলা—৩টি

(এবং সন্দেশের পাতায় প্রকাশিত বহু ধাঁধা)

[এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি-প্রকাশিত 'সুকুমার রচনা সমগ্র' অনুযায়ী]

দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বয়ং উপেন্দ্রকিশোরের কৃতিত্বের কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় কিশোরোপযোগী বিজ্ঞান-সাহিত্য রচনায় সুকুমারের তৎকালীন একমাত্র প্রতিস্পর্ধী জগদানন্দ রায়। জগদানন্দ ছিলেন বিজ্ঞান-শিক্ষক। বিজ্ঞান-সাহিত্যকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর আমৃত্যু নিরলস সুপরিকল্পিত চর্চাকে সাধনা বলা উচিত। জগদানন্দের মতো একমুখী উদ্দেশ্য ছিল না সুকুমারের, প্রসঙ্গান্তরে যাবার মধ্যে কোন বিশেষ পরিকল্পনাও ছিল না। বিবিধ বিষয় নিয়ে লিখেছেন। বিজ্ঞান-বিষয়ক বিদেশী বই ও পত্রিকা থেকে প্রয়োজনমতো তথ্য আহরণ করেছেন। সম্পাদক হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই বিষয় নির্বাচনে বৈচিত্র্য রক্ষা করার দিকেই ছিল সজাগ দৃষ্টি। সামগ্রিক বিচারে তাঁর নিবন্ধগুলি বিশিষ্ট তিনটি কারণে। প্রথমত, বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার প্রতি পক্ষপাত তো ছিলই, তার মধ্যে আবার মানব কল্যাণে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের কাজে নিযুক্ত বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকগুলির, প্রযুক্তিবিদ্যার অবদানের প্রসঙ্গ তিনি বারবার উত্থাপন করেছেন। নিবন্ধের শ্রেণীবিভাগ-তালিকা থেকেই সেটা বোঝা যায়। বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ইতিহাস থেকেই ধরা পড়ে আধুনিক কারিগরী তথা যন্ত্র-বিজ্ঞানের শাখাটি চিরকাল উপেক্ষিত। সুকুমার রায়ের পূর্বে বা সমকালে কালিদাস মৈত্র 'ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ' ও 'বাষ্পীয় রেলওয়ে' (১৮৫৫), ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'বাষ্পীয় যন্ত্র' (১৮৫৯), আদীশ্বর ঘটক ও মন্মথ চক্রবর্তী 'ফটোগ্রাফি' (১৯০১—২), নীরদাচরণ মিত্র 'বৈদ্যুতিক যন্ত্রপ্রকরণ' (১৩১৩), শৈলজাপ্রসাদ দত্ত 'মোটরগাড়ি' (১৯২৪) ও রবীন্দ্রনাথ সেন 'এরোপ্লেন' (১৩২৭) বিষয়ে মাত্র গুটিকয়েক উল্লেখযোগ্য বই লিখেছেন। বলাই বাহুল্য, এর কোনটিই কিশোরোপযোগী নয়।

সুকুমারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, সাবলীল সর্বত্রগামী ভাষা ছাড়াও তাঁর বক্তব্য পরিবেশনের সম্পূর্ণ মৌলিক ভঙ্গি। সুকুমার-সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এ প্রথম থেকে শেষ পাতা অবধি যেন একটা টানা লেখা পড়ার স্বাদ পাওয়া যায়। কোন্‌টা গল্প আর কোন্‌টা নিবন্ধ বা আলোচনা স্বতন্ত্র করতে অসুবিধা হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংবাদও মজলিসী ঢঙে পরিবেশিত হয়েছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, তাঁর পরিবেশিত সংবাদের আধুনিকতা। 'সন্দেশ'-এর পাঠকদের তিনি কারিগরী দুনিয়ার সমকালীন ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রেখেছেন।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলে সুকুমারের নিবন্ধগুলির মূল্য দিতেন শুধু সাহিত্য-গবেষক, ইতিহাসের উপকরণ বিবেচনায়। কেননা, এগুলির অধিকাংশই বিদেশী রচনা থেকে আহৃত। সেটা খুব ভালভাবে বোঝা যায়, পশুপাখি কীট-পতঙ্গের কথা ও জীবনীগুলি পড়লে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা তথ্য আহরণের অবকাশ পাননি বলেই জগদীশচন্দ্রের নামোল্লেখ ছাড়া আর কোন ভারতীয়কে কোথাও দেখা যায়নি; পশুপাখিদের বেলায়ও বিদেশীদের দাপট। জীবজগতের বিচিত্র সংবাদ পরিবেশনের ইচ্ছাকেই তার একমাত্র কারণ নির্দেশ করা যায় না। সংক্ষিপ্ত জীবনের সংক্ষিপ্ততম

অবসরে যেখানেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা চিন্তা যুক্ত করার সুযোগ পেয়েছেন, রচনাটি সাধারণের গণ্ডি ভেঙেছে। 'আলিপুরের বাগানে' 'শ্রীযুক্ত ওরাংচন্দ্র ওটান' মহাশয়কে পর্যবেক্ষণ ক'রে যে নিবন্ধটি লিখেছিলেন সেটি তাঁর নিজস্বতায় অসামান্য।

শিশুপাঠ্য জীবনীর যে সাধারণ ক্ষেত্র, সুকুমার তার বাইরে বিশেষ যেতে পারেন নি। অর্থাৎ অধ্যবসায়, মানবতা, সারল্য ও সততা ইত্যাদি বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে। একটা ব্যাপার চোখে না-প'ড়ে যায় না: 'সন্দেশ'-এ কোথাও জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অগণিত শহীদদের কোনো নামোল্লেখ নেই। অথচ সুকুমার জোয়ান অব আর্কের জীবনী লিখেছেন। বোঝা যায়, জাতীয় রাজনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকাই ছিল 'সন্দেশ'-এর সম্পাদকীয় নীতি। উপেন্দ্রকিশোরের আমলে পঞ্চম জর্জের ছবিও ছাপা হয়েছিল।

এটা যেমন নেতিবাচক দিক, তেমনি অপর দিকে এ ব্যাপারটাও লক্ষণীয় যে স্বদেশী বা বিদেশী কোন ধর্মগুরুর জীবনী লেখেননি সুকুমার। বিজ্ঞানীদের যেসব জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে সাধারণ মানুষের ও বিজ্ঞানীদের দেখাকে তিনি স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছেন।

তবে বিষয় যাই হোক, যত সাধারণই হোক, রচনাগুণে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হতো অনায়াসে। লিভিংস্টোনের জীবনীতে পড়ি, "তিনশো হাত খাড়া ঝরণার" পিছনে "ঝাপসা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে গাছ পালা পাহাড় দেখা যাচ্ছে—ঠিক যেন ছিটের পর্দা"। এই "ছিটের পর্দায়" আশ্চর্য ব্যবহার দৃশ্যটিকে জীবন্ত করে তোলে।

এই গুণ অন্য রচনাতেও লক্ষ্য করি। লেটারপ্রেস মেশিনে ছাপার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, "হাঁ-করা প্রেসের মধ্যে" কাগজ বসিয়ে দিলে "প্রেসটা সেই কাগজের ওপর অক্ষরের 'টাইপ' দিয়ে এক কামড় বসিয়ে দেয় ...।" এখানেও "হাঁ-করা" মুখ আর "কামড়"—এই দুটি অভিব্যক্তি প্রক্রিয়াটিকে প্রত্যক্ষ করে তোলে।

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যাগত বিষয়কে আমাদের চেনা-জানা ও সাধারণ অভিজ্ঞতার পরিধির মধ্যে এনে দিয়েছেন সুকুমার। ফলে বিষয়গুলি সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য হয়েছে। অপর দিকে, তথাকথিত "সামান্য" ঘটনাতেও তিনি অসামান্য মাত্রা যোজনা করতে পেরেছেন, কারণ তিনি জানতেন সামান্য-অসামান্যের বিচার বিচারকের দৃষ্টিকোণ-নিরপেক্ষ নয়। এমনি একটি লেখা, 'সন্দেশ'-এর তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'সন্দেশের হিসাব' (রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত নয়)। তিন বছরে 'সন্দেশ'-এর "মাত্র" ছত্রিশটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু প্রতি সংখ্যা তিন হাজার ছাপা হলে মুদ্রিত কপির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ আট হাজার। এখানেই শেষ নয়, সুকুমারের চিন্তা ছুটলে সত্যিই সহজে ঠেকান যেত না। বিজ্ঞাপন বাদে 'সন্দেশ'-এর প্রতি সংখ্যায় ৩২ পাতা থাকত তাই তিন বছরে সবসুদ্ধ পঁয়ত্রিশ লক্ষ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছিল। ছাপা কাগজগুলো এক সঙ্গে ওজন করলে তবে প্রায় ২১৫ মন হত, "অর্থাৎ তোমাদের প্রায় দু'শ জনের সমান। সন্দেশগুলি যদি একটার উপর একটা উঁচু থাক করে সাজান যেত তবে প্রায় ৭০০ ফুট উঁচু একটা স্তম্ভ হত—কলকাতার মনুমেণ্টের চারগুণ। যদি উপরে উপরে না রেখে লম্বালম্বি সার বেঁধে বসাতে তবে সে সার কলকাতা থেকে বারাকপুর অর্থাৎ প্রায় ১৭-মাইল লম্বা হ'ত।

"যদি প্রত্যেকটি পাতা আলগা ক'রে ঐ রকম পরপর বসান যেত, তা দিয়ে এখান থেকে প্রায় নেপাল বা বর্ম্মা পর্য্যন্ত লম্বা লাইন পাতা যেত।

"এই পঁয়ত্রিশ লক্ষ পৃষ্ঠায় যত অক্ষর আছে সব যদি এই লাইন সার দিয়ে গাঁথা যেত, তাহলে সেই লাইন ধরে স্বচ্ছন্দে বিলাত চ'লে যেতে পারতে।

"এতগুলি ছেঁড়া পাতা জুড়ে যদি চাঁদোয়া তৈরী করা যেত, তবে সেই চাঁদোয়ার নীচে অন্তত আড়াই লক্ষ লোক অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত।"

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বা পরিসংখ্যানের হুল ফুটিয়ে পাঠককে উত্যক্ত করেননি সুকুমার। যেমন 'সূক্ষ্ম হিসাব' দাখিল করছেন তিনি: "কাট্ বলতে ১/১০ সেকেণ্ড লাগে। দ্রুত চলন্ত ট্রেন ততক্ষণে পাঁচ ছয় হাত চলিয়া যায়। ট্রেনটা যতক্ষণে এক ইঞ্চি যায়—আলো ততক্ষণে কলকাতা থেকে ছুটে মধুপুরে হাজির হবে।"

জীববিজ্ঞানের কিশোরপাঠ্য বই খুললেই তার কোন না কোন পাতায় মানবদেহের বিভিন্ন উপাদানের একটি শতকরা

হিসেব বা ওজন নির্দেশক ফর্দ দেখা যায়। কিন্তু 'সন্দেশের হিসাব'-এর মতোই অভিনব ঢঙে সুকুমার জানিয়েছেন, দু'মন ওজনের মানুষের দেহের চর্বি দিয়ে এক পোয়া ওজনের গোটা তিরিশ মোমবাতি এবং মানুষের হাড়ে সঞ্চিত ফসফরাস থেকে আট লক্ষ দেশলাইয়ের মসলা হবে।

উপমার ব্যবহারে জগদানন্দ রায়ের লেখায় নয়, একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দরের লেখাতেই সুকুমারের মতো মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। 'সৌরজগতের উৎপত্তি' প্রবন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন, "একটি কয়লার পৃথিবী গড়িয়া ছত্রিশ ঘণ্টায় পোড়াইতে পারিলে যে পরিমাণ তাপ জন্মে, সূর্যপৃষ্ঠে প্রতি বর্গফুট হইতে প্রতি ঘণ্টায় সেই পরিমাণ তাপ নিয়ত বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে।" আর "পরমাণু" প্রবন্ধে: "এক ফোঁটা জলকে যদি কোনরূপে বড় করিয়া আমাদের পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—যে পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার মাইল, সেই পৃথিবীর সমান করিতে পারি,—তবে সেই জলের ফোঁটায় এক-একটি অণু এক-একটা বেলের মত বড় দেখাইবে।"

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারেও সংযমের পরিচয় দিয়েছেন সুকুমার। 'কনভেক্স লেন্স' বা 'উত্তল কাঁচ'—এই দুটি শব্দকে বাদ দিয়েই তিনি বুঝিয়ে বলেছেন, "কোনো কোনো চশমার কাঁচ এমন থাকে যে, তাহাতে অনেকখানি সূর্যের আলোককে অল্প জায়গার মধ্যে ধরিয়া আনা যায়।"

আর 'কনকেভ মিরার' বা 'অবতল আয়না' বোঝাতে: "সরার মত গর্তওয়ালা আরশি দিয়াও এই কাজটি করান যায়।"

সাবমেরিনকে ডুবুরী জাহাজ, পেরিস্কোপকে 'দিকবীক্ষণ', ডায়াটম-কে 'জীবন্ত ধূলি,' কোলটারকে 'তেল-কয়লা,' এক্স-রে ছবিকে 'কংকালছায়া' বা 'হাড্ডিসার' ছায়া, সিসমোগ্রাফকে 'কম্পনলিপি যন্ত্র,' লাইফ-বোটকে 'প্রাণ-বাঁচানো নৌকা,' টানেল বোরিং মেশিনকে 'কেঁচো-কল,' টিউব রেলকে 'সুড়ঙ্গ রেল,' রেডিও ট্রান্সমিটার বা রিসিভারকে 'আকাশবাণীর কল' নামে পেশ করেছেন তিনি।

সুকুমার-রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিবন্ধগুলির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য তাদের প্রাসঙ্গিকতা ও সমকালীনতা।

টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, রেডিও-ফটো, এরোপ্লেন, ম্যাথমেটিকাল ক্যালকুলেটার, আণ্ডার-ওয়াটার টেলিগ্রাফ লাইন, স্কাইস্ক্রেপার ও প্রিফেব্রিকেটেড বিল্ডিং, ইলেকট্রিক লিফট, প্যারাসুট, বায়োস্কোপ, নিউমেটিক ট্রান্সপোর্টেশান, রেলওয়ে ইত্যাদি বিবিধ যন্ত্রের ও কৌশলের কথা লিখেছেন তিনি।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিজ্ঞানী গডার্ড যখন প্রথম রকেট ছাড়লেন তখন তার গতি বা দৌড়ের পাল্লা দেখে বিজ্ঞানী মহলের বাইরে সঙ্গত কারণেই তেমন কোন কৌতূহল জাগেনি, বা রকেটের ভবিষ্যত পরিণতি কল্পনা ক'রে সোরগোল পড়ে যায় নি। এমন কি ১৯২৬-এর আগে তরল জ্বালানীও ব্যবহৃত হয় নি রকেটে। জুলভার্ন-পড়া সুকুমার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'চাঁদমারি' প্রবন্ধে গডার্ডের কৃতিত্ব আলোচনা করে চাঁদে পাড়ি দেওয়ার সম্ভাবনার কথা তুললেন, "যাহোক মানুষের খেয়াল চাপলে মানুষ সবই করতে পারে। হয়তো তোমরা বুড়ো হবার আগেই শুনতে পাবে যে চাঁদের দেশের প্রথম যাত্রীরা চাঁদে যাবার জন্য রওনা হয়েছে। তারা যদি গিয়ে ফিরে আসতে পারে তাহলে কত যে আশ্চর্য কাহিনী তাদের কাছে শুনতে পাবে, তা এখন কল্পনা করাও কঠিন।"

বছর ষাট বয়সে যারা ১৯৬৯-এর ২০শে জুলাই আর্মস্ট্রঙের চাঁদের মাটিতে পা ফেলার খবর শুনেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো দশ এগারো বছরের শিশু-পাঠক হিসাবে ১৯২৭-এর আষাঢ় মাসের 'সন্দেশ'-এ এই লেখা পড়েছিলেন।

সিরিডির কাছে কয়লাখাদে স্পনটেনিয়াস কম্বাসশানের খবর শুনে সুকুমার লিখেছিলেন 'রাবণের চিতা'। ভূমিকম্পে কলকাতা নড়েচড়ে বসতেই তিনি ভূমিকম্পের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। 'লোহা'-র কথা বলবার সময় টাটার লোহা ও ইস্পাত কারখানার কথা তিনি ভোলেন নি। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি প্রচলনের আগে তাঁদের শৈশবকালে বাইসাইকেল দেখে লোকে কি রকম আশ্চর্য হত।

এরোপ্লেনের অনেক খবরাখবর পাওয়া যায় তাঁর লেখায়। তখনো ভারতে আকাশপথে ডাক এখন চালু হয়নি। দমদমে বিমান বন্দর দূরের কথা, ১৯২০ সালে প্রথম সেই প্রস্তাব অনুমোদিত হল। ১৯১৯-এর বিজ্ঞাপনে প্রথম দেখা গেল মার্টিনসাইড কোম্পানী প্রথম আকাশপথে লণ্ডন-অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেওয়ার সুযোগের কথা জানাচ্ছে। অবশ্য ভারতের আকাশে

১৯১১ সালেই প্রথম একটি ফরাসী 'বেলেরিও' এরোপ্লেন কসরৎ দেখিয়েছিল।

১৯২৩-এ 'দা ইণ্ডিয়ান স্টেট্‌স্ অ্যাণ্ড ইস্টার্ন এজেন্সি' নামে একটি বেসরকারী সংস্থা ভারতে প্রথম বেতারবার্তা প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করে কলকাতায়। অল্প দিনের মধ্যেই বাঙালী বিজ্ঞানী ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র কলকাতায় দ্বিতীয় বেতার প্রেরক যন্ত্রটি নির্মাণ ও স্থাপন করেন বিজ্ঞান কলেজে। ১৯২৭ থেকে 'ইণ্ডিয়ান ব্রড্‌কাস্টিঙ কোম্পানি' নিয়মিত বেতার অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করার আগে কলকাতায় শুধু এই দু'টি প্রেরকযন্ত্রই ছিল। অবশ্য বেতার-উৎসাহী ডক্টর বি. সিংহ, টি. এন্ গুপ্ত ও এ সি. গুপ্ত তাঁদের অ্যামেচার রেডিও লাইসেন্স পেয়েছিলেন ১৯২১ সাল নাগাদ। এই প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে দেখতে হবে ১৩২৯ এর (১৯২২-এর) ভাদ্র মাসের 'সন্দেশ'-এ সুকুমার রায়ের লেখা 'আকাশবাণী। কল'। অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র আকাশবাণী নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'আকাশবাণী' শব্দটি রেডিও তরঙ্গের প্রতিশব্দ হিসাবে সম্ভবত সুকুমারের আগে ব্যবহার করেন নি। সুকুমার 'আকাশবাণী কল বলতে প্রেরক ও গ্রাহক উভয় যন্ত্রই বুঝিয়েছিলেন, 'এমনি কলে যে 'গান কানে যায় না শোনা', যে গান আকাশের তরঙ্গে চড়ে বিদ্যুতের বেগে চারিদিকে ছুটে বেড়ায়, সেই অশব্দ গানকে আকাশময় ছড়িয়ে দিয়ে মানুষ আবার তাকে কলের মধ্যে ধরে আকাশের ভাসা ও আকাশের সুর শুনছে।"

সুকুমারের আরেকটি রচনা আজো আধুনিক। কলকাতায় প্রথম টিউব রেলের পরিকল্পনা হয় ১৯২০ সালে। মিস্টার লাইডেল্ নামে এক বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে আসা হয়েছিল হুগলী নদীর তলা দিয়ে শিয়ালদহ ও হাওড়া সংযোগকারী সুড়ঙ্গ খুঁড়ে রেলগাড়ি চালানো সম্ভব কিনা অনুসন্ধান করে দেখবার জন্যে। মিস্টার লাইডেল্ টিউব্ রেল বসানোর পক্ষে মত দিলেও, সেকালের হিসাবে ৪০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ প্রকল্পটি গৃহীত হয় নি। হ'লে হয়তো টিউব রেলের মতো 'ভুঁইফোঁড়' নামে সুকুমারের রচনাটিও এতদিনে সেকেলে হয়ে যেত। লণ্ডনে দেখা টিউবের বিবরণ দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, কলকাতাতেও 'ভুঁইফোঁড়' সুড়ঙ্গের রেল বসানোর কথা হচ্ছে।

সাধারণভাবে বিজ্ঞান-বিষয়ক যেকোন রচনার সঙ্গেই কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের শত্রুতা। প্রত্যক্ষভাবে কয়েকটি নিবন্ধে সুকুমার প্রচলিত ধারণা ভেঙে বৈজ্ঞানিক মত প্রচার করেছেন। ধূমকেতুর সঙ্গে সংঘর্ষে বা সূর্যগ্রহণের সময়ে পৃথিবীতে প্রলয়কাণ্ড ঘটার অলীক ভীতিকে আঘাত ক'রে সুকুমার ১৩২৪-এ 'প্রলয়ের ভয়' লিখেছিলেন। আজো আমাদের দেশে এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই। ১৩২৪-এর কার্তিকে প্রকাশিত 'আমাদের জ্যোতিষ' ও ১৩২৫-এর শ্রাবণে প্রকাশিত আবোলতাবোল সংগ্রহভুক্ত কবিতা 'ভূত দেখানো'-র মূল প্রতিপাদ্য এক—"মানুষের বিদ্যায় যেখানে কুলোয় না কল্পনা সেখানে অভাব পূরাইয়া লয়" এবং বিপত্তি বাধায়।

সুকুমার রায়ের সৃজনশীল বিজ্ঞানী মন যে কত বিচিত্রগামী ছিল সেটা আরো বোঝা যায় তাঁর রচিত ধাঁধা, হেঁয়ালি বা মজার খেলা থেকে। এখানে তিনি খেলার ছলে শব্দ, অঙ্ক আর যুক্তি নিয়ে লোফালুফি করেছেন। এই-জাতীয় রচনার কয়েকটি শুধু তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত, অধিকাংশ রয়েছে 'সন্দেশ'-এর পাতায়। 'হিজিবিজি' খাতাতেও 'ক্রিপ্টোগ্রাম' বা সাংকেতিক-লিপি ও 'অ্যানাগ্রাম' বা বর্ণসংস্থান উলট-পালট করে নতুন শব্দসৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায় (প্লেট দ্রষ্টব্য)। গণিতের ও ভাষার, সংখ্যার ও শব্দের সংকেতময় চরিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই এই ধরণের খেলার নেশায় মেতেছিলেন তিনি, গণিতের অধ্যাপক লিউইস ক্যারলেরই মতো। শব্দ-বদল বা ওয়ার্ড-ট্র্যান্সফর্মেশনের খেলায় ক্যারল্ 'APE'-কে 'MAN' করেছিলেন, আর সুকুমার 'সাবান' থেকে 'মলম' ও 'সোনাও'-থেকে 'পায়স' তৈরি করেছিলেন। তাছাড়া 'ঠকানে প্রশ্ন,' 'গরুর বুদ্ধি' ইত্যাদি লেখাকে 'logic games' বলা চলে। 'হেঁয়ালি নাট্য'-তে শব্দকে ধ্বনি অনুসারে ভেঙে তিনি কিভাবে অনর্থ ঘটিয়েছেন তা লক্ষ্য করলেই 'অবাক জলপান' নাটক বা 'ফুল ফোটে তাই বল'-পংক্তিগুলি মনে পড়ে। শুধু শব্দের ধ্বনিতত্ত্বই নয়, শব্দ ও বর্ণের রূপতত্ত্ব নিয়ে সচেতন সুকুমার শেষ জীবনে, মুদ্রণের কাজ সুষ্ঠু করার জন্য বাংলা হরফ সংস্কার নিয়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

চারটি উপবৃত্তাকার চাকা জোড়া একটি অবাস্তব গাড়িকে

যন্ত্রসম্ভব করেছিলেন ক্যারল। একইভাবে বিদঘুটে কল্পনার মধ্যেও সুকুমার যান্ত্রিক বিচারবোধ হারাননি। ছবিতে দেখি 'সত্যি' গল্পের বিটকেল প্রফেসরের কামানটি হাপরের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ 'কম্প্রেস্‌ড্‌ এয়ার'-চালিত। চণ্ডীদাসের খুড়োর আজব কলটিও যন্ত্রকৌশল-সিদ্ধ। মণ্ডা-মিঠাই গাঁথা সুতোটা দুটো কপিকলের ওপর দিয়ে গেছে আর তার শেষ প্রান্ত ফ্লাইনাট্‌ লাগানো সকেটের মধ্যে স্ক্রু-র চাপে আঁটা। অ্যাডজাস্ট করার ব্যবস্থা সত্ত্বেও, সুতোর দৈর্ঘ্য এমনই যে লোভনীয় খাদ্য কিছুতেই মুখের আরো কাছে নামানো সম্ভব নয়। এমন কি সুতো যদি দোলে তাও না। কপিকল ফিট্‌-করা ডাণ্ডার সামনের দিক্‌ বেশি লম্বা, তাই বাড়তি ভার সামলাতে আরেকটা সুতো সেটাকে পিছনের দিক টেনে রেখেছে। 'রেলওয়ে মিস্‌লেনি' ও 'প্রফেসর ব্রেন্‌স্টর্ম'-খ্যাত উইলিয়াম হিথ রবিন্‌সনের সঙ্গে বোধহয় এদেশে সুকুমারেরই একমাত্র তুলনা চলে। প্রফেসর হেঁশোরামের দেখা সৃষ্টিছাড়া জীবজন্তুর অ্যানাটমি বিশ্লেষণ করে শিল্পসমালোচকরা বোধহয় টেক্‌নিকাল্‌ কোন ত্রুটি পাবেন না।

বহু বিচিত্র, অসাধারণ কতকগুলি গুণের সমন্বয় ঘটেছিল সুকুমারের মধ্যে। উপেন্দ্রকিশোরের মতো সব্যসাচী বিশ্বকর্মার স্নেহচ্ছায়ায় গড়ে উঠেছিল তাঁর মন। বিজ্ঞানীর সত্যসন্ধানী স্বচ্ছ দৃষ্টির অধিকারী সুকুমার সজাগ ছিলেন কেবল ভাষার দৌরাত্ম্য সম্পর্কেই নয়, চিন্তা ও কর্মের অসংগতি, সামাজিক অসংগতি সম্পর্কেও। এর পাশাপাশি ছিলেন আবাল্য পরিহাস-প্রিয়, কৌতুকপ্রিয় মজলিশী ছান্দসিক মানুষটি। এই দুই সুকুমারের মধ্যে, মননের গাম্ভীর্য এবং মেজাজের সরসতার মধ্যে যে আপাত-বিরোধ, হয়তো তা নিষ্পত্তির একমাত্র দিশা মেলা সম্ভব ছিল খেয়ালস্রোতের উজানে। পিতার অকালমৃত্যুর পর 'সন্দেশ'-সম্পাদনা তাঁর পূর্ণ মনোযোগ দাবি করেছে। শিক্ষামূলক ও নীতিমূলক বহু ফরমায়েশি লেখা লিখে সুকুমার নিজেকে 'সন্দেশ'-বন্দী করলেও, তাঁর একান্ত নিজস্ব যে রচনা সেখানে কখনোই তিনি শুধু কৈশোরিক আবেদন রেখেই ফুরিয়ে যাননি। প্রথম পাঠে যা শুধু শিশু-কিশোরের সম্পত্তি, পরবর্তী পাঠে তা যে-কোনো বয়সের। তাঁর রচনার মেজাজ ও স্টাইল গড়ে ওঠার পিছনে অন্তরের তাগিদ যেমন ছিল, সম্পাদকের এই দায়ও বোধহয় তেমনি কাজ করেছিল।

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ

শিশু স্বপ্নলোকে নতুন বিজ্ঞানের ছায়া

এ শতাব্দীর নতুন পদার্থবিদ্যার বৈপ্লবিক আবিষ্কারগুলি সম্বন্ধে সুকুমার রায়ের গভীর উপলব্ধিসমৃদ্ধ 'হ য ব র ল'র প্রথমাংশে শিশুকল্পনার এক ইন্দ্রজাললোক সৃষ্টি করেছে। কীভাবে এই রূপান্তরণ ঘটেছে এবং 'হ য ব র ল'র দ্বিতীয়াংশে প্রকাশিত তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক ভাবনার সাযুজ্য কোথায়, সেটি আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।

সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্বের তিনটি দিক আমার কাছে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয়। বিজ্ঞানে, বিশেষত আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে, তাঁর প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল ; এ ছাড়াও তাঁর মধ্যে ছিল বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এক গভীর অনুসন্ধিৎসা, যা এদেশের মানুষের মধ্যে একটি দুর্লভ গুণ, এবং বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলির বৃহত্তর দার্শনিক তাৎপর্য সম্পর্কে ঔৎসুক্য। দ্বিতীয়ত, তাঁর সূক্ষ্ম ও গভীর সমাজচেতনা ঃ ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতির মর্মমূলে অবস্থিত এক অদ্ভুত বৈপরীত্যের সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি এবং তাঁর পারি-পার্শ্বিক ঔপনিবেশিক জগতে ঐ বৈপরীত্যের প্রতিফলন সম্পর্কে একই সঙ্গে সকৌতুক এবং ব্যঙ্গাত্মক প্রতিক্রিয়া। তৃতীয়ত, তাঁর অন্তরের অতুলনীয় খেয়ালরসের প্রস্রবণ। Fantasy-র অসম্ভব জগতে অবাধ বিচরণের যে প্রবণতা চিরন্তন শিশুমনের সম্পদ তা সুকুমারের মানসিক গঠনের মধ্যে সংজাত ছিল। তার সঙ্গে তাঁর পরিণত বুদ্ধিদীপ্ত মনে জীবন ও জগতের অন্তর্নিহিত বহু বিচিত্র বৈপরীত্য সম্বন্ধে যে-সব অনুভূতি জেগে উঠতো সেগুলি মিশে গিয়ে সৃষ্টি করেছে এমন এক অপূর্ব জগৎ যা শিশুদের জোগায় অফুরন্ত আনন্দ এবং সাবালকদের মনে জাগায় এক অবর্ণনীয় মিশ্র অনুভূতি যার মধ্যে অনাবিল হাস্যরসের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে এক সূক্ষ্মতর চিন্তার জগৎ।

সুকুমারের কবিতা, নাটক, গল্প—তিনটি ক্ষেত্রেই বহু দৃষ্টান্তে পাওয়া যায় উচ্ছল কৌতুকরসের সঙ্গে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মক সমাজচেতনার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। তা বলে অবশ্য একথা মনে করা ঠিক হবে না যে এইসব কবিতা বা গল্প বা নাটক-গুলির মূল আকর্ষণই হচ্ছে তাদের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গরস বা ব্যঙ্গাত্মক সমাজচেতনা। সবচেয়ে অর্থপূর্ণ রচনাগুলিও সার্থক হয়ে উঠেছে তখনই যখন তারা সুকুমারের মনের সহজাত খেয়ালরসের বিচিত্র বর্ণালীতে অভিষিক্ত হয়ে এক-একটি কৌতুকোজ্জ্বল মূর্তি ধরে আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়েছে।

খেয়ালী কল্পনার ঐতিহ্য ও সুকুমার

সাহিত্য বা শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এমন কিছু কিছু মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা ঠিক প্রত্যক্ষ বাস্তবের ক্ষেত্রে তাঁদের জীবনচেতনার স্ফুরণ খুঁজে পান নি, যাঁদের

সৃজনী-প্রতিভা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে চেতনার এমন এক ছায়াময় প্রান্তদেশে যেখানে স্রষ্টার বাস্তবচেতনার সীমানা অনির্দেশ্যভাবে হারিয়ে গেছে এক বিচিত্র কল্পলোকের বা খেয়ালরসের রোমান্টিক অবাস্তবতার মধ্যে। কোলরিজ্-এর কবিত্বশক্তি দুই পাখা মেলে অবাধ বিচরণ করতে পেরেছে একমাত্র সেই রোমাঞ্চকর ছায়ালোকটিতে যেখানে বাস্তব ও অবাস্তব, লৌকিক ও অলৌকিক মিশে একাকার হয়ে গেছে। একমাত্র এই-জাতীয় মাধ্যমের ভিতর দিয়েই তিনি ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নীতি-দুর্নীতি সম্বন্ধে তাঁর বেদনার্ত চেতনাকে রূপ দিতে পেরেছেন। রেনেসাঁস্ যুগের মহান বাস্তবধর্মী লেখক শেক্সপিয়র-এর সমসাময়িক সার্ভ্যান্টিস্ও (ইংরেজী উচ্চারণ) অনেকটাই ছিলেন এই ধরণের অ-প্রত্যক্ষ জীবন চিত্রণের পথের পথিক। তাঁর অপেক্ষাকৃত বাস্তবানুগ লেখাগুলি আজ প্রায় সবই বিস্মৃত, কারণ সেখানে তাঁর প্রতিভা স্তিমিত। কিন্তু তাঁর অমর রচনা Don Quixote-এ নায়কের উদ্ভট, অসম্ভব অ্যাড্ভেঞ্চারগুলির অপূর্ব চিত্রণের ভিতর দিয়েই মহান জীবনদ্রষ্টা আদর্শ ও বাস্তবের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত জগতে আদর্শবাদী প্রয়াসের পরিণামকে রূপায়িত করতে পেরেছেন। চার্লস্ ল্যাম্-এর রচনায় করুণরস ও হাস্যরস দুইয়েরই ব্যঞ্জনা সবচেয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে যখন তা fantasy-র রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে। ডিকেন্স্ তাঁর অনবদ্য caricature-গুলি সৃষ্টি করেছেন সম্ভবকে প্রায়-অসম্ভবের চত্বরে নিয়ে গিয়ে। উড্হাউস্-এর সমস্ত জগৎটিই তাঁর লঘুচ্ছন্দ খেয়ালী কল্পনার রঙে রাঙানো। আর-একদিকে জুল্ ভার্ন এবং এইচ্. জি. ওয়েল্স্ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে মানুষের অসীম অগ্রগতি সম্বন্ধে যে-সব ধারণা ও আশা পোষণ করতেন সেগুলির অবিস্মরণীয় সাহিত্য-রূপ দিতে পেরেছেন তাঁদের বিজ্ঞানী-কল্পনাকে অসম্ভবের জগতে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা দিয়ে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে সুকুমার রায় আধুনিক যুগের লেখক এবং তাঁর fantasy-র ছন্দের মধ্যেও একটা আধুনিকতার ধাঁচ আছে যা আগেকার যুগের লেখকদের মধ্যে পাওয়ার কথা নয়। তাই এদিক দিয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ মিল এ-জাতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে পূর্বসূরী লুইস্ ক্যারল্ ও এড্ওআর্ড্ লিআরের সঙ্গে। এঁদের মধ্যে আবার ক্যারল-এর সঙ্গে তাঁর মিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এসব সত্ত্বেও কিন্তু এঁদের প্রত্যেকের চেতনার ধারা এবং ক্ষেত্র কম-বেশী স্বতন্ত্র এবং প্রত্যেক রচনার স্বাদই ভিন্ন। এমন কি লুইস্ ক্যারল এবং সুকুমার রায়, যাঁদের মধ্যে আপাতসাদৃশ্য এত বেশী, তাঁদের মধ্যেকার পার্থক্যও রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ। নিঃসন্দেহে দেশ ও কালের বিপুল ভিন্নতা এর জন্য কিছুটা দায়ী। কিন্তু এক্ষেত্রে দুজনের মনের গঠনের ভিন্নতাই বোধ-হয় এই পার্থক্যের প্রধান কারণ। উনিশ শতকের মধ্য ও শেষ পর্যায়ের মানুষ লুইস্ ক্যারল্ ছিলেন—তাঁর বিচিত্র ব্যঙ্গ-প্রবণতা সত্ত্বেও—শান্ত ও লাজুক প্রকৃতির, একান্ত ধর্মপ্রবণ এবং অনাবিল শিশুদরদী মনের অধিকারী। অক্স্ফোর্ডে অংক কষানো আর শিশুদের সঙ্গ উপভোগ ও তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নানারকম fantasy রচনা করা--এই ছিল তাঁর নিঃসংসার জীবনের প্রধান কাজ। তাঁর রচনায় অজস্র রহস্য ও কৌতুকের চমকের মধ্যেও একটি অদ্ভুত সারল্যের সুর ধরা পড়ে। সুকুমার রায়ের বিংশ শতাব্দীর মন ছিল অনেক বেশী জটিল ও বৈপরীত্য-সমন্বিত। তাঁর খেয়ালের অভিযান বিশ্বজগৎ, সমাজ ও মানবমনের অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে বলে মনে হয়। পারিপার্শ্বিক সমাজ-জীবনের অন্তর্নিহিত অসংগতিগুলি সম্পর্কে তাঁর চেতনা ছিল গভীরতর ও তীব্রতর -- যার ফলে তাঁর রচনায় এই সব বিচিত্র অসংগতি সম্বন্ধে বিস্ময়বোধ ও ব্যঙ্গপ্রবণতা এক অবর্ণনীয় স্বাদের সৃষ্টি করেছে। খেয়ালরসিকের জীবন ও জগৎকে নানাভাবে উল্টেপাল্টে অসংখ্য উদ্ভট ও কৌতুকের চেহারায় রূপান্তরিত করে দেখার যে মন, সুকুমারের ক্ষেত্রে সেই মনের খেয়ালের অন্তরালে ছিল একটি সূক্ষ্ম জীবন-সমালোচকের দৃষ্টি। সাধারণভাবে ভারতীয় চিন্তাভঙ্গীকে এবং বিশেষভাবে ঐ যুগের ঔপনিবেশিক সমাজের elite-এর দৃষ্টিভঙ্গীকে সুকুমার তাঁর খেয়ালী কল্পনার অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে এমন এক তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন যা আজ পর্যন্ত অতুলনীয় হয়ে আছে। তাঁর মনের এই অনন্যতা আমাদের আরো অবাক করে দেয় যখন আমাদের মনে পড়ে যে তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক আদর্শবাদী চির-রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথের নিকট-সহচর এবং ব্রাহ্ম-

সমাজের একজন বিশিষ্ট সদস্য।

আমাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুকুমারের উল্লেখযোগ্য পূর্বসূরী হিসাবে একজনের কথাই মনে পড়ে। তিনি উনিশ শতকের শেষার্ধের স্বনামধন্য fantasy-রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর 'কঙ্কাবতী' প্রভৃতি রচনা এই-জাতীয় সাহিত্যের রীতিমত উচ্চ পর্যায়ে পড়ে। তাঁর ওপরেও লুইস্ ক্যারল্-এর Alice-কেন্দ্রিক গল্পগুলির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু স্পষ্টতই তাঁর fantasy-র ভিত্তিভূমি ছিল তাঁর সমাজ-চেতনা। তৎকালীন সমাজের দুটি বিশেষ দুর্বলতার ক্ষেত্র ছিল (যার সুস্পষ্ট চিত্র শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়)। প্রথমটি হচ্ছে পল্লীসমাজের চরম-কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জাতিভেদ-পীড়িত, আচারবিচার-কণ্টকিত, জমিদারী-দাপট-শাসিত এবং পিতৃতান্ত্রিক অত্যাচার-জর্জরিত অবস্থা, যেখানে মানুষের মনুষ্যত্ব এবং সহজ সুবুদ্ধি ছিল নিত্য-পদদলিত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ঐ গ্রামাঞ্চল থেকে আমদানী কলকাতার নতুন ইঙ্গ-বঙ্গ (৫% ইঙ্গ, ৯৫% বঙ্গ) বাবুদের আচরণে সনাতনধর্মীয় ভণ্ডামির সঙ্গে বিলাতী খানাপিনা-পোশাক-আসবাবের প্রতি অন্ধ লালসার এক উৎকট মিশ্রণ, এবং অসুস্থ গ্রামাজীবনের ওপর ঐ মনোবৃত্তির আরো অস্বাস্থ্যকর প্রভাব। সমাজের এই অবস্থাটির একটি মর্মস্পর্শী ব্যঙ্গচিত্র পাওয়া যায় 'কঙ্কাবতী'-তে। এর মধ্যে ব্যঙ্গরসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে গভীর করুণারস এবং স্নিগ্ধমধুর মানবিকতার মাধুর্যরস। এই বিচিত্র ভিত্তিভূমির ওপর গড়ে উঠেছে যে অপূর্ব fantasy-র সৌধ তার মধ্যে আছে দুটি মূল উপাদান ঃ এই শ্বাসরোধকারী সমাজ-পরিবেশ থেকে পালানোর ইচ্ছা, অর্থাৎ escapism ; এবং এই অসহ্য জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার একটি স্বপ্নপ্রয়াস অর্থাৎ wish-fulfilment—যদিও সুখ-শান্তি-সততার পথে দাঁড়ানো বাধাগুলির দুর্লংঘ্যতার চেতনাও কঙ্কাবতীর স্বপ্নের দুঃখময় সমাপ্তির মধ্যে আভাসিত।

সুকুমার রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঔপনিবেশিক সমাজের সবচেয়ে এগিয়ে-থাকা অংশটির সঙ্গে যুক্ত থেকে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে তার ধাতটি বেশ ভালভাবে বুঝে ফেলেন। এই সামাজিক পরিবেশের বিচিত্র হাস্যকর স্ববিরোধিতা এবং এর অপরিবর্তনীয়তা সম্বন্ধে এক অদ্ভুত অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাঁর অধিকাংশ রচনায়ই পাওয়া যায়। তাঁর মধ্যে escapism বা wish-fulfilment কোনটাই নেই। তাঁর মধ্যে আছে একটি চাপা (এবং একটা বাঁকা) critical spirit, যা শেষ পর্যায়ে (যেমন 'হযবরল'-র শেষাংশে ও 'হেঁশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি'-তে) অনেকটাই পরিণত হয়েছে আশাহত আদর্শবাদীর cynicism-এ। সর্বত্র না হলেও মূলত এই critical spirit-ই তাঁর অসাধারণ খেয়ালী কল্পনার আকাশ-বিহরণের ভিতর দিয়ে বিচিত্র শিল্প-রূপে ব্যক্ত হয়েছে।

'হ য ব র ল'-র প্রথমার্ধে কীভাবে সুকুমার রায় বিংশ শতাব্দীর নতুন পদার্থবিজ্ঞানের আপাত-অবিশ্বাস্য বৈপ্লবিক আবিষ্কারগুলিকে শিশুমনের এক অপূর্ব স্বপ্নবিলাসের রূপ দিয়েছেন—তা এবার আলোচনা করব। 'হ য ব র ল'-র স্পষ্ট দুটো ভাগ। যোগসূত্রটি হিজি বিজ বিজ, যার অসহ্য কৌতুকের হাস্যোচ্ছ্বাস দুটি জগতের মধ্যে একটি সেতু রচনা করেছে। দ্বিতীয় অংশটি, যার শীর্ষ রচনা করেছে একটি অনন্য বিচার অনুষ্ঠান, সেটি স্পষ্টতই (শিশুস্বপ্নের মাধুর্যমণ্ডিত) একটি অপূর্ব সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র। এই অংশটি এবং এর অন্তর্নিহিত গভীর সমাজ-চেতনার বিষয়টি এখানে আমরা আলোচনা করছি না। বর্তমান আলোচনার ক্ষেত্র "হ য ব র ল"-র প্রথমার্ধটি, অর্থাৎ শিশু-কথকের রুমালকে বেড়ালে পরিণত হতে দেখা থেকে শুরু করে দুই দেড়হাতী বুড়োর ধস্তাধস্তির শেষে ব্যাকরণের দোকানপাট বন্ধ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে এক বিচিত্র বৈপরীত্য-শাসিত স্বপ্নলোকের মিলন লুইস্ ক্যারলের Alice's Adventures in Wonderland, Through the Looking Glass and What Alice Saw There এবং Sylvie and Bruno প্রভৃতি লেখাতেও পাওয়া যায় এবং আধুনিককালে সাহিত্যের এই ক্ষেত্রটিতে তিনিই বোধহয় পথিকৃৎ। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রেও সুকুমারের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর পার্থক্য লক্ষণীয়। প্রথমত ক্যারলের লেখার মধ্যে বিজ্ঞানতত্ত্বচেতনা এক বিপুল ক্ষেত্রের ওপর ক্ষীণভাবে পরিব্যাপ্ত। সুকুমারের

খেয়ালী লেখার অল্প অংশেই বিজ্ঞানচেতনার সুস্পষ্ট ছাপ বর্তমান। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিশেষ লেখাটিতে অর্থাৎ 'হ য ব র ল'-র প্রথমাংশে, সুকুমারের বিজ্ঞানচেতনা স্বল্প-পরিসরের মধ্যে এক আশ্চর্য ঘনীভূত সংহত রূপে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ক্যারলের চিন্তায় প্রতিভাত হয়েছে মধ্য-উনবিংশ শতকের বিজ্ঞানের শান্ত অগ্রগতির ধারা, যা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছিল নিউটনের মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব থেকে ক্যারলের সমকালীন ম্যাকস্ওয়েলীয় Electrodynamics পর্যন্ত। কিন্তু সুকুমারের চিন্তালোকে যেসব বিজ্ঞানতত্ত্ব ছায়াপাত করেছিল সেগুলি এমনই আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং আপাত-উদ্ভট প্রকৃতির যে তাদের প্রভাব ছিল এক-একটি চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎঝলকের মত। এই নিবিড় চিন্তাসংহতির আর-একটি কারণ অবশ্য সুকুমারের বিশেষ মানসিক গঠন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর এক সহজাত অন্তর্মুখী গভীরতা, যার বলে তিনি একটি নবোন্মেষিত দুরূহ তত্ত্বলোকের বিপুল পরিসরকে কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে বন্দী করে ফেলেছেন এক অপূর্ব স্বপ্নরূপকচিত্রে।

নতুন বিজ্ঞানের ঢেউ

যে নতুন পদার্থবিজ্ঞানের অভিঘাত সুকুমারের মনে এই বিস্মিত উপলব্ধির ঢেউ তুলেছিল তা হচ্ছে প্রধানত আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ এবং দ্বিতীয়ত ম্যাক্স্ প্লাংক্, আইনস্টাইন, রাদারফোর্ড, বোর্, প্রভৃতি বহু বিজ্ঞানীর ধারাবাহিক চিন্তা-সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা কোআন্টাম্ তত্ত্ব। (সুকুমার রায়ের জীবিতকালে দ্য ব্রয়লি, শ্রডিংগার, হাইজেন্বার্গ, বর্ণ্, ডিরাক, পাউলি প্রভৃতি বিজ্ঞানীর চিন্তার মাধ্যমে গড়ে-ওঠা 'কোআন্টাম মেকানিক্স্'-এর পর্যায় তখনও আসেনি।) এই তত্ত্বগুলির আবির্ভাবের ধারাবাহিক কোন ইতিহাস দেবার চেষ্টা আমি এখানে করব না। শুধু বস্তুজগৎ সম্বন্ধে যে নতুন বৈপ্লবিক ধারণাগুলি দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত গ্যালিলীয়-নিউটনীয় ধারণাগুলিকে অনেকাংশেই ভ্রান্ত বা অপ্রতুল প্রতিপন্ন করলো সেগুলির একটা সাধারণবোধ্য স্থূল বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করব।

উনিশ শতকের ধারণা অনুযায়ী, ইথার-মাধ্যমের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর গতিবেগ নির্ণয়ের প্রয়াসে মাইকেলসন্ ও মর্লির ১৮৮৭ সালের বিখ্যাত পরীক্ষা এবং আলোকের গতির কাছাকাছি গতিতে ধাবমান যে-কোন বস্তুর রহস্যময় দৈর্ঘ্য-সংকোচন সম্বন্ধে লোরেন্টজ্ ও ফিট্জ্জেরাল্ডের গবেষণা যেসব গভীর প্রশ্নের উদ্রেক করেছিল সেগুলির চমকপ্রদ উত্তর পাওয়া গেল ১৯০৫-এ প্রকাশিত আইনস্টাইনের "বিশেষ বা সীমিত আপেক্ষিকতাবাদ"-এ (Special or Restricted Theory of Relativity)। আলোর গতি সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার (১৮৬২৮১ মাইল) তা আগেই জানা ছিল। এখন জানা গেল, ঐ গতি একটি বিশ্ব-ধ্রুবক। অর্থাৎ কেউ যতই বেশী বেগে কোন আলোক-উৎসের দিকে বা বিপরীত দিকে যাক না কেন, সে সর্বদাই আলোককে (শূন্যতার মাধ্যমের মধ্যে) ঠিক ঐ গতিতেই চলতে দেখবে। এ ছাড়াও জানা গেল, আলোর গতিই বস্তুবিশ্বে সর্বোচ্চ সম্ভাব্য গতি এবং কোন বস্তুর পক্ষেই আলোর চেয়ে বেশী বা আলোর সমান গতিতে চলা সম্ভব নয়। যদি কোন বস্তু আলোর কাছাকাছি গতিতে চলে তাহলে (১) তার ভর (mass) প্রায় অসীম হয়ে উঠবে এবং (২) তার দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে প্রায় শূন্যতায় গিয়ে ঠেকবে (Lorentz-Fitzgerald contraction)। তাছাড়াও (৩) ঐ প্রায়-আলোকবেগসম্পন্ন system-এ সময়ের গতি অত্যন্ত মন্থর হয়ে যাবে (Time dilation)। আমাদের আপাতস্থির system-এ যখন কয়েক বছর কেটে গেছে তখন ঐ অতিদ্রুত-গামী system-এর ঘড়ি অনুযায়ী হয়তো মাত্র কয়েকঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়েছে। কেউ যদি ঠিক আলোকের বেগে চলতে পারে (যা বস্তুত সম্ভব নয়) তাহলে আপেক্ষিকতাবাদ অনুযায়ী তার চেতনায় সময় বলে কিছুই থাকবে না, অর্থাৎ তার নিজেরও বয়স বাড়বে না এবং সে জগৎকে সর্বতোভাবে অপরিবর্তিত দেখবে। এই চিন্তাসূত্রকে আরো এগিয়ে নিয়ে গিয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ যদি (যদিও তা বস্তুত সম্ভব নয়) আলোকের চেয়েও বেশী গতিতে চলতে পারে, তাহলে কী হবে? উত্তর এই যে, তাহলে সময়কে সে উল্টো-দিকে চলতে দেখবে, অর্থাৎ সে ক্রমশই অতীতের দিকে ফিরে যাবে—অর্থাৎ তার বয়স কমতে থাকবে।

অতি-আলোকীয় বেগের যাদুবলে মানুষের অতীতে ফিরে যাওয়ার এই স্বপ্নময় ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে একটি মজার

আপেক্ষিকতাবাদী ছড়ায় :

There was a young girl named Miss Bright
Who could travel much faster than light
She departed one day
In an Einsteinian way
And came back on the previous night

গতি বাড়লে যদি ভর বাড়ে তাহলে absolute mass বলে আর কিছু রইলো না। কোন বস্তুর গতিবেগ বাড়লে তার মধ্যেকার সমস্ত গতি-ছন্দগুলি (যেমন ঘড়ির চলন) মন্থর হয়ে পড়বে। সুতরাং absolute time বলেও আর কিছু রইলো না। আর, গতিবেগের সঙ্গে ভর, দৈর্ঘ্য, সময় সবই যখন বদলে যাচ্ছে, তখন সাধারণ অর্থে simultaneity বা যুগপত্তা বলে কিছু থাকছে না। একটি বিশেষ গতিবেগ-সম্পন্ন system থেকে যে ঘটনাগুলি একই সময়ে ঘটেছে বলে মনে হবে, ভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন অন্য একটি system থেকে সেগুলি একই সময়ে ঘটেছে বলে মনে না-ও হতে পারে।

এই বিশ্বে, যেখানে সব কিছুই গতিশীল এবং সব গতিই আপেক্ষিক এবং যাবতীয় চলমান বস্তুর অবস্থান, ভর, দৈর্ঘ্য, সময়-ছন্দ সবই তার গতিবেগের সঙ্গে জড়িত, সেখানে পরিসর ও সময় (স্থান ও কাল) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের বিশ্বের পরিসর (space) ত্রিমাত্রিক (three-dimensional); কিন্তু পরিসরের ঐ তিনটি মাত্রার সঙ্গে সময়ের একটি মাত্রাকে একত্রিত করে ঐ আন্তঃসংযুক্ত চারটি মাত্রার মাপ দিয়ে বিচার করলে তবেই কোন বস্তুর অবস্থা সঠিকভাবে বিচার করা সম্ভব। ঐ অর্থে আমাদের বিশ্ব একটি চতুর্মাত্রিক স্থান-কাল নিরবচ্ছিন্নতা-ক্ষেত্র (four dimensional space-time continuum)- এটিও আপেক্ষিকতাবাদের একটি বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত।

১৯০৫-এর Special Relativity Theory থেকে আনুষঙ্গিক ভাবে আরো প্রতিপন্ন হল যে শুধু বস্তুরই (matter) ভর (mass) আছে এবং শক্তি (energy) ভরশূন্য— এ কথাটি ঠিক নয়। একটি লোহার বলের বা এক বালতি জলের বা এক সিলিণ্ডার গ্যাসের যেমন ভর আছে তেমনি যে-কোনো রূপের শক্তিরও (আলো বা তাপ বা শব্দ গতিশক্তি) ভর আছে। অর্থাৎ আলোকরশ্মিরও ভর আছে, তা সে যতই কম হোক না কেন। সুতরাং এও প্রতিপন্ন হল যে বস্তু ও শক্তি (যাদের সংকেতচিহ্ন যথাক্রমে m ও E) মূলত একই; এবং একটির অন্যটিতে রূপান্তরণ সম্ভব। শুধু তাই নয়, বিশ্বধ্রুবক আলোকগতির (যার সাংকেতিক চিহ্ন c) হার এবং যে-কোন বস্তুর গতিশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে তার ভরবৃদ্ধি, দৈর্ঘ্য সংকোচন ইত্যাদির হার থেকে আইনস্টাইন ভর ও শক্তির পরিমাণগত সম্পর্ক নির্ণয় করলেন—যার সত্যতা পরবর্তীকালে মারাত্মকভাবে প্রমাণিত হয়েছে অ্যাটম্ (ইউরেনিয়ম) বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার মাধ্যমে। আরো একটি পরমাশ্চর্য কিন্তু অমোঘ যুক্তিসমন্বিত ব্যাপার হচ্ছে ভর (m) এবং শক্তির (E) পরিমাণগত সম্পর্কের মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে ঐ রহস্যময় বিশ্বধ্রুবক আলোকের গতিবেগ (c)। সংক্ষেপে বস্তু শক্তির অপেক্ষাকৃত অচঞ্চল এবং অতি-ঘনীভূত অবস্থা এবং শক্তি বস্তুর অপেক্ষাকৃত চঞ্চল এবং অতি-ব্যাপ্ত অবস্থা। এবং এই দুই অবস্থার মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে আলোকের ঐ রহস্যময় অপরিবর্তনীয় গতিবেগ।

১৯১৫-১৬ সালে প্রকাশিত আইনস্টাইনের General Theory of Relativity বা সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বটির অবশ্য আমাদের এই বিশেষ আলোচনার ক্ষেত্রে তেমন কোন প্রাসঙ্গিকতা নেই। শুধু কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য মনে হচ্ছে। এই তত্ত্বটি প্রধানত মাধ্যাকর্ষণের এক নতুন চমকপ্রদ আপেক্ষিকতাবাদী ব্যাখ্যা। নিউটনের তত্ত্বে ছিল, মাধ্যাকর্ষণ একটি শক্তি যার বলে দুটি বস্তু তাদের পারস্পরিক ভর অনুযায়ী পরস্পরকে আকর্ষণ করে তাৎক্ষণিকভাবে। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুযায়ী বস্তুপিণ্ডের উপস্থিতি বিশ্বের চতুর্মাত্রিক সময়-পরিসর ক্ষেত্রে (four dimensional space-time field) বিভিন্ন ধরণে ও বিভিন্ন পরিমাণে বিকারের সৃষ্টি করে যার ফলে ঐ বস্তুপিণ্ডের নিকটবর্তী বিকৃত ক্ষেত্রে অন্যান্য গতিশীল বস্তুপিণ্ডসমূহ কতকগুলি বিশেষ ধরণের উপবৃত্তাকার পথে ভ্রমণ করে—যেগুলির আকার সম্বন্ধে ধারণা নিউটনের তত্ত্বের চেয়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বে অনেক বেশী সঠিক। মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রে কোন সচল বস্তুকণা কখনই সরলরেখায় ভ্রমণ করতে পারে না; এক বিন্দু থেকে আর-এক বিন্দুতে যেতে তাকে

বক্রপথ গ্রহণ করতেই হবে। তাহলে absolute space বলেও কিছু আর রইলো না, কারণ বস্তুশূন্য পরিসর এবং বস্তুপূর্ণ পরিসরের জ্যামিতিক গঠন আলাদা। এ ছাড়াও প্রমাণিত হল যে আলোরও যখন ভর আছে তখন আলোক-রশ্মিও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের প্রভাবে সামান্য একটু বেঁকে যাবে। শুধু তাই নয়, সময়ও মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত হবে। আলোর গতি এবং বিশেষ রঙের আলোর বিশেষ স্পন্দনের (বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের) হার সময়ের সূচক। নতুন তত্ত্বে প্রমাণিত হল, প্রবল মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র থেকে নির্গত আলোকের স্পন্দনের হার কমে যায় অর্থাৎ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যায় এবং আলোটি অপেক্ষাকৃত লালচে হয়ে যায়। এইভাবে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সব কিছুতেই সময়ের ছন্দ মন্থরতর হয়ে যাবে: আলোকের কম্পন, ঘড়ির চলন, প্রাণীদেহের হৃৎস্পন্দন সব কিছুরই তাল—যত অল্প পরিমাণেই হোক—স্তিমিত হয়ে পড়বে।

নতুন পদার্থবিজ্ঞানের দ্বিতীয় স্তম্ভ যে কোআন্টাম্ তত্ত্ব তার প্রভাব 'হ য ব র ল'-য় খুব একটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু আমার ধারণা, কোথাও কোথাও এই তত্ত্বের সূক্ষ্ম ছায়া সুকুমারের আপেক্ষিকতা-প্রভাবিত কল্পনার সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তাকে আরো ঐশ্বর্যময় করে তুলেছে। কোআন্টাম্ থিওরীর যে মূল ধারণাটি ম্যাক্স প্লাংক্ ১৯০০ সালে প্রচার করেন সেটা এই: সমস্ত রকমের শক্তি (যার প্রকৃতি তরঙ্গের মতো বলে এতদিন জানা ছিল) বিচ্ছুরিত হয় অবিচ্ছিন্নভাবে নয়, বিচ্ছিন্ন শক্তিকণার স্রোত হিসাবে। অর্থাৎ আলোকের একটি ন্যূনতম শক্তিকণা বা quantum আছে,—প্লাংকের ধ্রুবক h হিসাবে যা পদার্থবিদ্যার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে আছে। যে কোনো পরিমাণ আলোক শক্তি এই ন্যূনতম শক্তিকণার (quantum) গুণিতক। সব রঙের আলোর গতি এক, কিন্তু বিভিন্ন রঙের আলোর স্পন্দনহার (frequency) ভিন্ন, এবং যার স্পন্দনহার যত বেশী তার তরঙ্গগুলি তত ছোট। আর, যে আলোর স্পন্দনহার যত দ্রুত সেই আলোর quantum-এর শক্তি তত বেশী। অর্থাৎ নিউটনের আলোর প্রকৃতি সম্বন্ধে ২০০ বছর আগেকার অস্পষ্ট ধারণা প্লাংকের নতুন চিন্তার মাধ্যমে অভাবনীয় বিকাশলাভ ক'রে এই আপাত-অসম্ভব ধারণাটি উপস্থাপিত করল: যে-আলোক তরঙ্গ-প্রকৃতি বলে জানা ছিল তাকে এখন স্পষ্টতই কণা-প্রকৃতি বলে মনে হচ্ছে। তাছাড়াও প্লাংকের ধ্রুবক h যে-কোন আলোর স্পন্দনহার (যা দৃশ্য আলোর ক্ষেত্রে এক-একটি বিশেষ রঙের সঙ্গে জড়িত) ও তার শক্তির পরিমাণের মধ্যে অমোঘ সম্পর্কটি আবিষ্কার করলো। ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের Photo-electric Effect সম্বন্ধে গবেষণা এই তত্ত্বকে আরো এগিয়ে নিয়ে গেল।

তখনকার ধারণা অনুযায়ী ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা (একটিমাত্র ঋণাত্মক ইলেকট্রিক চার্জবাহী) ইলেক্ট্রনের ভর টমসন আগেই আবিষ্কার করেছিলেন ১৮৯৮ সালে। ১৯১২ সালে রাদারফোর্ড প্রমাণ করলেন যে পরমাণুর সমস্ত ধনাত্মক চার্জ সংহত আছে তার কেন্দ্র বা nucleus-এ। ১৯১৩ সালে নীলস্ বোর পরমাণুর একটি চিত্র দিলেন: তাতে ধনাত্মক কেন্দ্রটি ঘিরে ঋণাত্মক ইলেক্ট্রনটি (বা ইলেকট্রনগুলি) বিশেষ কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলির মতো ঘুরছে, এবং এক কক্ষপথ থেকে আর-এক (কেন্দ্রের আরো কাছের বা দূরের) কক্ষপথে গেলেই একটি ইলেকট্রন আরো এক quantum শক্তি আহরণ বা ত্যাগ করে। বেশ কিছুদিন পরে, ১৯২৪ সাল থেকে (সুকুমার রায়ের মৃত্যুর প্রায় এক বছর পরে) বিভিন্ন বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানীর চিন্তার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে প্লাংক যেমন তরঙ্গ-প্রকৃতি আলোকের কণা-প্রকৃতি আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি প্রতিটি ইলেকট্রন এবং অন্যান্য মৌল বস্তুকণার সঙ্গেও এক ধরনের তরঙ্গ জড়িয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদ বা Uncertainty Principle থেকে প্রতীয়মান হল যে সূক্ষ্মতম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেও কোন একটি বিশেষ ইলেকট্রনের তাৎক্ষণিক অবস্থান, গতিবেগ, শক্তি, ইত্যাদি নিশ্চিত ও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এই অতিক্ষুদ্র মৌল কণাগুলির একক পরিমাপের ব্যাপারে বিজ্ঞানকে নিশ্চয়তা (certainty) ছেড়ে সম্ভাব্যতার (probability) আশ্রয় নিতে হল।

রুমাল-বেড়াল-চন্দ্রবিন্দুর বিশ্বলীলা

এবার আমরা দেখবো 'হ য ব র ল'-র ঐ খেয়াল-স্বপ্নের চলচ্চিত্রলোকে কীভাবে এইসব নবোদ্ঘাটিত বিজ্ঞানতত্ত্বগুলির

রহস্যচেতনা বিচিত্র বর্ণাঢ্যে ঝলক দিয়ে উঠেছে। একটু মন দিলেই দেখতে পাবো কীভাবে nonsense-এর ঐ অপূর্ব মায়াজালটি রচিত হয়েছে দুরূহ বিজ্ঞানতত্ত্বের গভীর উপলব্ধির সূত্র দিয়ে। অ্যালিস-সংক্রান্ত গল্পগুলিতে স্বপ্নলোকের রহস্যকে গড়ে তোলা হয়েছে ধীরে ধীরে। কিন্তু 'হ য ব র ল'-র সংক্ষিপ্ত পরিসরে লেখক নিমেষের মধ্যেই আমাদের অসম্ভবের জগতে স্থানান্তরিত করেছেন। রুমালটা হঠাৎ 'ম্যাও" করে উঠলো। দেখা গেল ফিনফিনে সাদা রুমালটা একটা মোটাসোটা লাল বেড়ালে পরিণত হয়েছে। ছেলেটির বিস্মিত উক্তির উত্তরে বেড়ালটি বললো : "সুপ্রবিল আবার কি ? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এতো হামেশাই হচ্ছে।" অর্থাৎ এখানে রুমালটি ছিল একটি ছোট্ট পদার্থ, বস্তু। চক্ষের নিমেষে সেটি (অপেক্ষিকতত্ত্বের ক্রুহকে) রূপান্তরিত হয়ে গেল একটি মোটাসোটা লাল বেড়ালে ; অর্থাৎ একটা শক্তিপুঞ্জ—যে শক্তিপুঞ্জ স্ফীত হয়ে মূল বস্তুটির চেয়ে আয়তনে, ব্যাপ্তিতে বহুগুণ বেড়ে গেছে ! আর আপেক্ষিকতত্ত্ব জগতের যে নতুন সত্যচিত্রটি তুলে ধরেছে তাতে বস্তু (ভর) ও শক্তির এই পারস্পরিক রূপান্তরণ রীতিমত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। Lorentz-Fitzgerald Transformation এবং Special Theory of Relativity বস্তুজগতের যে স্বতঃপরিবর্তনশীল রূপটি তুলে ধরেছিল, রুমালের বেড়ালে রূপান্তরণটি খেয়ালের জগতে তারই অপূর্ব রূপকচিত্র।

এর পরের কথাটিতে রয়েছে ঐ তত্ত্বটিরই গাণিতিক রূপটির সূক্ষ্মতর প্রতিফলন। ছেলেটির প্রশ্নের উত্তরে বেড়াল বলছে, আমাকে "বেড়ালও বলতে পারো, রুমালও বলতে পারো, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো।" অর্থাৎ বস্তু ও শক্তির মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য আছে বলে এতদিন ধারণা ছিল তা আজ নিরর্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বস্তুকে বস্তুও (রুমাল) বলতে পারো আবার তার অন্য রূপ শক্তিও (বেড়ালও) বলতে পারো। নতুন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দুটো একই জিনিসের ভিন্ন রূপ। আবার চন্দ্রবিন্দুও বলতে পারো। "চন্দ্রবিন্দু" টি কী ? এই বিচিত্র কথাটির অবতারণা বোধহয় সুকুমারের প্রতিভার উজ্জ্বলতম স্ফুরণগুলির অন্যতম। না-স্বর না-ব্যঞ্জন, প্রায়-অধরা এই চন্দ্রবিন্দু অক্ষরটি হচ্ছে রহস্যময় বিশ্বধ্রুবক আলোকের গতিবেগ। এই গতিবেগ (c) হচ্ছে বস্তু, ভর (m) এবং শক্তির (E) পারস্পরিক রূপান্তরণের যোগসূত্র। রুমালকে চন্দ্রবিন্দুর বর্গ দিয়ে গুণ করলে হয় বেড়াল ($mc^2=E$) আর বেড়ালকে চন্দ্রবিন্দুর বর্গ দিয়ে ভাগ করলে হয় রুমাল ($E/c^2=m$)। সুতরাং রুমাল ও বেড়ালের রূপান্তরণের মধ্যে যখন চন্দ্রবিন্দুর নিত্যলীলা, তখন আমাকে "বেড়ালও বলতে পার, রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার।" "চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো ?" এর মধ্যে তাহে বিজ্ঞান ও আবোল-তাবোলের অপূর্ব সংমিশ্রণ। হঠাৎ "চশমা" কথাটির আবির্ভাব বিচিত্র কৌতুকের সৃষ্টি করে ঃ আবার "চশমা" হচ্ছে নতুন আপেক্ষিকতাবাদী দৃষ্টির প্রতীক, যার মাধ্যমে চন্দ্রবিন্দু, বেড়াল ও রুমালের গভীর আন্তঃসম্পর্কটি বোঝা যায়।

এর পরে তিব্বত যাওয়ার প্রসঙ্গটি। এর ভিতর দিয়ে আইনস্টাইনের General Relativity মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রের যে চমকপ্রদ নতুন চরিত্রটি আবিষ্কার করেছিল তারই বিচিত্র আভাস ফুটে উঠেছে। এত জায়গা থাকতে তিব্বত যাওয়ার কথা কেন, এই প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত হবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ খেয়ালের এই অনির্দেশ্য অভিযানের জগতে প্রত্যেকটি কথারই যে কোন তাত্ত্বিক অর্থ থাকবে তার কোন মানে নেই। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে রুমালটা বেড়াল হয়ে যাওয়ায় মুখ মোছবারও উপায় রইলো না, তাই স্বভাবতই "তিব্বত গেলেই তো পার।" রহস্যসূত্রটি আছে তিব্বতের মধ্যে নয়, তিব্বত যাওয়ার "সিধে রাস্তা"টির মধ্যে। বেড়ালের মতে সিধে রাস্তাটি হচ্ছে 'কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রাণাঘাট, তিব্বত, ব্যস্।" এর চেয়ে উদ্ভট কৌতুককর আর কী হতে পারে ? কিন্তু এর পেছনে রয়েছে মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রে দ্রুতগতি বস্তু-পিণ্ডের গতিপথ সম্পর্কে নতুন ধারণাটি। ধারণাটি এই যে space-time field-এ কোন বিপুল ভরসম্পন্ন বস্তুপিণ্ড এমন এক বিচিত্র বিকারের সৃষ্টি করে যে তার ফলে এ ক্ষেত্রের জ্যামিতিক গঠনটিই বদলে যায়, এবং সেখানে সমস্ত পথগুলিই হয় বাঁকা—বিভিন্ন রকম উপবৃত্ত, অধিবৃত্ত বা পরাবৃত্তের মত। সেখানে দুটি বিন্দুর মধ্যে সংক্ষিপ্ততম পথ কোন সরল রেখা

নয়, কোন ধরণের একটি বক্ররেখা। আর "সওয়া ঘন্টার পথ" —এর মধ্যে আছে বিশ্বের মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রে চলমান বস্তুগুলির গতিবেগের প্রচণ্ড দ্রুততার আভাস। (পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় কুড়ি মাইল বেগে।)

তারপরে আসছে গেছোদাদা প্রসঙ্গটি—যে গেছোদাদার এই নিমেষের আভাস চিত্রটি (হিজি বিজ বিজের সুস্পষ্ট কিন্তু সৃষ্টিছাড়া মূর্তিটির মত) অজস্র পাঠক ও লেখকের মনে একই সঙ্গে কৌতুক ও রহস্যের ঢেউ তুলেছে। দেখা যাচ্ছে, সেই চিরনিরুদ্দেশ না-দেখা গেছোদাদার দুটি বিশেষ গুণ এখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথমত তিব্বত যাওয়ার অদ্ভুত রকমের পাক-খাওয়া পথটির (অর্থাৎ কোন মাধ্যাকর্ষণক্ষেত্রে কোন গতিশীল বস্তুর accelerated curved গতিপথটির) সঠিক এবং অব্যর্থ সন্ধান একমাত্র তিনিই দিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর নিজের রহস্যময় গতিবিধি এবং অবস্থানের একান্ত অনিশ্চয়তা। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, তাহলে এই পরিস্থিতিতে গেছোদাদাটি কে? তাঁর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য কী? কী ধরনের চিন্তাসূত্র বা তত্ত্বচেতনা তাঁর এই চরিত্রটির মধ্যে ব্যঞ্জিত হয়েছে? মনে হয় গেছোদাদা একদিকে (১) স্বয়ং আইনস্টাইন, একমাত্র যিনি এই সঠিক গতিপথটি বলে দিতে পারেন তাঁর General Relativity-র field equation-গুলি প্রয়োগ করে। প্রায় একই অর্থে (২) গেছোদাদা যেন ত্বরান্বিত অসম গতির (accelerated non-uniform motion) প্রতীক, যে কারণে তাঁর সঠিক পাত্তা পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। একেই তো Special Relativity-র সূত্র অনুসারে বিভিন্ন গতিবেগ-সম্পন্ন সিস্টেম থেকে একই জিনিসের সব কিছু (ভর, অবস্থান, দৈর্ঘ্য, Time rhythm প্রভৃতি) সম্বন্ধে আলাদা আলাদা হিসেব পাওয়া যাবে। তার ওপর গতির ক্ষেত্রটি, অর্থাৎ space-time fieldটি, আবার যদি মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বক্র হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রচারী বস্তুটির গতিপথ তো আরও বেশী ঘোরালো হয়ে উঠবে। গেছোদাদা এই নতুন গতিসূত্রের রহস্যের প্রতীক। এছাড়াও (৩) গেছোদাদায় ঐ চির-পলাতক অধরা প্রকৃতির মধ্যে যেন electron-এর গতি ও অবস্থানের অনিশ্চয়তার একটা ছাপ পড়েছে। নীল্‌স বোর-এর ১৯১৩ সালের ধারণা অনুযায়ী একটি ইলেক্‌ট্রন পরমাণু-কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্তনকালে এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে লাফ দিয়ে আসা-যাওয়া করে। ইলেকট্রন সম্বন্ধে এই ধারণাটির ছায়াপাত ঘটেছে গেছোদাদার পলায়নী গতি-ছন্দের মধ্যে। আমার নিজের মনে হয় গেছোদাদার অবস্থানের এই চির-অনির্দেশ্যতার মধ্যে আরো এগিয়ে-থাকা চিন্তার একটা আভাস রয়েছে। 'হযবরল' লেখা হয় ১৯২২ সালের মাঝা-মাঝি সময়ে। Quantum mechanics বা Wave mechanics-এর প্রথম সূত্রগুলির আবির্ভাব তারও প্রায় বছর দুয়েক পরে। কিন্তু বিশেষ কোনো মুহূর্তে গেছোদাদার অবস্থানের গভীর জটিলতা ও অনিশ্চয়তাটি লক্ষ্য করুন :

'আমি বললাম, "তাহলে তোমরা কি করে দেখা কর?"
'বেড়াল বলল, "সে অনেক হাঙ্গামা। আগে হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় নেই; তারপর হিসেব করে দেখতে হবে, দাদা কোথায় কোথায় থাকতে পারে; তারপর দেখতে হবে, দাদা এখন কোথায় আছে। তারপর দেখতে হবে সেই হিসেব মতো যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছবে, তখন দাদা কোথায় থাকবে। তারপর দেখতে হবে—" '

অর্থাৎ কোন বিশেষ মুহূর্তে গেছোদাদার সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার, বহু চেষ্টা করে তাঁর সম্ভাব্য অবস্থানটি বড় জোর নির্ণয় করা যেতে পারে। এর মধ্যে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তাবাদের (Uncertainty Principle or Principle of Indeterminacy) একটা পূর্বাভাসের ছায়াপাত ঘটেছে মনে করা কি একেবারেই অবাস্তব হবে—যে-সূত্র অনুযায়ী কোন উপায়েই একটি বিশেষ ইলেকট্রনের ভর, গতিবেগ, তাৎক্ষণিক অবস্থান প্রভৃতি নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়? নিজস্ব পারমাণবিক কক্ষপথটির মধ্যেও ইলেক-ট্রনটির সঠিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়, বড় জোর তার তাৎক্ষণিক অবস্থানের সম্ভাব্যতা (probability) সম্বন্ধেই একটা ধারণা করা যেতে পারে। গেছোদাদাকে ধরার সমস্যাটাও কি অনেকটা ঐ ধরণের নয়?

মনে হয় লুইস্ ক্যারল-এর রচনাতেও অনেক সময়, হয়তো লেখকের অজ্ঞাতসারেই বিজ্ঞানের আসন্ন সব আবিষ্কারের অস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটেছে। যেমন Through the Looking

Glass-এ Red Queen অ্যালিসের সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে বলছে : "Now, *here*, you see, it takes all the running *you* can do, to keep in the same place" (Modern Libraryসংস্করণ, পৃ ১৬৬)। Relativityর আপেক্ষিক গতিলোকের একটা ক্ষীণ ছায়া যেন এখানে এসে পড়েছে। কিম্বা Sylvie and Bruno-র প্রফেসারের সেই "curious machine"টি, যা কুকুর, কুমির ইত্যাদির দৈর্ঘ্যকে নিমেষের মধ্যে কমিয়ে দিতে পারে, সেটির মধ্যে যেন (প্রায় সমসাময়িক) Lorentz-Fitzgerald contraction-এর ছায়া এসে পড়েছে (ঐ পৃ ৪০৮-৯)। তাছাড়া, সুকুমার রায়ের মনে বস্তুকণার গতি, অবস্থান প্রভৃতির অনিশ্চয়তা যে নানারকম গভীর প্রশ্ন জাগিয়েছিল তার পরিচয় বোধহয় তাঁর নিচের মন্তব্যটি থেকে পাওয়া যাবে : "বিজ্ঞান একসময়ে জড়পরমাণুর স্থায়িত্বের উপর নিত্যতার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল।...আজকাল পরমাণু সম্বন্ধে সুক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার মধ্যে একান্ত অনিত্যতার যে-সকল প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা হারাইয়া, এখন কোন কিছুকেই নিত্য বলিতে সাহস পায় না" ('চিরন্তন প্রশ্ন,' বর্ণমালাতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রবন্ধ)।

যাই হোক, গেছোদাদার চরিত্র নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাঘাটি না করাই ভাল, কারণ গেছোবৌদি, যাঁর মেজাজের খবর আমরা রাখি না, তিনি হয়তো গাছের কোটর থেকে স্বামীর এই পলায়নীবৃত্তি সম্বন্ধে সব কিছুই শুনে ফেলেছেন। এবার এর পরের ব্যাপারটা কীরকম দাঁড়াচ্ছে দেখা যাক। "আমি"র অনুরোধে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বেড়াল "গেছোদাদা," "তুমি," "চন্দ্রবিন্দু", "তিব্বত," রন্ধনরতা "গেছোবৌদি", "গাছের গায়ে একটা ফুটো" প্রভৃতি দিয়ে একটি জটিল diagram ফাঁদতে সুরু করলো। "আমি"র কাছে সেটা একটা দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। সে বিরক্তি প্রকাশ করায় বেড়াল বললে, "আচ্ছা, তাহলে একটু সহজ করে বলছি। চোখ বোজ, আমি যা বলব, মনে মনে তার হিসেব কর।" একটু পরে "আমি" চোখ খুলে দেখে "বেড়ালটা ল্যাজ খাড়া করে বাগানের বেড়া টপকিয়ে পালাচ্ছে আর ক্রমাগত ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করে হাসছে।" অর্থাৎ ঐ অতিদুরূহ তত্ত্বকে বেশী সহজ করে বোঝার চেষ্টা করলে সমস্ত ব্যাপারটাই হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যায়। আর-একটা তত্ত্বাভাসও এর মধ্যে থাকতে পারে : বেড়াল, যে প্রথমেই ছিল শক্তির (energy) প্রতীক, সে এবার পুরোপুরি তার সচল শক্তিস্বরূপটি প্রকাশ করে বিদ্যুৎবেগে উধাও হয়ে গেল।

ভাষ্যকার কাক্কেশ্বর

এর পর কাক্কেশ্বরের আবির্ভাব। সে এই উদ্ভট আপেক্ষিকতালোকের accountant। গাছের ডালে তার শ্লেট-ঝোলানো পেনসিল-মুখে অবস্থান, মাস্টারমশাই-সুলভ গুরুগম্ভীর হাবভাব এবং শিশুটির সঙ্গে তার প্রথম কয়েকটি কথা—"কই জবাব দিচ্ছ না যে? সাত দুগুণে কত হয়?" কিম্বা, "কাকটা অমনি দুলে-দুলে মাথা নেড়ে বললে, 'হয় নি, হয় নি, ফেল'"—এক অপূর্ব, অভাবিত কৌতুকরসের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এরও পেছনে রয়েছে আপেক্ষিকতার একটি মূল সূত্রের প্রভাব। নতুন তত্ত্ব আমাদের অমোঘভাবে দেখিয়েছে যে কোন কিছুরই কোন চিরস্থায়ী পরম মান থাকতে পারে না : ভর, দৈর্ঘ্য, সময়—সব কিছুই বদলে যায় গতিবেগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তাই "সাত দুগুণে চোদ্দ" এরকম কোন absolute statement এখন আর গ্রাহ্য নয়।

এই 'সাত' মানের বস্তুটিকে যখন দ্বিগুণ করা হচ্ছে ঠিক সে-সময়ে তার গতিবেগ কত ছিল তা না জানলে কোনো সঠিক গুণফল পাওয়া সম্ভব নয়। "আমি"—যে সাতকে স্থির, ধ্রুব বলে দেখছে, আপেক্ষিকতাবাদী কাক তাকে দেখছে চিরচঞ্চল, কারণ জগতে কোনো বস্তুই স্থির নয়; প্রত্যেকেরই নানারকম আপেক্ষিক গতিবেগ আছে। কাক্কেশ্বরের ব্যাখ্যায় সেই গভীর সত্য fantasy-রঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে :

> তুমি যখন বলেছিলে তখনো পুরো চোদ্দ হয়নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে ধাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।

এই প্রসঙ্গে এক মার্কিন ভদ্রলোকের কাছে শোনা একটি

গল্প মনে পড়ছে। কোনো এক জমজমাট রাস্তায় একদিন এক উস্কোখুস্কো-চুল ভদ্রলোক ধীর পদক্ষেপে অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে হেঁটে চলেছেন, যেন তাৎক্ষণিক পরিবেশ সম্বন্ধে তাঁর কোনো চেতনাই নেই। তাঁর ঐ অদ্ভুত ভাব দেখে একটু মজা করার লোভ সামলাতে না পেরে দুটি ছোকরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, Old man, does two and two make four? ভদ্রলোকের স্বপ্নালু চোখে এক অদ্ভুত দীপ্তি ফুটে উঠলো। তিনি একটু হেসে বললেন: Yes, if they are not in motion। ভদ্রলোকটি স্বয়ং আইনস্টাইন।

আলোকসীমার ওপারে

আপেক্ষিকতাবাদের বৈপ্লবিক সূত্রগুলি মনুষ্যের চির-অশান্ত মনকে চিন্তা ও কল্পনার যে চরম সীমায় নিয়ে গেছে সেখানে গাণিতিক যুক্তি নিজেই যেন fantasy-তে রূপান্তরিত হয়েছে। এর পরের উধো-বুধোর পর্যায়টিতে সেই রোমাঞ্চকর অনুমানের জগতে সুকুমার রায় তাঁর খেয়ালী কল্পনার দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছেন। আপেক্ষিকতা-তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো বস্তু আলোকের সমান বা আলোকের চেয়ে বেশী গতিতে চলতে পারে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকরাই ঐ তত্ত্বের যুক্তিকে অসম্ভব বা অভাবনীয়ের এলাকায় প্রসারিত ক'রে প্রশ্ন করেছেন: 'যদি' কোনো বস্তু অতি-আলোকীয় বেগে যেতে পারে তাহলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াবে? বিজ্ঞান এখানে অনেকটাই speculation-এর পর্যায়ে এসে পড়ে। এই অতি-আলোকীয় গতিবেগে-চলা বস্তুর একটিমাত্র গুণ সম্বন্ধেই বিজ্ঞানীরা কিছুটা স্পষ্ট ধারণা করতে পেরেছেন। সেটা এই যে ঐ বস্তুর "দৃষ্টিতে" time-sequence উল্টে যাবে; অর্থাৎ অতীত থেকে ভবিষ্যতের বদলে সে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে ধাবমান হবে। সোজা কথায়, তার বয়স ক্রমশ কমে যাবে। কিন্তু ঐ বস্তুর অবস্থার অন্যান্য দিকগুলো সম্বন্ধে ধারণাগুলি আরো ধোঁয়াটে। যেমন তার ভরের বা দৈর্ঘ্যের ব্যাপার। আলোর গতিতে পৌঁছলে যে-কোনো বস্তুর ভর হয়ে উঠবে অসীম। তাহলে গতি আরো বাড়লে ভরের অবস্থা কী দাঁড়াবে? আবার, আলোর গতিতে পৌঁছলে বস্তুটির দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে দাঁড়াবে শূন্যে। তাহলে, আরো বেশী গতি হলে তার দৈর্ঘ্যের অবস্থা কী হবে? গণিতের যুক্তিতে দেখা যাচ্ছে যে এক্ষেত্রে ভর নির্ণয় করতে গেলে একটা ঋণাত্মক রাশির বর্গমূলের দ্বারা ভাগের ব্যাপার এসে পড়ে এবং দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে গেলে ঐ ঋণাত্মক রাশিটির বর্গমূল দিয়ে গুণ করার প্রশ্ন আসে। আমরা জানি, সমস্ত ঋণাত্মক রাশির বর্গমূলই কাল্পনিক সংখ্যা; সুতরাং অতি-আলোকীয় গতি-সম্পন্ন বস্তুটির ভর ও দৈর্ঘ্য দুটিই imaginary number-এর পর্যায়ে পড়বে; অর্থাৎ বাস্তবভিত্তিক কোন সূত্রের সাহায্যে এর হিসাব হয় না। এই super-luminal গতিবেগের জগৎটি, যেখানে বিজ্ঞানের অমোঘ যুক্তিকেই প্রসারিত করলে পৌঁছতে হয় এক রোমাঞ্চকর কল্পনা-অনুমানের জগতে, সেখানে উধো-বুধো-কাক্কেশ্বর-আদির এই চলচ্চিত্রাবলী রচনার মধ্যে সুকুমার রায় স্বভাবতই বিজ্ঞানকে তাঁর খেয়ালী কল্পনার রং দিয়ে এমন সব বিচিত্র সাজে সাজিয়েছেন যার সব-কিছুকেই বিজ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে পুরোপুরি মেলানো যায় না।

সবুজ দাড়ির ভেল্কি

এখানে শুধু মূল তত্ত্বচিন্তাগুলির রূপায়ণ সম্বন্ধেই আমরা আলোচনা করবো, অপেক্ষাকৃত গৌণ ব্যাপারগুলি বাদ দিয়ে। প্রথম, বুড়োটির আবির্ভাবের ধরণটি লক্ষ্য করা যাক: "এমন সময়ে গাছের একটা ফোকর থেকে কি যেন একটা সুড়ুৎ করে পিছলিয়ে মাটিতে নামল। চেয়ে দেখি, দেড়হাত লম্বা এক বুড়ো, তার পা পর্যন্ত সবুজ রঙের দাড়ি, হাতে একটা হুঁকো, তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, আর মাথাভরা টাক। টাকের উপর খড়ি দিয়ে কে যেন কি সব লিখেছে।"

বুড়ো লম্বায় মাত্র দেড় হাত। প্রথমে এটাই মনে হওয়ার কথা, আলোর কাছাকাছি গতিতে ভ্রমণ করার ফলে Relativity-র অমোঘ সূত্র অনুযায়ী তার দৈর্ঘ্য সংকুচিত হয়ে মাত্র দেড় হাতে পৌঁছেছে: তার অবস্থা দাঁড়িয়েছে সেই মজার ছড়াটিতে বর্ণিত ফিস্‌ক্ নামক ব্যক্তির অতিদ্রুত-সঞ্চালিত অসিটির মত:

> There was a young fellow named Fisk
> Whose fencing was exceedingly brisk.
> So fast was his action,

The Fitzgerald contraction
Reduced his rapier to a disk.

বাহাদুর খেলোয়াড় ফ্লিস্‌ক্‌-এর (প্রায়) বিদ্যুৎবেগে চালানো তলোয়ারটি যেমন বেঁটে হয়ে গিয়ে একটি চাকতির আকার ধারণ করেছে, তেমনিই আমাদের (হয়তো একদা-চারহাতি) বুড়ো নিশ্চয় তার মারাত্মক স্পীডের ঠেলায় লম্বা-লম্বি চেপ্টে গিয়ে এই দেড়হাতি হালে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আরো একটু লক্ষ্য করে মনে হচ্ছে, বুড়ো লোকটি মোটেই সোজা নয়, খুবই গোলমেলে। একদিকে সে পাক্কা বুড়ো আর তার মাথাভরা টাক; কিন্তু অন্যদিকে তার পা পর্যন্ত নেমে-আসা দাড়িটি সবুজ, অর্থাৎ তারুণ্যের প্রতীক। অর্থাৎ একদিকে সে বুড়ো, আবার অন্যদিকে সে তরুণ, এবং একটু পরে জানা যাবে তার বর্তমান বয়স তেরো। এই বিচিত্র দ্বৈততার অর্থ এই যে কখনো সে চলে অব-আলোকীয় গতিতে, যা তাকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের পথে, অর্থাৎ বার্ধক্যের দিকে; কিন্তু আবার অন্য সময়ে সে চলে আলোকের চেয়েও দ্রুতগতিতে, যে super-luminal speed তাকে নিয়ে যায় অতীতের দিকে, অর্থাৎ অল্প বয়সের দিকে। তাই তার চেহারায় বার্ধক্য আর তারুণ্যের এই বিচিত্র সমাবেশ।

তার পরে আসে শিশু-কথকের সঙ্গে ঐ তরুণ বৃদ্ধের প্রচণ্ড কৌতুককর সংলাপটি যার ভিতর দিয়ে আবার নতুন বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার এবং সুদূরপ্রসারী অনুমানগুলির সারমর্ম গভীরভাবে আভাসিত হ'য়ে উঠেছে। বুড়োর Relativistic system ছেলেটির অস্তিত্বই টের পায়নি। যখন টের পেলো তখন সে "বন্‌বন্‌ করে আট দশ পাক ঘুরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।" অর্থাৎ rotation বাড়িয়ে তার প্রচণ্ড গতিবেগ কিছুটা কমিয়ে ফেলে সে ছেলেটিকে একটা চলনসই observation range-এর মধ্যে নিয়ে এলো। তারপর সে ছেলেটির সম্পূর্ণ foreign system-টিকে নানা রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো। প্রথমত চোঙা-দূরবীণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ, তারপরে "পকেট থেকে কয়েকখানা রঙীন কাঁচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বার বার দেখতে লাগল।" ঐ কাঁচগুলি হ'চ্ছে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র বা spectroscope-এর প্রতীক, যার সাহায্যে সে "আমি"র আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এবং তার Doppler effect লক্ষ্য করে তার উপাদান, গঠন, গতিবেগ, সময়-ছন্দ (বয়স) এবং সে ঐ বিশেষ বেগে কাছে আসছে না দূরে সরে যাচ্ছে এই সব হিসাব করতে লাগলো। "তারপর কোত্থেকে একটা পুরানো দরজীর ফিতে এনে সে আমার মাপ নিতে শুরু করল, আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ২৬ ইঞ্চি, হাত ২৬ ইঞ্চি, আস্তিন ২৬ ইঞ্চি, ছাতি ২৬ ইঞ্চি, গলা ২৬ ইঞ্চি'। মনে হয় এই অনবদ্য রস-চিত্রটির ভিতর দিয়ে একই সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে দুটি গভীর তত্ত্ব। প্রথমত, ছেলেটির মানদণ্ডে যেমন বুড়োর গতি প্রচণ্ড এবং দৈর্ঘ্য সংকুচিত হ'য়ে মাত্র দেড় হাতে দাঁড়িয়েছে তেমনি বুড়োর মানদণ্ডে ছেলেটির গতি ঠিক ঐ রকমই প্রচণ্ড এবং তার ফলে বুড়োর দৃষ্টিতে ছেলেটির Fitzgerald contraction হ'য়ে দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ২৬ ইঞ্চি। অর্থাৎ ঐ দেড় হাতেরই মত। কিন্তু খাড়াই, গলা, ছাতি সবই ২৬ ইঞ্চি কেন? এখানে আবার Relativityর আর-একটি মৌলিক ধারণার ছাপ পড়েছে। মনে হয়, এখানে ২৬ ইঞ্চি হচ্ছে (শূন্যমার্গে) আলোকের অপরিবর্তনীয় গতিবেগের (সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার) প্রতীক। আমরা জানি, কোন দুটি ব্যক্তি (বা বস্তু) যতই দ্রুতবেগে পরস্পরের দিকে বা পরস্পরের বিপরীত দিকে চলুক না কেন তারা সর্বদাই আলোককে ঠিক ঐ সেকেণ্ড-পিছু তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে চলতেই দেখবে। বৃদ্ধ প্রচণ্ড অতি-আলোকীয় বেগে ধাবমান (যার ফলে তার বয়স কমে গেছে) এবং তার দৃষ্টিকোণ থেকে সে ছেলেটিকে ঠিক ঐ নিদারুণ অতি-আলোকীয় বেগে ধাবমান দেখছে। কিন্তু তাদের আপেক্ষিক গতির পরিমাণ যাই হোক না কেন, তারা পরস্পরকে ঠিক আলোর গতিতে চলতে দেখছে, একটুও বেশী বা কম নয়। তাই (বুড়োর দৃষ্টিতে) অতি-আলোকীয় গতিসম্পন্ন ছেলেটিকে সে যেভাবেই মাপুক না কেন, মাপ ঐ ২৬ ইঞ্চিই হচ্ছে; অর্থাৎ তার গতিবেগ ঠিক আলোকের গতিবেগের মত মনে হচ্ছে; কোনো রকম যোগ বা বিয়োগে তার কোনো হেরফের হচ্ছে না। মাপের ফিতে থেকে ২৬ ছাড়া আর সমস্ত সংখ্যা মুছে যাওয়া হচ্ছে আলোর গতিবেগের বিশ্বধ্রুবক রূপে প্রতিষ্ঠার প্রতীক।

তারপর "ওজন কত?" এই প্রশ্নটির মাধ্যমে অতি-

আলোকীয় ভ্রমণের রহস্যালোক সম্পর্কে আর-একটি তাত্ত্বিক অনুমানের অবতারণা করা হয়েছে। আলোর গতির যত কাছাকাছি যাওয়া যায়, ভর (এখানে যাকে ওজন বলা হয়েছে) ততই বাড়ে। আলোর গতির সমান গতি হলে ভর হয়ে দাঁড়াবে অসীম। এই অসম্ভবকেও ছাড়িয়ে গেছে আরো অসম্ভবের ধারণা। আলোর চেয়ে বেশী গতিতে চললে সব কিছুই যদি উল্টে যাবে বলে ধরা হয় (যেমন সময় অতীতের দিকে বইতে শুরু করবে) তাহলে ভরও নিশ্চয় সসীম থেকে অসীমের দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে, অর্থাৎ অসীম থেকে সসীমের দিকে যাবে। অর্থাৎ সোজা কথায়, কমতে থাকবে। বুড়োর ভর এক সময় অসীমে উঠেছিল ; এখন অতি-আলোকীয় বেগে ভ্রমণ করতে করতে বয়সের সঙ্গে তার ভরও কমছে। কিন্তু বুড়োর দৃষ্টিতে ছেলেটিই ঐ প্রচণ্ড অতি-আলোকীয় বেগে চলছে, যার ফলে বুড়োর মাপে আট বছরের ছেলেটির ভর আড়াই সের হচ্ছে। কী ভাবে মাপলো ? আগেই সে দেখেছে ছেলেটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ সবই ২৬ ইঞ্চি। এখন "বুড়ো তার দুটো আঙুল দিয়ে" "আমি"কে একটুখানি "টিপে-টিপে" তার matter-এর density মেপে ফেললো, এবং আয়তনের সঙ্গে ঘনত্ব মিলিয়ে ওজন বের করলো আড়াই সের। এখন আপনারা যদি বলেন, তাহলে এবার বলুন আপেক্ষিক অনুপাতে বুড়োর "ওজন" কত, তাহলে আমাকে বেড়ালের মত বলতে হবে, "উঁহু, সে আমার কর্ম নয়," এবং আরো বিপদের কথা, স্বয়ং গেছোদাদাও এই বিপরীতমুখী প্রতিবিশ্বলোকের এইসব জটিল রহস্যের কিনারা করতে পারতেন কি না সন্দেহ। চন্দ্রবিন্দুকে তলব করতে পারলে হয়তো কিছু সুবিধা হতে পারত, কিন্তু তাকে ধরতে হলে তো সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার বেগে ছুটতে হবে। সুতরাং সে আশাও দুরাশা।

তারপরে আসছে বয়সের প্রশ্ন এবং এই অতিতাত্ত্বিক (ultra-theoretical) অনুমানের জগতে সুকুমার তাঁর খেয়ালী কল্পনাকে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা দিয়েছেন। বুড়ো বলল, "তাহলে লিখে নাও—ওজন আড়াই সের,বয়স সাঁইত্রিশ।" বুড়ো যে-শিশুর ওজন বলছে আড়াই সের সেই-শিশুর বয়স বলছে ৩৭ বছর, এর চেয়ে উদ্ভট মজার কথা আর কী হতে পারে! কিন্তু এত দেখার পরে আমাদের মনে হতে পারে, এ-মজার পেছনে অন্য কোন মজা নেই তো ? ব্যাপারটাও তাই। "আমি" যখন প্রতিবাদ করে বললো, "দূৎ! আমার বয়েস হল আট বছর তিন মাস, বলে কিনা সাঁইত্রিশ," তখন ঐ দুর্দান্ত super-luminal traveller বৃদ্ধ-তরুণও একটু ঘাবড়ে গেল। সে খানিকক্ষণ কী ভেবে জিজ্ঞাসা করল, "বাড়তি না কমতি ?" এখানে একদিকে মজা আরো ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে লেখক, তত্ত্ব-অনুমানের আরো এক স্তর গভীরে চলে গেছেন। ছেলেটির বয়স সম্বন্ধে বুড়োর এই নিমেষের বিভ্রান্তির কারণ, সে ভাবছে, তাহলে "আমি" এখন অতি-আলোকীয় না অব-আলোকীয় বেগে চলছে। অব-আলোকীয় বেগে চললে সে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে, অর্থাৎ কম থেকে বেশী বয়সের দিকে যাচ্ছে, আর অতি-আলোকীয় গতিতে চললে ঠিক উল্টো ফল হওয়ার কথা। অর্থাৎ তার ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে, বার্ধক্য থেকে কৈশোরের দিকে যাওয়ার কথা। সাঁইত্রিশ বছরটা একদিকের হিসাব, কিন্তু "আমি" বলছে তার বয়স ৮ বছর ৩ মাস। তাই বুড়ো ভাবছে, তাহলে ছোঁড়া কি উল্টোদিকে দৌড়ে আমার সব হিসাবকে ওলটপালট করে দিচ্ছে ?

তারপরেই সবুজদাড়ি বুড়োর শ্রীমুখনিঃসৃত বয়স বাড়া-কমার সেই বিখ্যাত তাত্ত্বিক বিবৃতিটি : "তোমার যেমন বুদ্ধি! আশি বছর বয়েস হবে কেন ? চল্লিশ বছর হলেই আমরা [Relativity-র জগতের লোকেরা] বয়েস ঘুরিয়ে দিই। তখন আর একচল্লিশ বেয়াল্লিশ হয় না—উনচল্লিশ ,আটত্রিশ, সাঁইত্রিশ করে বয়েস নামতে থাকে। এমনি করে যখন দশ পর্যন্ত নামে তখন আবার বয়েস বাড়তে দেওয়া হয়। আমার বয়েস তো কত উঠল নামল আবার উঠল, এখন আমার বয়েস হয়েছে তেরো।" Relativity-র সূত্রগুলি বহু বিচিত্র রূপে সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়ে শুধু মানুষের চিন্তাকে নয়, ঐ চিন্তার সঙ্গে জড়িত কল্পনা ও অ্যাডভেঞ্চার-স্পৃহাকে অসীম ও অভাবনীয়ের দিকে প্রসারিত করেছে : সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে আলোকের গতিতে, আলোকের চেয়েও দ্রুত গতিতে ভ্রমণ ক'রে একদিকে স্থানের সীমা অতিক্রম করে অসীম নক্ষত্রলোকের পথিক হবার, আর কালের শাসনকে তুচ্ছ করে ইচ্ছামত ভবিষ্যৎ ও অতীতের মধ্যে যাতায়াত

করার। দেড়হাতি সবুজদাড়ি এই টেকো ছোকরা-বুড়োটির চেহারা, হালচাল এবং বোলচালের উদ্ভট রসচিত্রটির ভিতর দিয়ে আভাসিত হয়েছে মানুষের সেই ultimate dream-টি। পরম আশ্চর্যের কথা এই যে ১৯২২ সালে সুকুমার রায় এই স্বপ্নচিত্রটি রচনা করেছিলেন।

বুড়োর গল্প ও কাকের বিজ্ঞাপনে (আমার মনে হয়) পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক চিন্তার রসরূপায়ণের মাঝখানে একটি প্রায়-বিশুদ্ধ nonsense-এর বিরতি, যার অপূর্ব illogica-iity-র শীর্ষ রচনা করেছে রাজার নিদারুণ প্রশ্নটি, "পক্ষীরাজ যদি হবে তাহলে ন্যাজ নেই কেন?" আর খদ্দেরদের কাছে প্রাপ্য data সম্বন্ধে কাক্কেশ্বরের প্রাঞ্জল নির্দেশটি: "আপনার জুতার মাপ, গায়ের রঙ, কান কট্‌কট্‌ করে কি না, জীবিত কি মৃত, ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিবরণ পাঠাইলেই ফেরত ডাকে ক্যাটালগ পাঠাইয়া থাকি।" (অবশ্য পক্ষীরাজের "ন্যাজ কী হল?" এই প্রশ্নের মধ্যে "তাহলে প্লাংক-আবিষ্কৃত কণা-প্রকৃতি আলোর তরঙ্গের কী হল?" এই গভীর প্রশ্নের ছায়াপাত ঘটে থাকতেও পারে।)

তারপরেই আপেক্ষিকতার কুহকলোকে আমাদের আর-একবার এবং শেষবার প্রবেশ। কিন্তু এবারের পুনঃপ্রবেশটি বেশ ধীর এবং আরো কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বিরতি-চিহ্নিত। এই বিরতিগুলির মধ্যে নিছক উদ্ভটরস এবং সামাজিক ব্যঙ্গরস এই দুরকম উপাদানই আছে; এগুলি কিন্তু ঠিক আমাদের বর্তমান আলোচনার পরিধির মধ্যে আসছে না। কাক ছেলেটিকে কোনো এক টাকওয়ালা খদ্দেরের কথা উল্লেখ করতেই বুড়ো ক্ষেপে গিয়ে বললো: "দেখ্‌! ফের যদি টেকোমাথা টেকোমাথা বলবি তো হুঁকো দিয়ে এক বাড়ি মেরে তোর শ্লেট ফাটিয়ে দেব।" আবার একটু পরেই 'কাক অমনি "এই দেখ" বলে তার শ্লেটখানা ঠকাস করে বুড়োর টাকের ওপর ফেলে দিল। বুড়ো তৎক্ষণাৎ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল আর ছোট ছেলেদের মতো ঠোঁট ফুলিয়ে "ও মা, ও পিসি, ও শিবুদা" বলে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদতে লাগল।' দুটি ক্ষেত্রেই বুড়োর এই হাস্যকর শিশুসুলভ আচরণের তাত্ত্বিক তাৎপর্য এই যে সে একদিকে সত্যিই বুড়ো হওয়া সত্ত্বেও এখন অতি-আলোকীয় বেগে ভ্রমণের ফলে বর্তমানে একটি ১৩ বছরের বালক মাত্র। তাই টেকো বলায় তার ঘোরতর আপত্তি এবং সামান্য আঘাতেই তার ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদার প্রবণতা।

জলবৎ তরলম্‌

এইবার কাক্কেশ্বরের সুদীর্ঘ আদালতী গৌরচন্দ্রিকাটি পার হয়ে আসল হিসাবটিতে আসা যাক। হিসাবটি হচ্ছে: "সাত দুগুণে ১৪, বয়স ২৬ ইঞ্চি, জমা /২॥ সের, খরচ ৩৭ বৎসর।" এত সব বিচিত্র ভেল্কি দেখার পর এই হিসাবটির একটা কিনারা হয়তো করে ফেলতেও পারি। "সাত দুগুণে ১৪" হচ্ছে কাকের সেই প্রথম প্রশ্নের জের। হয়তো এই একটি হিসাবই আপেক্ষিক স্থিরতার প্রতীক। অর্থাৎ সাত আর সাত চোদ্দ ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই যখন তারা পরস্পরের দৃষ্টিতে গতিহীন। মনে হয়, এই একটি আপেক্ষিক নিশ্চলতা বাদে হিসাবের আর সব item-গুলিই Relativity জগতের প্রচণ্ড গতিশীলতার সঙ্গে যুক্ত। পরিসর ও সময়ের পরিমাপগুলি যে একান্তভাবেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, তারা যে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেই তত্ত্বচিন্তাটির রূপায়ণ হয়েছে "বয়স ২৬ ইঞ্চি" এই উদ্ভট হিসাবটিতে। আমরা আগেই জেনেছি বুড়োর মাপে ছেলেটির দৈর্ঘ্য ২৬ ইঞ্চি। কিন্তু ২৬ ইঞ্চিটা বয়স হয় কী করে? এই হিসাবে যে—একটি বিশেষ দৈর্ঘ্যের বস্তু অব-আলোকীয় বা অতি-আলোকীয় একটা বিশেষ গতিতে একটা বিশেষ সময় ধরে ভ্রমণ করলে তবেই দৈর্ঘ্য ২৬ ইঞ্চিতে দাঁড়ায়। তাই দৈর্ঘ্যের মাপ আবার একই সঙ্গে সময়ের মাপও। এর পরে "জমা /২॥ সের" এবং "খরচ ৩৭ বৎসর"। কাক যখন এই ভেল্কিলোকের accountant তখন স্বভাবতই সে জমা-খরচের ভাষায় হিসাবপত্র দাখিল করবে। আমরা আগেই বুড়োর কাছে শুনেছি ছেলেটির ওজন নাকি আড়াই সের। কিন্তু সেটাকে "জমা" বলার মানে কি? মানেটি একটু জটিল হলেও বোধহয় অনুমান করা যায়। Relativity-র প্রচণ্ড বেগময় জগতে দু-ধরনের ভ্রমণ-গতি হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে ক্রমত্বরান্বিত হয়ে আলোর গতির দিকে যাওয়া—যার ফলে "ওজন" (ভর) ক্রমশই বাড়তে, অর্থাৎ জমা হতে থাকবে এবং সময় খরচ হতে থাকবে, কিন্তু ক্রমশই মন্থর হারে। কারণ, গতি যত বাড়বে সময়ের গতি তত

ভিমে হয়ে পড়বে। আর দ্বিতীয় ধরনের ভ্রমণটি হবে আলোকের গতিবেগ থেকে শুরু করে অতি-আলোকীয় বেগের পথে ক্রমিক ত্বরণ—যার ফলে ভর অসীম থেকে শূন্যের দিকে যেতে থাকবে এবং সময় নিশ্চলতা থেকে শুরু করে ক্রমশই ত্বরান্বিত হতে থাকবে। কিন্তু এই অতি-আলোকীয় ভ্রমণের ক্ষেত্রে জমা-খরচ সব কিছুরই হিসাব হবে উল্টোদিক থেকে, অর্থাৎ ঠিক আলোকের গতিটি ছাড়িয়ে অতি-আলোকীয় গতিতে ধাবমান হওয়ার মুহূর্তটি থেকে। এই হিসাবে বুড়োর দৃষ্টিতে "আমি" ৩৭ বছর অতি-আলোকীয় বেগে ভ্রমণ করছে, অর্থাৎ তার ৩৭ বছর খরচ হয়ে গেছে, যার ফলে অসীম অবস্থা থেকে ক্রমবর্ধমান হারে ক্ষইতে ক্ষইতে এই মুহূর্তে তার "জমা" অর্থাৎ ভর এসে দাঁড়িয়েছে আড়াই সেরে। এই অতিগভীর এবং অতিজটিল তত্ত্বচিন্তাগুলি (যা বোঝার মত লোক ১৯২২ সালে সারা পৃথিবীতে খুব বেশী ছিল না) সুকুমারের বিচিত্র মানসক্রিয়ার ভিতর দিয়ে আপাত-nonsense-এর কতকগুলি কৌতুকোজ্জ্বল স্বপ্ন-রূপকচিত্রে ফুটে উঠেছে।

পোঁটলা বনাম হুঁকো

এর পরে ত্রৈরাশিক-ভগ্নাংশ-জলমেশানো হিসাবের (কিছু সমাজ-ব্যঙ্গাভাস জড়িত) বিচিত্র মজাপর্বের বিরতিটি পেরিয়ে এসে সুকুমার আমাদের সামনে তাঁর বিজ্ঞান-স্বপ্নের master strokeটি এনে হাজির করেছেন। বিরতিটি শেষ হতে না হতেই আবার Relativity-র সেই উদ্ভট স্বপ্নলোকে তিনি আমাদের অতি স্বচ্ছন্দে নিয়ে গেছেন। কোথাও গল্পের সূত্রটি একটুও দুর্বল হয়ে পড়েনি। কাক পয়সা পেয়ে মহাফুর্তিতে যেই "টাক-ডুমাডুম, টাক-ডুমাডুম" বলে নেচে উঠলো অমনি আমাদের খোকা-বুড়ো উধো আবার তাকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে মনে করে ক্ষেপে উঠলো: "ফের টাক-টিক বলছিস?" এবং চিৎকার করে বৃক্ষ-কোটরগত সেই কণ্ঠস্বরের অদৃশ্য অধিকারী বুধো নামক ব্যক্তিকে ডাকতে লাগলো, নিঃসন্দেহে কাকের একটা গুরুতর শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যে। সেই আহ্বানের ফলস্বরূপ "গাছের ফোকর থেকে মস্ত একটা পোঁটলা মতন কি যেন হুড়মুড় করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। চেয়ে দেখলাম, একটা বুড়ো লোক একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নীচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। বুড়োটা দেখতে অবিকল এই হুঁকোওয়ালা বুড়োর মতো।" এই অপূর্ব গেছো যমজটি কে? (মনে রাখতে হবে, antiparticle সম্বন্ধে ধারণা তখনও অনেক দূরে; সুতরাং এদের electron-positron pair মনে করার প্রশ্নই ওঠে না।) দুটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রথমত বুধো অবিকল উধোর মত দেখতে। অর্থাৎ সে-ও আমাদের হুঁকোওয়ালা ওস্তাদটির মতন একটি দেড়হাতি, টেকোমাথা, সবুজদাড়ি-ঝোলানো খোকা-বুড়ো। অর্থাৎ, বুধোও উধোর মত relativistic space traveller। তারা দফায় দফায় অতি আলোকীয় ও অব-আলোকীয় গতিতে চলে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধ ও তরুণ, বেঁটে ও লম্বা, ভারী ও হালকা হয়। এও বোঝা যাচ্ছে, দুজনে বর্তমানে একই অবস্থায় আছে; তা না হলে তাদের চেহারা অবিকল একরকম হবে কী করে? কিন্তু দ্বিতীয় ব্যাপারটিই খটকা লাগায়। বুধো "একটা প্রকাণ্ড বোঁচকার নিচে চাপা পড়ে ব্যস্ত হয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে।" বুধোর গায়ে জোড়া এই বোঝাটি কী এবং কেন? উধোর পিঠে তো ওরকম কোন বোঝা নেই। মনে হয়, বুধোর এই বোঝাটি হচ্ছে relativistic mass, অর্থাৎ কোনো বস্তু আলোর গতির সঙ্গে তুলনীয় (এক-চতুর্থাংশ বা তার বেশী) গতিতে চললে তার ভর (mass) বিপুলভাবে বেড়ে যায়, এবং ঐ বাড়তি ভরই শেষ পর্যন্ত তার আলোর গতিতে পৌঁছনোর পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ে ওঠে। বুধো এরকম একটা গতিতে চলার ফলে তার যে প্রচণ্ড ভরবৃদ্ধি হয়েছে সেই ভরের নিদারুণ চাপেই সে কুপোকাৎ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে উধোর সঙ্গেও ঐরকম একটা বোঝা জোড়া নেই কেন? তার কারণ উধোর গতির মুখ উল্টোদিকে। সে বুধোর মত আলোকের গতির দিকে এগোচ্ছে না, সে যাচ্ছে আলোকের গতি ছাড়িয়ে super-luminal velocityতে। এইরকম অতি-আলোকীয় গতিতে চললে ভর এবং বয়স কমতির দিকে যায় এবং দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। এখানে লেখক তাঁর Relativity-উদ্দীপিত খেয়ালী কল্পনাকে তার চরম সীমায় নিয়ে গেছেন। এবং আমরা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, আজকের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীরা যে অতি-

আলোকীয় কণা Tachyon-এর অস্তিত্বের কথা (গাণিতিক প্রক্রিয়ায়) কল্পনা করেছেন, 'হ য ব র ল'-য় সুকুমার-চিহ্নিত অতি-আলোকীয় পথিকের সমস্ত লক্ষণ ও আচরণের মধ্যে তারই পূর্বাভাস রয়েছে।

দুই relativistic space-traveller উধো ও বুধো দুটি shuttle-এর মত অনবরত পরস্পরের বিপরীত পথে ভ্রমণ করছে। একজন যখন অব-আলোকীয় বেগে যাচ্ছে আলোর গতির দিকে, তখন অন্যজন অতি-আলোকীয় বেগে যাচ্ছে ঠিক উল্টো দিকে, এবং এই অবস্থায় মাঝপথে পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় তাদের দেখা "আমি"র বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির সম্মুখে। বুধোর ঘাড়ের জমাট গোলাকার বোঝাটি যেমন তার ক্রমশ বেঁটে ও গোলাকার হওয়ার চিহ্ন, তেমনই উধোর হাতের সরু লম্বা কল্কেহীন হুঁকোটি হচ্ছে অতি-আলোকীয় বেগে চলার ফলে তার ক্রমশ পাতলা ও লম্বা হয়ে ওঠার প্রতীক। অর্থাৎ এই মুহূর্তে একজন যাচ্ছে অতীত থেকে ভবিষ্যতের দিকে, অন্যজন আসছে ভবিষ্যৎ থেকে অতীতের দিকে, একজনের দৈর্ঘ্য ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে, অন্যজন ক্রমাগতই দীর্ঘায়িত হচ্ছে, একজনের ভর শূন্য থেকে অসীমের দিকে বেড়েই চলছে, অন্যজনের ভর অসীম থেকে কমতে কমতে শূন্যতার দিকে এগুচ্ছে। মাঝপথে এমন এক জায়গায় এবং সময়ে লেখক এদের দেখা করিয়ে দিয়েছেন যখন এই সব বিভিন্ন co-ordinateগুলির আপেক্ষিক সমাবেশ মুহূর্তের জন্য তাদের চেহারাদুটিকে একরকম করে দিয়েছে। কিন্তু হুঁকো আর পুঁটলির তফাৎ তাদের relativistic motion-এর দিক ও পরিমাণগত গভীর পার্থক্য নির্দেশ করছে।

বয়স নিয়ে কাড়াকাড়ি

তারপরেই দুই সৃষ্টিছাড়া খোকা-বুড়োর মধ্যে সেই প্রচণ্ড হাতাহাতি। নিঃসন্দেহে কৌতুকরসই এখানে প্রধান, কিন্তু ঐ অপূর্ব হাস্যরসও বোধহয় তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে গভীর বৈজ্ঞানিক কল্পনার সূত্র বেয়ে। পুঁটলিচাপা বুধোর ওপর চেপে বসে উধো তাকে হুঁকো দিয়ে ঠেঙাতে ঠেঙাতে বলতে লাগলো, "ওঠ্ বলছি, শিগ্গির ওঠ্।" তারপরেই কিন্তু বুধো পোঁটলাশুদ্ধ উঠে দাঁড়ালো এবং দুজনের মধ্যে প্রচণ্ড হাতাহাতি লেগে গেল : "ঝটাপট খটাখট্, দমাদম্, ধপাধপ্।"

শেষ অবস্থাটিতে পৌঁছনোর আগে কাকের রহস্যময় ব্যাখ্যাটি একটু ভেবে দেখা যাক : "ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না ? উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে। এর বোঝা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন ? এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।" এ কি ব্যাখ্যা, না জিলিপির প্যাঁচকে আরো কয়েক পাক পেঁচিয়ে দেওয়া ? তবু দেখা যাক এই প্যাঁচের পাক থেকে কিছু উদ্ধার করা যায় কিনা। "উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে।" তার মানে কি বোঝাটি আগে উধোর সঙ্গেই লটকানো ছিল এবং সেটিকে সে কোনো কারণে এবং কোনোভাবে বুধোর ঘাড়ে চাপিয়েছে ? "এখন ও আর বোঝা ছাড়তে চাইবে কেন ?" তাহলে কি উধো আবার বোঝাটি ফেরৎ নিতে চায়, কিন্তু বুধো তাতে রাজী নয় ? আরো তথ্য : "এই নিয়ে রোজ মারামারি হয়।" তার মানে কি এদের মধ্যে এই উদ্ভট বোঝাবদলের নাটক নিয়তই চলতে থাকে ? ঐ বিরাট গোল পুঁটলি বা relativistic mass যার সঙ্গে যুক্ত সে প্রচণ্ড দ্রুত কিন্তু অব-আলোকীয় গতিতে ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান। উধোর আগে ঐ অবস্থা ছিল, যে-অবস্থায় সে ক্রমশই বেশী ভারী আর বেঁটে হয়ে যাচ্ছিল। নিশ্চয়ই তার সখ হয়েছিল গতিটি আলোর চেয়েও দ্রুততর করে এবং উল্টে নিয়ে একটু অতীতের, অর্থাৎ কম বয়সের দিকে ফিরে যাওয়া, এবং সঙ্গে সঙ্গে figure টিকে একটু হাল্কা আর slim করে নেওয়া। তাই ভ্রমণপথে সাক্ষাৎকালে কোনো বিচিত্র কায়দায় ঐ relativistic load-টি সে বুধোকে গছিয়ে দেয়। বুধোরও বোধহয় কোনো আপত্তি ছিল না। হয়তো সে অতি-আলোকীয় বেগে শৈশবের দিকে এবং অত্যধিক লঘুতার দিকে গিয়ে গিয়ে বিরক্ত হয়ে এবার আবার ভবিষ্যতের দিকে যাবার একটা সুযোগ খুঁজছিল। সেটাই সে পেয়ে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে পোঁটলার ভারমুক্ত উধো অতি-আলোকীয় গতিতে ছুটতে ছুটতে তেরো বছরে এবং আড়াই সেরে পৌঁছে বিতৃষ্ণ হয়ে আবার ভবিষ্যতের দিকে মোড় ঘুরতে চায়। কিন্তু তা করতে হলে ঐ relativistic massটি আবার পাওয়া চাই। সুতরাং সে বুধোর ঘাড়ে যে-বোঝাটি চাপিয়েছিল সেটি ফেরৎ পেতে চায়। কিন্তু এখন বুধো আর

বোঝা ছাড়তে চায় না। তার হয়তো এখন নেশা চেপেছে, আলোর গতিতে পৌঁছতেই হবে; তাই ঐ প্রচণ্ড বোঝার ভারে ছটফট করা সত্ত্বেও ওটাকে আঁকড়ে থাকতে চায়।

কিন্তু সংঘর্ষের ফল কি দাঁড়ালো? "মুহূর্তের মধ্যে চেয়ে দেখি উধো চিৎপাত শুয়ে হাঁপাচ্ছে, আর বুধো ছটফট করে টাকে হাত বুলোচ্ছে।" অর্থাৎ পরিস্থিতি আবার উল্টে গেছে। উধো আর বুধোর আবার অবস্থা-বিনিময় ঘটেছে। উধোই এখন মাটিতে পড়ে হাঁপাচ্ছে, অর্থাৎ relativistic mass-এর পোঁটলাটি আবার তার সঙ্গেই পুনঃসংযুক্ত হয়েছে এবং সে আবার ভবিষ্যতের পথের পথিক হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারমুক্ত বুধো এবার অতি-আলোকীয় বেগে অতীতের দিকে ধাবমান হবে।

কিন্তু এই বোঝার ঘাড়-বদল এবং তার ফলে অবস্থার আমূল পরিবর্তনের ফলে উধো-বুধোর মধ্যেকার relativistic সম্পর্কটি কেমন যেন গুলিয়ে গেল। তা তো হবেই, কারণ বোঝাটি পুনর্দখল করে উধো গোঁৎ খেয়ে আবার ভবিষ্যতের দিকে about turn করে গেল, এবং ফলত বুধোর আকস্মিক বোঝাহীনতা তাকে উল্টোদিকে গোঁৎ খাইয়ে অতি-আলোকীয় বেগে অতীতের পথে ধাবিত করলো। গতি, গতিমুখ, ভর, দৈর্ঘ্য সময়-ছন্দ সবই নিমেষের মধ্যে বদলে যাওয়ায় উধো-বুধো যেন তখনকার মত পরস্পরকে হারিয়ে ফেললো। তাই বুধো কান্না শুরু করল, "ওরে ভাই উধো রে, তুই এখন কোথায় গেলি রে?" এবং সঙ্গে সঙ্গে 'উধো কাঁদতে লাগল, "ওরে হায় হায়! আমাদের বুধোর কি হল রে।" '

তারপরে তাদের কোলাকুলি এবং গলা জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটির আর কোনো বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নেই। এটি নিছক এই রহস্যময় নাটকটির কৌতুক-মধুর সমাপন। শুধু, তাদের দুজনেরই গাছের ফোকরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া বোধহয় তাদের মহাশূন্যের অসীম পরিসরে মিলিয়ে যাওয়ার প্রতীক—যে রহস্যলোকে আমাদের মন্থরগতি জীবনের দৃষ্টি আর তাদের অনুসরণ করতে পারে না। Alice-এর Cheshire cat, যার দেহটি মিলিয়ে গেলেও হাসিটি ভেসে থাকে, সেও দেখা দিয়েছিল গাছের ডালে। চিরঞ্জীব—অথবা গেছোদাদারও (স-বৌদি) নিবাস গাছে। কাকেশ্বর গাছের ডালে বসেই তার হিসাবের ভেল্কি দেখিয়েছিল। উধো বুধো দুজনেই গাছের অদৃশ্য অভ্যন্তর থেকেই আমাদের দৃশ্যলোকে বেরিয়ে এসেছিল; এখন দুজনেই আবার সেই গাছের ফোকরের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাহলে 'হ য ব র ল'-র প্রথমাংশটির চমৎকারিত্ব কি মূলত তার মধ্যে প্রতিফলিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা-কল্পনার গভীরতা ও সূক্ষ্মতায়? নিশ্চয়ই না। "হযবরল" বিচিত্র উদ্ভট-রস এবং কৌতুকরসের নিখুঁত সংমিশ্রণে গড়া একটি অনবদ্য রসরচনা। প্রতিটি পাঠক, সে শিশুই হোক, আর বড়ই হোক, এর থেকে প্রথমত এবং প্রধানত পায় অনাবিল এবং অফুরন্ত মজা। জীবনের উপাদানগুলিকে নানাভাবে উল্টেপাল্টে বহু বিচিত্র, উদ্ভট, অভাবনীয় মূর্তিতে পুনঃ-সন্নিবিষ্ট করে দেখানোর যে ক্ষমতা একজাতীয় রসস্রষ্টার মধ্যে দেখা যায় সেই ক্ষমতার চরম পরিচয় পাওয়া যায় এই লেখাটিতে। প্রথমত, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি image-এর মধ্যে আছে এক অপূর্ব অসম্ভবের ঝিলিক, যা মনে একই সঙ্গে কৌতুক ও রহস্যের শিহরণ জাগায়। দ্বিতীয়ত, এই অসম্ভব ঘটনা বা image-গুলি একের পর এক ভেসে এসেছে একটি অসম্ভবের sequence-এ। জগতে সমস্ত ঘটনার স্রোত বয় অমোঘ কার্যকারণ-পরম্পরায়। এখানে অসম্ভব ঘটনাগুলি একের পর এক ভেসে এসেছে অসম্ভবেরই logic-এর স্রোতে। একটি পর্যায়ের পর আরেকটি পর্যায় যে কী মূর্তি ধরে আসবে তা আমরা কোনো সময়েই আন্দাজ করতে পারি না; অথচ যখন সেটি আসে তখন সে অসম্ভবের এমন এক নতুন এবং অমোঘ যৌক্তিকতা নিয়ে আবির্ভূত হয় যে তাকে ঐ পরি-স্থিতিতে আমাদের পুরোপুরি লাগসই মনে হয়। বাস্তবকে স্বপ্নলোকে রূপান্তরিত করে সেই কল্পলোকের অন্য-নিয়ম-শাসিত জগতে এই স্বচ্ছন্দ বিচরণ এইজাতীয় প্রতিভার যে মান নির্দেশ করে তা বোধহয় আর কোথাও অতিক্রান্ত হয়নি।

কিন্তু কোনো সময়েই একথা ভুলে গেলে চলে না যে মানুষের চেতনার সমস্ত কিছু ফসলই বাস্তব থেকে উদ্ভূত। কোনো একটি রচনা যতই কল্পনারঞ্জিত, যতই স্বপ্নময়, যতই অবাস্তবধর্মী হোক, শেষবিচারে দেখা যাবে ঐ কল্পনা বা স্বপ্ন বা অবাস্তবের পিছনে রয়েছে বাস্তবের অভিঘাত—তা সেই অভিঘাতের স্পন্দন

যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন। সুতরাং nonsense বা খেয়াল-রসের রচনার মূলেও বাস্তবের একটা সুদূর ভিত্তি না থেকে উপায় নেই। আগেই বলেছি, নিছক খেয়ালরসের সৃষ্টি বলে লেখক নিজেই যাকে অভিহিত করেছেন, সেই 'আবোল-তাবোল'-এর সবচেয়ে সার্থক কবিতাগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রেই সেদিনের সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে লেখকের মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 'হযবরল'কে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলেও এই সত্যটি খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বই-টির দ্বিতীয়ার্ধটি, অর্থাৎ হিজি বিজ বিজ, ব্যাকরণ শিং ও ন্যাড়ার আবির্ভাবের সময় থেকে জোগাড়-করা আসামী ন্যাড়ার সাত-দিনের ফাঁসি আর তিনমাসের জেলের হুকুম হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটি যে আমাদের বহুপ্রশংসিত বিচারপ্রথার একটি নিদারুণ ব্যঙ্গচিত্র তা তো দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। এখানেও খেয়ালী কল্পনা ও কৌতুকরসের উচ্ছ্বাস জেগে উঠেছে কঠোর সামাজিক বাস্তবের অভিঘাতে—fantasy-র ভাষায় তার equal and opposite reaction হিসাবে। বাস্তব ও খেয়ালখেলার মধ্যে এই সম্পর্কটি এখানে যতটা স্পষ্ট (শিশু-পাঠকের মনেও এর অর্থাভাস কিছুটা পৌঁছায়) অন্যান্য বহু জায়গায় অবশ্য ততটা নয়, এবং কোথাও কোথাও এতই প্রচ্ছন্ন যে তার সূক্ষ্মতম স্পন্দনটি অনুভব করতে না পারলে তার অস্তিত্বই বোঝা যায় না। কিন্তু স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন যে-ভাবেই হোক, বাস্তবের সঙ্গে এই সম্পর্কের সূত্রটি প্রায় সর্বত্রই বর্তমান। শুধু তাই নয়, খেয়ালরসের রূপরচনার প্রাণময়তা, অনুভূতিশীল পাঠকের মনে তার আবেদনের গভীরতা ও স্থায়িত্ব অনেকটাই নির্ভর করে বাস্তব-চেতনার সঙ্গে তার এই প্রচ্ছন্ন সম্পর্কটির ওপর। খেয়ালরসের অনন্য শিল্পী সুকুমারের ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষভাবে সত্য বলে মনে হয়।

'হযবরল'-র আলোচিত প্রথমাংশটিতে পাওয়া যায় আর-এক ধরণের বাস্তবের, সেদিনের নতুন বিজ্ঞানের নিদারুণ চমকগুলির প্রতিফলন। দ্বিতীয়ার্ধের মত এখানেও বাস্তব-চেতনার অসাধারণ সূক্ষ্মতা ও গভীরতা ছাড়া এই অপূর্ব রস-লোকের সৃষ্টি সম্ভব ছিল না। কিন্তু 'হযবরল'-র সামগ্রিক গঠন সম্বন্ধে আর-একটা প্রশ্ন উঠতে পারে: প্রথমাংশের বিজ্ঞানভিত্তিক রসচিত্রগুলির সঙ্গে শেষাংশের সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রগুলির সম্পর্ক কী? একই রচনায় পর পর দুটি ভিন্ন বিষয়ের রসরূপায়ণ কেন? মনে হয়, এই সংযুক্তির কারণ, জীবনের শেষ পর্যায়ে (মারাত্মক রোগের প্রকোপে শয্যাগত অবস্থায়) সুকুমারের মনে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের অন্তর্নিহিত বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে একটা ব্যাপক চেতনা ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল। এদেশের সভ্যমানুষের চেতনা ও জীবনযাত্রার মধ্যে যে কত অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রকমের উল্টো-পাল্টা জিনিসের সমাবেশ তিনি অনুভব করেছিলেন তার ব্যাপক পরিচয় আছে তাঁর 'আবোলতাবোল'-এর কবিতাগুলিতে, 'দ্রিঘাংচু' প্রভৃতি গল্পে এবং 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' প্রভৃতি নাটকে। কিন্তু এই সমাজব্যবস্থার উদ্ভট ন্যায়হীনতা সম্বন্ধে তাঁর চেতনা সবচেয়ে তীক্ষ্ণ ও সংহত হয়ে উঠেছে 'হযবরল'-র শেষাংশের বিচারসভাটির চিত্রণে। যে সমাজজীবন এত সভ্য এত সুসংগঠিত বলে পরিচিত তার কেন্দ্রস্থলেই এই চরম বৈপরীত্য! Appearance আর reality-র মধ্যে এই নিদারুণ বিরোধিতা! আপেক্ষিকতাবাদ ও কোআন্টম-তত্ত্ব পুরোনো বস্তুজগতের গোছানো ছবিটির মধ্যে যেসব উদ্ভট বৈপরীত্যের সন্ধান দিয়েছিল, সুকুমারের বিজ্ঞান-বিদগ্ধ মন যেন তার মধ্যে সামাজিক অন্তর্বিরোধেরই একটা image খুঁজে পেয়েছিল। সমাজ-জীবনের প্রকৃত অসংগতি যেন বিজ্ঞান-জগতের ঐ আপাত-অসম্ভব ব্যাপারগুলিরই মত। বিজ্ঞান-লোকের ঐ কুহকচিত্রগুলি তাই সমাজ-জীবনের বৈপরীত্যচিত্রণের একটা ভূমিকার মত কাজ করেছে, এবং নিদারুণ কৌতুক-পীড়িত হিজি বিজ বিজের মাধ্যমে একটি থেকে অন্যটিতে উত্তরণ ঘটেছে অতি সহজেই।

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

সুকুমার রায় : তাঁর লেখার ভঙ্গি

বহিরাবরণের দিক থেকে মিল থাকলেও সুকুমারের 'হযবরল' আর ইউরোপের 'অ্যালিস'-এর মধ্যে 'পার্থক্যের পরিধি'টিও সুস্পষ্ট। তাঁর ফ্যানটাসির সঙ্গে স্বপ্নদর্শনের প্রক্রিয়ারও আত্মীয়তা রয়েছে। তবে তাঁর রচনায় ফ্যানটাসি, অ্যাবসার্ড আর রূপক মিশ্ররূপে বিভিন্নভাবে মূর্ত হয়েছে। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন বয়স্ক, তাই অভিভাবকের উচ্চতা থেকেই তাঁর পরিপার্শ্বের ছেলেমানুষীকে বিদ্ধ করেছিলেন সস্নেহ ভৎসনায়।

১৮৮৭ থেকে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। ছত্রিশ বছরের জীবনকাল। এই সময়সীমার মধ্যে খান-কুড়ি গ্রন্থের ভাবনাকে রচনারূপ দান করতে পেরেছিলেন সুকুমার রায়, যদিও মৃত্যুশয্যায় তাদের মাত্র একখানির প্রেসকপি দেখে যেতে পারেন তিনি।

কবিতা, কাহিনী, নাটক ও প্রবন্ধ—চতুর্বিধ শিল্প-মাধ্যমে নিজেকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করেছিলেন সুকুমার। এদের সবগুলিই যে শিল্প হিসাবে চূড়ান্ত হয়ে উঠেছিল তা নয়, বরং একথা স্পষ্টই মনে হয় যে 'হযবরল', 'আবোল তাবোল' ও 'চলচিত্তচঞ্চরি' যেভাবে পাঠকের প্রাথমিক আমোদ ও পরবর্তী সূক্ষ্মতর ভাবনার চাহিদাকে সন্তুষ্ট করেছে, একই সঙ্গে বিভিন্ন বয়সী ও বিচিত্র রুচির পাঠককে স্পর্শ করেছে, অন্য লেখাগুলি তেমন পারে নি। তাতে অবশ্য শিল্পী হিসাবে সুকুমার রায়ের অনন্যতা, বৈচিত্র্য ও গভীরতার কোন হানি হয় না, বরং তাঁর আপাত-হাস্যরসাত্মক রচনার পিছনে যে অমলিন ও ঋজু মনটি ছিল তার জন্য ও তাঁর প্রকাশভঙ্গির অভূতপূর্ব অন্তরঙ্গতার জন্য তিনি আমাদের চিরকালের আপনজন হয়েই থাকেন। তাঁর রচনায় ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ—যা কৌতুকের কণা মেখে সর্বদা হাসে—তা শেষ পর্যন্ত একটি আলোকিত মনকেই প্রকাশ করে। ঐ হাসি, ঐ আলো মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্যতম প্রাণসঞ্চারী শক্তি।

শিল্পীর ভূমিকায় সুকুমার রায়ের অনন্যতা কোনখানে? বলাই বাহুল্য, লেখক তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোয় জীবন-যাত্রার দ্বন্দ্ব ও তার অন্তর্নিহিত অসঙ্গতিকে বিশিষ্ট রূপ দেন। তখন আর তা কেবল তাঁর ব্যক্তিগত ও সমসাময়িক হয়ে না থেকে টুকরো সময় ও একক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে পেরিয়ে যায়।

সুকুমার রায়ের লেখার অমলিন হাসি ও আমোদে ঠাসা মাল-মশলা যে রচনার প্রাথমিক স্তর, কৌতুকী আবরণ তা একটু পরেই বুঝতে পারি আমরা। শিল্পিত আবরণে ঢাকা তাঁর অনুভূতি ও বক্তব্যকে লুকিয়ে নিয়ে লেখাগুলির হাস্যময় মুখগুলি প্রাথমিকভাবে আকর্ষণ করলেও, অন্যতর, গভীরতর আকর্ষণের সম্মুখীন হই তাঁর লেখার দ্বিতীয় স্তর আবিষ্কারের পর।

তাঁর অব্যবহিত পূর্বের ও সমকালীন বাংলা দেশের

জীবনযাত্রায় যে দ্বন্দ্ব, অসঙ্গতি ও অতিরেক সুকুমারের নজরে পড়েছিল, সচেতন লেখকের মতই তাদের শিল্পিত রূপ দিয়েছেন তিনি।

১. "আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!"
('ছায়াবাজি'/আবোলতাবোল)

২. "হ্যাঁ, এ তো বোঝাই যাচ্ছে—চন্দ্রবিন্দুর চ, বেড়ালের তালব্য শ, রুমালের মা—হল চশমা। কেমন, হল তো?"
(হ য ব র ল)

৩. "ঈশান। কি হয়েছে? এই আপনার চলচিত্ত-চঞ্চরি? এসব কি? ঈশানবাবুর ছায়া ঘুরছে—লাটাই পাকাচ্ছে—আর ঈশেনবাবু গোঁৎ খাচ্ছেন। পেটের ভিতর বিরাট অন্ধকার হাঁ করে কামড়ে দিয়েছে—চ্যাঁচাতে পারছেন না, খালি নিঃশ্বাস উঠছে আর পড়ছে— সব ঝাপসা দেখছে—গা ঝিমঝিম—নাক্স ভমিকা থার্টি—

ভবদুলাল। বাঃ! ওগুলো ত আপনাদেরই কথা। শুধু নাক্স ভমিকাটা আমার লেখা।" (চতুর্থ দৃশ্য/চলচিত্তচঞ্চরি)

'সুকুমার-সমগ্র রচনাবলী' থেকে নমুনা হিসাবে আমি তিনটি অংশকে গ্রহণ করেছি। বাল্যে এই অংশগুলি পড়ে আমাদের কত নির্জন দুপুর হাস্যোদ্বেল হয়ে উঠেছে; এখনও এইসব লেখা পড়লে বয়স্ক মুখের রেখা চিরে এক চিলতে হাসির রোদ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হয়ে যাই আমরা, লেখার দ্বিতীয় স্তর আন্দোলিত করে আমাদের। তখন 'ছায়াবাজি' কবিতাটি মনে করিয়ে দেয়, কত অপ্রয়োজনীয় কলহে মত্ত হয়ে জীবনের খেই হারিয়ে ফেলি আমরা, পায়ে-পা দিয়ে ঝগড়া করে শক্তিক্ষয় করি, লক্ষ্যে পৌঁছনো আর হয় না। 'হ য ব র ল'র অংশটি মনে করিয়ে দেয়, অন্ধভাবে তত্ত্ব-প্রচারের উগ্রতায় আমরা কীভাবে জোর করে হিসাব মেলাই, 'বেড়াল'-এর থেকে 'তালব্য শ'-কে খুঁজি। আর 'চলচিত্তচঞ্চরি'? সে তো, ভবদুলালের কথা অমৃতসমান / সুকুমার রায় কহে শুনে পুণ্যবান।

উনিশ-শতকীয় নবজাগরণের বিশাল কর্মকাণ্ডের, চিন্তা ও পরিকল্পনার বিস্তৃতির পায়ের তলায় সর্বদা মাটি ছিল কি-না—থাকলেও সাধারণ মানুষের জীবনে তা কতখানি অর্থবহ হয়ে উঠতে পেরেছে, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। পরবর্তী যুগের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধি হিসাবে সুকুমার রায় যেন পিছন ফিরে ঐ যুগের কিছু হাস্যকর অসঙ্গতির পর্যালোচনা করেছেন নিজস্ব ঢঙে।

এই সময়ে বাংলা দেশে বিভিন্ন-বিচিত্র সভা ও সমিতি গঠিত হতে দেখা যায়। 'জমিদার সভা', রাজনারায়ণ বসুর নেতৃত্বে 'সুরা নিবারণী সভা', 'সঞ্জীবনী সভা' ('হামচুপামুহাফ'; এটির উদ্দেশ্য ছিল, রবীন্দ্রনাথের মতে, 'উত্তেজনার আগুন পোহানো') প্রভৃতির নাম মনে পড়ে। জনসমাজে তখন একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র ও নব্যবণিকতন্ত্রের সাজপোশাক, মাথার উপরে ব্রিটিশ। এই বিভিন্ন উপাদানে গঠিত সমাজের পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্য একধরণের অসঙ্গতি-জাত কৌতুকের জন্ম দেয়। 'চলচি চঞ্চরি'-র একদিকে ঈশানবাবুর, সত্যবাহনবাবুর 'সাম্য সিদ্ধান্ত সভাগৃহ' ও 'সমীক্ষা মন্দির'; অন্যদিকে শ্রীখণ্ডদেবের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত নবীনবাবু প্রভৃতির 'শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম'। এইসব গোষ্ঠীর 'সাম্য সাধনাদি', 'বিবিধ মৌলিক বিষয়ে সম্যক শিক্ষাভাবজনিত খণ্ডাখণ্ড বিচারহীনতা', 'বিবেকবৃত্তির নানা বৈষম্যঘটিত অবিমৃষ্যকারিতা' প্রভৃতি উচ্চচিন্তারূপ 'ধূপের ধোঁয়া' ও 'দীপের আলো'য় যাদের চিন্তা ক্রমে ক্রমে আবছা—তাদের নিয়ে লেখক এখানে সস্নেহ ঠাট্টার আয়োজন করেছেন।

সুকুমার-সাহিত্যে হাস্যময়তার অন্তরে এই যে অন্যতর বক্তব্যের চোরাস্রোত, আমোদ-আহ্লাদের মোড়কে এই যে সমাজ-সচেতনতার নিগূঢ় দৃষ্টিভঙ্গি—এই দ্বিতীয় স্তরের উপস্থিতি তাঁর লেখা একটি চিঠিতে প্রত্যক্ষভাবে বেরিয়ে এসেছে। আমাদের কাছে যিনি সপ্রাণ ব্যক্তিত্বের তুমুল উল্লাসে সাধারণভাবে পরিচিত, বুকের ভিতর তিনি যে কতবড় ক্ষত নিয়ে পথ চলেছিলেন, তা এর প্রতিটি লাইনে প্রকাশিত। ২৩শে অগস্ট ১৯২০ সালে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা এই চিঠিতে সুকুমার স্পষ্টই জানাচ্ছেন ঃ "আশার কথা, আনন্দের কথা, optimism-এর কথা এক বর্ণও সত্যি সত্যি বিশ্বাস করি না। বারবার করে বলি, খুব বেশী বেশী করে বলি এইজন্য যে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি মনের মধ্যে আছে। আসলে মনে

মনে যা বিশ্বাস করি তা ঠিক উল্টো—rampant, morbid, out and out pessimism"। আমাদের বেঁচে থাকার প্রতি মুহূর্তের বেদনাকে যিনি হাসির স্বর্ণধারায় ধুইয়ে দিয়েছিলেন, যেন মনে হয়, এইভাবে মহাদেবের মত, সামাজিক জীবনের যাবতীয় গরল তিনি পান করে অভিভাবকের ভূমিকায় উত্তীর্ণ করেছিলেন নিজেকে। ব্যক্তিগত জীবনের অনুভূতিতে, এবং তা থেকে উৎসারিত যাবতীয় শিল্পকর্মের মধ্যে এইভাবে তাঁর লেখায়, তাঁর লেখায় রসরূপের স্থিতর উপস্থিতি সম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু সমাজের অসঙ্গতি, অন্যায় ও অতিরেকবে তিনি তো অন্যভাবেও, বিদ্রূপের কশাঘাতেও, অস্থির করতে পারতেন—যেমন করেছিলেন হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলাল? সমকালীন কবি ও কবিতার প্রতি বিরক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল অনায়াসে লিখেছিলেন:

> আমি একটা উচ্চকবি, এমনি ধারা উচ্চ,—
> শেলি, ভিক্টর হিউগো, মাইকেল, আমার কাছে তুচ্ছ
> আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে টস্‌কে
> পড়েছি এ বঙ্গভূমে বিধাতার হাতে ফস্‌কে।...
> আমি লিখছি যেসব কাব্য মানব জাতির জন্যে
> নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝবে কি তা অন্যে।"
>
> ('আনন্দবিদায়' নাটকের গান)

একই মনোভাব সুকুমার রায়ের হাতে পড়ে বিদ্বেষের তীব্রতা হারিয়ে অমল হাসির রসে ভরপুর হয়ে উঠেছে। সচেতন শিল্পী হিসাবেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য এই অমলিনতায়:

> বলছিলাম কি, আমি একটা বই লিখেছি কবিতার
> উঁচু রকম পদ্যে লেখা আগাগোড়াই সবি তার।
> তাইতে আছে "দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর
> শ্মশান ঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।"
> এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও,
> বুঝছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।
>
> ('অবুঝ'/খাই খাই)

একদিকে যেমন বিদ্রূপের কশাঘাতে বিশ্বাসী ছিলেন না সুকুমার, তেমনি অন্যদিকে চারপাশের জীবনযাত্রার মধ্যে যেসব অসঙ্গতি চোখে পড়ে, তাদের নিয়ে বিষাদময় শিল্পসৃষ্টিতেও মন ছিল না তাঁর। 'গোরা'তে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে নব্যহিন্দুতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের ছবি আঁকছিলেন গোরার অন্বেষণের মাধ্যমে, তার নিজের ভুল ভাঙার মধ্যেই ঐ অন্বেষণের বিসর্জন ঘটল। ফলে গোরার সেই বিশাল কর্মকাণ্ডের স্বপ্ন ও গভীর বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তার স্বপ্নভঙ্গকে অপচয়-জনিত হতাশা ও পতনের জন্য ট্র্যাজিক বলে মনে হয় আমাদের। সুকুমার রায়ের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল আলাদা। গোরার অসঙ্গতিকে যদি তিনি শিল্পরূপ দিতেন, হয়তো তার রস হত কৌতুকের।

সামাজিক জীবনের এই বহুবিধ অন্যায়, অসঙ্গতি ও অতিরেক-কে সুকুমার রায় কোন্ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাস্যে রূপান্তরিত করলেন? সাধারণভাবে মনুষ্যচরিত্রের ব্যবহারে যে অতিরেক ও অসঙ্গতি লক্ষ্য করি আমরা, তাকে তেমন অভিনব বলে বোধ হয় না আমাদের। কিন্তু ঐ অতিরেক ও অসঙ্গতিকে যখন তাদের আধার অর্থাৎ একটি মানুষের চরিত্র থেকে বার করে নিয়ে এসে তাদেরই একটি পৃথক ব্যক্তিত্বের রূপ দিয়ে সাজানো হয়, তখন তা-ই হাস্যকররূপে অদ্ভুত ও বিচিত্র বলে মনে হয়। যেন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে একটি বীজাণুকে বৃহত্তর করে বিকট রূপ দেওয়া হল। সমাজের দেহেও লুকিয়ে আছে এইরূপ নানা অন্যায় ও অসঙ্গতির বীজ। সাধারণভাবে তাদের সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই; কিন্তু তাদেব আলাদা করে ও বৃহত্তর করে দেখিয়ে দিলে প্রথমে হাসি পায় আমাদের—অনুভূতির পরবর্তী স্তরে সতর্ক ও সচেতন হয়ে উঠি আমরা।

'হ য ব র ল'-র প্যাঁচারূপী বিচারকের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যটিকে এইভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইছি আমরা। লক্ষণীয় যে বিচারক রূপে প্যাঁচাকে নির্বাচন করা হয়েছে, যে-কিনা দিবা-লোকের মুক্ত আলোয় তাকাতে পারে না। অ্যালিসের গল্পের বিচারদৃশ্যে নেংটি ইঁদুরের ঘুমিয়ে পড়ার সঙ্গে 'হ য ব র ল'-র বিচারকের ঘুমিয়ে পড়ার দৃশ্যটি শুধুই তাৎক্ষণিক মজার ব্যাপারে তুলনীয় হতে পারে। অ্যালিসের কাহিনীতে নেংটি অকিঞ্চিৎকর একটি চরিত্র, কিন্তু 'হ য ব র ল'-র খোদ বিচারকই ঘুমন্ত। তখন মনে হয় শুধু তথাকথিত বিচারালয় নয়, জীবনের যাবতীয় বিচারদৃশ্যেই কি এই অবহেলা ও অজ্ঞতা আমাদের

নজরে পড়ে না? বিচারালয়কেও তখন জীবনের বিভিন্ন-বিচ্ছিন্ন ফললাভের নির্ধারিত ও সংহত প্রতীক বলে মনে হয়। জীবনযাপনের উদ্দেশ্যহীনতা অর্থহীনতা ও কেন্দ্রীয় নিশ্চয়তার অভাববোধটিকে এইভাবে 'হ য ব র ল' স্পর্শ করেছে এবং প্রাত্যহিক জীবনে বিচারকের অন্ধত্বকে আরও বাড়িয়ে শিল্পে যখন প্যাঁচারূপী বিচারককে স্রেফ ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল, তখন প্রথমত দৃশ্যটির চমৎকারিত্ব আমাদের হাসিয়ে দিলেও পরবর্তী স্তরে আমাদের সচেতনতার মাত্রাটিকে স্পর্শ করল।

এভাবেই 'আবোলতাবোল'-এর 'গোঁফ চুরি', 'কাতুকুতু বুড়ো', 'গানের গুঁতো' প্রভৃতি কবিতাকে বিশ্লেষণ করা যায়। চ্যাপলিনের সিনেমার মত এগুলিও 'human experiences exaggerated'। এছাড়া 'ছায়াবাজি' কবিতায় 'ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা' পংক্তিতে, 'ন্যাড়া ক্ষ্যাপা'য় পাগলা জগাই-এর সর্বত্র শত্রু দেখার পাগলামিতে, 'হাতুড়ে' ডাক্তারের মানুষ খুন করার কেরামতিতে, 'বুঝিয়ে বলা'র 'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য-পূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত'-এ আপাতহাস্যরস সৃষ্টির পরিবেশ প্রধান হয়ে উঠলেও রূপকার্থে এরা সবাই মনুষ্য-আচরণবিধির অসঙ্গতি ও অতিরেকের দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। যেখানে সেই অসঙ্গতি অন্যায়ের নামান্তর সেখানে (যেমন 'বাবুরাম সাপুড়ে') লেখকের বাঁকা হাসির ব্যঙ্গও আছড়ে পড়েছে। অবশ্য সর্বত্রই আপাত-হাস্যের বা কবিকল্পনার মনোহারী পরিমণ্ডলটি অটুট ও অক্ষুণ্ণ থেকে এদের শিল্প-মর্যাদা রক্ষা করেছে।

এই রচনার প্রথমে ব্যবহৃত ভবদুলালের উদ্ধৃতিটিকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। 'চলচিত্তচঞ্চরি' নাটকে ঈশান প্রভৃতির নিরর্থক বাক্-সর্বস্বতাকে সে আরও 'mundane' স্তরে নামিয়ে এনে আপাত-হাস্যের পরিমণ্ডল রচনা করলেও আসলে তাদের কথায় ও ব্যবহারের মধ্যে যে ভূমিহীন ও অসংলগ্ন চিন্তার পদ্ধতি, তাকেই ফুটিয়ে তুলেছে আমার তো মনে হয় যে তাঁর সৃষ্ট শিল্পের যে চরিত্রটির মধ্যে সুকুমার বিশিষ্টভাবে প্রকাশিত, সে ভবদুলাল। চারপাশের হাস্যকর ও অন্তঃসারশূন্য গম্ভীর তাত্ত্বিকতার আবহাওয়ার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে ভবদুলালী কৌতুকবোধ—যার আপাত-নিপাট সরল প্রশ্নের খোঁচায় অসঙ্গতিতে ভরা ভাবরাজ্যের বেলুন মুহূর্তে চুপসে গেছে। হাস্যকর ও নিরর্থক কলহে মত্ত দুটি প্রতিপক্ষের মধ্যে সে-ই সার্থক তৃতীয়পক্ষ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, তাঁর রচনায় পারিপার্শ্বিক জীবনের বিচিত্র ফাঁকিকে অন্যতর রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন সুকুমার রায়। রূপকের ঐ আবরণ হাসির জন্ম দিলেও, সচেতন হয়ে এ কথাও ভাবতে হয় আমাদের যে জাগতিক সমস্যারই বর্ধিত রূপ ঐগুলি। এই যে মূলের সমস্যাকে বাড়িয়ে অন্যতর রূপ দিয়ে পাঠককে সচেতন করার প্রচেষ্টা —এই ব্যাপারটা অ্যাবসার্ড শিল্পেও লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য অ্যাবসার্ড ছাড়াও শুদ্ধ রূপক, ননসেন্স, ফ্যানটাসি প্রভৃতির চিহ্নও সুকুমার রায়ের লেখায় স্পষ্ট। সবগুলি মিলে-মিশে মিশ্র-রূপেও বিভিন্নস্থানে মূর্ত হয়েছে অনেকক্ষেত্রে। এমনকি যেখানে অ্যাবসার্ডের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে, সেখানে অমিলও স্পষ্ট। তবে বিস্তারিতভাবে সেই প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে প্রাথমিকভাবে অ্যাবসার্ড সম্বন্ধে দু-এক কথা বলে নেওয়া যায়।

অ্যাবসার্ড ও সুকুমার

পাহাড় থেকে অবতরণকালে নীট্শে-কল্পিত জরথুস্ট্র এক সন্ন্যাসীর দেখা পান জঙ্গলে। ইনি জরথুস্ট্রকে শহরে যেতে বারণ করেন ও তাঁর সঙ্গে বেতুল নাচে-গানে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের জন্য কেঁদে-হেসে সেই জঙ্গলেই বাস করার পরামর্শ দেন। নারাজ জরথুস্ট্র শহরের দিকে রওনা দেবার সময় অবাক হয়ে ভাবেন, 'ঈশ্বর যে মারা গেছে, এই খবরটাই লোকটা জানে না।'

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নীট্শের 'জরথুস্ট্র উবাচ' প্রকাশিত হয়। তারপর থেকে এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বর্ধিত হয়েছে, যাঁরা নীট্শের মতই মনে করেন যে ভগবান মারা গেছেন। তাই তাঁরা এখন এমন-এক বিশ্বে অবস্থিত, একদা যার একটি কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সেই কেন্দ্রবিন্দুর অভাবে সাধারণভাবে মানুষের জীবনযাত্রা উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েছে। তাকে তাই রীতিমত স্খলিত, উদ্দেশ্যহীন—এককথায় অ্যাবসার্ড বলে মনে হয়। এই ধারণা থেকেই

অ্যাবসার্ড শিল্পের যাত্রা শুরু। এর ফলে পুরনো মূল্যবোধ থেকে উৎসারিত শিল্পসৃষ্টি করাকে অনেকে নিরর্থক, অনাবশ্যক, অনুপযুক্ত বলে মনে করলেন।

মজার ব্যাপার হল এই যে অ্যাবসার্ড শিল্পও মানুষকে ভগবৎ-অন্বেষার মতই ছড়া বেঁধে মাতিয়ে রাখে, বেভুল ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় হাস্যরস উৎপন্ন করে। কিন্তু এতদুভয়ের তফাৎ এইখানে যে ঈশ্বর উদ্দেশ্য নয়, বরং এই জাগতিক বিশৃঙ্খলা ও যুক্তিহীনতা ও জীবনবৃত্তের কেন্দ্রীয় সত্যবিন্দুর অভাববোধ সম্বন্ধে সক্রিয় ও সচেতন করাই অ্যাবসার্ড শিল্পের অভীপ্সা। ঐশ্বরিক উপস্থিতির অভাবে. কেন্দ্রাভিগ উদ্দেশ্যের অভাবে মানব-অস্তিত্ব বিছিন্ন, বিভিন্ন—কোন সাধারণ আত্মিক সত্তায় সূত্রবদ্ধ নয়। অ্যাবসার্ড শিল্প মুগ্ধ, সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত মানুষকে আঘাত করে' বর্তমান চেতনায় নিয়ে এসে 'ultimate reality of his condition' সম্পর্কে সচেতন করে।

এই সচেতনতার কাজটি অনেক সময়ই একটি ব্যঙ্গাত্মক মাত্রাযুক্ত হয়ে আসে। এই প্রসঙ্গে ক্যামুর 'দ্য মিথ অব্ সিসিফাস' কে মনে পড়ে, যেখানে মানবজীবনের উদ্দেশ্যহীনতা বোঝাতে গিয়ে তিনি কাচঘরে আবদ্ধ মানুষের টেলিফোন করার নির্বাক মূকাভিনয়ের ভঙ্গিমার কথা স্মরণ করেছেন' এবং তিনি যে কেন বলেছিলেন "কতগুলো শব্দের অর্থ আমি বুঝি না, তাদের মধ্যে একটি হল 'পাপ'" তা-ও এবার বুঝে যাই আমরা।

এই অর্থহীন, অভ্যস্ত, যান্ত্রিক, ঘুমন্ত ও অনবচেতন মনকে অ্যাবসার্ড শিল্প ফুটিয়ে তোলে। সুররিয়্যালিস্ট চিত্রীও প্রথাসিদ্ধ, ব্যাকরণসম্মত মাধ্যমের দ্বারা তাঁর অনুভূতিকে মুক্ত করতে না পেরে, মানবমনের অন্তস্থিত এই জটিল, ব্যাখ্যাহীন ভাবরূপকে তাঁর ছবিতে ফোটাতে চান। অবশ্য এইটুকুই এঁদের মিল, রসরূপের বিচারে এঁরা স্বতন্ত্র, অনেকসময় দুরবর্তী।

এখানেই অবশ্য অ্যাবসার্ড তত্ত্বের সঙ্গে সুকুমার-চেতনার একটা বড় পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ব্রহ্ম-চেতনায় বিশ্বস্ত আস্তিক সুকুমার রায় সেই অর্থে কখনোই জাগতিক বৃত্তকে ঈশ্বরশূন্য করে ভাবতে পারেন না। ফলে একটা স্তর পর্যন্ত পরিপার্শ্বকে অসঙ্গতির শিকার হিসাবে দেখলেও সুকুমার রায়ের শিল্পের মধ্যে জীবনের কেন্দ্রহীন বা ঈশ্বরহীন অস্তিত্বচেতনা অনুপস্থিত। তথাপি তাঁর লেখার সঙ্গে যে অ্যাবসার্ডের মিল খুবই ঘনিষ্ঠ, তার কতগুলি কারণ আছে। প্রথমত, পরিপার্শ্বের অসঙ্গতি, অন্যায় ও অবিচারে তাঁর মন দোলায়িত হয়েছিল; দ্বিতীয়ত, অ্যাবসার্ড-তত্ত্ব বা দর্শনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনদর্শন সচেতনমত না মিললেও ঐ তত্ত্ব থেকে জাত ঐ শিল্পের মেজাজের সঙ্গে তাঁর শিল্পের স্বভাব-নৈকট্য ও সাদৃশ্যও চোখে না-পড়ে পারে না।

তাছাড়া, ১৯২০ সালের আগস্ট মাসের ২৩ তারিখে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্দেশে তিনি যে আট পাতাব্যাপী দীর্ঘ পত্ররচনা করেছিলেন, তাতে তাঁর বিশ্বাসী মনও যে কীভাবে অন্তর্দ্বন্দ্বে জ্বলছিল, তার ঘনিষ্ঠ বিবরণ পাওয়া যায়। ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ সুখী ও নিশ্চিন্ত হৃদয়ের বদলে সেখানে ফুটে বেরিয়েছে ইতিহাস ও অভিজ্ঞতায় পুষ্ট পরিপার্শ্ব সম্পর্কে সচেতন একটি মানুষের দ্বিধাদীর্ণ মন—এতদিনের অভ্যাসের, বিশ্বাসের পাথর ঠেলে যিনি বাইরে আসতে চাইছেন। হয়ত এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তার পরিশ্রম থেকেই মৃত্যুচেতনা গ্রাস করেছিল তাঁকে। অন্তত ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তিনি যে হতাশ, তিক্ত ও শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিলেন, এই চিঠি পড়লে তাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

অ্যাবসার্ড-এ এই বিশৃঙ্খল জগত, তার করুণ ও অব্যবস্থিত উপস্থিতি সম্পর্কে দর্শক/পাঠককে সচেতন করা হয়। এই করুণ ও অব্যবস্থিত অস্তিত্ব অ্যালিসের বিভিন্ন রূপাকৃতির (গল্পের শুরুতেই সে মিশ্র স্বাদ-গন্ধের চাটনি খেয়ে, কেকের টুকরো কামড়ে, জাপানি পাখা হাতে নিয়ে বারবার অস্বাভাবিক লম্বা বা ক্ষুদ্রায়তন হয়ে গেছে) ও বিভিন্ন লোকের কাছে তার বিভিন্ন পরিচয় থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে।

'হ য ব র ল'র 'কি মুশকিল। ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল।' অমনি বেড়ালটা বলে উঠল 'মুশকিল আবার কি? ছিল একটা ডিম, হয়ে গেল দিব্যি একটা প্যাঁকপেঁকে হাঁস। এ তো হামেশাই হচ্ছে।' আমি খানিক ভেবে বললাম 'তাহলে তোমায় এখন কি বলে ডাকব?

তুমি তো সত্যিকারের বেড়াল নও, আসলে তুমি হচ্ছ রুমাল।' বেড়াল বলল 'রুমালও বলতে পার, চন্দ্রবিন্দুও বলতে পার'।" এই অংশটিও আমাদের বক্তব্যকে ফুটিয়ে তুলছে, অর্থাৎ কারুরই কোন স্থির সনাক্তকরণ ঘটছে না।

যেহেতু অন্যান্য শিল্পবোধের মত পূর্বপরিকল্পিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাস্রোতকে সে হাজির করে না, বরং শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করে, তাই অ্যাবসার্ড তথাকথিত যুক্তিশৃঙ্খলের বদলে (যা কেন্দ্রাভিগ কোন স্থির অস্তিত্বের অভাবে আজ অর্থ-হীন) মূর্ত ভাবরূপের ভাষায় কথা বলে। সেজন্য তথাকথিত 'দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ নাটকীয়তা', 'যৌক্তিকতা', 'ঔচিত্যবোধ' বা 'সমস্যা-সমাধান' প্রভৃতির বদলে এতে শুধু মানবজীবনের আপতিক উপস্থিতিকেই ফুটিয়ে তোলা হয়। এই শুধু-বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় একই জীবনের যে বিভিন্ন খণ্ডিতমূর্তি, তাকে অস্তিত্ববাদের দর্শনেও ফোটানো হয়েছে; অবশ্যই অন্য ভাবে, অন্য সূত্রে, অন্য উদ্দেশ্যে।

অনেকে মনে করেন যে আমাদের অনুভূতিগুলি প্রত্যক্ষত কতকগুলি রূপাকৃতির জন্ম দেয়। বিশ্লেষণী চিন্তার মাধ্যমে তাকেই আমরা সাধারণ প্রকাশভঙ্গিতে অনুবাদ করি। সৃষ্টিশীল অনুভূতিপ্রবণতা এইভাবে বিশ্লেষণী যুক্তিপ্রবণতার দ্বারা প্রভাবিত, বাধাপ্রাপ্ত ও খণ্ডিত হয়। এ যেন খানিকটা লিরিক কবিতা ও গদ্যপ্রবন্ধের স্বভাবসুলভ বিভিন্নতা ও তা থেকে উৎপন্ন দ্বন্দ্বের মত। অ্যাবসার্ড, এক অর্থে, কাব্যিক এই রূপপ্রকাশকেই বিশিষ্ট মাত্রা ও ভাষা দেয়। তখন তার গদ্য-ভাষাও কোন কোন ক্ষেত্রে গদ্যের স্বভাবচ্যুত হয়ে যুক্তিশৃঙ্খল, বিশ্লেষণী দক্ষতা বা বিবরণী প্রতিভার বদলে শিল্পীর মনোজগতের একান্ত প্রত্যক্ষ, কোন কোন ক্ষেত্রে অরূপ চিন্তা ও রূপাকৃতির স্বভাব-বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। তথাকথিত ভাষায় প্রকাশের বাইরের এই সত্যকে অ্যাবসার্ড ধরে রেখেছে : তার ঐ ধারণ-ভঙ্গিমাই অ্যাবসার্ড শিল্পের স্টাইল।

এই প্রসঙ্গে 'হ য ব র ল'র ন্যাড়ার গাওয়া "লাল গানে নীল সুর হাসি-হাসি গন্ধ" লাইনটিকে নেওয়া যেতে পারে। গানের সুরের বর্ণচিন্তা সচেতনভাবে আমরা করি না; তা থেকে যে গন্ধ বেরিয়ে আসতে পারে, তাও যুক্তিপূর্ণ আমাদের মন মেনে নেয় না। সুরের জালে অনেকেই ছবি আঁকি, তখন তাতে বর্ণের প্রলেপও লাগাই, কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে তাকে ব্যক্ত করি কি?

কিংবা 'অ্যালিস'স অ্যাডভেঞ্চারস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষে কথা বলে' বেড়াল যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল ও তার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক যখন বললেন "and this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail and ending with the grin which remained some time after the rest of it had gone", তখন আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে যদিও অবয়বহীন এই হাসিটুকু আমাদের অবচেতন মনের দৃশ্যের জগতে অনেকক্ষণ ঝুলে থাকতে পারে, বাস্তবিক প্রথাগত কাহিনীতে বা যুক্তিপূর্ণ ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। কবিতার বিষয়ভুক্ত এই নিরালম্ব মুচ্‌কি হাসিটুকু উদ্ভটের দিগন্তে চিরতরে ঝুলে রইল।

ইতিপূর্বে দেখেছি যে অ্যাবসার্ড শিল্পের মত সুকুমারের বিভিন্ন কবিতায়, নাটকে, কাহিনীতে মনুষ্য-ব্যবহারের অসং-লগ্ন, অসংগত দিকগুলিকে বাড়িয়ে বিকট করে দিয়ে পাঠককে কীভাবে সচেতন করা হয়। ভাষার ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। শ্রীয়রের ছড়ায় বা হ্যামটি ডাম্‌টির জগতে, আসলে ইতিপূর্বে প্রকাশিত চর্বিত চর্বণের ভাষাকে ও চিন্তাকে সূক্ষ্মভাবে ভ্যাঙানো হয়েছে। অথচ এই ভাষাই বর্তমান পৃথিবীতে স্থূল ও প্রবল প্রতাপ দেখাচ্ছে। এই নির্বোধ, সন্তুষ্ট, চেতনাহীন বিশ্বের বিকট ভাষাকে অ্যাবসার্ড শিল্পে বিকটতর করে দেখিয়ে পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা চলে—খানিকটা শক্‌-থেরাপির মত।

সাধারণত কাহিনীর কমিক চরিত্রের সঙ্গে আমরা নিজেদের যুক্ত করি না। ভাঁড় মঞ্চে পোশাক খুললে আমরা হাসি। যদি তার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতাম, লজ্জায় মাথা কাটা যেত। অ্যাবসার্ড কাহিনীতে এই কমিক উপাদান আপাতত থাকে বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য আর তামাসা নয়। জীবনের উদ্দেশ্যহীন ভাঁড়ামিকেই সে ফুটিয়ে তুলতে চায় বিকটতর রূপের সাহায্যে। তাই এই ধরণের কাহিনীতে ঠাট্টা ও গাম্ভীর্য, কমেডি ও ট্র্যাজেডির উপাদান মিশে থাকে।

'হ য ব র ল' বা হেশোরামের কাহিনীতে যে বিকট বা

অদ্ভুত চরিত্রগুলিকে পাই, তাদের উৎসমুখে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের জীবনের অসঙ্গত, অন্যায় ও বিকট ব্যবহার বা প্রতিক্রিয়ার মিছিল। 'আবোল তাবোল'-এর বিভিন্ন অদ্ভুতুড়ে প্রাণীর উৎসমুখও যে সেইদিকে, তা-ও তখন মনে হয় আমাদের। মূলে যা-ছিল চরিত্রের মুদ্রাদোষ-ঘটিত অতিরেক, তাকেই একটু বাড়িয়ে শুধু অতিরেক-জাত ব্যক্তিত্বের অংশটিকেই যখন প্রাণ দেন লেখক, তখন তা আরও অদ্ভুত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। দর্শনের দিক থেকে তা যদি শিল্পীর সচেতনতাসঞ্জাত হয়, রসের বিচারে তা আপাতত 'হাস্য' ও 'অদ্ভুত'-এর মাত্রাকে ছুঁয়ে থাকে। অ্যাবসার্ডের দর্শক বা পাঠক সচেতনতার এই স্তরে এসে বর্তমান জীবনযাপনের অ্যাবসার্ড দিকটির প্রতিই হেসে ওঠে—বুঝে বা না-বুঝে।

পার্থক্যের পরিখা

কিন্তু শিল্পে প্রকাশিত ফ্যানটাসি বা অ্যাবসার্ড বা ননসেন্সের সঙ্গে বাস্তবিক ঐ মনোভঙ্গির পার্থক্যের পরিখা থেকেই যায়। প্রথাভুক্ত রচনায় লেখক সর্বদা নিজের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও পূর্বতন শিল্পসৃষ্টির উপর নির্ভর করতে পারেন। কিন্তু এই বিশেষ ধরণের শিল্পে তাঁকে সর্বদাই নতুন করে শিল্প-কল্পনা করতে হচ্ছে, যা প্রথাগত ব্যবহারিক জীবন বা জীবনভাষ্যের বাইরে অবস্থিত। এই সঙ্গেই তাঁকে বানাতে হচ্ছে এক নতুন জগৎ—যা-কিনা আসলে বর্তমান বিশ্বেরই ব্যঞ্জিত প্রতিভাস।

মনে যা এল, তাই যদি লেখা যায়, তবে তা পাগলামির লিখিত প্রকাশ হতে পারে, উদ্ভট শিল্প তাতে রচিত হয় না। কারণ তাহলে তাতে বর্তমান জগতেরই খণ্ডিত এক-টুকরো পাগলামি প্রকাশ পাবে, কিন্তু এই পৃথিবীর উদ্দেশ্যহীনতার সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি—যা উদ্ভটে প্রত্যাশিত—পাওয়া যাবে না।* কারণ আসলে তো উদ্ভট শিল্পেরও উদ্দেশ্য আছে। বর্তমান বিশ্বের উদ্দেশ্যহীন, খণ্ডিত, পারম্পর্যহীন বেঁচে-থাকাকেই সে সম্পূর্ণত প্রকাশ করতে চায়।

অ্যাবসার্ডের এই দর্শন ও রসরূপকে অ্যাবসার্ডের সমর্থক তাত্ত্বিকেরা অভিন্ন বলে মনে করেন। আমরা তা মনে করি না। 'হ য ব র ল' ছাড়াও পরশুরামের 'দক্ষিণ রায়' গল্পটিকে এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। প্রকাশরূপের ও রসরূপের উদ্ভটত্বাদের জন্য দুটিকেই ফ্যানটাসি বলে মনে হয়। কিন্তু একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখা যায় যে 'হ য ব র ল'-এ মাঝে-মাঝেই যে-মন উঁকি মেরেছে, সে বাস্তবজীবনের যাবতীয় অসঙ্গতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল। খেয়ালখুশীতে পাল তুলে 'হ য ব র ল' যখন নীল আকাশের গায়ে উড়ে যায়, তখন প্রাথমিক ভাবে অনবদ্য ফ্যানটাসির উদাহরণ হিসাবেই তাকে ভাবতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সেখানেও মাঝে-মাঝে সমালোচক-মন ভূমিতে নেমে এসেছে। এই প্রসঙ্গে 'হ য ব র ল'র বিচার-দৃশ্যের দু-এক স্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে।

'দক্ষিণ রায়' গল্পেও এই ব্যাপার ঘটেছে। নানাবিধ চোরা কারবারের মালিক অসৎ বকুলাল দত্ত। সমাজকে ফাঁকি দিয়ে যেনতেন মানুষের ঘাড় মটকে বাঘের মতই সে শোষণ করেছে নিরপরাধের রক্ত অর্থাৎ তার প্রাণশক্তি। ফলে "বাবা দক্ষিণ রায় তাঁর ল্যাজটি চট্ করে বকুবাবুর সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে বকুলাল ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করলেন।" প্রকৃত জীবনে যে-জীবনযাপন ছিল বিকট, অ্যাবসার্ডরূপের গল্পে তাকেই বিকটতর করে প্রকাশ করা হল। বকুবাবুর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ ব্যাপারটা আলাদা করে দেখতে ফ্যানটাসির মত, কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্যের দিক থেকে ভাবতে গেলে গল্পটিকে অ্যাবসার্ড শ্রেণীর উদাহরণ বলেই মনে হয়। এইসূত্রে ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র কথাও মনে পড়ে।

বিদেশী কাহিনীর মধ্যে জোনাথন্ সুইফ্‌টের 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স'-কেও মনে না-পড়ে পারে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বহুবিধ কদাচার, ভণ্ডামি ও অমানবিকতাই এক্ষেত্রে লেখকের আক্রমণের বিষয়। তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আবহাওয়া ছিল প্রতিহিংসাপরায়ণ। ফলে খোলাখুলি লেখা সুইফ্‌টের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি বেছে নিলেন এক উদ্ভট কাহিনীকে—যার শিল্পিত আবরণীর আড়ালে দাঁড়িয়ে লেখক যুদ্ধ চালালেন: '...the chief end I propose to myself in all my labours is to vex the world rather than divert it···without hurting my own person...' (Letter to Alexander Pope, Sept. 29, 1725)। 'Down the world। I am not content

with despising it, but I would anger it, if I could with safety. I wish there were an hospital built for its despisers, where one might act with safety'. (Letter to Pope, Nov. 26, 1725. Gulliver's Travels / Swift / Ed. by R. A. Greenberg, p. 264) এই ধ্বংসের ইচ্ছা ও নিজেকে আড়াল করার প্রচেষ্টার জন্য 'গালিভার্স ট্রাভেলস' নামক রূপকটি উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে সামাজিক ব্যঙ্গ হলেও অসম্ভবের গল্পাঙ্গিকের মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করা হল।

ফ্যানটাসি, অ্যাবসার্ড ও রূপকের চরিত্র ও চেহারা মিলে-মিশে এইভাবে এইধরণের বেশীরভাগ কাহিনী মিশ্র একটি মূর্তি লাভ করে। 'হ য ব র ল'র মধ্যেও এই মিশ্র রসরূপ বিভিন্ন ভাবে মূর্তি পেয়েছে।

'হ য ব র ল'-কে যে আপাতত সমাজসচেতন রচনা বলে মনে হয় না, রূপকথার ভিতরের রূপক নয় বরং পরিবেশের মায়াই যে আমাদের প্রধানত আকর্ষণ করে, 'গালিভার্স ট্রাভেল্‌স'-এর বামন ও দৈত্যদের কাহিনীর আকর্ষণেই যে আমরা অভিনিবিষ্ট হয়ে যাই ; ভণ্ডামির মুখোশ টেনে খোলা নয়, বরং ভবদুলালি ঠাট্টাই যে মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠে, তা লেখাগুলিরই কৃতিত্বের পরিচায়ক। আঙ্গিকের বহিরাবরণ মনোহরণ না করলে রসসৃষ্টির প্রাথমিক দিকটিই উপেক্ষিত থাকে, তখন লেখা হয়ে ওঠে তত্ত্বের সারসংক্ষেপ। শেক্সপীয়রের নাটকের মধ্যে বিভিন্ন চরিত্র যেহেতু জীবনের গভীরতাকে অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ করেছে, তাই চিরন্তন হয়ে উঠে বিংশ শতকের মানুষের কাছেও তা আদরের বস্তু হয়ে থাকছে। কিন্তু তার আপাত-নাট্যরূপটি যদি জমজমাট না হত, তবে এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের দর্শকের কাছে তা প্রবলভাবে আদৃত ও গৃহীত হত না ! বাইরের রূপেও রূপপ্রকাশের মায়ায় শূন্যবাদী চর্যার পদকারেরা ধরা দিয়েছেন, সাধারণ দর্শক বা পাঠক তো দেবেনই।

ফ্যানটাসির শিল্পরূপ এবং স্বপ্ন

দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অবসরে আমাদের মুক্ত মন গগনবিহারে মত্ত হয়। কিন্তু সচেতনভাবেই আমরা তার গতিপথকে অনেকক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করি, তার সীমা নির্দেশ করে দিই। এই কারণে স্বপ্নে তার বিস্তার ঘটে বাধাহীন-ভাবে। ফ্যানটাসির শিল্পরূপ কি বাস্তবজীবনের স্বপ্নের মত ? হ্যাঁ এবং না। শিল্পী যখন তাঁর অবাধ কল্পনার বিস্তৃতি ঘটান শিল্পের মধ্যে, তখনও চয়ন-বর্জনের শিল্পসম্মত প্রশ্নটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই প্রশ্ন তথাকথিত বাস্তবতার মাপকাঠিতে কল্পনাকে পঙ্গু করার প্রশ্ন নয়, শৈল্পিক উত্তরণের প্রশ্ন। এছাড়া, যতই না কেন বাস্তব পৃথিবীর নিয়ম লঙ্ঘন করে কাহিনী অসম্ভব-এর রাজ্যে প্রবেশ করুক, ধর্মীয় অলৌকিক বিশ্বাসের কাহিনীতে বা অসুস্থ মনোবিকারের চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে উদ্দাম হয়ে উঠুক কল্পনা, তাকে ফ্যানটাসি বলা চলবে না। কারণ সেখানে ঐ উন্মার্গ চিন্তাই প্রত্যাশিত, নিয়ম—লেখকের কৃতিত্ব নয়।

Encyclopedia Britannica-র 18th Vol-এর 'Types of the Thought Processes' অধ্যায়ের FANTASY শীর্ষক আলোচনায় এ-সম্পর্কে বলা হচ্ছে : When a person who is otherwise awake tends to lose contact with the environment and his thinking proceeds with little or no concern for logical considerations, conditions become favourable for fantasizing. The activity mav also take on a problem-solving character...

মানসিক স্তরের জৈবিক ক্রিয়ায় ফ্যানটাসি কীভাবে ব্যক্তি-গত জীবনের সঙ্গে ইচ্ছা অনিচ্ছার সূত্রে জড়িত, তা এর থেকেই বোঝা যায়। 'হ য ব র ল' ও অ্যালিসের কাহিনীর সূত্রপাতকেও এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

"বেজায় গরম। গাছতলায় দিব্যি ছায়ার মধ্যে চুপচাপ শুয়ে আছি, তবু ঘেমে অস্থির। ঘাসের উপর রুমালটা ছিল ; ঘাম মুছবার জন্য যেই সেটা তুলতে গিয়েছি অমনি রুমালটা বলল 'ম্যাও'।" পাঠক মনে মনে মুচ্‌কি হেসে ধরে নেন যে তৃতীয় বাক্যের থেকেই গল্পের আত্মচরিত্র ঘুম ও জাগরণের মধ্যবিন্দুতে চলে গেছে।

কিংবা অ্যালিসের কাহিনীর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে এসে যখন দেখি : 'She was considering in her own mind

(as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid) whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her'—তখন সহজেই বুঝি যে অ্যালিস ইতিমধ্যেই অর্ধঘুমন্ত অবস্থার মধ্যে চলে গেছে। মানসিক অবস্থার এই প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার পূর্বোক্ত আলোচনা আরো জানাচ্ছে : An example is the drowsy (hypnagogic) period experienced just before falling asleep ; at such times images and apparently at-random thinking may well up and "float" freely.

ঘুমভাঙা ও ঘুমন্তাবস্থার সঙ্গেও বাইরের যোগ থাকে। 'হ য ব র ল' থেকেই প্রথমে ব্যাপারটাকে স্পষ্ট করা যাক :

> এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ 'ব্যা-করণ শিং' বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক চুঁ মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কিরকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজমামার মত হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখলাম, মেজমামা আমার কান ধরে বলছেন, 'ব্যাকরণ শিখবার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে ?'

ব্যাকরণ শিং ছাগল আর বর্ণতত্ত্ব-ভাষাতত্ত্বের ব্যাকরণের মিল বা ছাগলের কান কামড়ানোর সঙ্গে মেজমামার কান-মলা এইভাবে মিলে যায়।

একই ব্যাপার 'Alice's Adventures in Wonderland'-এও :

'At this the whole pack rose up into the air and came flying down upon her : she gave a little scream half of fright and half of anger and tried to beat them off and found herself lying on the bank with her head in the lap of her sister, who was gently brushing away some dead leaves that had fluttered down from the trees upon her face.'

এনসাইক্লোপেডিয়ায় এসম্পর্কেও সপ্রমাণ তথ্য হাজির করা হয়েছে :

Although dreaming largely seems to express intrinsic activity, it can be influenced by external stmuli and is likely to include experiences that symbolize such stimuli. A light tap on the foot of a sleeper, for example, might prompt him to dream of buying a new pair of shoes. (p. 358, 'Types of the Thought Processes', 'Dreaming', Encyclopedia Britannica, macıopaedia/15th Edition)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শুধু ব্যক্তিচরিত্রের আত্মাভিমান নয়, বাইরের ঘটনাও স্বপ্নের মধ্যস্থিত কল্পনাকে প্রভাবিত করতে পারে।

কিন্তু এ তো স্বাপ্নিকের কথা। তার স্বপ্ন যখন ফ্যানটাসির রসে সিক্ত হয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছচ্ছে, তখন পাঠকের প্রতি-ক্রিয়াই বা কীরকম হতে পারে ?

সে যদিও জানে যে গোটা ব্যাপারটাই ঘটছে স্বপ্নের ভিতর, তথাপি কাহিনীর ঐ বিচরণভূমি তার কাছে বাস্তব জীবনের জাগরূক অবস্থার বিশিষ্ট (এক্ষেত্রে ফ্যানটাসির) রূপ ধারণ করে হাজির হচ্ছে। পাঠক জানে যে বস্তুত ঐ স্বপ্ন-দেখা বা নিদ্রা-টুকুই বাস্তব। এইবার সে বাস্তবাতীতের রাজ্যে প্রবেশ করছে।

'ননসেন্স' এবং 'গ্রাউণ্ড রুল্‌স্‌'

বিংশ শতকে এসে মানুষ বিজ্ঞানের জয়যাত্রার এমন একটি স্তরে উপনীত হয়েছে, যেখানে অসম্ভব-জাত বিস্ময়বোধ তার হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে। 'Through the Looking Glass'-এ Alice যখন বলছে :

> "Oh Tiger-lily !" said Alice, addressing herself to one that was waving gracefully about in the wind, "I wish you could talk !"
> "We can talk", said the Tiger-lily, "when

there's anybody worth talking to".
Alice was so astonished that she couldn't speak for a minute : it quite seemed to take her breath away' (p. 127, Purnell Publication).

কাহিনীর এই অংশের ভাববিকাশে তিনটি স্তর স্পষ্ট। Tiger-lily ফুলগাছ, কথা বলতে পারে না। যদি পারত। প্রথম স্তরে অ্যালিসের এই ভাবনা স্বাভাবিকত্বের জগৎ থেকে উত্থিত হল। টাইগার-লিলি জানাল যে সে কথা বলতে পারে। এই অসম্ভব কথাটিই ভাবের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে এসে অ্যালিস বিস্মিত হচ্ছে। প্রথম দুই স্তরের পরস্পর-বিরুদ্ধ বৈপরীত্য-হেতু অ্যালিসের প্রত্যাশিতের জগৎ ভেঙে যাচ্ছে বলেই সে বিস্মিত হচ্ছে।

এই প্রত্যাশাকেই অন্যভাবে পরিপ্রেক্ষিত বলা যেতে পারে। স্বাভাবিক জগতে প্রতিটি বস্তুর গ্রহণ ব্যাপারে এক-একটি পরিপ্রেক্ষিত থাকে। তার ভূমিটি সরে গেলেই অসম্ভবের রাজ্যে উপনীত হই আমরা। এই প্রত্যাশার জগৎ বা পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মকেই Eric Rabkin তাঁর 'The Fantastic in Literature' গ্রন্থে 'Ground rules' বলেছেন। এই সম্পর্কিত ধারণা, সুতরাং, sense ও nonsense, উভয়-ক্ষেত্রেই থাকা প্রয়োজন। 'Ground rules'-কে টিকিয়ে রাখলে sense বজায় থাকে, তাকে অস্বীকার করলেই nonsense আবির্ভূত হয়।

'হ য ব র ল'-র একটি অংশ উদ্ধার করলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

কে যেন ভাঙা ভাঙা মোটা গলায় বলে উঠল 'সাত দুগুণে কত হয়?' আমি বললাম 'সাত দুগুণে চোদ্দ'। কাকটা অমনি দুলে দুলে মাথা নেড়ে বলল 'হয় নি, হয়নি, ফেল্।' আমার ভয়ানক রাগ হল। বললাম 'নিশ্চয় হয়েছে। সাতেক্কে সাত, সাত দুগুণে চোদ্দ, তিন সাত্তে একুশ।' কাকটা কিছু জবাব দিল না, খালি পেন্সিল মুখে দিয়ে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।' আমি বললাম, 'তবে যে বলছিলে সাত দুগুণে চোদ্দ হয় না?, এখন কেন?' কাক বলল 'তুমি যখন বলছিলে তখনো পুরো চোদ্দ হয় নি। তখন ছিল তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই। আমি যদি ঠিক সময়ে বুঝে খাঁ করে ১৪ লিখে না ফেলতাম, তাহলে এতক্ষণে হয়ে যেত চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই।'

কাহিনীর এতটা অংশ ইচ্ছা করেই উদ্ধার করা হল। এর প্রতিটি অংশের ও ভাবনাপ্রবাহের প্রতিটি স্তরের অসঙ্গতি ('Ground rules'-কে অস্বীকার) প্রত্যাশার জগৎ থেকে আমাদের ক্রমাগত দূরে ঠেলে দেয়। সাত দু'গুণে চোদ্দর 'Ground rules' বা প্রত্যাশার জগৎ বৈপরীত্যের মত হাজির থেকে ফ্যানটাসির উন্মার্গ চিন্তাকেই স্পষ্টতর করে।

বলেছি যে 'হ য ব র ল'র ফ্যানটাসির কল্পনা সর্বত্র ছড়িয়ে থাকলেও মাঝে-মাঝেই এতে লেখকের সমাজ-সচেতন মনটি উঁকি মেরেছে। উদ্ধৃত অংশে কিছুক্ষণ আগেই আমরা দেখেছি যে সময়ের সামান্যতম হেরফেরে 'চোদ্দ' হয়ে যেতে পারে 'তেরো টাকা চোদ্দ আনা তিন পাই' বা 'চোদ্দ টাকা এক আনা নয় পাই'। এই ঘটনাটি কি প্রশ্ন তুলছে না মানবজীবনের তাৎক্ষণিক জীবনযাপন সম্বন্ধে? এই মুহূর্তের আমি আর কিছুক্ষণ পরের আমি কি একই লোক? এমন কোন স্থির উদ্দেশ্য ও বিশ্বাস কি আমার জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যা জীবনের প্রতিটি সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টার দিনযাপনকে অখণ্ডিত সম্পূর্ণতায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে অর্থবহ?

আত্মজিজ্ঞাসার ও চারিপার্শ্বের মানবজীবনের দিকে দৃষ্টিপাতের পর হতাশ আমাদের মনে হয় : না, পারে না। অ্যাবসার্ড শিল্পের মতই সেক্ষেত্রে 'হ য ব র ল'র এই অংশটি উদ্দেশ্যহীন জীবনের তাৎক্ষণিকতাকে আরও প্রকটরূপে হাজির করে। আমাদের এই জীবনটাই যে 'হ য ব র ল' হয়ে গেছে, তখন আমরা ভেতরে-ভেতরে তা টের পেতে থাকি।

সাহস ও চারিত্র্য

সুকুমার-সাহিত্য পাঠের পর শিল্পীর সমগ্র, জীবন্ত ও অন্তরঙ্গ ছবিটি পাঠকের মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। কোন তত্ত্ব-ব্যাখ্যা নয়, বাক্যের কায়দা নয়—অমলিন, সুকুমার ও সাহসী একটি মনই আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকে। সৌকুমার্যে ভরা ছিল

বলেই সুকুমার রায়ের মন পরিপার্শ্বের যাবতীয় ক্লিন্নতা, অবিচার ও অসঙ্গতিকে নিজের ঢঙে ঠাট্টা করেছে। এবং ভিতরে সাহস ও চারিত্র্য না থাকলে ঐ ঠাট্টা অগভীর ফাজলামিতে পরিণত হত, ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না। যাঁরা তাঁকে সরাসরি দেখেছেন, তাঁর ব্যবহারের আস্বাদ পেয়েছেন, স্মৃতিকথায় মানুষ-সুকুমারের মনটিকে এঁকেছেন—পাঠক সেই মনটিকেই পেয়ে যান তাঁর ছড়ায়, নাটকে, গল্পে।

যে-দুটি গুণের জন্য সুকুমার রায় বিশেষ ভাবে স্মরিত হন তা হল তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা ও কল্পনার মুক্তি। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে এই দুই ব্যাপারে তাঁর অবাধ ক্ষমতার মূলেও ঐ সাহসের প্রেরণা কাজ করে গেছে। প্রবলভাবে কল্পনা করার জন্যও তীব্র শক্তির প্রয়োজন, দ্বিধাহীন সাহসের প্রয়োজন। এই সাহসের বলে বলীয়ান হয়ে তাঁর এ-যাবৎকার সামাজিক-ধর্মীয়-ব্যক্তিক পটভূমিকার বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছিল তাঁকে, বলতে হয়েছিল 'আমার মনের অনেক অনেক cherished illusions সব ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে—যে "আনন্দ" "আনন্দ" বলে যা-কিছু আমরা বলাবলি করেছি, তার একটাও আমার নিজের কোন কাজে লাগে নি এবং লাগছে না।...আমি কিছুদিন থেকে feel করেছি যে আমার জীবনের মধ্যে একটা বড় crisis বা turning point আসছে।...ইচ্ছা আছে আগামী সপ্তাহে executive committee-কে আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করব, তারপর resignation দেব।...আমার মনে হচ্ছে কি একটা drastic irrevocable step আমি already নিয়েছি...' (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা চিঠি, ২৩শে আগস্ট ১৯২০)। A. M. Bose memorial meeting-এ এই অবস্থার চূড়ান্ত রূপ দেখা দিল।

'সৎপাত্র', 'রামগরুড়ের ছানা', 'নারদ নারদ', 'একুশে আইন' প্রভৃতি কবিতায় যে ব্যঙ্গাত্মক সমালোচক-মনের সাহসী প্রকাশ লক্ষ্য করি, তাকেই অন্যভাবে দেখা গেছে পাগলা দাশুর নিজস্ব শিক্ষাদান-প্রক্রিয়ার মধ্যে—উদ্ভটের আড়ালে সেই সাহস থেকেই জন্ম নিয়েছে 'হ য ব র ল'র বিচারদৃশ্য। আবার 'অবাক জলপান' নাটিকা থেকে ভাবতে হয় আমাদের : তৃষ্ণার্তকে জল বিষয়ে গল্প করা যেমন অপরাধ, ক্ষুধার রাজ্যে খাদ্য-সমস্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ, সিম্পোসিয়াম-সেমিনার বা ঐ বিষয়ে ফাইলপত্রের দীর্ঘসূত্রিতায় তাকে আবদ্ধ করে রাখার মধ্যেও সমান অপরাধ লুকিয়ে আছে।

আর একটা কথা। সুকুমার রায় যে এখনও ছোটদের মনের রাজা, তার কারণ কী? তার কারণ কি শুধু এই যে নিজের মনের মধ্যে অমলিন সৌকুমার্যকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন বলেই ছোটরা তাঁকে নিজেদের মত ভেবে ডেকে নেয়? প্রত্যাশিতের জগৎ ডিঙিয়ে, নীতি ও কর্তব্যের বেড়া টপকে বালক ক্রমাগত হাজির হতে চায় উদ্দেশ্যহীন মজা ও রোমাঞ্চের জগতে। বাস্তবে সে সফল হয় না। প্রথম বাধা, গোমড়ামুখো বড়দের শাসন; দ্বিতীয় বাধা, নিজস্ব কল্পনার অভাব। সুকুমার এই দুই বাধা তাদের হয়ে অতিক্রম করে দিয়েছেন। এই হিসাবে তিনি ছোটদের মনের সঙ্গী, কিন্তু বয়স্ক-সঙ্গী।

আমার তো মনে হয়, সত্য অর্থে সুকুমার এতই বয়স্ক মনের ছিলেন যে নিজের চারপাশে তাকিয়ে তথাকথিত বড়দের আত্মকলহমুখর, অদূরদর্শী, অগভীর কার্যকলাপকে তাঁর প্রকৃত ছেলেমানুষী বলে মনে হয়েছিল, আর তাই 'চলচিত্তচঞ্চরি'র বিপুল ঠাট্টার আয়োজন পূর্ণ করে তুলেছিলেন তিনি। অভিভাবকের মতই উপর থেকে সস্নেহে তিনি জগতের অন্তঃসার-শূন্য ব্যাপৃত কলহমুখরতাকে দেখেছিলেন।

'আবোল তাবোল'-এর শেষ ছড়াতে 'মেঘ মুলুকে' উঠে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ স্নেহভরে এই জগতের কর্ম-কাণ্ডকে দেখছেন লেখক। দেখার ঐ ভঙ্গিতে ও স্থানগত দূরত্বে এক ধরণের কৌতুকবোধই জন্মাচ্ছে। ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত থাকলে এর থেকেই ক্রোধ বা বিষণ্ণতা বা প্রতিযোগিতামূলক আবহাওয়া তৈরী হতে পারত।

অনুপম মজুমদার

সময়ের আয়নায় আবোলতাবোল

বঙ্গভঙ্গ রদের স্বদেশীযুগ শেষ হবার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কয়েকটি বছর 'আবোলতাবোল'-এর সৃষ্টিকাল ; সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পিছু হটাই সে সময়ের প্রধান দিক। সেই অসময়ের আজগুবি, উদ্ভট ও অসম্ভব দিকগুলো আবোলতাবোল'-এ প্রতিফলিত হয়েছে।

মলাট্‌টা ওল্টাতেই চোখে পড়বে নিষ্পত্র শাখাহীন দুটো গাছের গুঁড়ির মাথায় সরু একটা ডাল আটকানো—দেখতে অনেকটা গেটের মতন। চারজন লোক ভারী গম্ভীর মুখে একটা সাইনবোর্ড টাঙাতে ব্যস্ত। ১৯২৩-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে এ অবস্থায় থেমে আছে।

আমরা অর্থাৎ শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালীরা যখন খুশি ঐ গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছি। মনে রাখতে হবে ঐ গেট দিয়ে ঢোকার-ও একটা নিয়ম আছে। নিয়মটা হল, ডান দিকের খুঁটিতে ঝোলানো নোটিশটা পড়ে নেওয়া। প্রায় ষাট বছর আগে লেখা নোটিশ, একটু অস্পষ্ট। অনুমানে বলা যায়, কথাগুলো এরকম—"যাহা আজগুবি যাহা উদ্ভট যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়া এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং যাঁহারা এ রস উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"

"পুস্তক" আর "বই" শব্দ দুটো কেউ যদি ভুলবশত 'জগৎ' এবং 'দেশ' বলে পড়ে ফেলেন তাহ'লে ব্যাকরণের ভুল হ'লেও বোঝার ভুল হবে না। এরকম ভুল অবশ্য আমাদের। হামেশাই হয়। যেমন এখনো বলাই হয়নি যে সাইনবোর্ডের লেখাটা "আবোলতাবোল" এবং ছবির বাঁ দিকে দুটো ইংরেজী অক্ষর আঁকা আছে—'SR'—অর্থাৎ বাংলাদেশের এক শিক্ষিত নাগরিক কবি সুকুমার রায়।

আর একটা কথা—দুই 'আবোলতাবোল' কবিতার ফ্রেমে বাঁধানো সুকুমারের স্বনির্বাচিত কাব্যগ্রন্থ আবোলতাবোলের জগতে, খেয়াল রসের দেশে ঐ গেট দিয়ে প্রবেশ করার আগে "গ্রন্থকারের কৈফিয়তে" লেখা কথাগুলো মনে রাখা খুব জরুরী। তার প্রথম প্রমাণ, আবোলতাবোলের জগতে ঢোকার পরে একবার পিছন ফিরলেই দেখা যাবে নোটিশ-টাঙানো যে খুঁটিটা এতক্ষণ ডানদিকে ছিল সেটা এখন বাঁ দিকে। অর্থাৎ, গেটের একপাশে আমাদের চেনা পৃথিবী, অন্যদিকে খেয়াল রসের আবোলতাবোল-জগৎ। ঐ জগতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদেরও তাই বারবার চেনা পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকিয়ে জেনে নিতে হবে আবোলতাবোলের পরিচিত ঠিকানা।

ব্যাকরণ না-মানা

'আবোলতাবোল'—যে কবিতার শিরোনাম হিসেবে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল (সন্দেশ/ফাল্গুন ১৩২১), আমাদের কাছে

"কাঠবুড়ো' নামে তার সমাদর। ঠিক তার আগের সংখ্যার সন্দেশে বোধহয় আবোলতাবোলের আগমনী হিসেবে 'খিচুড়ি' প্রকাশিত হয়েছিল।

হাঁস ছিল, সজারু, (ব্যাকরণ মানি না),

হয়ে গেল 'হাঁসজারু' কেমনে তা জানি না।

পাঠককে অপ্রস্তুত করে দেবার উপকরণ এখানে অনেক। যোলটা জীবজন্তুর ইচ্ছে অনিচ্ছের তোয়াক্কা না করে আজব "সন্ধি" ঘটান হ'ল। আটটা দোআঁশলা শরীরের মন-ও দোআঁশলা। "গিরিগিটিয়া"র শঙ্কা : "পোকা ছেড়ে শেষে কিগো খাবে কাঁচা লঙ্কা ?" কারো বা এই চেহারায় "মনে ভারি ফুর্তি"।

হাতিমি আর সিংহরিণের ছবিটা শুধু সন্দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সমস্যা ও ইচ্ছেপূরণের জন্যে আন্তরিক মারামারির খবর সুকুমার আবোলতাবোল কাব্যগ্রন্থ প্রকাশকালে সংযোজন করেছিলেন শেষ চার পংক্তিতে। যেখানে হাতিমির দ্বন্দ বস্তুত দুজনের বেঁচে থাকার প্রয়োজনজাত —"তিমি ভাবে জলে যাই" আর "হাতি বলে, এই বেলা জঙ্গলে চল ভাই।" সিংহরিণের অবশ্য কোন সমস্যা নেই। দুর্বল হরিণ পরাক্রান্ত সিংহরাজকে তার সিং দুখানা দান করেই যেন কৃতার্থ। ছবিতে কিন্তু মুখটাও হরিণের মত—বেচারা এখন গরুবাছুরের সাথে ঘাসপাতা খাবে কিনা কে জানে।

দোআঁশলা জীবের এমন সম্ভাবনা আজগুবি হলেও পাঠক অপ্রস্তুত হয় না। স্পষ্ট যুক্তি না হোক যুক্তির একটা আন্দাজ আমাদের চেতনার কোন গভীরতর তলে আপনাআপনি বহে যায়। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের কথা কারো মনে হতে পারে, কারো আবার "প্রফেসর হিজি বিজ্ বিজ্"-এর কাণ্ডকারখানা মনে পড়তে পারে। আমরা তো বিলক্ষণ জানি যে গোপালপুরের সমুদ্রসৈকতে এই প্রফেসরের কল্পবিজ্ঞানের (না ক্যানটারির ?) ল্যাবরেটরিতে প্লাস্টিক সার্জারি করে হামেসাই এরকম জীব তৈরী হয়। তারপরেও খেয়ালরসের কড়াইতে না রাঁধলে খিচুড়ির স্বাদ খোলে না।

বলা দরকার, সেকালের সন্দেশ পাঠকদের কাছে এ কবিতার অন্য একটা মাত্রা হয়ত ধরা পড়েছিল। এধরণের আজগুবি ব্যাপারে আর-একটু আগে থেকে তাঁরা সম্ভবত অন্যভাবে প্রস্তুত হতে পেরেছিলেন। একই বছরের শ্রাবণ সংখ্যার সন্দেশে একটা ধাঁধা ছিল—

"ব্যাকরণ যে কাজ করতে বলে না সে কাজ যদি কর তার ফল ভারী উৎকট হতে পারে। সে যে কেমন উৎকট তার নমুনা দেখ—

ক্যারামারাহারাহাটা

ঘ্যাকামারাতারাদারা

নারাচারা হা হা হা হা

এ ভূতের হাসি নয়, রাক্ষসের গানও নয়। তোমার আমার ভাষায় সহজ কথায় সুমিষ্ট সংবাদ লেখা হয়েছে। বল দেখি সেটি কি সংবাদ ?"

ব্যাকরণ না-মানার কুফল দেখাতে উপেন্দ্রকিশোর ধাঁধাটা তৈরী করেছিলেন—উত্তর কেউ দিতে পেরেছিলেন কিনা জানা যায় না। পরের সংখ্যায় উত্তর ছাপা হয়েছিল এই রকম—

"বাংলা শব্দের সন্ধি করিতে নাই। গতবারের সেই উৎকট কথাগুলো আর কিছুই না, কতকগুলো বাংলা কথার সন্ধি করার ফল অমন হ'য়েছে। সন্ধি ভাঙলে এমনি হয়—

কি আর আমার আহার ? আহা, আটা

ঘী আক আম আর আতা আর আদা আর

আনার আচার আ হা হা হা হা।"

আবোলতাবোলের বেশীর ভাগ কবিতাই দৃশ্যপাঠ্য—শুধু পড়ার জন্যে নয়, দেখার জন্যেও বটে। 'খিচুড়ি'র আটটা দোআঁশলা উদ্ভট প্রাণীর অস্তিত্ব আমরা কবিতা পড়ে শুধু অনুভব করি না, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখতে পাই। আমাদের কল্পনা-ও আর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। অথচ ছবিগুলো বাদ দিয়ে, জীবজন্তুগুলোর স্বাভাবিক (?) সমস্যাগুলোর প্রতি একটু কম সহানুভূতিশীল হতে পারলে হয়ত' যোলটা জীবজন্তুর বাংলা নাম বা শব্দকে আটটা জোড়ে বাঁধার মজাটাই প্রধান হয়ে উঠত। মনে রাখতে হবে, কবিতার প্রথম ছত্রেই সুকুমার সদর্পে ঘোষণা করেছেন "ব্যাকরণ মানি না"।

ব্যাকরণ না-মানার উৎকট কুফল দেখাতে উপেন্দ্রকিশোর যোলটা শব্দকে (হাস্যধ্বনিগুলো বাদ দিয়ে) সন্ধিবদ্ধ করেছিলেন ধাঁধায়, আর ব্যাকরণ না-মানার ঘোষিত উদ্দেশ্য নিয়ে যোলটা বাংলা শব্দ আটটা জোড়ে বেঁধে সুকুমার তাঁর

আজগুবি, উদ্ভট ও অসম্ভবের "আবোলতাবোল" পর্যায় শুরু করেছিলেন।

আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা

'আবোলতাবোল'-এর আভিধানিক অর্থ যা-তা-বোল, অর্থাৎ প্রলাপ বকা। অভিধানোক্ত এই অর্থ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অচল। প্রচলিত আভিধানিক বা ব্যাকরণগত ধ্যানধারণাগুলো সুকুমার মানেন নি। সমাজের সারথীদের ফতোয়ার ব্যাকরণ, ভাষার ব্যাকরণ অথবা সাহিত্যরসের শাস্ত্রীয় ব্যাকরণ—কোনটাই যে তিনি মানতে রাজী ছিলেন না তার প্রমাণ 'আবোলতাবোল'-এর ছেচল্লিশটা কবিতা।

বিদেশীদ্রব্য বয়কট এবং স্বদেশীদ্রব্য কেনার ডাক দেওয়া হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এক ঢিলে দুই পাখী মারা ফন্দি—ইংরেজ রাজার বিরুদ্ধে লড়াই আর স্বদেশী পণ্যের বাজার পাওয়া। প্রথম পাখীটা ফসকে গেল আইনের তেজে, পুলিশী লাঠির ভয়ানক ব্যবহারে এবং নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য বা ঠিকানাটা ঠিক-ঠিক জানা না-থাকায়। অন্য পাখীটা ধরতে গিয়ে দেখা গেল পাখীটাই নেই। বিলিতি জিনিসের সমকক্ষ, স্বদেশী উদ্যোগে অর্থাৎ দিশি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের দ্বারা তৈরী জিনিসই নেই। গোড়ার দিকে উৎসাহের জোরে একদল শহুরে শিক্ষিত ভদ্রলোক চেষ্টাবান হয়েছিলেন—কেউ জাহাজ, কেউ দেশলাই, কেউ পেয়ালা, কেউ কাপড়, কেউ কলুর ঘানিগাছ তৈরী করতে।

জাহাজ একদিন পদ্মার চরে আটকে গেল, আর জলে ভাসে নি। দেশলাই জ্বালার জন্যে কাছাকাছি আগুন রাখার দরকার হত; কলুর ঘানিগাছের জটিল সূত্রটা কাজে লাগানো হ'ল না কেন ঐ নিয়ে অনেক পরে ১৩২৫-এ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকাকে আক্ষেপ করতে দেখা যায়। সুকুমারের ভাই সুবিনয় যে নিত্যব্যবহার্য বস্তুগুলো সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন সে-সম্পর্কে লীলা মজুমদার লিখেছেন—"কোত্থেকে সব খেরোর মতো মোটা খড়খড়ে কাপড়, ত্যাড়া-বাঁকা পেয়ালা পিরিচ এনে দিত। পেয়ালাগুলোতে আবার চা ঢালার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নিতে হত, নয়তো সোঁ সোঁ করে অর্দ্ধেক চা-ই পেয়ালাতে শুষে নিত" (আর কোনোখানে)।

বঙ্গভঙ্গ রদ করার স্বদেশী আন্দোলনে ভাঁটা পড়তে দেরী হয় নি। কিন্তু স্বদেশী শিল্পের উদ্যোক্তাদের সংখ্যা কমে নি। বস্তুত ভারী গম্ভীর এবং স্বদেশপ্রেমে উজ্জ্বল একদল 'মনীষী'র আবির্ভাব হয়েছিল। সত্যি বলতে তাঁরা সেই "সত্যি" গল্পের "প্রফেসর নিধিরামের" মামাতো মাসতুত ভাইয়েরে দল।

তাঁরা "কি করেন?"

"কি করেন আবার কি? আবিষ্কার করেন!"

সুকুমারের গল্পে প্রফেসর আবিষ্কার করেছিলেন "গন্ধবিকট তেল" "কামান" ইত্যাদি, আর আবোলতাবোল কবিতায়—

"কল করেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো—"
('আবোলতাবোল'/সন্দেশ/ফাল্গুন ১৩২২)

যা কিনা, "ঘণ্টা দশেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা"।

মনে পড়ে 'অসম্ভব নয়' কবিতায় নিজের বিকট লম্বা নাকের ডগায় মুলোর ঝুঁটি ঝুলিয়ে সাহেব গাধার পিঠে চেপে বসল আর অলস গাধা নাকের ডগায় ঝুলতে থাকা মুলো ধরার জন্যে আপ্রাণ দৌড়তে লাগল। খুড়োর আজব কলের "সামনে"ও "খাদ্য দোলে যার যে রকম রুচি" এবং—

এমনি ক'বে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,...

হেসে খেলে দু দশ যোজন চলবে বিনা ক্লেশে,...

এ-হেন কল তৈরী করে "অতুল কীর্তি রাখল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো"। কিন্তু কলের বিক্রি-বাটা কেমন হয়েছিল সে খবর আর জানা যায় নি।

ছায়াবাজিকর অবশ্য ছায়া-ওষুধ শুধু আবিষ্কার করেই থেমে থাকে নি। স্ব-উদ্যোগে তৈরী তার "একেবারে দিশি" প্রডাক্ট বিক্রীর জন্যে সুকুমার চমৎকার একটা বিজ্ঞাপনের খসড়া (হ্যাণ্ডবিলও বলা যায়) তৈরী করে দিয়েছেন। ছায়ার ওষুধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছাড়া প্রস্তুত করা সম্ভব নয় একথা কে না বোঝে। এবং বৈজ্ঞানিক উপায়মাত্রই আমাদের দেশে তখন আজগুবি সব কাণ্ডকারখানা।

ক্যামেরায় ছায়া ধরলে সিল্যুয়েট ছবি হয়, তা দিয়ে ব্যবসাও হয় কিন্তু এছায়া রীতিমত তাগ্‌বাগ্ করে ঠিক সময় বুঝে খপ্ করে ধরে সাবধানে "ঘরে পুষে" রাখতে হয়। এবং তা দিয়ে হরেক রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ চিকিৎসা সম্ভব। এ-হেন

ছায়া যে বিদেশী কোন যন্ত্রপাতিতে ধরা যাবে না, স্বদেশী-বৈজ্ঞানিক-প্রক্রিয়ায় "ধামায় চেপে ধপাস করে" ঠেসে ধরতে হয় একথা কবিতার থেকে ছবিতে অনেক বেশী স্পষ্ট।

প্রফেসর নিধিরাম-আবিষ্কৃত গন্ধবিকট তেল একাই একশো—"সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে দেড় দিনে আধহাত লম্বা গোঁফ বেরোয়"। ছায়াবাজিকরের জন্য সুকুমার রায় কর্তৃক প্রস্তুত 'ছায়াবাজি' নামক হ্যাণ্ডবিলে দেখা যাচ্ছে, আজগুবি অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ধরা নির্দিষ্ট স্বদেশী ছায়ার সুনির্দিষ্ট গুণ—

চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।

কিংবা—

আমড়া গাছের নোংরা ছায়া কামড়ে যদি খায়,
ল্যাংড়া লোকের ঠ্যাং গজাবে সন্দেহ নাই তায়।

নতুন জিনিসের কদর বেশী, তার ওপর যদি সস্তা হয় তাহলে তো কথাই নেই। প্রফেসর নিধিরাম-আবিষ্কৃত গন্ধবিকট তেলও "নতুন অথচ সস্তা"। তাছাড়া বাসী হলে সাধারণ খাবার দাবারেও অসুখ হয়। সেখানে ওষুধ যদি টাটকা না থাকে ত' অর্ধেক মাটি। আর বিলিতি ওষুধ মানে সাত সমুদ্দুর পার হয়ে জাহাজে আসা—অর্থাৎ অর্ধেক গুণ তারা পথেই ফেলে আসে। ছায়াবাজিকরের ওষুধের সেটাই সর্বশেষ ও মোক্ষম প্লাসপয়েণ্ট—

পাক্কা নতুন টাট্‌কা ওষুধ এক্কেবারে দিশি—
দাম করেছি শস্তা বড়, চোদ্দ আনা শিশি।

(সন্দেশ/আষাঢ় ১৩২৩)

চোদ্দ আনা শিশি ঠিক কতখানি শস্তা তা এখন একটু ভেবে বার করতে হবে। তবে আনার জায়গায় টাকা ভেবে নিলে ব্যাপারটা বোধহয় বোঝা সম্ভব। স্বদেশী মায়ের দেওয়া এবম্বিধ মোটা কাপড়ের জ্বালায় অস্থির হয়ে অনেকে বিলিতি পণ্যবয়কটের স্লোগানকে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছিলেন। তাঁরা বৃটেনে প্রস্তুত পণ্য বয়কট করে জাপানী পণ্য ব্যবহার শুরু করেন। জাপান এই সুযোগে যে মোটা টাকার ব্যবসা করেছিল, তার হিসেব পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়।

তা বলে সুকুমার স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বস্তুত তিনি নিজেও স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করতেন। কিন্তু স্বদেশী হুজুগের মধ্যে এবং হুজুগ কেটে যাবার পরেও আত্মনির্ভরতার আবেগে যেসব আজগুবি কাণ্ডকারখানা হত, বিশেষত বিজ্ঞান-চর্চার যে ভয়ানক প্রকোপ দেখা দিয়েছিল, সেটা তাঁর চোখে 'আবোলতাবোল কাণ্ড।

'বিজ্ঞান শিক্ষা' (সন্দেশ পত্রিকায় 'বিজ্ঞান পাঠ') কবিতাতে টেলিস্কোপ উল্টে "ফুটোস্কোপ" হয়ে গেছে। এবং স্বদেশী গবেষক একটা বালকের মুণ্ডুর উপর সেই ফুটোস্কোপের সাহায্যে তাঁর জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। বিজ্ঞান পাঠের তৎকালীন স্বদেশী সংস্করণ যে আজগুবিত্বের চূড়া স্পর্শ করেছিল তা বস্তুত এই কবিতার শেষ দুটো পংক্তিতে প্রতিফলিত।

আবোলতাবোল-পর্যায়ভুক্ত কবিতায় প্রচলিত অর্থে humour-এর আবেগপ্রবণ শিথিল হাসির প্ররোচনা নেই বললেই চলে। অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এবং বিশেষভাবেই বুদ্ধিসঞ্জাত তীক্ষ্ণ wit-এর মৃদু হাসিই তাঁর ননসেন্সের রূপাবয়ব। ইংরেজী laughter শব্দটা সুকুমারের আবোল তাবোল প্রসঙ্গে যে কখনো-সখনো প্রযোজ্য এই পংক্তি দুটো নিঃসন্দেহে তার উদাহরণ—

মুণ্ডুতে ম্যাগনেট ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্ট্' করে,
ইঁট দিয়ে 'ভেলোসিটি' ক'ষে দেখি মাথা ঘোরে কি না ঘোরে।

(সন্দেশ/আশ্বিন ১৩২৬)

ভেলোসিটি বা গতি মাপার এই মাথা-ঘোরানো প্রক্রিয়ার পাশেই মনে পড়ে আরও একটা 'আবোলতাবোল' (হাতুড়ে)। ডাক্তারি পাঠ দিয়েছেন গুরু—

......শোন শোন বৎস
কাগজের রোগী কেটে আগে কর মক্‌স।

(সন্দেশ/ভাদ্র ১৩২৩)

বটেই ত'---"উৎসাহে কিনা হয় ? কিনা হয় চেষ্টায় ?" বিজ্ঞান নামক এক বহুমুখী আজগুবি শাস্ত্রের সাহায্যে ইউরোপ যে অত্যাশ্চর্য সভ্যতা গড়ে তুলেছে সেও ত' উৎসাহ এবং

চেষ্টারই জোরে। ভীতিপ্রদ, বিলিতি সেই শল্যবিজ্ঞান আহরণের ব্যাপারে "উৎসাহ" ও "চেষ্টা"র কোন ত্রুটি যেন না থাকে।

প্রফেসার নিধিরামদের এসব কাণ্ডকারখানার আবার একটি অন্য, কিন্তু স্বভাবিক, প্রতিক্রিয়ার দিক ছিল, সেটা সুকুমারের নজর এড়িয়ে যায় নি। ছায়াবাজিকর একেবারে সোজাসুজি বলে দেয়— 'গাছ গাছালি শেকড় বাকল মিথ্যে সবাই গেলে"। বোঝা যায় লড়াই একটা শুরু হয়েছিল। দিশি শেকড় বাকল কাঠকুটো মাদুলি তাবিজের বিধান-দাতা শাস্ত্রবিদ্ "কাঠবুড়ো"-কেও তাই দেখা যায় তার সাবেক ব্যবসা বাঁচাতে একপাশে হাঁড়ি নিয়ে বসে গেছে। সে অবশ্য তার জটিল জ্ঞানের জট খুলতে "রোদে বসে চেটে খায় ভিজে কাঠ সিদ্ধ" এবং বিড়বিড় করে ; অবশেষে—

রেগে বলে "কেবা বোঝে এ সবের মর্ম ?
আরে মোলো গাধাগুলো একেবারে অন্ধ
বোঝে নাকো কোনো কিছু খালি করে দ্বন্দ্ব।
কোন কাঠে কত রস জানে নাকো তত্ত্ব
একাদশী রাতে কেন কাঠে হয় গর্ত" ?

('আবোলতাবোল'/সন্দেশ/ফাল্গুন ১৩২১)

কাঠশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞানী বুড়োর জ্ঞানের অভিমানটা বড় বেশি। সে আপনমনে বিড়বিড় করে। দিশি বদ্যিদের মত জ্ঞান বিতরণ অপেক্ষা মন্ত্রগুপ্তিই যেন অভিপ্রেত। কিন্তু এভাবে তো আর ম্লেচ্ছ-বিদ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সুতরাং কাউকে না, কাউকে দায়িত্ব নিতেই হয় "বুঝিয়ে বলা"র। "অবুঝ"-গুলোকে দরকার হল রাস্তা থেকে ধরে এনে "সেই কথাটা" বোঝাতে হয়।

কথাটা জলবৎ তরলং। আগের কালে অবশ্য এ জ্ঞান আহরণ করা বড় সহজ কাজ ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র রায় "বিজ্ঞানচর্চা—প্রাচীন ও নব্য ভারত—একনিষ্ঠ সাধনা" প্রবন্ধে বলেছিলেন, শাস্ত্র অনুযায়ী—"গুরু বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ রসায়ন-শাস্ত্রবিদ, শিবদুর্গার প্রতি ভক্তিমান ও স্থির হইবে। শিষ্য গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাবান,সুশীল,সত্যবাদী, কর্মঠ, বাধ্য, অহঙ্কারশূন্য ও দৃঢ়বিশ্বাসী হইবে।" আর এখন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে গিয়ে, ম্লেচ্ছ-জ্ঞানের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে যাকে-তাকে রাস্তা থেকে ধরে আনতে হয়। কথাটা বোঝাবার জন্য অবশ্য পাঁচ মিনিটই যথেষ্ট। কথাটা হল—

...বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে
অর্থাৎ কি না লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—
গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।

ব্যাকরণ শিং B. A.-এর কাছে সম্ভবত শিকড়টা খুব মোটা না হলে সবটাই বেশ সোজা। কিন্তু অবুঝদের এতে অমনি হাই ওঠে। তার ওপর সে যদি পালাতে চায় তাহলে কোন গুরুর না কান ম'লে দিতে ইচ্ছে করে।

একদলের মতে বেদ-এ সব আছে, অপরদলের মতে বেদ-এ কিছুই নেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে সব আছে। বাস্তবে দুই দলের কেউই তখন আর শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে নেই। দাঁড়িয়ে ছিলেন ফাঁকা ও উদ্ভট কথার রাজ্যে। আবেগবাষ্পে উদ্বেল হয়ে অন্য অনেকের মত স্বদেশপ্রেমের অঞ্জন মেখে এসব দেখতে পারলে কোন না কোন আশু প্রয়োজনের হিসেবিস্বার্থে একটা পক্ষভুক্তির প্রশ্ন উঠত। কিন্তু সুকুমারের জগতে সবকিছুই অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ, জাগতিক নিয়মাধীন। এমন সাবালক মানুষের স্বাভাবিক বোধ ও দৃষ্টিতে এগুলো অর্বাচীনতা ; অসংগতির অভিপ্রকাশ। স্বদেশী আমলে লিখিত তাঁর র‍্যামসডেন বধ নাটকের গান ছিল—

আমরা দিশি পাগলার দল
দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল।

সময়ের দূরত্বজনিত সুবিধে আমাদের আছে, তাই হয়ত একথা আজ সত্যি বলে মনে হয় যে, সেই সময়ের হুজুগে এমন অনেক কিছুই স্বাভাবিক ছিল। দেশপূজ্যদের মতে কর্তব্য ছিল—এমন বহু কাণ্ডকারখানা আসলে পাগলামো বৈ নয়। স্বদেশী জিনিস সম্পর্কে এই গানের শেষ চরণ দুটো—

দেখতে খারাপ টিঁকবে কম দামটা একটু বেশী
তা হোক না তাতে দেশেরি মঙ্গল।

বস্তুত 'খুড়োর কল', ছায়া-ওষুধের বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রয়োগ আর তার সাথে প্রাচীন মন্ত্রগুপ্তি জ্ঞানের লড়াইয়ের মধ্যে ব্যঙ্গের আভাস খুব অস্পষ্ট নয়। কিন্তু কোন ব্যক্তি, নির্দিষ্ট কোন ঘটনা কিংবা স্বদেশী আন্দোলন কোনোটাই তাঁর ব্যঙ্গের

লক্ষ্য নয়; আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত কিছু অসংগত কর্মকাণ্ডই সুকুমারের বিষয়।

কুমড়োপটাশ...! সাবধান!

"বাঙালীর ছেলে ননসেন্সের মধ্যেও মানে খোঁজে—শুধু কথায় ভোলার ছেলে সে নয়। হয়ত পায়ও—কে জানে?" 'আবোলতাবোল' প্রসঙ্গে শ্রী যুবনাশ্বের (মনীশ ঘটক) এই মত প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২ সালের চৈত্র সংখ্যার 'কল্লোল'-এ। রস সাহিত্যের প্রাণ। একটা শরীরকে আশ্রয় ক'রে প্রাণ স্পন্দিত হয়। নচেৎ সাহিত্যরসও শুধু তত্ত্বকথা, কেবল ব্যাকরণের সূত্র। যে শরীরকে আশ্রয় করে যুগে যুগে বিভিন্ন সাহিত্য-রসের নতুন নতুন সৃষ্টি, নতুন প্রাণের স্পন্দন তা হ'ল সেই সৃষ্টির নিজস্ব যুগের দেশকাল ও মানুষ। অন্যদিকে স্রষ্টার অভিজ্ঞতার সীমাবদ্ধতাও যেহেতু নিশ্চিতভাবেই বাস্তব, ফলে সমাজ, সময় ও সমকালীন জীবনধারার বিবিধ স্রোতের সাথে লেখক-কবির শ্রেণীগত ও শিক্ষাগত অবস্থানের সম্পর্কটাও পাঠকদের বুঝে নেবার দায় থাকে। অন্যথায় দেশকালের নির্দিষ্ট জীবনধারার আশ্রয় থেকে সাহিত্যকে উদ্বাস্ত, পরিচয়-হীন করে আপনখুশিতে বুঝে নেবার এবং রস উপভোগ করার খেয়াল চেপে বসতে পারে। এবং সেটা হ'লে আর যাই হোক সাহিত্যের রস যে অনেকটাই মাটি তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ননসেন্সের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা একটু বেশী মাত্রায় থাকে, কারণ এখানে সময়, সমাজ ও মানুষগুলোর এক-একটা দিক বড় হ'তে হ'তে এমন উদ্ভট আর আজগুবি চেহারা নিয়ে নেয় যে আমাদের স্বাভাবিক কল্পনাশক্তি আর তার নাগাল পায় না। ননসেন্সের হাসির আপাতউৎসও সেটা। সুকুমারের নিজের ডায়েরীতে লেখা চারটে পংক্তি এ-ব্যাপারে তথ্য হিসেবে অকাট্য—

> রসের মাঝে মজবি যদি মন,
> বাস্তবের এই বস্তুলীলার তত্ত্বকথা শোন্।
> জড়জগতের বাস্তভিটায় বস্তু করেন বাসা
> নিংড়ে দেখ রসের মধু মৌচাকে তার ঠাসা।
>
> (অপ্রকাশিত "হিজিবিজি খাতা"[১] থেকে)

তাঁর খেয়ালরসের বাস যে এই জড়জগতেরই বাস্তভিটেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ কুমড়োপটাশ নামক জন্তু কিংবা 'ভয় পেয়োনা'র হাফজানোয়ার ভয়ংকর জীব অথবা হুঁকোমুখো হ্যাংলার বিষণ্ণ ও সন্ত্রস্ত মানুষমত জন্তুটা, সকলেই সুকুমারের নিজস্ব দেশকালের সাথে গভীর অন্তরঙ্গতায় সংযুক্ত। এদের নিয়ে খেয়াল রসের যে "মধু" তা সেকালের "জড়জগতের... বস্তু...নিংড়ে"-ই আহরণ করা।

আয়নাবাড়ীর বইতে 'অ্যালিস' 'জ্যাবারওয়াকি' কবিতা পড়ার পরে স্বগতোক্তি করেছিল, "মাথামুণ্ডু কিছুই যে বুঝতে পারি নি, দেখছ তো নিজের মনও সেটা মানতে চাইছে না।" বোঝার ইঙ্গিতগুলো কিন্তু লুইস্ ক্যারল সঙ্গে সঙ্গে অ্যালিসের ভাবনা দিয়ে বলে দিয়েছিলেন,—"কিন্তু কি জানি কেন মাথার মধ্যে হরেক রকম ছবি [idea] সব ঘুরপাক খাচ্ছে—তবে সেগুলো ঠিক কি, তা বলতে পারব না।" (অনুঃ লীলা মজুমদার)। আবোলতাবোলের জন্তুগুলোর মধ্যে দিয়েও তেমনি আমাদের মাথার মধ্যে হরেকরকম ছবি ঘুরপাক খায়। জন্তুগুলোর ভয়ানক গাম্ভীর্য, ক্ষমতা ও অক্ষমতার আভাস আছে কবিতায়, ছবিতেও। যেমন, "কুমড়োপটাশ"। সে "যদি" নাচে, কাঁদে, হাসে, ছোটে, কিংবা ডাকে—তাহ'লে তার প্রত্যেক কাজের সাথে তাল মেলাবার জন্যে নির্দিষ্ট ও রীতিমত জটিল, শ্রমসাধ্য কিন্তু বিশেষভাবে নম্রতা-প্রকাশক, বাধ্যতামূলক বিবিধ কর্তব্যের বিধান দেওয়া হয়েছে। অথচ এহেন কুমড়োপটাশকে এখনো কেউ দেখে নি, তার নাচাহাসাছোটাডাকা নামক ক্রিয়াগুলোও বাস্তবায়িত হয় নি।

না হলেই বা, প্রস্তুত হ'তে হবে না? সে না-আসুক সে যে আসতে পারে, এই ভয়টা তো এসে গেছে। বন্ধনীতে আবদ্ধ "যদি" থেকে অনুমান করা যায়—কোলকাতা কিংবা তার উপকণ্ঠে সত্যিই সে এসে পড়ে নি, কিন্তু নাগরিক বাঙালীর প্রবল দুশ্চিন্তার মধ্যে এ জুজুর তখন নিত্য আসা-যাওয়া।

সবটুকুই অনুমান কিংবা 'যদি' নয়। এর পিছনে একটা মস্ত কাণ্ড, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, শুরু হয়েছিল। সে যুদ্ধে ভারত-বর্ষের প্রভু বৃটিশ নিজে জড়িয়েছিল শুধু নয়, হরেকরকম প্রলোভনের সুড়সুড়ি দিয়ে সাথে জড়িয়ে নিতে পেরেছিল তার উপনিবেশগুলোকেও। ছবিতে ছাগলদাড়ি হ্যাংলা সাহেবমার্কা "কাতুকুতু বুড়ো' জনৈক নেটিভকে (সন্দেশের পাতায়) পায়ের

ওপর রাজা পালকের সুড়সুড়ি দিয়ে যে গল্প বলে তা আমাদের পরিচিত গল্পের থেকে একটু আলাদা। সেটা ছিল তার যোদ্ধা রাজার মহিমাকীর্তন—

বলে "এক যে যোদ্ধা রাজা—হোঃ হোঃ হো হি হী
তার যে ঘোড়া—হাঃ হাঃ হা—ডাকত সেটা চীঁহি,
ছুটত যখন হেঃ হেঃ হে—সবাই বলত বাহা।"

বোঝা যায়, রাজার মহিমাকীর্তন অপেক্ষা রাজার বশম্বদ ঘোড়াটার মহিমাকীর্তনই কথকের উদ্দেশ্য। রাজা তো বাহাদুর যোদ্ধা বটেই, তার বশম্বদরাও এ-বিপদের দিনে যোদ্ধা রাজার ঘোড়া হিসেবে বাহবা পেতে পারে বৈ কি। প্রলোভনের সাথে ভারী স্নেহপরবশচিত্তে বুড়ো কিন্তু সহসা স্বর বদল করে আদরের সুরে আদেশ করে—

হঠাৎ বলে "আর কোথা যাও কাতুকুতু ময়না,
ভাত খাবি ত' আয় না দেখি আর ত' দেরী সয় না।"

দেরী সত্যিই সয় না। বৃহত্তম এই উপমহাদেশের সহযোগিতা না পেলে যুদ্ধে পরাজয় না হোক উপনিবেশ হাত-ছাড়া হ'তে পারে। অতএব সুড়সুড়ি ও স্নেহস্পর্শের সাথে "কুটুৎ ক'রে চিমটি" এবং "খ্যাংরা মতন" আঙুলের খোঁচায় অবশেষে ভারতবাসী "কাতুকুতুর কুলপি" খেয়েছিল। স্বরাজের টোপ গলায় নিয়ে বৃটিশ-রাজের যুদ্ধে রসদ শুধু নয় সৈন্যও জুগিয়েছিল। কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯১৪) বস্তুত কাতুকুতু বুড়োর প্রস্তাব অনুযায়ী যোদ্ধারাজার বশম্বদ ঘোড়ার ভূমিকা পালনের পূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। আবদার হিসেবে বলা হয়েছিল—ঘোড়ার সাজটা যেন একটু ভাল হয়। গৃহীত প্রস্তাবটা ছিল—"War has been declared in Europe and the Congress made profuse declaration of loyalty and promised all help in the prosecution of the war. Demanded that the higher ranks of the Army should be thrown open to Indians."

অবিমিশ্র এই loyalty ঘোষণার আগের যুগটাই ছিল বিপ্লবীদের ফাঁসী, দ্বীপান্তরে নির্বাসন ও জেলের মধ্যে অত্যাচারিত হওয়ার যুগ, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি loyalty নয়, ঘৃণার যুগ। তাই কংগ্রেস তথা ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের দিনে বৃটিশের শত্রুর প্রতি প্রবল ঘৃণায় স্বদেশে এক নতুন যুদ্ধ শুরু করে দিলেন তখনই সুকুমারের মনে হয়েছিল, এ গল্পে "হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশী"।

অন্যদের কান্না সম্ভবত এসেছিল আরো পরে—হোমরুল (স্বরাজ)-এর বদলে যখন "জড়দেহধারী রুল-নামক অন্য একটা জিনিষ" (প্রবাসী)—রাউলাট আইন এল, তখন।

সজনীকান্ত দাস 'আত্মস্মৃতি'তে লিখেছেন—"দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুললিত ইংরাজী ও বাংলা বক্তৃতার সাহায্যে দিনাজপুরের তরুণ সম্প্রদায়কে ইংরাজের পক্ষে সৈন্যদলে যোগদানে উৎসাহিত করিবার জন্য আসিলেন।" শুধু দিনাজপুরে নয় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশ প্রচারযন্ত্রের সুললিত বক্তৃতার "আওয়াজখানা" গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ—"দিল্লী থেকে বার্মা" পর্যন্ত হানা দিচ্ছিল। যুদ্ধে ভারতীয়দের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন আদায়ের জন্য এ চিন্তাটা ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া দরকারি ছিল যে বৃটিশ আক্রান্ত হবার অর্থ ভারতবাসীও আক্রান্ত হওয়া। তাছাড়া "এমডেন" নামে একটা জার্মান ক্রুজার থেকে মাদ্রাজের দুর্গের ওপর গোলাবর্ষণের ঘটনা এতবড় যুদ্ধে একেবারে তুচ্ছ হলেও ভারতবাসীর সামনে তখন এ ঘটনা ব্যাপকভাবে প্রচারিত। মোটের ওপর বাস্তবে বৃটেন আক্রান্ত হলেও প্রচারের গুণে ভারতবাসীর কাছে ভারতবর্ষও আক্রান্ত।

জনৈক "ভীষ্মলোচন শর্মা"র সংগীতচর্চার ঠেলায় "ছুটছে লোকে চারদিকেতে ঘুরছে মাথা ভন্ ভন্," এবং "মরছে কত জখম হয়ে করছে কত ছট্‌ফট্" (গানের গুঁতো/সন্দেশ / ভাদ্র ১৩২২)—বাস্তবে যে-কোন পাঠকেরই এমন অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব। আবার তৎকালীন যুদ্ধ প্রচারের বিপুল আড়ম্বর ও গুজবের প্রতিক্রিয়াতে নাগরিক বাঙালীর মানসপটে "জার্মেনির একদল দুর্দান্ত উলহান সেনা"র "পাশবিক অত্যাচার" (প্রবাসী) ও মাথা ভন্ ভন্ করা জখম, মৃত্যু ও ছট্‌ফটানির নারকীয় সব দৃশ্যের আনাগোনা।

কিন্তু সজনীকান্তের মতো তৎকালীন বহু যুবকেরই "লেখাপড়ায় বিতৃষ্ণা আসিয়াছে, ইংরাজকে এ দেশ হইতে

উৎখাত করিতে না পারিলে কিছুতেই শান্তি নাই—মনের এই-রূপ অবস্থা।" দেশপূজ্যদের বক্তৃতায় তাঁরা হয়ত' শেম্ শেম্ বলে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে পারতেন। কিন্তু ঘটনা ঘটেছিল "ব্যুমেরাঙের বিচিত্র রীতি অনুযায়ী"। এই সব বক্তৃতা ও প্রচারের কল্যাণে তাঁরা স্থির করলেন—"ইংরাজের হইয়াই লড়িতে যাইব।"

বৃটিশ উৎখাতের জন্য প্রবল দেশপ্রেমাবেগের এই আশ্চর্য ও মর্মান্তিক রূপান্তর সেযুগের বহু যুবকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। এতবড় উদ্ভট কাণ্ডের পরিণামে আরো বড় একটা পরিহাস তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল—'টেরোরিস্ট বাংলা' থেকে আপাতত সিপাহী নিয়োগ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতসরকার। "লড়াই ক্ষ্যাপা" জগাইয়ের যুদ্ধে যাবার স্বপ্ন এই ভাবে বিনষ্ট হয়েছিল অঙ্কুরে। তাতেও দমে নি বাঙালী। যুদ্ধ শুরু হবার বছর দুয়েক পরে সিপাহী হবার অধিকার অর্জন করে ছেড়েছিল।

কিন্তু সে মুহূর্তে রয়টার-প্রেরিত "এইরূপ সংবাদ আসিতেছে যে ভারতবর্ষের নানা জাতীয় সিপাহীরা অসাধারণ শক্তি সাহস ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, এমনকি তাহারা কোন কোন সময়ে পরাজয়ের আশঙ্কাকে জয়ে পরিণত করিতেছে" (প্রবাসী/অগ্রহায়ণ ১৩২১)। যুদ্ধে যাওয়া হয় নি বলে জগাই তখন রাগে দুঃখে (হয়ত ঈর্ষায়ও) পথে ঘাটে আপন খেয়ালে যুদ্ধ করে। এবং নিজস্ব শৌর্যের খতিয়ান সে নিজেই লেখে—

লিখল তাতে "ওরে জগাই ভীষণ লড়াই হ'লো
দুই ব্যাটাকে খতম ক'রে জগাই দাদা মোলো।
আর দুটো লোক কই যে গেল ভয়েতে দেশ ছাড়া—
তিন জার্মান জখম হ'ল জগাই গেল মারা।

('আবোলতাবোল'/সন্দেশ/বৈশাখ ১৩২২)

ভারতীয় ভূখণ্ডে "মান্দ্রাজের দুর্গের উপর গোলা চালাইয়া কয়েকজন মানুষের প্রাণবধ ও কিছু সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছিল" যে "এমডেন", তার "বিনাশ"-এর সংবাদ তখন এসেছে (প্রবাসী/অগ্রহায়ণ ১৩২১)। আবার "বাপকে" লেখা শিখ সৈন্যের চিঠিখানাও এসেছে। "বিলাতে শিখ সৈন্য" কি বিপুল বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধরত সে-খবর তাতে আছে, কিন্তু সেই চিঠিতে টাটকা খবর—"আমাদের পূর্বদিকে জার্মানরা প্রায় হিন্দুস্থান অবধি ছাইয়া রহিয়াছে" (সন্দেশ / বৈশাখ ১৩২২)। ভরসা শুধু এই যে জার্মানী যদি আসে তাহলে বাহাদুর ইংরেজ তার ব্যবস্থা নেবে। এই ভয় ও ভরসার দোলায় শঙ্কাতুর মনে কোন প্রকারে অতি "সাবধানে" বেঁচে থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

অন্যদিকে খবর আসছে "চীনের যে অল্প অংশ জার্মেনীর অধীন ছিল তাহা জাপান দখল করিয়াছে..."। সাময়িকপত্রে গম্ভীর মন্তব্য ছিল "আমাদের মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে ও পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য লইয়া ভীষণ সংগ্রাম হইতে পারে। ...জাপানের রণতরী বিভাগ বেশ শক্তিশালী" (প্রবাসী/জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)। জার্মান ঘোষিত শত্রু, তার বিরুদ্ধে বৃটিশের যুদ্ধ-প্রস্তুতি আছে—যুদ্ধ চলছেও। কিন্তু জাপান যেহেতু মিত্রশক্তি তার বিরুদ্ধে তেমন কোন সতর্ক দৃষ্টি বা সামরিক প্রস্তুতি নেই। উল্লিখিত যুক্তি ও তথ্যের সমন্বয়—গুজবের কাল্পনিক স্তরে ঘটে নি। ঘটেছিল সাময়িকপত্রের বুদ্ধিসঞ্জাত সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলিতে। সাধারণ বাঙ্গালীর মনে, অতএব, যখন-তখন সে এসে পড়লে আর হতচকিত হবার কারণ নেই। বরং ধরে নেওয়া ভাল, সে যদি আসে তাহলে অনতিবিলম্বে দেশ দখল করবে। সুতরাং আমাদের করণীয় কর্তব্যগুলো সম্পন্ন করতে হবে বুদ্ধি বিবেচনা করে।

অথচ তখনো সে অচেনা। কেই বা চেনে? শিশুর মনে জুজু কেমন—মাসীপিসীরা তার কতটুকু জানেন? বর্তমান প্রভু, বিদেশী জুজুটাকেও তো চিনে উঠতে পারেন নি ভদ্রলোকেরা, তবু তার সাথে একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক তৈরী হয়েছিল। সেই আদলে নতুন সম্ভাব্য জাপানী জুজু "কুমড়োপটাশ"-এর সাথেও একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক তৈরীর মানসিক প্রস্তুতি রাখতে হবে। যদিও কুমড়োপটাশ ঠিক কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করে তা কারো জানা নেই, এমনকি যিনি এতগুলো বিধান দিয়েছেন তিনিও শেষ পর্যন্ত কবুল করেছেন—

কুমড়োপটাশ চটলে পরে ঘটবে তখন কি যে,
বলব কি ছাই বুঝাই কারে বুঝতে না পাই নিজে।

('আবোলতাবোল' / সন্দেশ / শ্রাবণ ১৩২৩)

কিন্তু কুমড়োপটাশ যাতে না চটে সেই জন্যে তার কাল্পনিক আবির্ভাবের পরে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্থায় তার সাথে তাল মিলিয়ে কর্তব্যের দীর্ঘ বিধান স্বীকৃত। কখনো "চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমূলার গাছে" কখনো "উপুড় হয়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে / বেহাগ সুরে গাইবে খালি রাধে কৃষ্ট রাধে।" কিন্তু "(যদি) কুমড়োপটাশ হাসে—" তখন আলাপের ভাষা তো জানা নেই, এমতাবস্থায় দলিলে দস্তাবেজের কুলীন ভাষায় কথা বলাই সাব্যস্ত—"ঝাপসা গলায় ফার্সি কবে নিঃশ্বাসে ফিস্‌ফাসে"। অতঃপর যদি সে ডাকে, তাহলে বশম্বদ ভাব প্রদর্শনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, নাকখত্ দেওয়াই বিধেয়, নিদেন-পক্ষে "শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা" নাকে ঘষতে হবে।

সময়টা তখন এরকমই। এক জার্মানে রক্ষা নেই, জাপানী বোমার গুজব। একদিকে যুদ্ধের প্যানিক, অন্যদিকে প্যানিক কাটানোর কোন ব্যবস্থাই নেই। অর্থাৎ ইংরেজ উৎখাত-সংক্রান্ত বোমার ব্যবহার কিংবা পার্কের মিটিং সবই বন্ধ। তৎসত্ত্বেও ভারতরক্ষা দণ্ডবিধির তিন রেগুলেশন ও অন্যান্য দমন আইনের বিরাম নেই। সামান্যতম সন্দেহে প্রতিদিন গ্রেপ্তার ও নজরবন্দী-সংক্রান্ত খবর দেশীয় সংবাদপত্রে 'প্রেস আইন' বাঁচিয়ে-ও প্রকাশ পায়। সন্ত্রাসে সিঁটিয়ে যাওয়া নাগরিক বাঙালী তখন সাবধানতার প্রতিযোগিতা ক'রে কোন-ক্রমে প্রাণটা টিকিয়ে রাখছে। সাময়িকপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই সন্ত্রাসবিদ্ধ অবস্থা কাটাবার জন্যে ব্যঙ্গের সুরে লেখা হচ্ছে—"বাঙালী কি নীরব সাধনা ও তপস্যার দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন?" (প্রবাসী / অগ্রহায়ণ ১৩২৩)। এই গম্ভীর বক্রোক্তির ঠিক উল্টো পিঠেই কিন্তু লেখা ছিল নাগরিক মনের প্রাণের কথাটা—আপনি বাঁচলে বাপের নাম। একথা 'প্রবাসী'-সম্পাদকের বিষয় নয় কিন্তু সুকুমারের নন্‌সেন্সের বিষয়।

আপন প্রাণটা কোনক্রমে বাঁচিয়ে রাখার নিত্যক্রিয়াপদ্ধতি সম্পর্কে চাপাগলায় বলা যেসব কথা তখন হাওয়ায় ভাসছিল সেগুলো সুকুমারের খেয়ালী ভাষায় অন্য রূপ পেল—

> তাই বলি—সাবধান! করো নাকো ধুপ্‌ধাপ্‌
> টিপ টিপ পায় পায় চলে যাও চুপ্‌চাপ্‌।
> চেয়োনাকো আগে পিছে, যেয়োনাকো ডাইনে
> সাবধানে বাঁচে লোকে—এই লেখে আইনে।
>
> ('সাবধান' / সন্দেশ / অগ্রহায়ণ ১৩২৩)

সাবধানে যারা ইংরেজের আইন মোতাবেক চলতে চায় তারা অবশ্যই রাস্তার বাঁ-দিক দিয়ে হাঁটে। আর অসাবধানে রাস্তার ডানদিক দিয়ে চলা মানে শুধু ইংরেজের আইন ভাঙা নয়, জার্মানদের আইন অনুসরণ করা। ইংরেজসাম্রাজ্যে এমত আইনভঙ্গকারী এবং শত্রুর আইন অনুসরণকারীর পরিণাম কি, সেই শিক্ষা বক্তা অতঃপর পাড়ার ইতিহাস থেকে তুলে এনেছেন—রমেশের "সেয়না" মেজমামার বেলায় যা হয়েছিল—

> শেষকালে একদিন চান্নির বাজারে
> পড়ে গেল গাড়ী চাপা রাস্তার মাঝারে।

খেয়ালরসের নিয়মে প্রচলিত ব্যাকরণটা কিন্তু উল্টে গেল। সাবধানে জীবনের পথে চলার যে জ্ঞানগর্ভ উপদেশের সাথে যুগে যুগে বাঙালীর পরিচয় সেটা হল—আগে-পিছে খুব ভাল মত নজর করে চলা। অন্যথা হ'লেই বরং রমেশের সেয়না মামার হাল হ'তে পারে।

এ সময়ের অন্তর্গত অবস্থাটা আমাদের দেখার নিয়মে, অর্থাৎ সোজা চেহারায়, দেখতে চাইলে ১৩২৩-এর মাঘ সংখ্যার সন্দেশে প্রকাশিত "কাজের লোক" কবিতা পড়তে হবে। সেখানে তৎকালীন "বাঃ" "যদি" "বটে" "কিন্তু"-দের সুকুমার মাস্টারমশাইসুলভ গাম্ভীর্যে রীতিমত ধমকেছেন। এরাই আবার খেয়ালরসের ভিয়েনে একেবারে অন্য রূপ, অন্য স্বাদ নিয়ে হাজির হয়েছিল সন্দেশের চৈত্র সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় "হুঁকোমুখো হ্যাংলা" হয়ে। স্বাভাবিক মানুষের অবয়বে তাকে আর চেনার উপায় নেই। মনমরা, চুলখাড়া, সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত গোমড়াথেরিয়াম এক উদ্ভট জীব। অথচ খবর আছে, ক'দিন আগেও সে "থপ্‌ থপ্‌ পায়ে" নাচত এবং "আহ্লাদে গদ-গদ" হয়ে "গাইত সে সারাদিন" "সারে-গামাটিম্‌টিম্‌"।

ক'দিন আগেও যে-ভীষ্মলোচনদের নাচগানের গুঁতোয় সবাই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিল—ঘরবাড়ী উল্টে যাবার দাখিল, সেই সব বক্তা, সমাজসংস্কারক, স্বরাজ-সাধনার অগ্রপথিক শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট "কাজের লোক" বাঃ-বাঙালীর

অবস্থাটা তখন বাস্তবিকই চুলখাড়া, চোখবড়, সন্ত্রস্ত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। অসংখ্য যদি-বটে-কিন্তুর মধ্যে আবর্তিত অলস কর্মবিমুখ হুঁকোমুখোহ্যাংলা একদল ভদ্রলোক তখন ল্যাজে মাছি মারার জটিল ফন্দি উদ্ভাবনে ব্যস্ত।

বাস্তবের বড়-ছোট সমস্ত ঘটনাবলীর ওপরের পোশাকটা দেখে যখন অন্যেরা আহ্লাদিত কিংবা বিষণ্ণ, সুকুমার তখন তার প্রতিটি পরত খুলে দেখতে পান। তাঁর নিজস্ব আনন্দ-বিষাদ অন্যকে স্পর্শ করতে পারে না। ঘটনার অতল অভ্যন্তরের সত্যটুকু নিরাসক্তভাবে তুলে আনেন তথাকথিত স্বাভাবিকের একেবারে উল্টো নিয়মে :

ছুটছে মটর ঘটর ঘটর ছুটছে গাড়ী জুড়ি,
ছুটছে লোকে নানান্ ঝোঁকে করছে হুড়োহুড়ি,
ছুটছে কত ক্ষ্যাপার মতো পড়ছে কত চাপা,
সাহেব মেম থমকে থেমে বলছে 'মামা পাপা!'

('দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম'/সন্দেশ/আষাঢ় ১৩২৪)

বিশ্বজগতের বিপুল গতির সাথে পাল্লা দিয়ে পার্থিব সামাজিক সভ্যতা যখন উন্নতির শিখর স্পর্শ করতে চাইছে ঠিক সেই সময়—

আমরা তবু তবলা ঠুকে গাচ্ছি কেমন তেড়ে
"দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্! দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"

বিদ্রূপের আঘাত হয়ত বা সমাজসংস্কারকের কর্তব্য ছিল, কিন্তু খেয়ালরসের নিয়মে বিদ্রূপ ভর্ৎসনা উল্টে গিয়ে পিঠচাপড়ানো বাহাদুরি দেওয়ায় পরিণত হল। এই পিছন ফিরে চলার মধ্যে যেন কোন বিশেষ গোপন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে—

আসল কথা বুঝছ না যে, করছ না যে চিন্তা,
শুনছ না যে গানের মাঝে তবলা বাজে ধিন তা?

ভুতের ফাঁকি

"বাঙালীর নিশ্চেষ্টতা"-র এই সময়ে অনেকে যেমন সব ভাবনা ভুলে গলা ছেড়ে গান গাইছেন অনেকে আবার তখনই অনেক পরিশ্রমসাধ্য খাওয়া-দাওয়া ঘুমানোর কাজগুলো সেরে যে সামান্য সময়টুকু জমাতে পারছেন সেটুকুতে যুদ্ধে "উত্তরধাম সেনাদের" বিক্রম ও পরাজয়, ভারতীয় পাঠান, গোর্খা এবং বাঙালী সৈন্যদের ততোধিক বিক্রম ও জয় এবং যুদ্ধশেষে চূড়ান্ত জয়লাভের পরে সারা বিশ্বে human liberty-র ধ্বজাধারী বৃটিশের দেওয়া স্বরাজ ও স্বরাজের পর কি কি উপায়ে স্বদেশহিত করা সম্ভব—এমত অসংখ্য কাল্পনিক সম্ভাবনাকে বাস্তবতা ধরে নিয়ে চায়ের কাপে তর্কযুদ্ধের তুফান তুলছেন।

আবার সুকুমারের নিজস্ব গণ্ডির মধ্যেও একই ধরণের একটা তুফান উঠেছিল সে সময়। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে সুকুমারের—অলিখিত, স্বাভাবিক—নেতৃত্বে, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ প্রমুখদের সাহচর্যে নবযুবকদের দলটার সাথে 'সমাজের' প্রাচীনদের-ও একটা মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। ইস্যুগুলো অবশ্য একই ভাষায় বলা যায়—সাদাকে লাল বলা, বিশ্রীসুরে নাক ডাকা, বাড়ীর কারো দাড়ি না-রাখার মতোই ভারী, গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। আড্ডার নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে চায়ের কাপ জুড়িয়ে যায়—"ভেরি ভেরি সরি মশলা খাবি?" বলে পরবর্তী আড্ডার ভূমি প্রস্তুত করে ঘরে ফেরার নিয়ম। সুকুমারের "সমাজে"র গম্ভীর তর্কবিতর্কের শেষ অধ্যায়ে-ও "শেকহ্যাণ্ড আর দাদা" বলে মিটমাট হয়ে গেল, নব্যযুবকরা কেউ কেউ (দলের পাণ্ডা সুকুমারসহ) 'সমাজের' কার্যনির্বাহক সমিতিতে উন্নীত হলেন।

ছোটখাটো নৈমিত্তিকতার অঙ্গ এই সব ঘটনাকে ছাপিয়ে এই আড়ি-আড়ি ভাব-ভাব খেলাটা তখন সবথেকে জমেছিল কোলকাতা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে। এ্যানি বেসাণ্টকে সভাপতি করার পক্ষে যাঁরা, তাঁরা যখন বলছিলেন—

"ক্যান রে বেট্টা ইসটুপিড? ঠেঙিয়ে তোরে করব ঢিট্!"

('নারদ নারদ' / সন্দেশ / আশ্বিন ১৩২৪)

কোলকাতার গরমপন্থীরা তার বিরোধিতা করছিলেন বস্তুত একই ভাষায়—

"চোপরাও তুম্ স্পিকটি নট্, মারব রেগে পটাপট্—"

এই গালিগালাজের যুদ্ধে কারা শেষ পর্যন্ত "দাঁড়া একটা পুলিশ ডাকি" বলে বাজীটা মাৎ করলেন সেটা আর তত্তটা গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। কারণ দু'পক্ষই অবশেষে—"মিথ্যে কেন

লড়তে যাবি ?" এই যুক্তিতে মশলা বিনিময় করে আড়ি-ও ভাব-ভাব খেলার সেই সর্বভারতীয় সংস্করণের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন।

লক্ষণীয় যে, মানীগুণী দেশপূজ্য বড় ও বুড়োদের এসব বালসুলভ খেলা নিয়ে সুকুমার যে শব্দ-ছন্দের খেলা করেছেন তাতে satire-এর গন্ধ একটু-আধটু থাকলেও সেটা প্রধান হয়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু যখন দু'পক্ষই সমান তালে পা ফেলে আত্মপ্রবঞ্চনার চূড়ান্ত করে ছাড়ছেন এবং দেশের মানুষ সেই ফাঁকির স্বপ্ন নিয়ে আকাশকুসুম রচনা করতে করতে জীবনের বাস্তবতা থেকে অনেকদূর সরে যাচ্ছে, তখন কিন্তু তাঁর খেয়ালি কলম-তুলিতে বিদ্রূপের ঝাঁঝালো শব্দ ও ছবি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট।

"সরকারী সব অফিসখানায় কোন সাহেবের কদর কত", চাটনি পোলাও বানানোর কায়দা, "মুষ্টিযোগের বিধান", "পূজা পার্বণ তিথির হিসাব" এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতে যেসব বস্তু প্রস্তুত করতে পারলে স্বদেশী শিল্পের ভিত্ গড়ে উঠবে সেই "সাবান কালি দাঁতের মাজন বানাবার সব কায়দা কেতা" আমাদের জানা ছিল। জানা ছিল না শুধু "পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন ক'রে ঠেকাব তায়!" শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙ্গালীর বোধবুদ্ধি—অফিস কাছারিতে হিসেব ক'রে সাহেবদের কদর-অনুযায়ী মান্য করা, ঘরের পূজোপার্বণ, মুষ্টিযোগের সাথে চাটনি পোলাও এবং সেই সাথে নিরীহ স্বদেশী শিল্পের উদ্যোগ পযন্ত পৌঁছয়, কিন্তু পিছন থেকে কোন প্রবল শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলেই "কি মুস্কিল"—দিশেহারা অবস্থা।

সন্দেশ, ১৩২৪-এর মাঘে 'কি মুস্কিল' আর চৈত্র মাসে প্রকাশিত 'চোরধরা'-তে দেখা যায় টিফিনের ভুরি ভোজের ব্যবস্থাটা যখন প্রতিদিন বেমালুম হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছিল তখন বাবু একদিন ভয়ানক রাগে চোর ধরতে বদ্ধপরিকর হলেন। যোদ্ধার বেশে চোখ গোল গোল করে (যাতে কিছুতেই আর ঘুম না আসে) ঢালের আড়ালে মুক্তঅসি-হাতে পাহারারত—

এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে
এই বার টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।

'আবোলতাবোলে' ছবি সাধারণত কবিতার একটা বিশেষ বা প্রধান মাত্রাটাকে জীবন্ত ও convincing করে, কিন্তু কবিতায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে এই কবিতা দুটোর ছবি। 'কি মুস্কিল'-এর ছবিতে পাগলা ষাঁড় ভদ্রলোকদের তিন হাতের নাগালে ভীষণ রাগে ফোঁসাচ্ছে আর 'চোরধরা'তে যোদ্ধা ও পাহারাদার বাঙ্গালীর পিছন থেকে ঘরের শত্রু বেড়াল ইঁদুর কাকপক্ষীরা খাবারদাবার সাবাড় করছে।

অলক্ষ্যে পাগলা ষাঁড় যে পিছনে এসে গিয়েছিল এখবর কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্গের লাটসাহেব বক্তৃতা করে বলেছেন—"বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার জন্য একটা বিস্তৃত চক্রান্ত অনেকদিন হইতে চালতেছে" এবং সরকার "একটি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন"। এই কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ "চক্রান্ত দমন করিবার জন্য যদি নতুন আইন করিতে হয় তাহা হইলে সে আইন কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেওয়া।" (প্রবাসী/পৌষ ১৩২৪)। কমিটির সভাপতির নামটা প্রবাসীর চৈত্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল এইভাবে—"বিলাতের হাইকোর্টের জর্জ রোলাট (Rowlatt) সাহেব উহার সভাপতি"। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান 'ট্যাশপাখী'-দের সংবাদপত্র যাঁদের মতারেষ্ট বলত তাঁরাও জানতেন যে নতুন কিছু দমনআইন তৈরী করাই এই কমিটির উদ্দেশ্য। কিন্তু কোলকাতা কংগ্রেসে এই কমিটি সম্পর্কে একটা মামুলি নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হ'ল মাত্র। এই পাগলা ষাঁড় তাড়া করলে কি কর্তব্য সে-সম্পর্কে কোন কথাই হ'ল না।

ভাবের ঘরে চুরি আমাদের শুরু হয়েছিল অনেক আগে, যুদ্ধের গোড়া থেকে। ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ ক'রে প্রাণ দিয়ে, শতাধিক কোটি টাকা নিঃশর্ত দান ক'রে দেশ দেউলে হয়ে গিয়েছিল। লজ্জা নিবারণের উপযোগী কাপড় তখন বাঙালী মেয়েদের জন্যেও জুটছে না—"হাটলুঠ" "বস্ত্রলুঠ" "দুর্ভিক্ষ" "প্লেগ" এগুলোই তখন দেশের খবর। তবুও পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। যুদ্ধে ইংরেজের জয় হ'লে সভ্যতা টিঁকবে আর ফাঁকতালে আমাদের স্বরাজপ্রাপ্তি হবে। বিশেষত ভারত-সচিব মন্টেগু সাহেব ভারতবর্ষে আসছেন স্বরাজের খসড়া তৈরী করতে সরেজমিন তদন্তে। অতএব, গাও সবে

ভারতসন্তান, মন্টেগু সাহেব সুস্বাগতম। ঘরের মধ্যে চোর ঢুকিয়ে চৌমাথার মোড়ে গিয়ে পাহারা দেওয়া আর কাকে বলে?

ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসক 'ভালো ইংরেজের' মুখ থেকে human liberty এবং এই যুদ্ধের শেষেই "ভারতবাসী-দিগকে অনেক স্বায়ত্ত শাসন-ক্ষমতা দেওয়া কর্তব্য"—মন্টেগু সাহেবের এই বাণী শুনতে শুনতে ভারতবাসী তখন দিবারাত্র "জোছনা হাওয়ার স্বপনঘোড়ার চড়নদার"। কাতুকুতু বুড়োর সুড়সুড়ি খেয়ে যুদ্ধের গোড়া থেকে "পষ্ট চোখে" আর "বিনা চশমাতে" এই ভূতুড়ে খেলা দেখতে শুরু করেছে বাঙালী। আলো ঠিক্‌রে পড়া হীরের (?) আংটি পরা ভূতের 'কথায়' আদরের যেন শেষ নেই আর "জ্যান্ত ছানা" র-ও আহ্লাদের সীমা নেই। অবশেষে "গোবরা গণেশ মন্নদাঠাসা নাদুস"-এর ঘুম যখন ভাঙল তখন কিন্তু The Egyptian Law of Suspects of 1909-এর ধাঁচে গড়া আইনের খসড়াটা তৈরী হয়ে গেছে। ভূতেরও আর স্বপ্ন ভাঙাতে ভয় নেই। সে—

"ছিঁচকাঁদুনে ফোক্‌লা মানিক, ফের যদি তুই কাঁদিসরে"—
এই না বলে যেই মেরেছে কাদার চাপটি ফট্‌ করে,
কোথায় বা কি, ভূতের ফাঁকি—মিলিয়ে গেল চট্‌ ক'রে।

('আবোলতাবোল' / সন্দেশ / বৈশাখ ১৩২৫)

একেবারে হঠাৎই সব মিলিয়ে গেল। কোথায় human liberty, কোথায়ই বা স্বরাজ। যা সত্যি হয়ে এল সেটা ঐ 'রোলাট কমিটি'-কৃত আইনের খসড়াটা। 'মাতৃগৃহ' এক নিমেষে 'মাতৃকারাগারে' পরিণত হল।

যুদ্ধশেষ হবার মুখে ভারতবাসী এ প্রাপ্তির জন্যে প্রস্তুত ছিল না বললে বস্তুত অর্ধেকটাও বলা হয় না। ইংরেজের প্রতি যে দ্বিধাহীন আনুগত্য ও নির্ভরতা নিয়ে সেদিনের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাদের সমস্ত নৈতিক ও আর্থিক শক্তি এবং সম্পদ এই যুদ্ধে উজাড় করে দিয়েছিল কেবলমাত্র বৃটিশের অধীনে শান্তি ও সৌহার্দ্যময় স্বরাজ বা হোমরুল-এর প্রত্যাশায়, সেই ইংরেজের কাছ থেকে এই প্রতিদান বস্তুত মরণান্তিক আঘাতরূপে সত্য হ'য়ে উঠল।

যে স্বদেশ বা "মাতৃগৃহ" প্রবাসী সম্পাদকের কাছে 'মাতৃ-কারাগার" বলে মনে হয়েছিল সেই দেশই সুকুমারের খেয়াল-রসের নিয়মে "হাসি নিষেধ"-এর "ধমক দিয়ে ঠাসা" "রাম-গরুড়ের বাসা" হয়ে এলো।

যায় না বনের কাছে কিংবা গাছে গাছে
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে

কিম্বা

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
লাখ জোনাকির চক্ষুঠারা
হাসতে শেখায় কারে?

(হেস' না / সন্দেশ / জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)

রবীন্দ্রনাথের "বিদূষক" বলেছিল "আমি মারতেও পারি নে কাটতেও পারি নে, বিধাতার প্রসাদে আমি কেবল হাসতে পারি।" মহারাজের সভা থেকে বিদূষক অতএব বিদায় নেবার আর্জি পেশ করেছিল। কিন্তু যিনি কোন রাজপ্রাসাদের বিদূষক নন, এতদিন সমাজের বিবিধ অসংগতি যাঁর খেয়ালরসের অবলম্বন, তাঁকে তখন প্রকৃতির মধ্যে "দখিন হাওয়ার সুড়-সুড়ি" অথবা "মেঘের কোণে কোণে" কিংবা "লাখ জোনাকির চক্ষুঠারা"-র মধ্যে হাসির উপকরণ খুঁজতে হয়।

সেই বাসা যে নিত্যনতুন ধমক দিয়ে ঠাসা হচ্ছিল তার প্রমাণ আছে অসংখ্য। তবে ধমকের মধ্যে এক আশ্চর্য অভয়-দানের ব্যাপারও ছিল। কোলকাতার লাটসাহেব ২রা মে (১৯শে বৈশাখ ১৩২৫) তারিখে অভয় দিয়ে বলেছিলেন—এতে ভয়ের কিছু নেই। সন্দেহ হ'লে জেলে আনা হবে, এবং সংপ্রত কিছু কারণে বিচার করা হবে না। তা'বলে "তিনি কাহাকেও রাজনৈতিক আন্দোলন স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিতেছেন না।" (প্রবাসী / জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)। সুতরাং "ভয় পেয়ো না" ('ভয় কিসের?' / সন্দেশ / আষাঢ় ১৩২৫), "আমি তোমায় মারব না", তাছাড়া যদি মারি-ও "এ মুগুর যে বড্ড নরম, মারলে তোমার লাগবে না।" ('সন্দেশ'পাঠ)।

অবশ্য একথা মনে রাখা দরকার যে "ব্রিটিশ জাতির মেজাজ স্বতন্ত্র রকমের। কেহ কেহ তাহাদিগকে একগুঁয়ে জাতি বলে।" কিন্তু লাটসাহেব মনে করেন "তাহারা বেশ বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ জাতি। তুমি অনায়াসে তাহাদের সহিত তর্ক করিতে পার।"—সুতরাং কোন সন্দেহ নেই যে,

"মনটা আমার বড্ড নরম, হাড়ে আমার রাগটি নেই"। এতদূর "অভয়" দেবার পরেও যাদের সন্দেহ না ঘোচে সেই সব বিপজ্জনক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর "ঠ্যাং দুটো" ধরে ফেলাই যে উচিতকর্তব্য সে-কথা লাটসাহেব বলতে ভোলেন নি। বৃটিশের যদি "এরূপ সন্দেহ হয় যে তাহার বিপদের দিনে কেহ সেই সুযোগে কিছু লাভের চেষ্টায় আছে তাহা হইলে তাহারা ভারী চটিয়া যায়।" এবং তারপর—"বসলে তোমার মুণ্ডু চেপে বুঝবে তখন কাণ্ডটা।"

এ অভয়বাণী শুনে সন্দেশের ছবিতে স্যুট প্যান্ট পরা শিক্ষিত ভদ্রলোক প্রাণপণে দৌড়েছিল উল্টোদিকে। দৌড়ের গতির ফলে হাওয়ায় মাথার টুপি শূন্যে উড়ছিল। আর আবোলতাবোল গ্রন্থে সাধারণ গেরস্থ ভদ্রলোক খালি পায়ে হাঁটু অবধি কাপড় তুলে, ইংরেজ-সংস্রব থেকে যথাসম্ভব দূরত্বে অবস্থান করা শ্রেয় বিবেচনা করে প্রাণের ভয়ে দৌড়েছিল।

'আবোলতাবোলের' ছবিটাই অধিকতর বাস্তব। প্রথমটা ভয় পেলেও স্বল্পকালের মধ্যেই একদল 'দেশপূজ্য', যাঁরা মন্টেগু সাহেবের দেওয়া স্বরাজের মন্ত্রী হবার স্বপ্নে মশগুল তাঁরা কিন্তু লাটসাহেবের 'অনুমত্যনুসারে' ও 'সুনির্দিষ্ট' পদ্ধতিতে 'কংগ্রেসী দরখাস্তবৃত্তিতে' অটল থাকলেন। সেই 'ভারতসভা'র যুগ থেকে এই বিশিষ্ট ভদ্রলোকদের ভিক্ষাবৃত্তির শুরু। বারবার তাঁরা বিভিন্ন সমাজহিতকল্পে গরম গরম বক্তৃতায় সাধারণ মানুষকে টেনে নামিয়েছেন আসরে। আর বারে বারে একদফা করে দমন আইনের "বেল" ঢাল-তলোয়ারহীন "নেড়া" মানুষগুলোর মাথায় পড়েছে। কত-দিন ধরে, কতবার করে এই ভিক্ষা চাওয়া, দরখাস্ত করা চলবে এবং নব নব দমনআইনের মুগুর মাথায় উপভোগ করতে হবে এই অঙ্ক গণিতজ্ঞ রাজাও মেলাতে পারে না।

পৌনঃপুনিকের এই অঙ্ক মেলাতে গিয়ে রাজার যখন ঘেমে-নেয়ে "গা ছন্‌ছন্" অবস্থা তখন এক "ভিস্তিওলা" এসে সমস্যার সমাধান করে দেয়। ভিস্তিওলাদের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নগুলো বারে বারে শুধুই চোখের জলে ভারী হয়ে পিঠের বোঝা হয়েছে। তাই বোধহয় তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য নিয়ে নিজেরা অমন পরিহাস করতে পারে—

> হেসে বলে "আজ্ঞে সে কি? এতে আর গোল হবে কি?
> নেড়াকে তো নিত্যি দেখি আপন চোখে পরিষ্কার—
> আমাদেরি বেলতলা সে নেড়া সেথা খেলতে আসে
> হরে দরে হয়তো মাসে নিদেন পক্ষে পঁচিশ বার।
> ('আবোলতাবোল'/সন্দেশ/অগ্রহায়ণ ১৩২৫)

"মাস" এবং "পঁচিশ বার", দুটো গাণিতিক মান বস্তুত "হরে দরে হয়তো" এবং "নিবেদন পক্ষে"—দুটো সম্ভাব্যতাবোধক শব্দসমষ্টির কলে পড়ে দিশেহারা—অনির্দিষ্ট কাল ও অশেষ সংখ্যার সম্ভাবনার মধ্যে হারিয়ে গেল। তবু রাজার অঙ্কের এই উত্তরটাই সঠিক উত্তরের সবথেকে নিকটবর্তী। "দেশপূজ্য"-দের স্বরাজভিক্ষা ও মাথায় দমনআইনের বেল পড়ার এই খেলা শেষ হতে তখনো অনেক দেরী।

"আইন গাধা"

উদ্ভটরসের হাস্যরস সৃষ্টির পিছনে থাকে জীবন থেকে আহরণ করা কোন গভীর বাস্তবতার ভেতরের অসংগতিটুকু। সেই অভিজ্ঞতাটা যত বড় এবং বলার কথাটা যত গভীর তার অসংগতির পাল্লাটাও, অর্থাৎ উল্টোদিকটাও, তত হাল্কা, তত উদ্ভট। শিল্পরূপের মধ্যে নির্মল হাল্কা হাসির পরিমিত হাওয়া বইয়ে দিতে পারাটা শিল্পরূপের, বিশেষত খেয়ালরসে তৈরী শিল্পের, সাফল্যের মাপকাঠি। কিন্তু "জড়জগতের বাস্তবিটা" থেকে, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে "নিংড়ে" সত্যকে দেখাটা তাতে ছোট হয় না; সত্যকে তার পূর্ণতায় দেখাতেই বরং তা সাহায্য করে। যে ইমেজের আজগুবিত্বে, ভাষার অসংলগ্নতায় ও নিখুঁত ছন্দের বুনোটে বাঁধা এই সৃষ্টিকে আমরা উপভোগ করি ও হাসি, তার পিছনে সমসাময়িক জীবনের বহু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা ছিল, এটাই সত্যি। "অসংগতি যখন আমাদের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনই আমাদের কৌতুক বোধ হয়, গভীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ বোধ হয়।" রবীন্দ্রনাথের একথা উদ্ভটরসের সমস্ত হাস্যরসের ক্ষেত্রে সত্যি—সুকুমারের বেলায় বিশেষ ক'রে।

জীবনের শেষ কয়েক বছরে লেখা আবোলতাবোল পর্যায়-ভুক্ত কবিতায় সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অভিঘাত

আর তেমন কোন উদ্ভট মোড়কের আড়ালে আসে নি। রাউলাট্ আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হ'ল। গান্ধীর ভাষায় এই experiments with truth-কে দমন করার জন্যে ইংরেজ সরকার লাঠির ব্যবহারে কোন কসুর করে নি। এমন কি সাধারণ পথচারীদের-ও গোরা সৈন্যরা রেহাই দেয় নি। প্রবাসী সম্পাদক লিখেছেন "কাহারও কোন সন্দেহ থাকিলে প্রিন্সিপ্যাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের প্রতি কলেজস্ট্রীটে গোরা সেনানায়কের আক্রমণে সে সন্দেহ দুর হওয়া উচিত।" সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টির আরো বড় উদাহরণ অবশ্য আগেই সৃষ্ট হয়েছিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে। এ সময়ে সেই হত্যাকাণ্ডের তথ্যবিবরণ প্রকাশিত হতে শুরু করে। "বাবুরাম সাপুড়ে"-কে দেখা যায় জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ডাকাডাকি ক'রে বলে—

আয় বাবা দেখে যা, দুটো সাপ রেখে যা—

যে সাপের চোখ নেই, শিং নেই, নোখ নেই,

('বাপ রে !'/সন্দেশ/আষাঢ় ১৩২৮)

এবং যে সাপ "কাউকে কাটে না", বিষহীন গোবেচারা নিরীহ অথচ "জ্যান্ত" দুটো সাপ চাই। উদ্দেশ্যও অব্যক্ত নেই। "জ্যান্ত" কিন্তু নিরীহ সাপ দুটোকে "তেড়ে মেরে ডাণ্ডা" ঠাণ্ডা করে দেওয়া হবে।

পরের বছর, ১৩২৯-এর ভাদ্র সংখ্যায় বেরুল "একুশে আইন"। এই নামটার মধ্যে অনেকগুলো ব্যঞ্জনা হয়ত' আছে। যেমন, যোগেশচন্দ্র বাগল লিখছেন—"ভারতবর্ষীয় সভা ভারত সরকারের নিকট একটি আইন প্রণয়নের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এই বৎসর ১৮৬০ সনে ব্যবস্থাপরিষদে এ উদ্দেশ্যে একটি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহা ১৮৬০ সনের ২১ আইন নামে পরিচিত হইয়াছে। এই আইনটি যে কত গুরু ও সুদুরপ্রসারী তাহা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হইয়াছে। এই সনে এমন কয়েকটি আইন পরপর বিধিবদ্ধ হইল যাহা লইয়া সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে বৈরিতার সূত্রপাত হয় বিশেষ ভাবে।" (ভারতবর্ষীয় সভা / বিশ্বভারতী পত্রিকা / বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০)

মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) পরে ভারতবাসী, খোদ বৃটিশ সরকারের আইনানুগ প্রজা হবার অধিকার পেয়েছিল। অতঃপর ইংরেজ-সভ্যতার যে নির্যাসটুকু তার আইনে প্রতিফলিত হলো, সেই আইনের শাসনে এই "শিবঠাকুরের আপন দেশে"-র তৎকালীন হালচাল প্রকাশ করতে কল্পিত কোন উদ্ভট রূপকের আড়াল আনার প্রয়োজন হয় নি। সুকুমার তাঁর ভাষা ও ছন্দের কারিগরিতে ছ'টা স্তবক জুড়ে wit ও satire-এর এক অসামান্য মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

কয়েকমাস আগের সন্দেশে 'বিচার' নামে একটা কবিতা প্রকাশিত হয়। সেখানে যে বিচারক সে-ই জুরী, সে-ই উকিল এবং বিচারের আগেই বিচারক-বেড়াল আসামী-ইঁদুরের শাস্তি স্থির করে রেখেছে। অ্যালিসের একটি কবিতার হুবহু অনুবাদ বলে এটিকে ধরে নেবার সংগত যুক্তি আছে। কিন্তু এসময়েই কবিতাটা অনুবাদ করার বাস্তব পটভূমিটা মনে রাখা দরকার। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ৭০ জন মোপলা বন্দীকে ট্রেনের মালগাড়ীতে দমবন্ধ করে হত্যা করার অপরাধে অপরাধীদের সামান্যতম শাস্তিও না-হওয়া এবং বিনা অপরাধে বিনা বিচারে যে কোন লোককে শাস্তি দেবার বাস্তব ঘটনাবলীকে কেন্দ্র ক'রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় "আইন' ও 'বিচার" শিরোনামে সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন—"ইংরেজীতে একটা পরিহাস, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ আছে যে 'The law is an ass' 'আইন গাধা'।"

'একুশে আইন' এবং 'হ য ব র ল'-র শেষ কিস্তি—বিচারদৃশ্য—সন্দেশের একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আইন ও বিচার-ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের ফাঁকা অসারতাটুকু চূড়ান্তভাবে উন্মোচিত হয়েছে 'হ য ব র ল'-র এই দৃশ্যে, যেখানে আসামী এবং সাক্ষী যোগাড় হয় পয়সা দিয়ে, বিচারক ঘুমোয় আর উকিল আইনের "মস্ত একটা বই দিয়ে আস্তে আস্তে" পিঠ থাবড়ে মক্কেলকে সান্ত্বনা দেয়।

একটা প্রশ্ন এখানে আপনি এসে পড়ে, তাহ'লে কি আবোল-তাবোলের কবিতাগুলো আসলে সে-সময়কার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘাতগুলোরই নন্‌সেন্স-ভাষ্য ? ইতিমধ্যে আলোচিত যে সমাজ-রাজনৈতিক পটভূমির মধ্যে তাঁর কবিতাগুলোকে আশ্চর্য রকমের অর্থবহ হয়ে উঠতে দেখি তা কোন ইতিহাসের গ্রন্থে স্থান পাবে না। সেখানে যে-

সব ঘটনার মধ্যে বিপুল ঐতিহাসিক তাৎপর্যের অনুসন্ধান থাকবে সে-সব ঘটনা ও ঘটনার সেই সকল বিশ্লেষণ সুকুমারের খেয়ালরসের খোরাক যোগায় নি। যেমন জাপান চীনের অংশবিশেষ অধিকার করে নেবার পরে ভারতবর্ষ আক্রমণ ও দখল করতে পারে—এই জল্পনা-কল্পনার বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব সেকালে ছিল। খোদ বিলেতের কাগজপত্রে জাপানের সাথে সন্ধি থাকার আর কোন গুরুত্ব আছে কিনা বা তা কি-ধরণের বিপদ ডেকে আনতে পারে সে-সম্পর্কে ভারী ও গম্ভীর সব আলোচনা চলছিল। এগুলো সুকুমারের বিষয় নয়, জাপানের বিরোধিতা বা নিজেদের কর্তব্য—ইত্যাকার বহুবিধ রাজনৈতিক সমস্যা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় নি। কিন্তু এই ঘটনাবলীর একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা তাঁকে বিচলিত করেছে, কোলকাতার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের কল্পনাচিন্তার জগতে এর যে ভয়ভীতিকর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা হয়ত কোনদিনই ইতিহাসে স্থান পাবে না, কিন্তু সেটাই তাঁর "কুমড়োপটাশ"-এর বাসভূমি।

সুকুমার নিজে বলেছিলেন—"শিল্পরাজ্যে যেরূপ দেখা যায়, সেইরূপ মানুষের সকল প্রকার সাধনাক্ষেত্রেই তাহার অন্বেষণের সকল প্রকার খুঁটিনাটির মধ্যে কতকগুলি বিপরীতমুখী অথচ পরস্পর-সম্বদ্ধ বিভিন্ন ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে কখনো একটি কখনো অপরটি প্রবল হইয়া উঠিতে চায়..." (চিরন্তন প্রশ্ন)।

একথা সুকুমারের বেলায়-ও সত্যি। একদিকে যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জগৎ জীবনকে অন্বেষণ করার প্রবণতা, অপরদিকে পারিবারিক সূত্রে 'ব্রাহ্ম' ঈশ্বরের সাথে আবাল্য বন্ধন। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-কে লেখা সুদীর্ঘ চিঠি কিংবা ডায়েরীর[১] পাতায় লেখা স্বগত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এই দ্বন্দ্বেরই তীব্রতম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। একই কারণে 'আবোলতাবোলে'র স্রষ্টাকে 'অতীতের ছবি'-রও লেখক, প্রকাশক এবং বিনাপয়সায় বিতরণকারী হিসেবে মেনে নিতে হয় আমাদের।

'অতীতের ছবি'র বিপরীতেই বস্তুত 'আবোলতাবোলে'র কবি সুকুমারের বাস। কালিদাস নাগ সুকুমার সম্পর্কে বলেছিলেন, "সত্যকে ভেতর থেকে টেনে বের করে তার যে-রূপ দেখলে হাসি পায় সেই রূপটা ফুটিয়ে তোলার জন্মগত অধিকার ছিল তাঁর" ('রংমশাল'/অগ্রহায়ণ ১৩৫১)। বস্তুজগতের অবিরাম গতিশীল পরিবর্তনের মধ্যে সত্যকে অনুধাবন করতে না পারলে কিন্তু তার ভেতরের অসংগতিকে, হাস্যকর রূপটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, প্রকাশও করা যায় না।

ফাণ্ডামেণ্টাল আইডিয়াল বনাম ফল্স্ অ্যানালজিস

'আবোলতাবোল'-এর দৃশ্যপাঠ্য কবিতাগুলোতে উদ্ভট রূপকল্পে চিত্রিত যে চরিত্রগুলো এসেছে, তারা সবাই সেকালের এক-একটি সামাজিক টাইপ—পোশাক আষাক একটু বদলে নিলে একালেরও বটে। বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রভাব নাগরিক সমাজের এক-একটি গোষ্ঠী-বর্গের ওপর যেমনভাবে পড়েছে এবং তার যে বহুবিচিত্র প্রতিক্রিয়া সুকুমারের অনুভূতিতে ধরা দিয়েছে সেগুলোই খেয়ালরসে ফুলে ফেঁপে তৈরী হয়েছে 'আবোলতাবোল'। মনে রাখতে হবে, বিশেষ এক-একটা পরিস্থিতিতে রামগরুড়ের ছানা কিংবা হুঁকোমুখো হ্যাংলার দশাপ্রাপ্তি হয়েছিল এক-একটা বিশেষ ধরণের সামাজিক টাইপের।

নরমপন্থা, গরমপন্থা, স্বরাজ, হোমরুল, জাতীয়তা, স্বাধীনতা ইত্যাদি অসংখ্য রাজনৈতিক শব্দের মধ্যে যেমন এক-একজন নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন সেযুগে, তেমনি তাঁরাই আবার ধর্মের ক্ষেত্রে অসংখ্য দর্শনের ভাবালুতায় বিভক্ত। তার মধ্যে জাতপাঁতে শতচ্ছিন্ন হিন্দুত্ব আছে, বিবেকানন্দের 'বিপ্লবী' হিন্দুত্ব আছে, প্রকারভেদে তিন ব্রাহ্মত্ব আছে, আবার টাঁশত্ব-ও আছে। ইংরেজের সভ্যশিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রবাঙালীর পাণ্ডিত্যের বুড়বুড়িতে উঁচুনিচুর বিভেদ তো আছেই। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন ক'রে কেউ সর্বার্থে সম্পূর্ণ বাঙালী হ'তে চাইলে তাঁর অবস্থাটা হবে সেই 'কিম্ভূত'-এর মত—"আমি তবে কেউ নই!"

এই "কেউ নই"-এর অবস্থান থেকে কোন ঐক্যবদ্ধ লক্ষ্যে অগ্রসর হতে গিয়ে তখন প্রতি পদে পদে মস্ত সব আপোসরফা করতে করতে আসল লক্ষ্য—"ঠিকানা"টাই হারিয়ে যাচ্ছিল। একই গোলকধাঁধায় ঘুরে "আমড়াতলা" থেকে যাত্রা করে

আবার সেই "আমড়াতলা"য় ফিরে আসতে হচ্ছিল। উল্টো করে জ্যা রোপণ করে শিকার করছেন তাঁরা। লক্ষ্যবস্তু শুধু "দেখ বাবাজি দেখ্‌বি নাকি দেখ্‌রে খেলা দেখ্‌ চালাকি"র বাক্য-কৌশলের ফাঁক দিয়ে অন্তর্হিত হচ্ছে আর তীর গিয়ে বিঁধছে ভাগ্নের বুকে। সে বেচারা বড় আশা করে ধামা নিয়ে গুড়গুড়িয়ে গাছের নীচে হাজির হয়েছিল লক্ষ্যবস্তুটি ধরার জন্য। ফলাফল হিসাবে থেকে গেল ঐ আফশোষটুকু --"ফস্‌কে গেল"।

'গোঁফ চুরি'র আফ্‌শোষ কিন্তু "বাবু" বাঙালীর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিকে তখন কয়েকটা নির্দিষ্ট পেশার সাথে সংযুক্ত করা হত। সংবাদপত্রে এমন কার্টুনও দেখা যেত যেখানে কেউ ড্রাইভার, কেউ ছুতোর, কেউ রাঁধুনি ইত্যাদি আর বাঙালী বলতে বক্তা, চাষী এবং কেরাণীবাবু। প্রচলিত ঘুম-পাড়ানো ছড়া—

(পুত্রসন্তান সম্পর্কে) ওরে আমার মনি
আমার মানিক হবে
বড় সাহেবের কেরাণী।

(কন্যাসন্তান সম্পর্কে) মনি মনি মনি
বর যেন হয় বড় সাহেবের কেরাণী।

এমন সাধের বড় সাহেবের কেরাণী, হেড-অফিসের বড়বাবুর হিসেবের খাতায় দুনিয়ার সব বস্তুই যখন ক্রয়-বিক্রয় ও চুরি-যোগ্য তখন কেশহীন বড়বাবুর নিজস্ব বলতে একটা বস্তুই অবশিষ্ট আছে, যা তাঁর মতে অন্য কেউ কিনতে বা চুরি-করতে পারে না। সেই শেষ সম্বল গোঁফটাও যখন কোন দিবা-দুঃস্বপ্নে চুরি গেছে (না-কি কেউ কিনে নিয়েছে ?) বলে ভ্রম হয় তখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। মাছি-মারা কেরাণীও হাত-পা ছুঁড়ে বিদ্রোহ ক'রে ছবির ফ্রেম ভেঙে ফেলে (এ সংখ্যায় ক্রোড়পত্রের ছবি দ্রষ্টব্য)।

মেয়ের জন্যে "সৎপাত্র" খুঁজতে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের একাংশের কাছে বংশকৌলীন্যই একমাত্র বিচার্য। পাত্রের নিজস্ব গুণাগুণ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। সংস্কার-কণ্টকিত এই হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আর-একটা বিশেষ ভদ্রলোকী গোষ্ঠী আধুনিক ও সভ্য বিলিতি ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা, পোশাক এমনকি খাদ্যাভ্যাসের প্রতিও আদ্যোপান্ত অনুরক্ত। আর এঁদের সম্পর্কে সুকুমার লিখেছিলেন 'ট্যাঁশগরু'—যদিও এঁদের প্রতি সুকুমারের মনোভাব সবটা এই কবিতায় পাওয়া যায় না। একটা অসামান্য ছড়ায় তাঁর মনোভাব অনেক স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে—

বলব কি ভাই হুগলী গেলুম
বলছি তোমায় চুপিচুপি
দেখতে পেলুম তিনটে শুয়োর
মাথায় তাদের নেইকো টুপি।

আর জ্ঞান আহরণের জন্যে এক বিশেষ "জিজ্ঞাসু" টাইপের অমিত জ্ঞানলিপ্সার চমৎকার পরিচয় নিঃসন্দেহে 'নোটবই' কবিতা এবং নোটবইয়ের মালিক ও স্বত্বাধিকারীর ছবিটা। ইনি অসংখ্য ভাল কথার সংগ্রাহক। অন্য একজন কেতাবী বাবুকে আমরা আগেই দেখেছি, সময়ের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ একটা সমস্যা—"পাগলা ষাঁড়ে করলে তাড়া কেমন করে ঠেকাব তায়"—সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য কেতাব হাতড়াতে।

এই পুঁথিগত প্রয়োগহীন বিদ্যের অসার ফাঁকা অর্থহীনতা সুকুমারের আবোলতাবোল-অন্তর্ভুক্ত একটা কবিতার বিষয় হয়েছে। সেখানে বিদ্যের বোঝায় ভারী বাবুমশাই "সখের বোটে" জলভ্রমণ কালে মূর্খ মাঝির অজ্ঞানতার পরীক্ষা নিতে নিতে যখন তার জীবনের "বারো আনাই মিছে"— প্রমাণ করে ফেলছেন, তখনই ঝড় উঠল। এবং সঙ্গে সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারটির জীবনের "ষোল আনাই মিছে" এই সত্য মাঝির কাছে হাতে নাতে প্রমাণ হয়ে গেল।

এই শিক্ষিত ভদ্রলোক সমাজে জ্ঞান বলতে বোঝায় কিছু ফাঁকা কথার সংগ্রহ, যে-সব ভাল ও বড় বড় কথার সাথে বস্তুজগতের কোন সম্পর্ক থাকা চলবে না শুধু নয়, সেগুলো সাধারণ মানুষের ব্যবহারিক জগৎ থেকে যত দূরবর্তী হবে তার ভাব হবে তত ভারী ও গভীর। 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে সুকুমার এই "বাক্যভোজী...গন্ধর্বশ্রেণীর" ভদ্রলোকদের "ভাষার আশ্রয় লইয়া যে কোন অপকর্ম" অনুষ্ঠানের দায়ে ফেলেছেন। ভাষা তাঁদের কাছে নিজস্ব "অর্থগৌরবেই সত্য" নয়, "শব্দগৌরবে বড়"। এই বাস্তবতাকে সুকুমার ব্যঙ্গ করে-ছেন 'শব্দকল্পদ্রুম' (যার অপর নাম 'ফাজিলের ডিক্‌শনারি')

কবিতায়। যে "ঠাস্ ঠাস্ দ্রুমদ্রাম" ধ্বনির সাথে পট্কা ফাটার স্বাভাবিক ধ্বনিগত সাদৃশ্য, সেই শব্দে এখানে "ফুল ফোটে" এবং যে শব্দের ধ্বনির সাথে ঝোড়ো বাতাসের অনুষঙ্গ স্বাভাবিক সেই শব্দে এখানে সে-ফুলের গন্ধ ছুটে যায়।

ভাষার অত্যাচার সম্পর্কে আরো আগে লেখা একটা নাটক ব্রহ্মরূপী শব্দকে "অর্থপিশাচ" শব্দার্থ-অন্বেষণকারীদের কবল থেকে উদ্ধার করে অর্থের গুরুভার মুক্ত করে অর্থের বিষদাঁত ভেঙে শব্দকে "ঢোঁড়া" করে সাধনমার্গে উত্তীর্ণ হওয়ার মন্ত্র জপ করা হচ্ছে। আর, গল্পে একটা দাঁড়কাক পক্ষীর গলায় রাজসভার মধ্যে "কা" আওয়াজ করায় রাজা সন্ত্রস্ত হ'য়ে ওঠেন। এর কারণ কেউ বলতে পারে না। অবশেষে "রোগা সুঁটকো মতো একজন" অজ্ঞাতকুলশীল লোকের কাছ থেকে জানা গেল, ও দাঁড়কাক নয়, "দ্রিঘাংচু"। এই "দ্রিঘাংচু [illegible] পেলে", সেই মন্ত্র বললে "কি যে আশ্চর্য কাণ্ড হত তা কেউ জানেনা। কারণ তার কথা কোন বইয়ে লেখেনি"। সেই একই মন্ত্রের একটু প্রলম্বিত সংস্করণ জপ ক'রে 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' নাটকে সাধনমার্গে উঠতে হয়। মন্ত্রটা হল -

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইটপাটকেল চিৎপটাং
গন্ধগোকুল হিজিবিজি নো এডমিশন ভেরিবিজি
নন্দীভৃঙ্গী সারেগামা নেই মামা তাই কানামামা
মুস্কিল আসান উড়েমালি ধর্মতলা কর্মখালি
চীনেবাদাম সর্দিকাশি ব্লটিং পেপার বাঘের মাসি।

কোলকাতার শিক্ষিত ভদ্রলোকদের উৎকট অর্বাচীনতায় ভরা আজগুবি ভাবের খেলার উল্টোদিকে ছিল ভিস্তিওলা, মাঝি, বৃদ্ধ নাজির অথবা রোগা সুঁটকো মত নামগোত্রহীন সাধারণ মানুষরা। এদের সম্পর্কে সুকুমারের নিজের কথা—

All the messages of man, all the agelong gospels of hope and of liberty have re...hed down to the living depths within the common man—through endless tortures and denials, through the agonies of cataclysms (The Burden of the Common Man)। এই সাধারণ মানুষদের চোখ দিয়ে কখনো কখনো দেখিয়েছেন ঐ ভদ্রলোকদের আসল চেহারাটা। এক রাজার অঙ্ক মিলিয়েছিল ভিস্তিওলা, আর এক রাজমন্ত্রীর গায়ের গন্ধ ভাল কি মন্দ সে বিচার করার জন্যে কেউ যখন গন্ধ শুঁকতে পর্যন্ত ভরসা পাচ্ছে না তখন এক বৃদ্ধ নাজির মুশকিল-আসান করে। শুরু হয়েছিল গন্ধ ভাল কি মন্দ সেটা বিচার করার সমস্যা দিয়ে, শেষ হল গন্ধ শোঁকার সাহস পাওয়া দিয়ে। এটাই ঘটছিল তখন। বেড়ালের গলায় ঘন্টা না বাঁধলে বাঁচার উপায় নেই, কিন্তু ঘন্টাটা বাঁধার সাহস ছিল না।

যা কিছু স্বাভাবিক সেটাই তাঁদের তখন অবাক করছিল। হাত দিয়ে ভাতমাখা, খিদে পেলে খাওয়া, ঘুম পেলে চোখ বোজা— সবই "অবাক কাণ্ড"। আসলে ভুঁইয়ের উপর ঠ্যাং ঠেকিয়ে কেউই তো হাঁটছিলেন না। ভাবের ঘোরে এঁদের ঠ্যাং তখন আকাশে, আর হাত মাটিতে। এ ভাবের রাজ্যের রাজাকে দেখা যায় ছবির ফ্রেমে আমসত্ত্ব ভাজা বাঁধিয়ে রাখে, আর কুমড়ো নিয়ে ক্রিকেট খেলে সেই রাজার পিসি এবং রাজা শিরিষ কাগজের কণ্টকশয্যায় শুয়ে রাত্রিবাস করে। 'বোম্বাগড়ের রাজা' (সন্দেশের নাম 'কেন?') এবং 'অবাক কাণ্ড' সন্দেশের একই সংখ্যায় ১৩২৩-এর কার্তিকে ছাপা হয়েছিল। একটাতে সোজা স্বাভাবিক ঘটনাগুলো অবাক কাণ্ড মনে হচ্ছে আর অন্যটাতে সবকিছু উল্টো ঘটতে দেখে কবির শেষ প্রশ্ন "এমন [illegible] ঘটছে তা কেউ বলতে পারো মোরে?"

স্ব-[illegible] ফাঁকা বুলি সুকুমারের যুগের রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয়—সমস্ত পরিমণ্ডলটাকে দমবন্ধ গুমোটে ঠেসে রেখেছিল। সেই দূষিত পরিপার্শ্ব তাঁকে প্রভাবিত করেনি বরং সেই দূষণের মধ্যে তিনি সারাক্ষণ প্রতিষেধকের ভূমিকায় কাজ করে গেছেন। তৎকালীন যে ব্রাহ্মসমাজের কাছে সুকুমার ছিলেন উজ্জ্বলতম যুবক, 'সমাজের' নবযুবকদের স্বাভাবিক লীডার, সেই ব্রাহ্মসমাজের বড় বড় আদর্শের কথা, প্রয়োগহীন বাক্যসমষ্টি তাঁর কাছে 'false analogies' বলে মনে হয়েছে। ডায়েরীর একটা পাতায় লিখেছিলেন, 'fundamental ideal obscured by false analogies (This is true of practically all the various ideals of the SBS)'—SBS অর্থাৎ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। (অপ্রকাশিত 'হিজিবিজি খাতা'[১])।

কোন সন্দেহ নেই যে অসংখ্য false analogy-র গোলকধাঁধার ভেতর থেকে একটা fundamental ideal—জীবনের একটাই মৌলিক আদর্শের অন্বেষণ করতে হয়েছিল সুকুমারকে। সেই আদর্শকে শেষ পর্যন্ত তিনি যেভাবে খুঁজে পেয়েছিলেন তা বিশেষরূপে স্মরণীয়। কারণ উল্টো-দিকে যুগের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা ঐ false analogy-গুলোকেই বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ থেকে যখন যেটা সুবিধাজনক তখন সেটাকেই fundamental ideal বলে বক্তৃতা করেছেন। বস্তুগত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সুকুমার জীবনকে দেখেছিলেন বলেই জীবনের সব থেকে সরল ও মৌলিক সত্যের উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন এত দ্রুত। স্বল্প আয়ুর বাস্তবতাকে মনে রেখে বলতে হয় এটাই সুকুমারের জীবনের চূড়ান্ত উপলব্ধি। তার প্রমাণ আছে আবোলতাবোলের অপেক্ষাকৃত গম্ভীর একটা কবিতায়। মৃত্যুর তিনমাস আগে সন্দেশে প্রকাশিত এই কবিতা শুরু হয়েছে এইভাবে—"দাদা গো—দেখছি ভেবে অনেক দূর" ('ভাল রে ভাল')। অনেক দূর পর্যন্ত না ভেবে পরিপার্শ্বের অসংখ্য 'ভাল'র গোলকধাঁধা থেকে সবথেকে মানবিক এবং মৌলিক 'ভাল'টাকে এত সহজ করে উপলব্ধি করা যায় না, প্রকাশও করা যায় না। দুনিয়ার সমস্ত ভালত্বের চূড়ায় "পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়"-কে স্থান দেওয়াও যায় না।

"গানের পালা সাজ"

"গানের পালা সাজ" করেছিলেন যে কবিতায় তার নামও 'আবোলতাবোল'। গোড়ার 'আবোলতাবোল'-এ ড্রাম খাজিয়ে সবাইকে ডাক দিয়েছিলেন জীবনের অসংখ্য অসংগতিকে হাসতে হাসতে মুছে দিয়ে, সত্য আনন্দ অন্বেষণের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার উৎসবে যোগ দিতে—"আয় খ্যাপামন ঘুচিয়ে বাঁধন/জাগিয়ে নাচন তাধিন্ ধিন্"। "যেখানকার পথ সেখানেই" রয়ে গেল, শুধু পরিক্রমণটা দীর্ঘ হবার বদলে থেমে গেল বড় দ্রুত। জীবনের শেষ 'আবোলতাবোল'-এ "আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল" এই জগতের বিস্ময়, আনন্দ ও বেদনার সমস্ত অভিজ্ঞতার নির্যাসটুকু একেবারে দুহাতে উজাড় করে দিয়েছেন। গভীর অর্থপূর্ণ শব্দ ও শব্দের ধ্বনিকে ছন্দে গেঁথে তিনটে জগতের মাত্রাকে এখানে একসুরে বাঁধা হয়েছে।

সামনে তখন "মেঘমুলুকের ঝাপসা রাতে"র হাতছানি। "রামধনুকের আবছায়াতে" সত্ত্বেও বর্ণালীর সে-জগত তাঁর কাছে আনন্দের; কারণ, "হেথায় নিষেধ নাইরে দাদা/নাইরে বাঁধন নাইরে বাধা।" আর পিছনে ফেলে এসেছেন যে নিষেধ, বাধা, ধমক আর সন্ত্রাসে ঠাসা আজগুবি উদ্ভট মানুষদের জগৎ সে-সম্পর্কে অস্ফুট একটা অভিমান—

> আজকে দাদা যাবার আগে
> বলব যা মোর চিত্তে লাগে
> নাইবা তাহার অর্থ হোক
> নাইবা বুঝুক বেবাক লোক।

সুকুমার শুধু শব্দ নিয়ে অর্থহীন ছেলে-ভুলানো ছড়া বেঁধেছেন—এ অপবাদে তিনি শুধু নির্মল হাসির কবি, অনর্থের কবি, শিশুপাঠ্য 'আবোলতাবোলে'র কবি। তাঁর জীবৎকালে সন্দেশের পাতায় 'আবোলতাবোলে'র অনুরাগী বেবাক ছেলেবুড়ো পাঠকরা এভাবেই সুকুমারকে দেখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে 'প্রবাসী'-সম্পাদক লিখেছিলেন, "সুকুমার বিমল হাসির কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।......যাহাকে ইংরাজীতে nonsense rhymes (নন্‌সেন্স রাইম্‌স) বলে 'আবোলতাবোল' নাম দিয়া বাংলায় তাহার একরূপ প্রবর্তক ও সৃষ্টিকর্তা ছিলেন বলিলেও চলে।" 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এ ব্যাপারে একটা বাড়তি কথা বলা হয়েছিল "বয়োজ্যেষ্ঠরাও সেগুলি পাঠ করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিতে পারে।" সন্দেশের পাতায় একই কথা লিখেছিলেন শ্রী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বেবাক লোক না বুঝুক, এখন সামনে একটাই জগৎ অপেক্ষমান। পিছনে আর-একটা জগৎ অতীত। এই দুইয়ের মাঝখানে জীবনের তীরে দাঁড়িয়ে কোন কিছুকেই আর তোয়াক্কা নয়। বাকীটুকু নিজের সাথে আপনমনে কথা—

> আজকে আমার মনের মাঝে
> ধাঁই ধপাধপ্ তবলা বাজে—

অবশেষে মৃত্যুকে "আলোয় ঢাকা অন্ধকার" আর জীবনকে "ঘোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম" বলে তুড়ি দিয়ে যেন মহানন্দে "গানের পালা সাজ" করলেন। ১৯২৩-এর সেপ্টেম্বরে সুকুমারের

মৃত্যু। পঞ্চাশ বছর পরে, জুন ১৯৭৩-এ প্রকাশিত একটা লেখায় সত্যজিৎ রায় বলেছেন, "জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হয়ে এমন রসিকতা আর কোন রসস্রষ্টার পক্ষে সম্ভব হয়েছে বলে আমার জানা নেই।"

শেষ কথা

সুকুমারের মৃত্যুর আড়াই বছর পরে 'কল্লোল'-এ বুদ্ধদেব বসু অবশ্য সুকুমারের আবোলতাবোলকে স্রেফ ছেলে-ভুলানো ছড়ার তকমা এঁটে তথাকথিত সাবালক সাহিত্যের আসর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপপ্রয়াসেরও একটা জবাব দিয়েছিলেন— "এ অপূর্ব কবিতাগুলোকে কেবল nonsense rhyme বললে অনেকখানি কমিয়ে বলা হয়।...আবোলতাবোল...যদি বা nonsense rhyme হয় তবু এ অতি উঁচুদরের nonsense, কাব্যের কষ্টিপাথরে বিচার করলেও এ সব কবিতার মূল্য কিছু কমে ত' যায়ই না বরং অনেকখানি বেড়ে যায়।"

এ কি সেই Jack and Jill went up the hill অথবা "টিয়ের মা'র বিয়ে / লাল গামছা দিয়ে" ইত্যাদির মত ছড়া –যে ছড়া সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "ইহাদের কথা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে ; দুইয়ের বার" ?

'কল্লোল'-এর একই সংখ্যায় (বুদ্ধদেব বসুর বক্তব্যের উল্টোমত হিসেবে কিনা জানি না) "আবোলতাবোল" শিরোনামে ছাপা হয়েছিল অন্য যে প্রবন্ধটি তার লেখক মনীশ ঘটক (শ্রীযুবনাশ্ব) বলেছিলেন "মানে না থাকাই আলোচ্য সাহিত্যের মেরুদণ্ড। অর্থহীনতার বহিরাবরণ তাকে বজায় রাখতেই হবে।" সাহিত্যের "মেরুদণ্ড"টি সাহিত্যের "বহিরাবরণ" একথা মনীশ ঘটক লিখেছিলেন, বিশ্বাস করা সহজ না হলেও সত্যি। শব্দকে "তোড়া" করার ব্যারাম আজও আমাদের ঘোচে নি ; ইংরেজী ননসেন্সের ব্যাকরণগত তথাকথিত কাঠামো 'রসের' বোঝা মাথায় চাপিয়ে সুকুমার-প্রসঙ্গে হাস্যরসের ব্যাখ্যা আজও করা হয়।

সাহিত্যের উঁচু, সাবালক আসরে স্থান-না-পাওয়া ছেলে-ভুলানো ছড়া প্রসঙ্গে যে-রবীন্দ্রনাথ ঐ কথা বলেছিলেন, তিনিই কিন্তু সুকুমার সম্পর্কে ১.৬ ৪০ তারিখে লিখেছেন, "তাঁর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল"। ঠিক তাই, বিজ্ঞানীর গভীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি আয়ত্ত করতে না পারলে সমসময়ের জীবনকে এভাবে অনুভব করা যায় না, প্রকাশও করা যায় না। অতি-সংবেদনশীল তাঁর শিল্পীসত্তায় বাস্তবতার গভীরে অবস্থিত অসংগতিগুলো ধরা পড়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথের কথায় "তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।"

তারপরেও কেন সময়ের অসংগতিগুলোই শুধু তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হ'ল (ইতিবাচক দিকগুলো প্রায় স্থান পেল না বললেই চলে), এমন প্রশ্ন থাকতে পারে। যে বাঁধা গত্-এ এই প্রশ্নের উত্তর সহজলভ্য তা হ'ল—বাস্তবের অসংগতিই হাস্যরসের উৎস অর্থাৎ সুকুমারের আসল উদ্দেশ্য ছিল 'ননসেন্স' নামক এক বিশেষ শিল্পরূপের সৃষ্টি। কিন্তু কেবলমাত্র 'শিল্পরূপ' সৃষ্টির তাগিদে শিল্পসৃষ্টি হয়না। নির্দিষ্ট বাস্তব বিষয়গত অবস্থা মনে রেখে বলা যায় যে, সুকুমারের অত্যল্প জীবনকাল, বিশেষত তাঁর সাহিত্যিক জীবনের মূলপর্বটি (১৩২১ থেকে ১৩৩০—বঙ্গভঙ্গ রদের স্বদেশীযুগ শেষ হবার পরে শুরু এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী কয়েকটা বছর) আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পিছিয়ে পড়ার সময়। গোটা সময়পর্বে দেশপূজ্য নেতারা অসংগতিপূর্ণ অসংখ্য কার্যকলাপ করে 'দেশের হিত হচ্ছে' বলে চীৎকার করেছেন, যখন আসল হিতটা হয়েছিল বৃটিশ রাজশক্তির। অন্যদিকে যে শ্রমজীবী 'কমন-ম্যান'-এর চোখ দিয়ে দেখতে পারলে "পাঁউরুটি আর ঝোলা-গুড়"-এর fundamental ideal-কে বাস্তবায়িত করার পথ অন্বেষণ করা যায়, সেই চোখ দিয়ে দেখার শ্রেণীগত বাধা তাঁর ছিল। পিছু-হটাই যে সময়ের প্রধান দিক সেই অসময়ের আজগুবি আর উদ্ভট দিকগুলোকে—অসংগতিগুলোকে—তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তিগত স্বভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ একটা বিশেষ ও নতুন শিল্পরূপ (form) সম্ভবত সেই কারণেই তাঁকে আহরণ ও আয়ত্ত করতে হয়েছিল।

অনস্বীকার্য যে সমাজপাহাড়ের শীর্ষতলার মানুষ—যুগের সারথীরা তখন স্ব স্ব অবস্থানে দাঁড়িয়েই মস্ত মস্ত কেতাব বগলে নিয়ে কোটপ্যান্ট পরে বক্তৃতা করতেন। আর তার নিচের ধাপে একদল নিশ্চিন্ত আলস্যে মাছ ধরার নামে পাখির বাসায় ছিপ ফেলতো। এখানে যে শোনে তার কানে লাগানো

থাকে গ্রামোফোনের চোঙ, আর যে বলে সে উল্টোদিকে মুখ রেখে ত্রাহি চীৎকার করে। তারই পাশে সেই 'কমনম্যান'-রা, প্রায় আদিমযুগের বাসিন্দা—বল্কল পরে প্রাণ বাজি ধরে জীবনের মৌলিক চাহিদা মেটাতে বন্যজন্তু শিকার করে। কেউ একটু মাথা তুলতে চাইলে ভদ্রলোকি হাতা উদ্যত হয় তার মাথায়। এসব যিনি দেখেন সেই ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানবৃদ্ধ, চিন্তিত-মুখে হুঁকোহাতে তালগাছের মাথায় চাটাই পেতে বসে আছেন। দু-পাশে দুই জোকারকে নিয়ে মজাদার জমজমাট খেলা। অন্য একজন ক্ষ্যাপাটে চেহারার মানুষ গগনচুম্বী একটা মইয়ের ডগায় বসে নিবিষ্টচিত্তে মেঘমুলুকে "আবোলতাবোল" লেখেন। এটাই সম্ভবত সত্যি। এ সার্কাসে সুকুমার তাঁর নিজের অবস্থানটাও বুঝি 'আবোলতাবোল'-এর মলাট-টাতে[৩] এঁকে দিয়েছিলেন।

১। 'হিজিবিজি খাতা" আসলে সুকুমারের ডায়েরী। ডায়েরাটা পড়ার এবং প্রয়োজনীয় অংশ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়।

২। ২৩. ৮. ১৯২০ তারিখে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা সুকুমারের চিঠিটা সম্ভবত একবার প্রকাশ্যে পঠিত হয় কোলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সুকুমার-স্মৃতিসভায়। সুকুমারের মৃত্যুর পরে সেটাই প্রথম স্মৃতিসভা। সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুকুমার-গবেষক শ্রীকৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর সৌজন্যে চিঠিটা পড়া সম্ভব হয়েছে।

৩। ১৯. ৯. ১৯২৩-এ U. Roy & Sons থেকে পুঁথির আকারে প্রকাশিত "আবোলতাবোল" এখন দুষ্প্রাপ্য। পরবর্তীকালে 'সিগনেট প্রেস' আবোলতাবোলের মলাটের মধ্যবর্তী অংশটুকু ব্যবহার করেন। সুকুমার-অঙ্কিত মূল চিত্রণে দু'পাশে সার্কাসের দুটো জোকার ছিল। একজন চেলো বাজাচ্ছে, তার পিছনে বসে থাকা একটা বেড়াল তার শ্রোতা। অন্যজন একটা বিলিতি করতাল বাজাচ্ছে এবং বাচ্চা একটা শুয়োর নাকের ডগায় বল নিয়ে দু পায়ে খাড়া হয়ে নৃত্যরত। মলাটের জোকার দুটো দেখা সম্ভব হয়েছে শ্রীমতী নন্দিনী গুপ্তের (সিগনেট প্রেস) সৌজন্যে।

এঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ভারতী সেন

আবোলতাবোল-এর কাব্যভাষা

'আবোলতাবোল'-এর উদ্ভট জগতে আছে আমাদের পরিচিত সত্যেরই রূপান্তরীকরণ বা বিকৃতিকরণ। এই জগতের উদ্ভটত্ব ভাষাবাহিত হয়েই আমাদের চেতনায় ধরা দেয়। সংখ্যাতাত্ত্বিক সমীক্ষায় দেখা যায়, 'আবোলতাবোল'-এর কাব্যভাষায় অসংগত উদ্ভটের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। এই পরিমিতির কারণেই 'আবোলতাবোল' কোথাও ক্লান্তিকর হয়ে ওঠেনি, উপভোগ্যতা হারায়নি।

এক

"আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরো অনেক পৃথিবী রয়েছে যেন, সাধারণ চোখ দিয়ে স্বভাবত তা খুঁজে পাওয়া যাবে এমন নয়। থাকে তা সৃষ্টিপরায়ণ মানসের ভিতর। এঁরাই আমাদের দেখান। সেই সব পৃথিবীর ভিতর কোনোটা যেন এই জগতেরই তীব্র স্বচ্ছ মুকুরের মত, কোনোটা কিছু কুয়াশাচ্ছন্ন বা বিদ্যুতান্বিত, এই রকম এবং আরো অনেক রকম। কিন্তু সুকুমার রায়ের পৃথিবী—'আবোলতাবোলে' যা সত্য হয়ে জ্বলে উঠেছে তা মোটেই আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মত বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য। এইখানে কবির সাদাসিধেভাবে সে এক অনন্যসাধারণ শক্তি।"[১] (জীবনানন্দ দাশ)

'আবোলতাবোল' (১৯২৩)-এর খেয়াল-খোলা জগৎ শুরু হয়েছে স্বপনদোলার নৃত্যে, মত্ত মাদলের বোলে; আর মেঘ-মুলুকে ঝাপ্‌সা রাতে রামধনুকের আবছায়াতে—যেখানে স্বপ্ন দোলার আন্দোলন, আকাশ কুসুমের স্বতঃ-উদ্‌ভাস—সেখানে খেয়াল-স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে প্রান্তিক 'আবোলতাবোল' কবিতাটি শেষ করলেন ছত্রিশ বছরের উজ্জ্বল যুবক সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩)। কিন্তু আমাদের চেনাজানা পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্র হয়েও—'বেয়াড়া সৃষ্টিছাড়া নিয়মহারা হিসাবহীন' হয়েও, "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্‌ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার" হ'লেও—কেন এত পরিচিত ও সত্য হয়ে ওঠে এই আবোলতাবোল বিশ্ব? বাস্তববোধসম্পন্ন যুক্তিপরায়ণ সাবালক-মনের কাছেও কী করে এত উপভোগ্য (কাজেই গ্রহণযোগ্যও নিশ্চয়) হয় তা? লৌকিক জগতের নিয়ম সম্ভাবনা ও যুক্তিবিচারকে ভেঙে দিয়েই তো তৈরী হয়েছে এই জগৎ, লৌকিকের সঙ্গে ইচ্ছাকৃত-অসংগতিরচনার নৈপুণ্যেই তো বিস্ময়-কৌতুকে তা এত উপাদেয়, পাঠকের সেই বিস্ময়- ও কৌতুক-বোধের কাছেই তো এর আবেদন। অথচ সেই অসম্ভব জগৎকে তো মানুষ উপভোগ করে, অর্থাৎ মেনেও নেয় নিশ্চয়। এই বিচিত্র ব্যাপারের যেমন সংগত কারণ আছে তেমনি ঐ আবোলতাবোল বিশ্বের নির্মাণে কাব্য-ভাষার ভূমিকা নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই ভূমিকা কী, তা-ই আমাদের বর্তমান কৌতূহলের বিষয়।

বাস্তব না হয়েও সত্য

'ননসেন্স রাইম' মাত্রেই যে বিশুদ্ধ ('পিওর') ননসেন্স নয়, অনেকক্ষেত্রেই তা যে গূঢ় 'সেন্স'-এ উজ্জ্বল—একথা সমালোচনা-প্রথিত। 'আবোলতাবোল'-এর জগৎও একেবারে বিশুদ্ধ ননসেন্স নয়। তা "আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য।" কারণ, প্রথম কথা, এই জগতে আছে পরিচিত বাস্তব-সত্যেরই রূপান্তরীকরণ কিংবা অতি-করণ। পেঁচী ও তার সঙ্গীতমুগ্ধ প্যাঁচা বিশেষ ধরণের মানবদম্পতিরই রূপান্তরিত—হয়তো একটু অতি-কৃত—চিত্র ('প্যাঁচা আর প্যাঁচানি')। নন্দ-খুড়োর হাত-গণনা ও তার প্রতিফল তো আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা, কবি শুধু সকৌতুকে দেখিয়ে দিয়েছেন ঘটনাটির অসংগত দিক ('হাতগণনা')। তাই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বেড়া-না-মানা শৈশবে[২] আর নিহিত-ইঙ্গিত-মুগ্ধ কৈশোরে ও সাবালকজীবনে, সব বয়সেই, 'আবোলতাবোল' এত আকর্ষক, এত সত্য। দ্বিতীয়ত, সেই জগতে—সম্ভাবনার সীমা বারবার লঙ্ঘিত হওয়া সত্ত্বেও অসম্ভবের নিজস্ব নিয়ম ও যুক্তিগুলি ঠিক রক্ষা করেন সুকুমার। কোনো বিশেষ চরিত্রের পক্ষে একটি অসংগত কাজই সংগত হতে পারে, যেমন আয়েশে-নৃত্যপর আহ্লাদী ও কাঁচকলাভোজী একটি নিরীহ বুদ্ধিচর্চারহিত চরিত্রের পক্ষে তার দুটি লেজের মধ্যবর্তী কোনো মাছিকে নাড়া তো সমস্যার বিষয় হতেই পারে ('হুঁকোমুখো হ্যাংলা')। আবার, জগৎটি আবোলতাবোল বলেই সেখানে মেনে নিতে হয় কুমড়োপটাশ-রামগরুড়-বোম্বাগড় ইত্যাদির সম্ভাবনা। তৃতীয়ত, হুঁকোমুখো-কুমড়োপটাশ-ট্যাঁশগরু-অধ্যুষিত এই দেশটির অধিষ্ঠান যেন 'পরিচিত' ও 'সত্য' জগতেরই কাছাকাছি। হুঁকোমুখোর বাড়ি বাংলাদেশে, তার মামার নাম বাঙালীর সুপরিচিত শ্যামাদাস, ট্যাঁশগরুর দেখা হারুদের আপিসেই পাওয়া যায়। চতুর্থত, কবির বর্ণনীয় বিষয় ও বর্ণনা-ভঙ্গির বৈপরীত্যে যেমন অসংগতি-জনিত বিস্ময়-কৌতুক ঘনিয়ে ওঠে তেমনি উদ্ভটের বর্ণনায় কবির অনুত্তেজিত ভঙ্গি যেন অসম্ভবকেও সত্য ক'রে তোলে। একদিকে কবি খুব সপ্রতিভভাবে বিনা-ভূমিকায়—বড়োজোর 'ব্যাকরণ মানি না'র অতি-সংক্ষিপ্ত একটি দুঃসাহসিক উক্তির যুক্তিতেই—ব'লে গেছেন কুমড়োপটাশ-রামগরুড়-হাঁসজারু-বকচ্ছপদের কথা; অন্যদিকে 'মাসি গো মাসি', 'শুনছ দাদা' বা 'ডানপিটে'র মতো কবিতায় নিতান্ত-স্বাভাবিক সব ঘটনা ও চরিত্রই উপস্থাপিত হয়েছে বিস্ময়কর কিংবা উদ্ভট হিসেবে। পঞ্চমত, আবোলতাবোল কথা বলতে গিয়ে সুকুমার কখনোই অসংযত-কাল্পিক, অমিতবাক্ বা পুনরুক্তিপরায়ণ নন। তাই আপাত-অসত্য এই জগৎটিকে বিরক্তিকর অসম্ভব বলে মনে হয় না একবারও।

আসলে সুকুমারের উদ্ভটকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল তাঁর বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণশক্তি, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতা। তাই তাঁর আবোলতাবোল জগতেও তির্যকভাবে ফুটেছে বাস্তব পৃথিবী, অযৌক্তিকের মধ্যেও এসেছে যুক্তি। তাই এ-জগৎ এত সত্য, এত প্রত্যক্ষ। এছাড়া 'আবোলতাবোল'-এ আছে হৃদয়দ্রাবী সব মানবিক অনুভূতি— সিদ্ধকাম বিস্তুতাম্বিত জীবের একাকীত্ব ও অস্বস্তি ('বিস্তুত'), জীর্ণ গৃহে হাসিমুখ বৃদ্ধার দুরবস্থা ('বুড়ীর বাড়ী'), মৃত্যুপথযাত্রী কবির সংক্ষিপ্ত ও অনাড়ম্বর বিদায়বাণী—"ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর / গানের পালা সাঙ্গ মোর" (প্রান্তিক 'আবোলতাবোল')। আর আছে আবোলতাবোল কল্পনার ফাঁকে ফাঁকে ইমাজিনেশনের ক্ষণিক আভা—বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় "মাঝে মাঝে পদ্যের সীমা পেরিয়ে তিনি কবিতার স্তর স্পর্শ করে যান"।[৩] 'ভালরে ভাল'-তে, 'রামগরুড়ের ছানা'তে, প্রান্তিক 'আবোল তাবোল'-এ এর প্রমাণ আছে।

ভাষাসম্ভব জগৎ

এই আবোলতাবোল এক ভাষাসম্ভব জগৎ। স্থানকালগত অসীম দূরত্বের যুক্তিতে অর্থাৎ 'সাতসমুদ্রতেরোনদীর পারে' কিম্বা 'অনেক অনেক দিন আগে' স্থাপন ক'রে—এ-জগৎকে বিশ্বাস্য করার চেষ্টা করেন না কবি। কাব্যভূমিকাতেই তিনি বলে দিয়েছেন, শুধু আজগুবি-অসম্ভব-উদ্ভট-রসিকের কাছেই এ-গ্রন্থের আবেদন[৪]। প্রারম্ভিক 'আবোলতাবোল' কবিতাতেও তিনি সেই পাঠকদের আহ্বান ক'রে বলেছেন—"আয় রে তবে ভুলের ভবে অসম্ভবের ছন্দেতে"[৫]। এমন-কি এই ভুলের ভুবন রবীন্দ্রনাথের 'সে'-(১৩৪৪ ব.)র মতো গল্পলোক নয়,

ক্যারলের এলিস-কাহিনী (১৮৬৫ ও ১৮৭২ খ্রী.), ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯ ব.) বা সুকুমারের 'হ য ব র ল' (১৩২৯ ব.)-র মতো স্বপ্নরাজ্যও নয় তা। এ-বিশ্ব আছে শুধু কবির চিত্তলোকে, ভাষায় তা ধরা দেয় এবং ভাষাবাহিত হয়ে উপস্থিত হয় পাঠকচিত্তে। তাই একে বলি ভাষার গুণে তৈরি এক ভিন্ন বাস্তব।

মানবভাষার অসীম মহিমার কথা জানতেন সুকুমার রায়। অসমাপ্ত 'বর্ণমালাতত্ত্ব' কবিতায় তিনি লিখেছেন,

> "ভাষার প্রবাহে পুলকে-কম্পে জড়ের জড়তা ছাড়ে।।...
> নমো-নমো নমঃ সৃষ্টি প্রথম, কারণ-জলধি জলে
> স্তব্ধ তিমিরে প্রথম কাকলী প্রথম কৌতুহলে;
> আদিম তমসে প্রথম বর্ণ, কনক-কিরণ-মালা;
> প্রথম-ক্ষুধিত বিশ্ব-জঠরে প্রথম প্রশ্ন-জ্বালা।' ৬

এই ভাষা দিয়েই তো প্রবাহিত হয় কাব্যের ভাব—"কাব্যের ভাষা নামক জিনিসটা কতকগুলি নির্দিষ্ট শব্দ বা তৎসূচক চিহ্নাদি দ্বারা ভাব-বিনিময়ের একটা সাঙ্কেতিক উপায়"[৭]। তাঁর আবোলতাবোল কাব্যজগৎও গড়ে উঠেছে এই ভাষা দিয়েই। এ-জগতের নির্মাণে, উপভোগ্যতায়, গ্রহণযোগ্যতায় ভাষার ভূমিকা অসাধারণ।

আবার, "ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, একথা ভুলিয়া সে যখন কেবলমাত্র শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য"[৮]—একথাও স্পষ্টভাবে বুঝেছেন ও বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রাবন্ধিক সুকুমার রায়। বলেছেন, "চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না।"[৯] তাই নিজের আবোলতাবোল (বা তথাকথিত আবোলতাবোল) চিন্তাগুলিকে রূপ দেবার জন্য নতুন-নতুন শব্দ তৈরী করেছেন তিনি, পরীক্ষা করেছেন শব্দের ধ্বনিগত রূপ নিয়ে, দেখিয়ে দিয়েছেন একই ধাতুর ভিন্ন-ভিন্নার্থক ব্যবহার।

দুই

'আবোলতাবোল'-এর কাব্যভাষায় স্বাভাবিক সুপরিচিত বাঙলাভাষার বহুল ব্যবহার দেখা যায়, সে-ভাষার উপাদানে উদ্ভট অলৌকিক বিস্ময়বহ কৌতুককর কিছুই নেই। অনেক সময়েই বাঙলা কথ্যছাঁদকে পদ্যছন্দে আনতে পারেন সুকুমার। কখনো কখনো একেবারে গদ্য করেই লেখা যায়—"শুনে লোকে দৌড়ে এল, ছুটে এলেন বদ্যিমশাই, সবাই বলে, 'কাঁদছ কেন? কি হয়েছে নন্দগোঁসাই'?" ('হাত-গণনা'); "ছায়াধরার ব্যবসা করি তাও জাননা বুঝি? রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া, হরেক রকম পুঁজি।" ('ছায়াবাজি'); "এটা চাই সেটা চাই কত তার বায়না—কি যে চায় তাও ছাই বোঝা কিছু যায় না" ('কিম্ভূত'); "রুচি নাই আমিষেতে, রুচি নাই পায়সে [,] সাবানের সুপ আর মোমবাতি খায় সে" (ট্যাঁশগরু)। কখনো-বা পদ্যের প্রয়োজনে গদ্য-অন্বয় বিপর্যস্ত হলেও তাঁর পদ্যে ধরা যায় বাঙলা বাক্‌স্পন্দ—"দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো, বুড়ো আছে নেইকো হাসি, হাতে তার নেইকো হুঁকো।" ('হাত গণনা') "থাকে সারা দুপুর ধ'রে বসে বসে চুপটি করে, হাঁড়িপানা মুখটি ক'রে আঁকড়ে ধরে শ্লেটটুকু" ('নেড়া বেলতলায় যায় ক'বার')। আবার পুরনো পদ্যের স্বভাবে এসে-যাওয়া দু-একটি পদ ('তাহা', 'কভু', 'বাহারে', 'নাহি',) ছাড়া এ-ভাষাও তো মৌখিক বাঙলা গদ্য—"নাই তার মানে কি? কেউ তাহা জানে কি? কেউ কভু তার কাছে থেকেছ?" ('হুঁকোমুখো হ্যাংলা'); "মানবে না কোনো কথা চলাফেরা আহারে, একদিন টের পাবে ঠেলা কয় কাহারে।" (সাবধান); "বাপরে কি ডানপিটে ছেলে!—খুন হত টম চাচা ওই রুটি খেলে। সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে, রেগে তাই দুই ভাই ফোঁস ফোঁস ফোলে" ('ডানপিটে')। 'বুঝিয়ে বলা'য় বুঝিয়ে-বলার মৌখিক গদ্যভাষাটি কবিতার ছন্দে উঠে এসেছে—"অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্‌ রোদ পড়েছে ঘাসেতে, এই মনে কর্‌, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে—"। 'নারদ! নারদ!'-এর ভাষাও গায়ে-পড়ে-ঝগড়া-করার স্বাভাবিক বাঙালি ভঙ্গি—"হ্যাঁরে হ্যাঁরে তুই নাকি কাল সাদাকে বলেছিলি লাল?" ক্রোধে বঙ্গসন্তানের মুখে শুদ্ধ-অশুদ্ধ ইংরেজী বেরোয়। 'নারদ! নারদ!'-এর ভাষা তাই এত স্বাভাবিক—"ক্যান্‌ রে ব্যাটা ইসটুপিড্‌? ঠেঙিয়ে তোরে করব ঢিট।' "চোপরাও তুম স্পিকটি নট, মারব রেগে পটাপট—"। সপ্রতাপে বিশেষ আদেশ করার সময়ে বাঙালির মুখে যে বিশে হিন্দি শব্দটি প্রায়ই শোনা যায়

সুকুমার সেটিকে যথাস্থানে ব্যবহার করেছেন—"রাজা হাঁকেন, বোলাও তবে—রামনারায়ণ পাণ্ড্য" ('গন্ধ বিচার')। আবার এ-কবিতাতেই বাঙালীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে হিন্দিভাষী 'শের পালোয়ান ভীমসিং'-এর মুখে স্বাভাবিকভাবে আসে হিন্দি-বাঙলা মেশানো ভাষা—'রাম্রে আমার বোখার হ'ল বলছি হুজুর ঠিক বাৎ"। উচ্চারণগত ত্রুটিও অবিকল তুলে দেন কবি—"ট্যাক্‌স" (ট্যাক্‌স্), "চান্নি" (চাঁদনি)।

এই স্বাভাবিক সুপরিচিত ভাষায় 'আবোলতাবোল'-এর জগৎটি যেমন 'পরিচিত' ও 'সত্য' হয়ে উঠেছে তেমনি উদ্‌ভটের বর্ণনায় এই স্বাভাবিক ভাষার বৈপরীত্যে আরো নিবিড় হয়ে ওঠে উদ্দিষ্ট বিস্ময়-কৌতুক-রস।

আবোলতাবোল-বিশ্বে যেমন সম্ভব-অসম্ভবের সহজ সহাবস্থান তেমনি এর কাব্যভাষায় সহজ স্বাভাবিক অবিস্ময়করের সঙ্গেই আছে উদ্‌ভট বিস্ময়ধর্মী ভাষা। 'খিচুড়ি' কবিতায় শব্দের ধ্বনিগত রূপ অবলম্বন ক'রে সুকুমার তৈরী করেছেন জোড়কলম সব উদ্‌ভট শব্দ—'হাঁসজারু' 'বকচ্ছপ' 'হাতিমি'। 'কারুণীয় গূঢ়তা' হয়তো নেই এইসব জোড়কলমে (যেকথা বলেছেন বুদ্ধদেব বসু[১০]), কিন্তু এইসব শব্দের ভিত্তিতেই উদ্‌ভাবিত হয়েছে উদ্‌ভট সব প্রাণী, ছবিতে প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে তাদের চেহারা। শব্দই এখানে নতুন নতুন উদ্‌ভট জীব তৈরী করেছে, জীবগুলির পরিচায়ক হিসেবে তৈরী হয়নি উদ্‌ভট শব্দ—যেমন হয়েছে রামগরুড়, হুঁকোমুখো বা কুমড়োপটাশের ক্ষেত্রে। 'খিচুড়ি'র আর-এক বৈশিষ্ট্য হল—জোড়কলম সমস্ত প্রাণীরই সচিত্র বর্ণনা আছে, সেখানে হাঁসজারু-বকচ্ছপ-হাতিমির উল্লেখ ছাড়াও আছে গিরগিটিয়া বিছাগল জিরাফড়িং মোরগরু সিংহরিণের ইঙ্গিত, কিন্তু এই শেষোক্ত শব্দগুলি উচ্চারিত হয়নি একবারও। এই সংযমে ও ইঙ্গিতবহনেই কবিতাটির উদ্‌ভটত্ব এত উপভোগ্য। সবকটি নামের উল্লেখ পাঠকের পক্ষে একঘেয়ে বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর হয়ে উঠতে পারত।

'আবোলতাবোল'-এর উদ্‌ভট ও অসম্ভবগুলি যেমন অনেক সময়ে বাস্তবেরই রূপান্তরিত বর্ণান্তরিত বা অতিকৃত রূপ তেমনি এর ভাষাও অনেকসময়ে উদ্‌ভট ও আপাতনিরর্থক হলেও গূঢ়ার্থবহ ইঙ্গিতধর্মী বাস্তবের-অনুসরণেই-উদ্‌ভাবিত। লৌকিক জগতে পণ্ডপাণ্ডিত্যের যে বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তারিত হয় তার প্রতি কটাক্ষ করেই সুকুমার লিখেছেন, "বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে, অর্থাৎ কিনা লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—/গোড়ায় তবে দেখতে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে, / রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।" ('বুঝিয়ে বলা')

[অনিবার্যভাবে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' (১২৯৯ বঙ্গাব্দ)-এর কথা—'ত্র্যম্বকের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ' ইত্যাদি। তাছাড়া মনে পড়ে ভাষার অত্যাচারের উদাহরণে প্রাবন্ধিক সুকুমার লিখেছেন, "একটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক কৃষ্ণলীলার সমর্থনের উদ্দেশ্যে তর্ক করিতেছিলেন। তাঁহার যুক্তি প্রণালীটা এইরূপ—সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণাশ্রিত পুরুষ তিন রকম ভাবাপন্ন সুতরাং তিনের সাধনমার্গ ও অধিকারভেদ তিন প্রকার। সুতরাং নিম্নস্তরের অবিদ্যাশ্রিত আদর্শের দ্বারা সাত্ত্বিকী প্রকৃতির আশ্রয়ীভূত নিত্যমুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিচার করিলে চলিবে কেন?—ইত্যাদি। প্রতিপক্ষ বেচারা বাক্যজালে আবদ্ধ ও প্রত্যুত্তর দানে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া ছটফট করিতে লাগিলেন। সগুণ নির্গুণ পুরুষ প্রকৃতি প্রাণ কারণ শব্দব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি শব্দঘটার সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্যের মধ্যে গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে ভাবটুকু ছিল সে কোনকালে খোলস ছাড়িয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে?" ('ভাষার অত্যাচার')]

এবং "মুণ্ডুতে 'ম্যাগ্‌নেট' ফেলে, বাঁশ দিয়ে 'রিফ্লেক্‌ট্' ক'রে ইঁট দিয়ে 'ভেলসিটি' ক'ষে দেখি মাথা ঘোরে কি না ঘোরে।" ('বিজ্ঞান শিক্ষা')

আবার প্রান্তিক 'আবোলতাবোল' কবিতায় "আলোয় ঢাকা অন্ধকার / ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার। / গোপন প্রাণে স্বপন দূত, / মঞ্চে নাচেন পঞ্চভূত!"—নিরর্থক। কিন্তু অবালক পাঠক (কিছু কিশোরও নিশ্চয়) মুগ্ধ হয় এই সূক্ষ্ম কবিকল্পনা ও স্বপ্নমোহে, আর্ত হয় মৃত্যুপথযাত্রী যুবক-কবির জন্য—যাঁর নিভৃত হৃদয়ে তখনো স্বপ্নদূতের আনাগোনা, কিন্তু পাঞ্চভৌতিক দেহ বিলীন হতে দেরি নেই আর। 'ভুলোর গান'-এ "বিদ্যুটে

রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুটে ফাঁকা"—আপাতদৃষ্টিতে অসংগত নিশ্চয়। কিন্তু রাত্রি ও নির্জনতার বিশেষণ দুটির জায়গা-বদল করে দিয়ে (অন্তত প্রথমটির বিশেষণ দ্বিতীয়টিতে আরোপ ক'রে) উদ্দিষ্ট আবহাওয়া যেন আরো প্রত্যক্ষবৎ ক'রে দেন সুকুমার। 'খুড়োর কল'-এর "দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা" বাক্যে পুনরুক্তিমূলক পদের আপাত-অহেতুক ব্যবহারে আসলে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে কলটির বিচিত্র 'সহজত্ব'—"ঘন্টা পাঁচেক ঘাঁটলে পরে আপনি যাবে বোঝা"। "শুনতে পেলাম ভূতের মায়ের মুচকি হাসি কট্‌কটে" ('ভূতুড়ে খেলা') বাক্যে আওয়াজ বা রঙের বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে হাসিতে, নীরব-হাসি সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'শুনতে পেলাম'—অদ্ভুত নিশ্চয়। কিন্তু এতেই কি প্রত্যক্ষীভূত হয় না ভৌতিক মুচকি হাসির চেহারা ? "এই দ্যাখো ভরা সব কিল্‌বিল্‌ লেখাতে" ('নোটবই') বাক্যে অনড় অক্ষরের বিষয়ে যে বিশেষণটি ব্যবহৃত হয়েছে সেটির আভিধানিক অর্থ 'সাপ কৃমি ইত্যাদির তুল্য দেহসঞ্চালন' ('চলন্তিকা')। নোটবই-ভরা লেখাগুলির চিত্র ও চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে মুহূর্তে। আবার নিরর্থক 'কুমড়োপটাশ' নামে চরিত্রটির আকৃতির ব্যঞ্জনা, 'হুঁকোমুখো' নামে ধরা পড়ে একটি বিশেষ মুখচ্ছবি, 'ফুটোস্কোপ' নামকরণে যন্ত্রটির ছিদ্রসর্বস্বতা বা অসারত্ব ফুটেছে। "দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম। দেড়ে দেড়ে দেড়ে!"—নিরর্থক নিশ্চয়। কিন্তু কর্মব্যস্ত এই দ্রুত পৃথিবীতে যারা 'আসল কথা'টি বুঝে নিয়েছে, শুনতে পাচ্ছে সঙ্গীতের মধ্যে তবলার বাদ্য, চাঁদনি রাতের গান কেড়ে এনে নির্ভাবনায় গেয়ে যাচ্ছে সেই গান, তাদের মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই আপাত-নিরর্থক-এ।

আবার অসম্ভবের সহজ আনন্দ পাবার জন্য যেমন মেনে নেওয়া হয় 'আবোলতাবোল'-এর কাষ্ঠভক্ত বৃদ্ধকে, মেনে নেওয়া হয় ছায়াধরার ব্যবসায়ীকে, বোম্বাগড়ের রাজপরিবার ও প্রজাবৃন্দকে, তেমনি উপভোগ্যতার জন্যই গ্রহণযোগ্য হ'য়ে ওঠে নিরর্থক 'গুংগা', 'বোম্বাগড়', 'এঁ্যাকাচোর'। 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর অর্থ যারা জানে না সেইসব শিশুর কাছে শব্দটি ধ্বনিগুণে ও অপরিচয়ের রোমাঞ্চে আকর্ষক। আবার পরিণততর পাঠক ব্যাকরণ-বিষয়ক এই শব্দটির অন্যার্থক ব্যবহারে বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করে। 'দুন্দুভি' ও 'অরণি'র মতো দুর্বোধ্য সব অর্থবহ শব্দও শিশুর কাছে নিরর্থকের আনন্দবহ। আর কিশোর ও সাবালকের দৃষ্টি এইসব পাণ্ডিত্যগন্ধী শব্দে চিনে নেয় সুকুমারের সকৌতুক কটাক্ষ ও তার লক্ষ্যবস্তু,

"এই দ্যাখো পেনসিল নোটবুক এহাতে
এই দ্যাখো ভরা সব কিলবিল লেখাতে।...
কার নাম 'দুন্দুভি' ? কারে কয় 'অরণি' ?
বলবে কি, তোমরা তো নোটবই পড়োনি।" (নোটবই)

সম্ভব-অসম্ভবের সহাবস্থানে 'আবোলতাবোল'-এর বিস্ময়-কৌতুক নিবিড়। এর কাব্যভাষাতেও আছে বিপরীতধর্মী সব পদের নিকট-অবস্থান, জমে উঠেছে অসংগতিজনিত কৌতুকরস, ঘনিয়ে এসেছে বিস্ময়লোকের আবহ। কখনো সহজ ভাষার মধ্যে বিপরীতধর্মী পদের আকস্মিক ও সপ্রতিভ প্রয়োগ—

"হাতিটার কী বাহার দাঁতে আর শুণ্ডে—
ওরকম জুড়ে তার দিতে হবে মুণ্ডে!" ('কিম্ভূত')
"বসে যদি ডাইনে, লেখে মোর আইনে
এই ল্যাজে মাছি মারি ত্রস্ত ; ('হুঁকোমুখো হ্যাংলা')

কখনো-বা বিসংগতিমূলক পদে অন্ত্যমিল রচনা—'রাসে' ও 'হাসে' ('রামগরুড়ের ছানা'), 'পুণ্যফলে' ও 'পটল তোলে' ('হাতগণনা'), 'জল্লাদ' ও 'আহ্লাদ' ('গন্ধবিচার'), 'ত্যাগ করে' ও 'ফ্যাক করে' ('আহ্লাদী')।

বাস্তবের বিচিত্র অসংগত দিকগুলি যেমন স-কৌতুকে দেখিয়ে দিয়েছেন সুকুমার তেমনি দেখিয়ে দিয়েছেন—বাঙলা ভাষায় এক-একটি ধাতু কেমন দ্ব্যর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। 'আবোলতাবোল'-এর কল্যাণে স-কৌতুকে—যেন একটু অপ্রতিভ হাসিতে—আমরা দেখেছি কতো মূঢ় রীতিনীতিতে বন্ধ আমাদের জীবন ('কুমড়োপটাশ'), বুঝেছি গোঁফ দিয়ে মানুষ চেনার মতোই অসংগত কাজ করি আমরা, বিদ্যা-বিত্ত-পদমর্যাদা দিয়ে মানুষকে চিনি, এমন-কি নিজেকেও চেনাই ('গোঁফচুরি')। তেমনি 'শব্দকল্পদ্রুম' পড়ে জানা গেল যে বাঙলাভাষার এক 'ফোটে' ক্রিয়াপদটি ফুল ও পটকা উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করি আমরা—একেবারে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থে ! 'ছুটে যায়' 'পড়ে' 'ডুবে গেল' 'কাটে' 'ভাঙে' 'ঘোরে' 'বাজে' 'ফাটে' 'মারে' সম্বন্ধেও একজাতীয় কথাই বলা যায়। এ যেন বাঙলা-ব্যাকরণ-বিষয়ক এক উদ্‌ভট-রসের কবিতা।

ভাষার উপাদান

এইভাবেই অবিস্ময়ে ও বিস্ময়-কৌতুকে গড়ে উঠেছে 'আবোলতাবোল'-এর কাব্যভাষা, স্বাভাবিক ও উদ্‌ভট স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করেছে সেখানে, 'পরিচিত' ও 'সত্য' করে গড়ে তুলেছে এক আবোলতাবোল জগৎ। সে-জগতের নির্মাণে ও উপভোগ্যতায় এই দুধরণের ভাষাই মূল্যবান। কী করে, কোন্ নিয়মের বলে এত সহজ স্বাভাবিকতায় মিলেমিশে আছে এদুটি—তা ব্যাখ্যা করা যায় না কিছুতেই। বলতে হয়, সেই নিয়তি-কৃতনিয়মরহিত শক্তিই আছে এর পিছনে যার নাম 'প্রতিভা'। তবে ভাষার উপাদান বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যেতে পারে—কোন ভাষার পরিমাণ কতো এবং সেই পরিমাণের সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে।

সেই উপাদান-বিশ্লেষণের জন্য (১) 'আবোলতাবোল'-এর কবিতাগুলির শতকরা চল্লিশ ভাগ (৪০%) সমসম্ভব নমুনা (random sample) হিসেবে সংগ্রহ করা হ'ল, অর্থাৎ এমনভাবে নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হ'ল যাতে যে-কোনো কবিতার অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা সমান থাকে।

(২) সংগৃহীত কবিতাগুলির বাক্য ধরে বিচার করা হ'ল। কারণ, উল্লেখিত দুধরনের ভাষার যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি লক্ষ্য করার জন্য বাক্যই অবলম্বনযোগ্য। বাক্যে একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ পায় ব'লে বাক্যমধ্যে বিভিন্ন শব্দ ধাতু প্রত্যয় বিভক্তি ইত্যাদির নির্বাচন ও ব্যবহার, পদসংস্থান-রীতি—এরকম বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেই বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ভর করে।

(৩) কবিতাগুলির শিরোনামকেও এক-একটি বাক্য বলে ধরা হ'ল। এছাড়া সাধারণত পূর্ণচ্ছেদ বিস্ময়চিহ্ন ও জিজ্ঞাসা-চিহ্নে সম্পূর্ণ বাক্যটি শেষ হয়েছে ব'লে ধরা হ'ল। তবে কোনো কারণে বাক্য সম্পূর্ণ না হ'লে বাক্যাংশকেই সম্পূর্ণ বাক্য বলে ধরা হয়েছে। যেমন, 'এক যে রাজা—' (।) 'থাম না দাদা, রাজা নয় সে, রাজ পেয়াদা। (।)' ধরা হয়েছে : বাক্যসংখ্যা=২

সমীক্ষায় দেখা যায় যে মোট বাক্যসংখ্যার শতকরা উননব্বই ভাগ (৮৯%) বাক্যের ভাষাতেই কোনোরকম অসংগতি উদ্‌ভটত্ব বা বিস্ময়-কৌতুক-সৃষ্টির ঐজাতীয় কোনো আনুকূল্য নেই, আছে বাকি শতকরা এগারো ভাগ (১১%) বাক্যের ভাষায়। অর্থাৎ আবোলতাবোল জগৎ তৈরী করার ব্যাপারে এই দ্বিতীয় ধরণের ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হ'লেও এর ব্যবহার পরিমিত। পরিমাণগত বিচারে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অ-বিস্ময়-কৌতুককর ভাষাই আবোলতাবোল জগতের প্রধান উপকরণ। দ্বিতীয় ধরণের ভাষা পরিমাণে বেশী হ'লে 'আবোলতাবোল' সম্ভবত পাঠকের কাছে ক্লান্তি বিভ্রান্তি ও বিরক্তির বিষয় হয়ে উঠত।

এরকম অনুমানের কারণ আছে। সাহিত্যে ননসেন্স রাইমের নিকটতম আত্মীয় ফ্যানটাসি। লুইস ক্যারলের এলিসের গল্প[১১] (১৮৬৫ খ্রী. ও ১৮৭২ খ্রী.), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯ ব.), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সে' (১৩৪৪ ব.) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভূতপতরীর দেশ' (১৯১৫ খ্রী.), 'খাতাঞ্চির খাতা' (১৩২৭ ব.), সুকুমারের 'হযবরল' (১৩২৯ ব.) প্রমুখ ফ্যানটাসিতেও ধরা দেয় এরকম সত্যাসত্য মেশানো এক-একটি আশ্চর্য-উদ্‌ভট জগৎ, সঙ্গে বিকীর্ণ হয় কৌতুকের ছটা—যেমন হয়েছে 'আবোলতাবোল'-এর জগতে। শেষোক্ত চারটি ফ্যানটাসির গদ্য ভাষা সমীক্ষা ক'রে[১২] দেখা গেছে, এই রচনায় তিন ধরণের গদ্যভাষার ব্যবহার আছে : (ক) স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অ-বিস্ময়কর গদ্যভাষা। এর মধ্যে পড়ে : ১. বাঙলায় 'আধুনিক কালের সাহিত্যের ভদ্র ব্যবহারের প্রধান ভাষাছাঁদ চলিত ভাষা[১৩], ২. বাঙলা ভাষার বিভিন্ন লৌকিক কথ্য ছাঁদ, ৩. স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনমত ব্যবহৃত শুদ্ধ-অশুদ্ধ অ-বাঙলা ভাষা, এবং ৪. প্রত্যক্ষ ও স্বচ্ছন্দ গল্পকথনের ভাষাভঙ্গি।

(খ) অতিরিক্ত বিদগ্ধ উজ্জ্বল মাজিত চলিত গদ্য, যা বিস্ময়ের আবেদন জাগায় না। (গ) গদ্যভাষায় কোনোরকম অসংগতি, উদ্‌ভটত্ব, অ-লৌকিকত্ব বা বিস্ময়সৃষ্টির ঐজাতীয় কোনো আনুকূল্য। এর মধ্যে পড়ে : ১. বিস্ময়সৃষ্টির জন্য অর্থবহ ও অ-বিস্ময়কররূপে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার (যেমন 'টিন্টিন্যাবুলেশন', 'ধাঁইকিড়ি'), ২. ভাষায় পরিচিত সাহিত্যের উপাদান ব্যবহার (যেমন 'তিরপূনির ঘাট', 'প্যাখনা বিবি'), ৩. অলৌকিকের-অনুষঙ্গ-বাহী ভাষা ব্যবহার (যেমন 'একানোড়ে'), ৪. মোটামুটি-অর্থবহ কিন্তু অসংগতিমূলক

ভাষা উদ্‌ভাবন (যেমন 'লগুলাদ্য ঘৃত', 'গুড়গুড়দুমকাঁচু-মাচু'); ৫. গূঢ়ার্থক ইঙ্গিতবহ আপাত-অর্থহীন ভাষা উদ্‌ভাবন (যেমন, শেয়াল 'হৌহৌ', 'চিকড়ি মিকড়ি খেলা', 'হিজিবিজ্‌বিজ্‌'); ৬. নিরর্থক ভাষা উদ্‌ভাবন (যেমন 'কেটকু নাড়ু', 'রামতাড়ু'); ৭. বিসংগতিমূলক ভাষার মিশ্রণ (যেমন 'শ্রীলেজ'. 'চিমনিমূর্তি'); ৮. পরিচিত সাহিত্য, সূক্তি, প্রবচন ইত্যাদি অবলম্বন ক'রে প্যারডি-জাতীয় বা অন্য কোনো রকম অসংগতির সৃষ্টি (যেমন 'তাবচ্চ বাঁচতে মূর্খ যাবৎ ন বক্‌বকায়তে'); ৯. অর্থহীন ধ্বনি ও তাদের সঙ্গে অর্থযুক্ত ভাষার সাদৃশ্য আবিষ্কার ক'রে বিস্ময়-কৌতুক সৃষ্টি (যেমন কাকের জিজ্ঞাসা—'কা-কা?' ঝিঁঝিঁপোকার উক্তি'—চললে বাঁচি! চললে বাঁচি!'); এবং ১০. একই শব্দ বা ধাতুর একাধিক অর্থে ব্যবহারবিধি নিয়ে কিম্বা দুটি পদের ধ্বনিসাদৃশ্য অবলম্বন ক'রে বিস্ময়-কৌতুক রচনা (যেমন, বিভিন্ন শব্দ ও ধাতুর যোগে 'গা'-শব্দ 'বাজি'-শব্দ 'খা'-ধাতু কী বিচিত্র অর্থই না বহন করে, 'ষাট ষাট' ব'লে সান্ত্বনা দিলে সান্ত্বনাপ্রাপ্ত লোকটি বলে 'একষট্টি')।

সমীক্ষায় আরো দেখা গেছে : এর মধ্যে খ-শ্রেণীর ভাষার ব্যবহার আছে শুধু 'সে'-তে এবং তার পরিমাণ খুব অল্প। ক বা খ-শ্রেণীর ভাষায় বিস্ময়ের উপকরণ নেই, আছে গ-শ্রেণীর ভাষায়। এই গ-শ্রেণীর ভাষার—অর্থাৎ যে ভাষায় কোনো অসংগতি উদ্‌ভটত্ব অ-লৌকিকত্ব বা বিস্ময়সৃষ্টির এ-জাতীয় কোনো আনুকূল্য আছে ফ্যানটাসিগুলিতে তার ব্যবহার (ক+খ) শ্রেণীর, অর্থাৎ স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অবিস্ময়কর, ভাষার তুলনায় অনেক কম (মোট বাক্যসংখ্যার ১৪% থেকে ৩৫%)। এই পরিমিতির অভাবে ফ্যানটাসির গদ্যভাষা পাঠককে ক্লান্ত বিভ্রান্ত ও বিরক্ত ক'রে তুলত। 'সে'-রচনার একটি গল্পে যখন বিস্ময়বাক্যের বাড়াবাড়ি (মোট বাক্যসংখ্যার ৫০%) ঘটেছে তখন শ্রোতা হাঁপিয়ে ব'লে ওঠেন, 'থামো, থামো' (রবীন্দ্র-রচনাবলী ৭ম খণ্ড, শতবার্ষিক সংস্করণ, পৃঃ ৮৮২)

'আবোলতাবোল' প'ড়ে এরকম থামতে বলার কথা ভাবাই যায় না মোটে। শেষ কবিতায় কবি লিখেছেন, "ছুটলে কথা থামায় কে? / আজকে ঠেকায় আমায় কে? / আজকে দাদা যাবার আগে / বলব যা মোর চিত্তে লাগে।" যাবার আগে যা ব'লে গেছেন সুকুমার তা তো বাঙালীর চিরসম্পদ। তবু বড়ো অকালে মৃত্যু ঠেকাল তাঁকে, বড়ো অকালে থেমে গেল ছুটন্ত আবোলতাবোল কথা।

১। সিগনেট প্রেসকে লেখা চিঠি ([illegible]), দীপেনকুমার রায় সংকলিত 'জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী', রবিবাসরীয় জনতা/নীলকণ্ঠ ১৯৭৮

২। "সন্ধেবেলাটা রূপকথার রসে নিবিড় ; /বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে/বেড়া ছিল না উঁচু,/মনটা এ দিক থেকে ও দিকে/ডিঙিয়ে যেত অনায়াসেই।" (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পঁচিশে বৈশাখ', 'শেষ সপ্তক' ১৩৪২ ব.)

৩। 'বাংলা শিশুসাহিত্য', 'সাহিত্য চর্চা', ১৯৫৪ খ্রী. পৃঃ ৪৮ (প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯৫২ খ্রী.)

৪। 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্‌ভট্‌, যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়ালরসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।"—এখানে উল্লেখযোগ্য, সম্মানসূচক ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের ব্যবহারে কিন্তু 'আবোলতাবোল'-এর ব্যঙ্গাত্মক গাম্ভীর্যও স্বীকৃত হয়েছে।

৫। মনে পড়ে যায় ক্যারলের বিশ্ববিখ্যাত উদ্‌ভটলোকে বেড়াল ও এলিসের সংলাপ :

" 'Oh, you can't help that', said the Cat : 'we're all mad here. I m mad. You're mad.'

'How do you know I'm mad ?' said Alice.

'You must be', said the Cat, 'or you wouldn't have come here.' '

৬। 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ', সিগনেট প্রেস, ১৩৬৩ ব. পৃ ২১

৭। 'ভারতীয় চিত্রশিল্প', 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ', পূর্বোক্ত সূত্র পৃঃ ৮৩

৮-৯। 'ভাষার অত্যাচার', 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' পূর্বোক্ত সূত্র পৃঃ ২৮

১০। 'বাংলা শিশুসাহিত্য', পূর্বোক্ত সূত্র, পৃঃ ৫০। সুকুমারের 'হ য ব র ল' গল্পের উদ্‌ভটলোকে কিন্তু গূঢ়ার্থবহ সব জোড়কলম শব্দ আছে, যেমন 'হেঁৎলা', 'হাঁদাড়ে', 'হিজিবিজবিজ'।

১১। 'এলিসেস এডভেঞ্চারস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' ও 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস এণ্ড হোয়াট এলিস ফাউণ্ড দেয়ার'

১২। 'শিশুসাহিত্যে ফ্যানটাসি : গদ্য ভাষার সমীক্ষণ', 'বাঙলা গদ্যজিজ্ঞাসা', সমতট প্রকাশনী ১৩৮৮ ব.

১৩। ডঃ সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৬৫ খ্রী. পৃঃ ১৫৬

১৪। 'শিশু সাহিত্যে ফ্যানটাসি : গদ্যভাষার সমীক্ষণ', 'বাঙলা গদ্যজিজ্ঞাসা', সমতট প্রকাশনী ১৩৮৮ ব.

সমীর মণ্ডল

সুকুমার শিল্প

সুকুমার রায়ের আঁকা ছবি কেবল তাঁর সাহিত্যের অপরিহার্য পরিপূরক নয়, লেখা তাঁর ছবিরই সাহিত্যানুবাদ। তাঁর চিত্রকরণের মধ্যে মঞ্চসজ্জার এবং ফোটোগ্রাফির নানা উপাদান লক্ষণীয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সুকুমার-রচনা ও চিত্র সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

একটা কথা গোড়াতেই বলি—সাহিত্যিক সুকুমার সর্বক্ষেত্রে ঋণী শিল্পী সুকুমারের কাছে। তাঁর সৃষ্টির জগৎটাকে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে বোঝা যাবে কাগজের বুকে তাঁর কলমের আঁচড় পড়ার আগে পড়েছিল তুলির আঁচড়। সুকুমার-সাহিত্যের বড় মূলধন তাঁর শিল্পী-মানসিকতা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পী মন কাজ করে গেছে সমানে।

শিশুকাল থেকে বাবা উপেন্দ্রকিশোরের কাছে নানান বিষয়ে শিক্ষালাভের মধ্যে ছিল চিত্রাঙ্কন শিক্ষা। ভাইবোনদের মধ্যে আঁকায় হাত ভালো ছিল সুখলতা আর সুকুমারের। অঙ্কনে মনোযোগী হলেও খেয়ালিপনা আর দুষ্টুমিও ছিল। দু' বোন ছাতে টবে ফুলগাছ লাগিয়েছে। যত্নে গাছ বাড়লো। কুঁড়ি ধরলো। একবোনের গাছে রঙিন আর এক বোনের গাছে সাদা। সাদা কুঁড়ির বোনের মনে দুঃখ। পরের দিন দুঃখ ঘুচলো বোনের। সাদা কোথায়, রঙিন কুঁড়িই ধরেছে ত তার গাছে। আসলে এটা ঘটেছিল সুকুমারের সন্তর্পণ রঙ-তুলির ব্যবহারে। পড়ার বইয়ের খালি পাতাগুলো ভরা হ'ত হিজিবিজি ছবিতে, সাদা-কালো ছবিগুলো হ'য়ে যেত রঙিন।

সখ ছিল ফটোগ্রাফীতে। ছবি আঁকাকে কাজে লাগিয়েছেন সাহিত্যে ইলাসট্রেশান হিসাবে। সেই ইলাসট্রেশান কেমন তা আমরা তাঁর রচনা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখে আসছি। বিশেষভাবে তাঁর চিত্রিত ছবিগুলি সাহিত্যের সঙ্গে এমন অবিচ্ছেদ্য-রূপে জুড়ে থাকে যে কখনো কখনো বিস্ময় জাগে—লেখার জন্যে আঁকা, না আঁকার জন্য লেখা। বস্তুত তাঁর সৃষ্টির জগৎ গড়ার হাতিয়ার ছিল কাগজ, কলম, তুলি আর কালি।

লেখার সাথে ছবির ব্যবহার দাপটে শুরু হয় ননসেন্স ক্লাবের মুখপত্র 'সাড়ে বত্রিশ ভাজা'র পাতায় পাতায়। মলাট থেকে শুরু ক'রে মজার মজার ছবিগুলো সব তিনি আঁকতেন। পরবর্তী সময়ে আমরা দেখেছি তাঁর লেখা এবং আঁকা একই ধারায় বাহিত হয়েছে। তিনি দুটোতেই সমান যশস্বান হয়েছেন।

সুকুমারের অতিপরিচিত কিছু চিত্রকরণ দেখলেই তাঁর চারিত্রিক ছাপ খুঁজে পাওয়া যাবে। যেসব বিশেষ লক্ষণ থেকে সুকুমারকে আলাদা করা যায় তার একটি হ'ল নাটক। চিত্রকরণ যেন নাটকের নিয়মে। ছবিতে এরকমটা ঘটার মূলে তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি—নাটুকেপনা। শৈশবকাল থেকে অভিনয়ে ঝোঁক প্রবল। সেই প্রবৃত্তির ছাপ সরাসরি এসেছে ছবিতে। নাটকের মঞ্চে বিশেষ অংশে যখন আলোকপাত হয় তখন আমরা হয়ত একটি চরিত্রকে দেখি আর সঙ্গে দেখি তার ব্যবহারের অতিপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রাদি। কখনো বা পরিবেশ বোঝাতে একটিমাত্র গাছ বসিয়ে রাখা অথবা বাড়ীর একটা অংশ মাত্র। খুব প্রয়োজন না হ'লে বড় একটা নানান জিনিসের আয়োজন হয় না। সুকুমারের চিত্রকরণে ঠিক তেমনভাবে সযত্নে বাহুল্য বর্জিত হয়েছে। মূল চরিত্রের সঙ্গে

কেবলমাত্র তার বসা বা দাঁড়ানোর স্থান এবং দু-একটি প্রাসঙ্গিক বস্তু উপস্থাপিত হয়েছে।

আমাদের খুব চেনা কয়েকটি ছবির কথা টানবো। কাঠবুড়ো, যে কিনা রোদে বসে ভিজে কাঠ সিদ্ধ চেটে খায়। ছবিতে টাকমাথা দাড়িওয়ালা বুড়ো হাঁটু গেড়ে বসে, সামনে তার হাঁড়িভরা সিদ্ধ কাঠ। গরম। গরম বোঝানোর সহজ উপায় ভাপ ওঠা। সুতরাং হাঁড়ি থেকে ওপরের দিকে ওঠা ঝিরঝিরে সরু সরু কিছু রেখা। রেখাঙ্কন সাবধানী, সূক্ষ্ম। হাওয়া বেয়ে চলার মত হাল্কা। এই হাল্কা-দেখানোর কায়দা হচ্ছে ঃ হাঁড়ির রেখা তুলনায় ভারী এবং মোটা করে আঁকা। কোথাও বা কালি ভরাট করা। ছবিতে কালি-ভরা অংশের তুলনায় রেখার অংশ স্বাভাবিকভাবে হাল্কা মনে হয়। এটা অঙ্কনের করণকৌশল, যা সুকুমারের আয়ত্তে। যা বলছিলাম হাঁড়িতে সিদ্ধ কাঠ আর গরম বুঝতে কোনরকম অসুবিধার সৃষ্টি না করেও উনুন কিন্তু উধাও। নাটকের মঞ্চে হলেও তাই হ'ত। হাঁড়ি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখলেই পরিষ্কার মনে হয় এইমাত্র উনুন থেকে নামানো হ'ল বুঝি। কাতুকাতু বুড়োর হাতে শুধু খাতা আর কলম। খুড়োর কলে খুড়ো এবং তার টুকিটাকি কলকব্জা। রাস্তায় ছুটছে বলেই অথবা রাস্তার পাশের দৃশ্য ইত্যাদির উপস্থাপনার বাড়াবাড়ি নেই। লড়াইক্ষ্যাপার হাতে শুধু ছাতা। কুমড়োপটাশের পাশে গাছের কিছুটা অংশমাত্র, হট্টমুলার গাছ। 'হাতুড়ে'র ছবিতে ছুরি-কাঁচি সমেত টেবিলের এক অংশ, ডাক্তারের শরীরের আধখানা আর পিছনে একফালি চৌকো কালি ভরাটেই একটি কাজের ঘরের ভিতরের অংশের ছবি বেশ ফুটেছে। বুড়ির বাড়ি দেখলেই বোঝা যাবে কতখানি নাটুকে মজা আছে ছবিতে। এমনিধারা বহু ছবি। হুঁকোমুখো হ্যাংলা, বোম্বাগড়ের রাজা, ব্যাকরণ শিং—এরকম অনেক কুশীলবই নামমাত্র জিনিস (নাটকের ভাষায় প্রপ্) নিয়ে অদ্ভুত পরিবেশ আর মেজাজ সৃষ্টি করেছে। গ্রুপ কম্পোজিশান হিসাবে 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম' বা 'হ য ব র ল'-র জন্তুদের আদালতের মত সুন্দর ছবি আরো আছে।

সুকুমারের চিত্রনাটকে প্রধান চরিত্রের অভিব্যক্তি, তাদের প্রকাশ ভঙ্গিমা যথাযথ। কুশীলবরা মানুষ হোক আর জন্তুই হোক সর্বতোভাবে বক্তব্যের আদলে তাদের জীবন্ত ক'রে তোলার কাজে তাঁর লক্ষ্য এবং যত্ন ছিল। প্রয়োজনবোধে অঙ্কনে অতিরঞ্জন বা পরিচিত চেহারার আদল বদলের ব্যাপারেও সাবধানী হয়েছেন।

আর একটি উপাদান সাজ-সজ্জা। তাঁর চিত্রিত চরিত্রের সাজ-সজ্জাও ছিল খুবই নাটুকে। আর কুশীলবদের কাজ-কর্মের ঢং ছিল অনেকক্ষেত্রে আমাদের উল্টো নিয়মে। এই উল্টে-দেখা ব্যাপারটা ছিল সুকুমার-চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাতুকুতু বুড়োর পরনে কোট-প্যান্ট থাকা সত্ত্বেও পায়ে তার ডগা বাঁকানো বাদশাহী ঢঙের জুতো। তার হাতে খাতা আর পালকের কলম। যথানিয়মে কলম উল্টে ধরা। পায়ে নাগরার ব্যবহার এক জায়গায় খুবই মজার—ভূতের ছানাকে নিয়ে মা যেখানে 'ভূতুড়ে খেলা' খেলছে। ভূতের বাচ্চার পায়ে ছোট্ট ছোট্ট দুটি নাগরা। মা-ও সাজগোজে কম যায় না। তার গায়েও গহনা। ডান হাতের আংটির ওপর ছটার মত চিকন ক'টি রেখায় স্পষ্টই বোঝা যায় আঁধারেও তা ঝলসায়। 'ফসকে গেল'-তে পোশাক ছাড়া তীরন্দাজের মজা হ'ল ধনুকের উল্টো ব্যবহার এবং উল্টো হাতে তীর-নিক্ষেপ। উল্টো আরো আছে কয়েকটি ছবিতে ছাতা বাঁ হাতে। 'ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক'বার'-এ রাজার খাপসমেত তলোয়ার আর 'চোর ধরা'র পাহারাদারের তলোয়ারের খাপ কোমর থেকে ডান দিকে ঝোলানো। প্রয়োজনে বাঁ হাত ব্যবহার করতে হবে।

আগে বলেছি সুকুমারের ইলাসট্রেশান মঞ্চের নির্বাচিত অংশে আলোকপাতে যেমনটি দেখায় তেমন। আরো একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে যেহেতু তাঁর ফটোগ্রাফীতে দখল ছিল তাই কখনো ক্যামেরায়-ধরা মূল ছবি থেকে বাছাই অংশ প্রিন্ট করলে যেমন হয় তেমন হয়েছে আঁকা। কেউ যদি চেয়ারে বসে থাকে ত তাকে আঁকতে চেয়ারের নীচ থেকে পায়াই বাদ। কোথাও বা গাছের খানিকটা এঁকেই কাট্। 'কি মুস্কিল'-এর ষাঁড়ের খানিকটা বা 'বোম্বাগড়ের রাজা' কি 'গোঁফ চুরি'তে চেয়ারে বসা অথবা হ্যাংলার ডালে বসা দেখলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। নাটকের পছন্দসই আলোকিত অংশ ছাড়িয়ে এ যেন বাহুল্য-বর্জনের আর-এক ধাপ। যেন মূল বক্তব্যের আরো কাছাকাছি হওয়া বা ক্লোজ আপ্।

এর ধড়ে তার মুড়ো জুড়ে দিয়ে কিম্ভূতকিমাকার জন্তু বানানোয় সুকুমার ছিলেন সিদ্ধহস্ত। এ যেন তাঁর গবেষণা-লব্ধ ফসল। কিন্তু তাঁর চিত্রকরণ কি শুধুমাত্র খেয়াল-খুশিমত করা সম্ভব হয়েছিল? শৈল্পিক সৌন্দর্যের দিক থেকে তা মোটেই হয়নি। শব্দের খাতিরে হাতির সঙ্গে তিমিকে জুড়ে দিলে সে জলে যাবে, না জঙ্গলে যাবে, ভেবে পায় না। কিন্তু ছবির খাতিরে ধড়-মুড়ো জোড়ার ব্যাপারে কার ধড় আর কার মুড়ো নিতে হবে তা ভাববার কথা। তিমির ধড়ে হাতির মাথা তিনি জুড়েছেন। হাতির ধড়ে তিমির মাথা জুড়লে কিন্তু ছবির মজা মোটেই হয় না, পাঠক লক্ষ্য করবেন। তেমনি গরুর শরীরে মোরগের মাথা, বকের দেহে কচ্ছপের মুখ, জিরাফের শরীরে ফড়িঙের মুণ্ডু বসালে তা আজগুবি হয় ঠিকই তবে এমনিধারা ছবির মজা হয় কি? এইখানেই শিল্পী সুকুমারের কারসাজি পুরোদস্তুর। জোড়াতালিতে তাঁর উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি 'হ্যাঁস্‌জারু'।

সাহিত্যের বেলায় ভাষান্তর করার কালে শব্দের আক্ষরিক অর্থের চেয়ে ভাবের আশ্রয় নিতে হয় অনেকখানি। না হলে ভাবান্তর ঘটে। ফিস্‌ফ্রাই-কে যদি বাংলা করি মাছভাজা আর ফ্রায়েড্‌ রাইস্‌-কে চালভাজা তাহলে ভোজন-রসিকদের জিভের জল শুকিয়ে যাবে নিশ্চয়ই। মাধ্যম বদলাবার বেলায় দেখি সরাসরি আক্ষরিক অর্থ নিলে বিপত্তি বাড়ে। সেখানে 'যেমন ধারা কথায় শুনি, হুবহু তাই আঁকি'র ঝক্কি অনেক। কিন্তু ঐ উদ্‌ভট আর অনিয়মের বস্তুটি আসলে যে কি দাঁড়ায় তা হাতে-কলমে করে দেখেনি কেউ। এর চূড়ান্ত দেখি সুকুমারের 'ছবি ও গল্প'তে। "পরীক্ষাতে গোল্লা পেয়ে হাবু ফেরেন বাড়ি"। হাবু গোল্লাকার বস্তু নিয়ে বই বগলে ফিরছে। বাবার গায়ে আঁকা হ'ল আগুনের লেলিহান শিখা—কেননা বাবা রেগে আগুন। বুক-জলে পিসিমা সাঁতরাচ্ছেন। ছবিতে ঐ জল পিসিমারই চোখ-নিঃসৃত। শব্দে আছে—'পিসি ভাসেন চোখের জলে...'। ধড়-মুণ্ডু-হাত-পা-কে শুনে শুনে আট টুকরো করেই তবে হ'ল আহলাদে আটখানা হওয়ার চিত্রকরণ। শব্দকে ভাষার দিক থেকে না দেখে কেবলমাত্র তার আক্ষরিক অর্থের দিকে চেয়ে সমান মজা করা হয়েছে 'শব্দকল্পদ্রুম'-এ। ঠাস্‌ ঠাস্‌ দ্রুম দ্রাম করে ফুল ফোটে সেখানে। ফোটে যখন ফোটার আওয়াজ ত চাই। পটকাও ত ফোটে। ব্যথা বাজে, আর বাজে সে ঠুং ঠাং চং চং করেই। অতএব মায়ের বুক ফাটলে অঙ্কন হওয়া চাই বিস্ফোরণের মত। বুক থেকে চারি-দিকে ছটার মত সরলরেখাগুলো ছড়িয়ে গিয়ে শেষ প্রান্তগুলো বক্ররেখায় কম্পনের মত হয়েই ছবি হ'ল। "শুনে মায়ের বুক ফেটে যায়, হায় কি হ'ল বলে"। এ যেন শব্দ থেকে ছবিতে আক্ষরিক অর্থে অনুবাদ।

সুকুমারের বেশীর ভাগ চিত্রকরণ ছিল রেখাপ্রধান। বেশ কিছু ছায়ামূর্তি (সিল্‌য়েট) আর অল্প কিছু হাফ্‌টোনে ছাপা ছবিও আমরা দেখি। ফটোগ্রাফীতে দক্ষতা আর বাবার কাছে শেখা হাফ্‌টোন ছাপার পদ্ধতি মাথায় ছিল, তাই রেখাঙ্কনেও তার প্রতিফলন দেখা যায়। কেবলমাত্র রেখার কাটাকুটি আর প্যাঁচ খেলিয়েই বস্তুর ছায় (টোন) এবং ত্রিমাত্রিকতা এসেছে সুন্দর। কেবলমাত্র রেখার জোরেই বস্তুর টেক্সচার এনেছেন সুনিপুণভাবে। কোথাও কোথাও রেখার বুনুনি ছাড়াও কালি ভরাট ক'রে ছবির ভারসাম্য এনেছেন অসাধারণভাবে। সিল্‌য়েট ছবিতে আমরা পেয়েছি সাদা-কালোর আর এক মজা। গ্রাফিক চং। ভারসাম্য বজায় রেখে কালো-সাদার পরিবেশন যেমন সুন্দর হয়েছে তেমনি একটি বস্তু থেকে আর-একটিতে যাওয়ার ছন্দ গতি চমৎকার। ঠিক যেন মেঝেতে জল গড়িয়ে আপন খেয়ালে ছবি তৈরী।

এই রকমই খানিকটা বলা গেল সুকুমারের চিত্রাঙ্কন নিয়ে। পারদর্শিতা আর শিল্পীমনই তাঁর চিত্রণকে করেছে সার্থক। কখনো তা সাহিত্যকে ছাপিয়ে গেছে। লেখায় না-বলা কথা বলেছেন ছবিতে। কিন্তু শুধু ছবির জন্য ছবি কি তিনি আঁকেননি কখনো? এইবার বরং আমরা আর একটা ছবি দেখি। স্থান—সোদপুর-পানিহাটি। গ্রামের জমিদারী দেখতে গিয়ে কালাজ্বর বাধিয়ে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এসেছেন সুকুমার। জমিদার গোপালদাস চৌধুরীর চণ্ডীমণ্ডপ। জাফরী-কাটা দরমার বেড়া দিয়ে ঘেরা সুন্দর বিশ্রামাগার। ভিতরে আসন পাতা। সাজানো ড্রইং বোর্ড, রং-তুলি। পশ্চিমের জানালা দিয়ে গঙ্গার ওপারে রক্তিম আকাশ আর ঢলে পড়া সূর্য। তাকিয়ায় ঠেস্‌ দিয়ে আধশোয়া হ'য়ে ড্রইংবোর্ড কোলে রেখে রঙের পাত্রে তুলি ডোবালেন শিল্পী সুকুমার রায়চৌধুরী।

শোভন সোম

সুকুমার রায়ের শিল্পভাবনা

ক সুকুমার রায়ের শিল্পালোচনা

আঠার শ' ছিয়াত্তর খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরী' বইটি সম্ভবত বাংলাভাষায় লেখা শিল্পালোচনার প্রথম বই।

শ্যামাচরণকে সামনে রেখে আমরা বাংলাভাষায় শিল্পালোচনার চারটি ধারা দেখতে পাই। এগুলি যথাক্রম, রোম্যান্টিক আদর্শবাদী ধারা, আধ্যাত্মিক ভাববাদী ধারা, নির্মাণগত বিশ্লেষণাত্মক ধারা ও প্রশংসাত্মক ধারা।

ফরাসী নিও-ক্ল্যাসিসিজমের আদর্শে অন্নদাচরণ বাগচী মনে করতেন যে, আলোকচিত্রের মত বিশ্বাসযোগ্যভাবে কোনো পৌরাণিক ঘটনার ছবি এঁকে তার মাধ্যমে জনগণকে সেই মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই হচ্ছে শিল্পের উদ্দেশ্য। তাঁর উদ্যোগে আঠার শ' তিরাশি খ্রীস্টাব্দে 'শিল্প পুষ্পাঞ্জলি' নামে বাংলাভাষায় প্রথম শিল্পালোচনার পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। এই ধারার লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা রবি বর্মার রাম-সীতার বিবাহ ছবির আলোচনায় পাই,[১] "এই বিবাহ বুঝি পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই। তখন...কে জানি ন,...এই মূর্তিমতী আনন্দের কপালে কি দুঃখ আছে।" প্রবাসী পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা প্রদীপ হাতে একটি নারীর ছবির পরিচয় দিতে লেখা হল,[২] "অয়ি ভারতের মাতৃদেবীগণ, কবে তোমরা অমাবস্যার অন্ধকারের মত অজ্ঞানতা, ভীরুতা ও স্বার্থান্ধতার অন্ধকার দূর করিবে?" প্রবাসীতেই নন্দলাল বসুর আঁকা জগাই মাধাই ছবি সম্পর্কে লেখা হল[৩] "ইহারা মাতাল বটে—কিন্তু বড় সদানন্দ মাতাল।...তাহারা যে ভদ্র-সন্তান এ সংজ্ঞাটুকু যেন তাহাদের মত্ততার ভিতরেও আছে।"

অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে গুরু বলেছিলেন। তাঁর মতে[৪] "এদেশের আর্ট বুঝতে এমন দৃষ্টি ছিল না।" তাঁর কাছে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্পের পাঠ নিতেন। আঠার শ' সাতানব্বই খ্রীস্টাব্দে হ্যাভেল পুরাতত্ত্ব বিষয়ে ইংরাজীতে লিখতে শুরু করেন। হ্যাভেল, গ্রিফিথ, ফার্গুসন, উড্‌রফ, নিবেদিতা, কুমারস্বামী প্রভৃতির পুরাতত্ত্বনির্ভর ভারতীয় শিল্পের আলোচনা বাংলাভাষায় আধ্যাত্মিক ভাববাদী ধারাকে বেগবান করে। এই ধারার লেখকেরা মনে করতেন যে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রেই রয়েছে আধুনিক তার পথনির্দেশ।

আধ্যাত্মিক ভাববাদী গোষ্ঠী ভারতশিল্পকে বিশ্ব-শিল্পভাবন থেকে স্বতন্ত্র একটি অস্তিত্ব জ্ঞান করতেন। পাশ্চাত্য শিল্প তাঁদের কাছে বর্জনীয় বিবেচিত হত। উনিশ শ' একুশ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বভারতীর শিল্প-ইতিহাসের অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশ এদেশের "শিল্পের উপাদান আঙ্গিক নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা" করলেন ও কিউবিজম্‌ পর্যন্ত অধুনাতন পাশ্চাত্য শিল্পের রূপরেখা উপস্থিত করলেন।[৫] তাঁর প্রেরণায় ও কয়েকজন শিল্পী ও লেখকের উদ্যমে শিল্পের নির্মাণগত বিশ্লেষণ শুরু হন। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় এই ধারার অন্যতম লেখক।

বাংলাভাষায় শিল্পালোচনার আলোচ্য ধারাগুলির উদ্‌গমে রয়েছে ইংরাজি ভাষায় শিল্পালোচনার ধারা। প্রশংসাত্মক ধারার ক্ষেত্রেও আমরা একই ব্যাপার দেখতে পাই। বিষ্ণু দে ও জন আরুইন যামিনী রায় প্রসঙ্গে ইংরাজিতে লিখেছিলেন,[৬] "কোন্ নিরিখে যামিনী রায়কে আমরা দেখব? শুদ্ধ ফর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত একজন প্রতিভাবান শিল্পী রূপে? একজন ভারতীয় জোত্তো বা সেজাঁ রূপে?" পরবর্তীকালে যামিনী রায়কে তিনি পিকাসোর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৭] নীরদ মজুমদারের ছবিতে তিনি দেখেছেন, "পিকাসোর পেশীস্বচ্ছন্দ সাঁওতাল"।[৮] নীরদ মজুমদার মনে করেছেন যে,[৯] "ছবিতে একমাত্র বিবেচ্য হচ্ছে ফর্ম...বিষয়, প্রকাশভঙ্গী ও ধারণার তাতে আদৌ দাম নেই। একটি সপ্রাণ মুখ ও নিষ্প্রাণ কলসীর মধ্যে রূপগত কোনো ভেদ নেই।" এই প্রশংসাত্মক ধারার লেখকদের মুখ ফেরানো ছিল য়োরোপের প্রাঙ্গিকহুল আধুনিকতার দিকে।

সুকুমার রায় তাঁর জীবনের ক্ষীণ পরিসরে শিল্প-বিষয়ক মাত্র তিনটি রচনা লিখে যেতে পেরেছিলেন।[১০] এর মধ্যে 'শিল্পে অত্যুক্তি' নামক রচনাটি একটি সম্পূর্ণ প্রবন্ধ। 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' শীর্ষকে যে দুটি ছোট রচনা পাওয়া যায়, সে দুটি প্রবাসীতে অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার উত্তরে ও প্রত্যুত্তরে লেখা। 'শিল্পে অত্যুক্তি' রচনাটি আধুনিক য়োরোপীয় শিল্পের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এবং 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' রচনা দুটি সমকালীন ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাববাদী চিত্রচর্চা সম্পর্কে লেখা। ফলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য, দুই জগতের সমকালীন শিল্প-চর্চা সম্পর্কে তাঁর অভিমত এই লেখায় পাওয়া যায়।

দৃষ্ট জগতের বিশ্বস্ত পত্রীকরণ এককালে পাশ্চাত্য শিল্পের আদর্শ ছিল। উনিশ শতকের শেষের শিল্পীরা এর পরিবর্তে আঙ্গিককেই শিল্পের নিয়ামক মনে করেছিলেন। সুকুমারও মনে করতেন যে, চোখের দেখার হুবহু পত্রীকরণে মনের কথা ঠিক বলা হয় না। কিন্তু সেই কারণে আঙ্গিকের বাড়াবাড়ি ও ভড়ং (ম্যানারিজম্)-কে তিনি সমর্থন করেন নি। 'শিল্পে অত্যুক্তি' প্রবন্ধে তিনি পাশ্চাত্যের এই প্রবণতা সম্পর্কেই লিখেছেন।

অত্যুক্তির কারণ সুকুমার এইভাবে চিহ্নিত করেছেন, "শিল্পী এটি বেশ অনুভব করেন যে, তাঁহার চোখ তাঁহাকে যেটুকু দেখায়, কেবল সেইটুকুই ঠিক তদ্বৎ করিয়া আঁকিলেই তাঁহার মনের কথাটাকে ঠিক বলা হয় না। আবার শিল্পীর মাত্রাজ্ঞান যখন মুখ্যগৌণ বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন সে 'চার কড়ায় এক গণ্ডা' 'বারো ইঞ্চিতে এক ফুট' এরূপ হিসাব ধরিয়া চলে না। সুতরাং জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, শিল্পীর মন তাঁহার ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলিকে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট 'আদর্শের' অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। এইখানেই শিল্পঘটিত প্রায় সকল প্রকার সত্য ও মিথ্যা অত্যুক্তির মূল বলা যাইতে পারে।"

বহির্জগৎ→অন্তর্জগৎ→বহির্জগৎ, শিল্প এই প্রক্রিয়ার ফল। শিল্পের আধেয় হ'ল বিষয়ের অভিজ্ঞতা। আমাদের মস্তিষ্ক তা একটি ভাব বা আদর্শের এসেন্স বা নিষ্কর্ষে পৌঁছয়। আধেয়-বহির্ভূত অন্যান্য অনুষঙ্গ ও চেতনাও তার নির্মাণে সাহায্য করে। আধেয় বা বাস্তব সত্তা ও ভাব বা অন্তর্জগতের সংযোগ ও বাহ্যিক রূপায়ণ হচ্ছে শিল্প। এই বাহ্যিক রূপায়ণ নির্ভর করে উপকরণ ও আঙ্গিকগত কয়েকটি প্রক্রিয়ার উপর। সুকুমার বলেছেন যে, ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যগুলির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট আদর্শায়নে শিল্পে সত্য বা মিথ্যা অত্যুক্তি ঘটে থাকে। শিল্পে অত্যুক্তি থাকবেই, কিন্তু অত্যুক্তি মানেই অসঙ্গত বাহুল্য বোঝায় না। ক্লড্ টার্নারের ছবিতে অত্যুক্তিই সংযসঙ্গত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। লেখক যদি সূর্যাস্তের ছবিতে অপার্থিব জ্যোৎস্নাস দেখাতেন, তবে তাঁর পক্ষে সেটা অত্যুক্তি হত না। "কিন্তু আমিও যদি দেখাদেখি আবার লাল নীল আকাশের মধ্যে বীণাওদ্ধ গুটি দু-চার পরীর অবতারণা করি, তবেই সমঝদার লোকে আমার কান ধরিয়া শিল্পের আসর হইতে নামাইয়া দিবে।" সুকুমার তাঁর সমকালীন আধ্যাত্মিক ভাববাদিতার দিকে লক্ষ্য করেই একথা বলেছেন। অসিতকুমার হালদারের আঁকা 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে' ছবিতে আমরা আকাশের লাল নীল মেঘের মধ্যে সত্যিই বীণাশুদ্ধ একটি পরীকে পেয়েছি।

পাশ্চাত্যের অত্যুক্তির প্রসঙ্গে এদেশের সমকালীন চিত্রচর্চায় কল্পনার মুক্তসঙ্গ উদ্দামতার কথাও এসেছে। পাশ্চাত্যে বাস্তববাদিতার ও প্রাচ্যে আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়ে যে

বাস্তববিচ্যুত অত্যুক্তির প্রসারণ চলেছিল, এর কোনটাকেই সুকুমারের যুক্তিবাদী মন স্বীকার করতে পারে নি। আদর্শের অস্পষ্টতাকেই তাঁর মিথ্যা অত্যুক্তির কারণ বলে মনে হয়েছে। "বাস্তবিকতার একটা বিকৃত আদর্শের কল্যাণে...যে...নাটকীয় অত্যুক্তি" প্রশ্রয় পায়, সুকুমার তাকে অন্তর্দৃষ্টির দীনতা ঢাকার প্রয়াস মনে করেছেন।

শিল্পের ইজ্‌ম্‌ বা নব্যতন্ত্রগুলিকে সুকুমার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখেছেন। "প্রচলিত পদ্ধতিগুলি যখন নিতান্ত অভ্যস্ত ও 'মামুলী' হইয়া আসে তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে যে সকল নব্যতন্ত্রের আবির্ভাব হয়, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা অত্যুক্তির ধুয়া দেখিতে পাওয়া যায়।" ইম্প্রেশনিজম, পোস্ট-ইম্প্রেশনিজম্‌, ফভিজম্‌, দাদাইজম্‌, কিউবিজম্‌, সুররিয়্যালিজম্‌, এক্সপ্রেশনিজম্‌—প্রভৃতি নব্যতন্ত্রগুলির প্রত্যেকটিই পূর্ব তন্ত্রগুলিকে মামুলী বলে খারিজ করেছিল। এইসব নব্যতন্ত্রবাদীরা পূর্বতন শিল্পকে খারিজ করলেও সমাজের সুবিধাভোগের জায়গায় তাঁরা একত্রিত ছিলেন। তাঁরা ছবিতে বিদ্রোহ বলতে আঙ্গিকের চটক বুঝেছিলেন, সমাজের সঙ্গে শিল্পের সম্বন্ধের বিষয়ে তাঁরা উদাসীন ছিলেন। প্রতিষ্ঠানকে তাঁরা নাড়া দেন নি। ফলে পূবাপর নব্যতন্ত্রবাদ একই জিনিসকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছে। প্যারি কমুনের সমকালীন ইম্প্রেশনিস্টরা ভোগবিলাসী আনন্দোচ্ছল জীবনের ছবি এঁকেছেন, রেস্তোরাঁর নাচ গান প্রমোদ কিংবা আমুদে যুবকদের সঙ্গে নগ্ন যুবতীদের বিনোদনের ছবি এঁকেছেন, কিন্তু সমকালের কোন হৃদ্‌স্পন্দনকে ধরেন নি। কিউবিজমে যে ভাঙচুর তাতে সমাজের রূপক দেখা গেলেও সেখানে বিষয়গত ভাবে সমাজের ভাবনা নেই। ফভিজম্‌, দাদাইজম, সুররিয়্যালিজম ও এক্সপ্রেশনিজমে জীবনের অসহায়তাবোধ ও পলায়নকামিতাই প্রশ্রয় পেয়েছে।

আঙ্গিকসর্বস্ব আধুনিকতার নিদর্শন হিসাবে সুকুমার রুমানীয় ভাস্কর কনস্‌ট্যানটাইন ব্রাঁকুসির একটি ভাস্কর্যের উল্লেখ করেছেন। ভাস্কর্যের এই রমণীর মুখাবয়বের দুটি "ডিম্বাকৃত" চোখে "নাকি বিশেষভাবে অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা ও স্পষ্টতা সূচিত" হয়েছে। সুকুমারের কাছে এই ভাস্কর্য ও তার সাবজেকটিভ ব্যাখ্যা মিথ্যা অত্যুক্তি মনে হয়েছে। এই অত্যুক্তি শিল্পে প্রশ্রয় পেলে পরিণামে তা কি আকার ধারণ করে, ব্রাঁকুসির এই ভাস্কর্যটিকে তার নজির হিসাবে তিনি উপস্থিত করেছেন। এটিকে সুকুমার দেখেছিলেন "বস্তুনিরপেক্ষ প্রকাশের উৎকট চেষ্টায় প্রকৃতির" সঙ্গে "একটা অর্থহীন কলহ" রূপে। ব্রাঁকুসির ভাস্কর্যের শিল্পমূল্য সম্পর্কে সুকুমার প্রশ্ন তুলেছিলেন উনিশ শ' চোদ্দ খ্রীষ্টাব্দে। মজার কথা এই যে, এর বারো বছর বাদে একই প্রশ্ন তুলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক দপ্তর। উনিশ শ' ছাব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন শুল্ক দপ্তর ব্রাঁকুসি-র ভাস্কর্যকে নিছক রূপান্তরিত ধাতুপিণ্ড পণ্য করে উপযুক্ত শুল্ক ছাড়া মার্কিন দেশে ঢুকতে বাধা দিয়েছিলেন। জাতীয় শিল্প হিসাবে ঘোষিত ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন বাদে আর কোন শিল্পসামগ্রী শুল্কের আওতায় পড়ে না। কিন্তু মজার কথা এই যে ব্রাঁকুসির ভাস্কর্য যে রূপান্তরিত ধাতুপিণ্ড নয়, এটি যে শিল্পরচনা, তা বোঝাতে তাঁকে মার্কিন আদালতে দু বছর লড়তে হয়েছিল।[১১]

ক্লড্‌ টার্নার, জন কন্‌স্টেবল, ইউজিন দ্যলাক্রোয়া, ফ্রান্সিস্‌কো গোইয়া প্রমুখ পূর্বতন শিল্পীদের ছবিতে আলোকবিদ্যার প্রয়োগ দেখে ইম্প্রেশনিস্টরা মনে করেছিলেন, "কেবলমাত্র আলোক ও বর্ণবৈচিত্র্যের সাধনাতেই উচ্চতম শিল্পপ্রতিভা সার্থকতা লাভ করতে পারে।" যেহেতু রঙের উৎস আলো এবং নশ্বর গুণ রং, এই কারণে এই শিল্পীরা প্রতিটি মুহূর্তের আলোক-স্পন্দনকে ছবিতে লিপিবদ্ধ করে বাস্তবনিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিলেন।

পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট জর্জেস্‌ সিউরা ও পল্‌ সিন্ন্যাক আলোকতত্ত্বের মূলে যাবার চেষ্টায় প্রাথমিক রংগুলির ঘনসন্নিবদ্ধ ফুটকি সাজিয়ে মাধ্যমিক ও অন্যান্য রঙের আবহ ছবিতে আনতে চেয়েছিলেন। এই অপটিক্যাল মিক্‌শচার বা পইন্টিলিজম্‌-এর তত্ত্বসূত্র সম্পর্কে সুকুমার লিখেছিলেন, "বর্ণগত অত্যুক্তির মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে শেষটায় এই সিদ্ধান্তে আসিয়া ঠেকিল যে, 'যেহেতু বিজ্ঞান বলেন যে, চোখের মধ্যে কয়েকটা মৌলিকবর্ণের পাশাপাশি সমাবেশকেই আমরা আলোকরূপে প্রত্যক্ষ করি, অতএব আলোককে সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে উক্ত কয়েকটি মৌলিক বর্ণের বিন্দু-বিন্দু প্রয়োগ ভিন্ন সত্যসঙ্গত আর কোন উপায় নাই।'...একটা উৎকট

মতানুবর্তিতার খাতিরে অকারণ শক্তিক্ষয়ের এমন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত আর বড় দেখা যায় না।" এই শিল্পীরা এই সত্য ভুলে গিয়েছিলেন যে সূর্যের আলো স্বচ্ছ আর ছবি আঁকার রঞ্জক-নির্ভর রং অনচ্ছ। এই আঁকার রং সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত বস্তুসত্যের আভাস তৈরী করে মাত্র। সূর্যের আলোর সাতটি রংকে আমরা সমন্বিত ভাবে দেখি। কিন্তু আলোকতত্ত্বকে অনুসরণ করে হলদে ও নীলের ফুটকি ঘন করে সাজালে দূর থেকে সবুজের উদ্দীপন হয় বটে, তবে তা আলোকতত্ত্বের সমার্থক হয়ে ওঠে না। সূর্যের আলোর রংয়ের শুদ্ধতা ও ছবি আঁকার রংয়ের শুদ্ধতা যে এক নয় এটি বৈজ্ঞানিক সত্য।

দৃষ্ট পৃথিবীর বিশ্বস্ত প্রতিলিপি 'সত্যনিষ্ঠার চূড়ান্ত নিদর্শন' হতে পারে না। ভৌত জগৎ বেধ, আয়তন ও গভীরতাবিশিষ্ট। ছবির জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ আছে, গভীরতা নেই। পাশ্চাত্যের শিল্পে রিয়্যালিজম্ বা বাস্তবিকতা অর্থে ছবিতে দৃষ্ট জগতের হুবহু প্রতিলিপির কথা বারবার বলা হয়েছে কিন্তু তাঁরা বোঝেন নি যে, বাস্তবিকতা পরিতলসর্বস্ব কোনো ব্যাপার নয়, বাস্তবিকতা চেতনা ও দর্শনের ব্যাপার।

রিয়্যালিজমের দুর্মর প্রয়াস শিল্পীকে কোন্ পথে নিয়ে যায়, তাও সুকুমার লক্ষ্য করেছেন। আলোকচিত্রে একটি মুহূর্ত ধরা পড়ে; সিনেমাটোগ্রাফ বা চল-ছবিতে ধরা পড়ে প্রতিটি অনুক্রমিক মুহূর্তের গতীয়তা। একদল অত্যুক্তিবাদী মনে করেছিলেন যে দেহভঙ্গী বা অঙ্গবিন্যাসের "গতির ছন্দকে ব্যক্ত করিতে হইলে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির অসম্ভব বিক্ষেপ বা দেহ-চ্যুতি পর্যন্ত ঘটানো আবশ্যক হয়, তবে তাহা শিল্পসঙ্গত বলিতে হইবে। আর, দুই-চারিটা অতিরিক্ত হস্তপদ যোজনা করিলে যদি কথাটা আরো সুব্যক্ত হয় তবে তাহাতেই বা বিরত থাকিব কেন?...'ফিউচারিস্ট'...শিল্পীগণ হাতেকলমে ইহার সমস্তই করিয়া দেখাইতেছেন।...সৌন্দর্য বল, শৃঙ্খলা বল, সুরুচি বল এ সমস্তের মধ্যেই একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের আনুগত্য দেখা যায়। এ উপদ্রব নাই কেবল জীবন-সংগ্রামে এবং জীবনের মূলগত অকাট্য সত্যের নির্ভীক অনুসরণে...। ভবিষ্যবাদী যাহাকে 'জীবন-সংগ্রাম' বলেন তাহা...বাহিরের বিরোধ, যুদ্ধ বিদ্রোহ, বাণিজ্যের স্বার্থসংঘাত, শক্তির উদ্ধত অভিমান, লৌহ-কঙ্কাল সভ্যতার স্পর্ধা...যন্ত্রের ঝনঝনা, বিজ্ঞান বাণিজ্যের উদ্দাম ধূমোদ্গার ও সমাজসংগ্রামের নির্মম গদ্যকে তোমার শিল্পেও বরণ করিয়া তাহাতে চিরনূতনত্বের সঞ্চার কর।"

এই জীবনসংগ্রামে স্থান নেই কেবল মানুষের। আঙ্গিক-সর্বস্ব শিল্পও কি ভাবে রণোন্মাদী ফ্যাসিজমের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, ফিউচারিজম্ তা প্রমাণ করেছে। উনিশ শ' দশ খ্রীষ্টাব্দে এই আন্দোলনের প্রবক্তা ফিলিপ্পো মারিনেত্তি মেনিফেস্টোতে বলেছিলেন যে, তাঁদের উদ্দেশ্য যন্ত্রের ক্রমবর্ধ-মান বিজয়কে মহীয়ান করে তোলা। তাঁর মতে, 'একটা রেসের গাড়ি সামোথ্রেসে নাইকের মূর্তির চেয়েও সুন্দর'।[১২] এই মারিনেত্তি পরে মুসোলিনির বন্ধু হয়েছিলেন। ফিউচারি-স্টদের যন্ত্রের গতীয়গুণের প্রশংসার মধ্যে নিহিত ছিল ফ্যাসি-জমের আদর্শ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুর বছরে লেখা এই প্রবন্ধে ফিউচারিজমের এই বিশেষ দিকটির প্রতি সুকুমার স্পষ্টভাবেই ইঙ্গিত করেছিলেন। আঙ্গিকসর্বস্ব আন্দোলন-গুলি হয়েছিল সমাজের একটি বিশেষ স্তরের মনোযোগ আকর্ষণের উদ্দেশ্যে। ফিউচারিস্টরা এ ব্যাপারে কোনো ঢাকাঢাকি করেন নি।

ইম্প্রেশনিজম্ থেকে শুরু করে য়োরোপে অনবরত নানা ইজমের উদ্ভব দেখা গেছে। ফিউচারিজম্ এই অস্থিরতারই পরিণতি যা ফ্যাসিজমের জয় ঘোষণা করেছে। এর পরিণাম হিসাবে এসেছে সুররিয়্যালিজম্ বা পরাবাস্তব, যা পলায়ন করেছিল স্বপ্নের অলীক জগতে। ইম্প্রেশনিজম রং দেখেছিল, গঠন দেখে নি। কিউবিজম্ গঠনকে ভাঙতে চেয়েছিল। ফিউচারিজম্ শিল্প থেকে মানুষকে নির্বাসিত করতে চেয়েছিল। সুররিয়্যালিজ্ম ভৌত জগৎকে অস্বীকার করেছিল। এইসব আঙ্গিকসর্বস্ব শিল্প বাইরের অনিত্যতাকে চূড়ান্ত জ্ঞান করে শিল্পকে এগিয়ে দিয়েছিল বিচ্ছিন্নতার দিকে।

কিউবিজমে যে অ্যাবস্ট্রাক্শনের ইঙ্গিত ছিল, সে-বিষয়ে সুকুমারের মন্তব্য, "যদি সংস্কারবিমুক্ত হইতে হয়, তবে দৃষ্ট বা কল্পিত বস্তুর রূপকে এমন কিছুর দ্বারা ব্যক্ত করা আবশ্যক, যাহার সহিত সেই বস্তুর আকৃতিগত বা প্রকৃতিগত কোনো প্রকার সাদৃশ্য নাই।" তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে কিউবিস্টরা "সকল ছন্দকে এবং রেখা ও গঠনের সকল সংস্কারকে একেবারে নির্মূল" করে ছবিকে একটা

নিষ্প্রাণ ছকে পরিণত করেছিলেন। বিন্যাসের দোহাই দিয়ে তাঁরা রূপের তাবৎ গঠনকে চুরমার করেছিলেন। এই নঞর্থক ইজম্ কোনো সামাজিক সত্যকে স্বীকার করে নি। ইম্প্রেশনিজমে গঠন উপেক্ষিত হয়েছিল। পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্ট দল সোঁজা ছবিতে সেই গঠনকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তাবৎ সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণ রূপের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন শঙ্কু, গোলক ও স্তম্ভক। তাঁর এই নিষ্কর্ষের ভিত্তিতে আদ্রেঁ দ্যেরাঁ কিউবিজমের তাত্ত্বিক হয়েছিলেন। পাবলো পিকাসো ও জর্জ ব্রাক কিউবিস্টিক্ ছবি এঁকে আপেল, মানুষ, গীটার, গাছপালা, ঘরবাড়িকে "ত্রিকোণ, চতুষ্কোণাদির যে জঞ্জাল"-এ পরিণত করেছিলেন তা সুকুমারের চোখে "কোথাকার মানচিত্র বা ক্ষেত্রতত্ত্বের কোনো সিদ্ধান্ত" মনে হয়েছিল।

পিকাসোর কিউবিস্ট রীতিতে আঁকা বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি ছেপে সুকুমার বলেছিলেন, কিউবিজমের "ফল কিরূপ দাঁড়ায় তাহার একটা নমুনা দেওয়া গেল। চিত্রের ব্যাখ্যা দেওয়া কিউবিস্টশাস্ত্রে নিষিদ্ধ, সুতরাং চিত্রপরিচয়ের বৃথা চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।"

রোমান্টিক আদর্শবাদী ধারার শিল্পকে দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে এক উচ্চভাবের বাহন মনে করা হত। আধ্যাত্মিক ভাববাদীদের দাবি ছিল, "ভারতশিল্পের সচেতন লক্ষ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক অনুভূতির রূপায়ণ।"[১৩] "ভারতের বাইরে শিল্পচিন্তায় যে বিশৃঙ্খলা, তার কারণ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও নিম্নমানের আবেগের উপর নির্ভরশীলতা।[১৪] এই ক্লান্তি কিউবিস্ট, ফিউচারিস্ট এই ধরণের গোষ্ঠীর আন্দোলনে দূর হবে না; শিল্পীর চেতনাকে উচ্চ-আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নত করতে পারলেই সেই ক্লান্তি দূর হবে। আর এই কাজ বাংলা ঘরাণার (অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর ছাত্রগোষ্ঠী) শিল্পীরা করে চলেছেন।" নির্মাণগত বিশ্লেষণাত্মক ধারার আঙ্গিককে সমাজনিরপেক্ষ ব্যাপার হিসাবে দেখা হয়েছে। প্রশংসাত্মক ধারার লক্ষ্যও ছিল কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে মহিমান্বিত করা। রাজনৈতিক মতাদর্শে সুকুমারের কোনো বিশ্বাস ছিল বলে জানা যায় না, তথাপি তাঁর এই রচনা পড়ে মনে হয় যে, প্রগতিশীল আন্দোলনে নাম লেখালে বা পাশ্চাত্যের চটকদারিতে মুগ্ধ হলে প্রগতিশীল হওয়া যায় না, মানুষ প্রগতির পরিচয় দেয় তার যুক্তিপূর্ণ সদর্থক ভাবনায়।

এই প্রবন্ধের শেষে সুকুমার বলেছিলেন যে, ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু, অত্যুক্তি যা "কোনো না কোনো আকারে শিল্পে" থাকবেই, তাকে "মাথায় চড়িতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়।...তবে ভাবের সঙ্গে বস্তুজ্ঞানের একটা পরিচয় ঘটানো আবশ্যক। আর সর্বোপরি আবশ্যক আত্মনিষ্ঠা।" আত্মনিষ্ঠার অভাব ও দীনতা ঢাকার উপায় যে আঙ্গিকসর্বস্বতার অন্যতম কারণ, তা এই সর্বব্যাপী আঙ্গিকসর্বস্বতার দিনে আমাদের আবার বুঝে নেওয়ার অবশ্যই দরকার রয়েছে।

আধ্যাত্মিক ভাববাদী ধারার অন্যতম লেখক অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখার উত্তর ও প্রত্যুত্তরে সুকুমার ভারতীয় চিত্রশিল্প সম্পর্কে দুটি ছোট লেখায় তাঁর মত ব্যক্ত করেছিলেন।

আধ্যাত্মিক ভাববাদীরা প্রাচীন নিরিখের কয়েকটি লেবেল বা লক্ষণকে ভারতীয় চিত্রশিল্পের পরিচায়ক মনে করেছিলেন। তাঁদের কাছে পাশ্চাত্যের শিল্প জড়বাদী বলে বর্জনীয় ছিল। এই ধরণের শর্তবদ্ধতা সুকুমারের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

আধ্যাত্মিক ভাববাদীরা মনে করতেন যে, মানস-প্রতিমা শিল্পরচনার ভিত্তি, দৃষ্ট-প্রতিমা নয়। এই ধারার লেখকরা ছিলেন পুরাতত্ত্বে আগ্রহী। ই. বি হ্যাভেল, আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী, জন্ উডরফ, জেম্স কাজিন্স প্রমুখের চোখ ছিল পুরাতনের দিকে। প্রাচীনেই তাঁরা দেখেছিলেন বর্তমানের আদর্শ। আনন্দকুমারস্বামী 'শুক্রনীতিসারে'র উদ্ধৃতির কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন, মৃত্তিকার ধ্যানে পারঙ্গম হবেন, তিনি প্রত্যক্ষ না দেখে ধ্যানের সাহায্যে তাঁর মূর্তির রূপায়ণ ঘটাবেন।[১৫] এরই ফলে, এই লেখকেরা একযোগে শেখাতে লাগলেন যে, মানস-প্রতিমাই শিল্পের ভিত্তি। 'শুক্রনীতিসারে' সাদৃশ্যমূলক মানুষের ছবিকে ঈশ্বরানুভূতির বিরোধী অবশ্য বলা হয়েছে। কিন্তু একটা প্রাচীন শাস্ত্র যে বর্তমান যুগেও অভ্রান্ত, এর কোনো যুক্তিই নেই।

সুকুমার মন্তব্য করলেন যে এঁদের মতে, "মনোময় পুষ্পকরথে চড়িয়া কল্পনার মুক্ত আকাশে বিচরণ করাই তাহার বিশেষত্ব। জড়জগতে কি ঘটে না ঘটে, কোনটা সম্ভব

কোনটা অসম্ভব, এসব আদৌ ভারতশিল্পের আলোচ্য বিষয় নহে।" কেন না, প্রকৃতিকে নিয়ে জড়বাদীরাই টানাহ্যাঁচড়া করেন ; একাজ "বিজ্ঞানসর্বস্ব জড়বুদ্ধিপ্রধান পাশ্চাত্য জগতেই সাজে।"

এই 'অজায়ুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে'র পুরুষেরা অনবরত হিপ্‌নটিক্ সাজেশ্‌চনের মাধ্যমে এই অপব্যাখ্যা শিল্পীদের বুঝিয়ে ছিলেন আর শিল্পীরা এই প্রাচীনাভিসারকেই ভারতশিল্পের আদর্শ মনে করেছিলেন। সমকালীন সমাজ তো বটেই, জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তিও এই বর্তমান-বিমুখ শিল্পীদের ছবিতে দেখা যায় নি। শর্তবদ্ধ মানসিকতার বশে তাঁরা সতীদাহের মত কুপ্রথাকে ছবিতে মহিমান্বিত করেছিলেন। সেই ছবিতে নিবেদিতা এশিয়ার নারীত্বের মহিমা দেখেছিলেন।[১৬] লক্ষ্মণসেনের পলায়নের ঘটনার ছবি এঁকে বিলাতের স্টুডিয়ো পত্রিকায় ছেপে-ছিলেন। ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সেই পলায়নের ঘটনা যে মিথ্যা একথা বলায় [১৭] অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ছবিতে ইতিহাসের সত্যের চেয়ে শিল্পের সত্য বড়।[১৮] অবনীন্দ্র-নাথ ভারতমাতা-কে পৌত্তলিক দেবীতে রূপায়িত করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, হিন্দুর দেবদেবীর ছবিতেই জাতীয় আদর্শ ফুটে ওঠে।[১৯]

বিজ্ঞানবিমুখ গল্পকল্পাশ্রয়ী ছবির চর্চা দেখে সুকুমার প্রশ্ন করেছিলেন, "তবে কি আমরা ইহাই বুঝিয়া লইব যে ভারতীয় চিত্রশিল্পে চিত্রবিজ্ঞানের কোনও স্থান নাই।" চিত্র-বিজ্ঞান বলতে তিনি শারীর সংস্থান, পরিপ্রেক্ষিত জ্ঞান, বর্ণজ্ঞান প্রভৃতি বুঝিয়ে ছিলেন।

সুকুমার প্রশ্ন তুলেছেন, "শুনিতে পাই 'আধ্যাত্মিকতা'ই ভারতশিল্পের প্রাণ ও তাহার শ্রেষ্ঠতার কারণ। এই তথা-কথিত 'আধ্যাত্মিকতা' কিরূপ বস্তু?" তাঁর আরো প্রশ্ন, ছবির পাত্রপাত্রীর চোখে মুখে তন্দ্রাভাব, ছবির রঙের ঝাপ্‌সা অস্পষ্টতায় সামান্য আলোর রেখা, এসবই কি আধ্যাত্মিকতা-দ্যোতক? তিনি বলেছেন, সব দেশের শিল্পে দেশজ কিছু বিশেষত্ব থাকে। ভারতের শিল্পেও ধর্মভাবের ছায়া রয়েছে। কিন্তু তাতেই শিল্পের "শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন" কিংবা "ঐশ্বরিকতা"র অভিব্যক্তি দেখা গেল, এমন মনে করা যায়? জড়বাদ বলে কি "এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ" দেখাতে হবে আর ভাবের অস্পষ্টতা ও পার্সপেকটিভ বর্জনকে শিল্পের বিশেষ গুণ বলে ধরে নিতে হবে? সুকুমার শিল্পে ছুঁৎমার্গের বিরোধিতা করেছিলেন। প্রকৃতির অধিকার বিশ্বজনীন অধিকার। 'শুক্রনীতিসার' বা প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে কি লেখা আছে আর পাশ্চাত্যের আদর্শ কি, এই মানদণ্ডেই কি বর্তমানের শিল্পভাবন নির্ধারিত হবে—প্রকৃতি বর্জিত হবে?

আধ্যাত্মিক ভাববাদীদের বক্তব্য ছিল যে, ভারতীয় শিল্পের সৌন্দর্য বাইরে নয়, ভিতরে। সুকুমার বলেছেন, এটা সব শিল্পেরই লক্ষণ, এটা এদেশের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। কোনো লেবেল দিয়ে শিল্পকে চিহ্নিত করার তিনি বিরোধী ছিলেন। একদল ভাববাদী শিল্পকে যে-পথে বলবেন সেই পথে চলতে হবে, অন্যপথে 'গতিনাস্তি'—একথা তিনি সমর্থন করেন নি। "প্রকৃত শিল্পী অন্তর্নিহিত শিল্পবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যই শিল্প-সাধনা করেন। 'ভারতীয়' শিল্প 'গ্রীক' শিল্প প্রভৃতি প্রথা-বিশেষের খাতিরে নহে।" সুকুমার এমন এক সময় এই উক্তি করেছিলেন, যখন এই দূরদর্শিতা ছিল অভাবনীয়। তখনও রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক ভাববাদী ধারার সমর্থক। সুকুমারের উক্তির বহু পরে উনিশ শ' ছাব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। ঢাকায় প্রদত্ত দীর্ঘ বক্তৃতায়[২০] তিনি যা বলেন তাতে সুকুমারেরই অভিমতের বিশদ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন যে, কোনো দেশই নিজেকে আবদ্ধ রেখে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পারে নি। আদান-প্রদান ও আত্তীভবনের দ্বারা সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়। হেলেনীয় আদর্শে উদ্ভূত গান্ধার শিল্পে, মোঙ্গল-ইরাণী সূত্রে মুঘল চিত্রকলায়, ইরাণ থেকে সমস্ত এশীয় দেশের উপাদানে অজন্তায় যে প্রবল স্বীকরণ—তা আমাদের সাংস্কৃতিক ঔদার্য ও গ্রহণক্ষমতাকে প্রকাশ করেছে। বাইরের শিল্পেও এদেশের অবদান স্বীকৃত হয়েছে। "এইসব পারস্পরিক আদান-প্রদানের সময় পেশাদার শিল্প-সমালোচকদের দাপট ছিল না। ঔচিত্যবোধের ব্যাপারে শিল্পীদের কনুইয়ের খোঁচা মেরে সজাগ করে দেওয়া হত না।"

ভারতীয় চিত্রশিল্পে তৎকালীন বাড়াবাড়ি সম্পর্কে সুকুমার বলেছেন যে, কবিতার মত "শিল্পেও অলঙ্কার ও উপমার স্থান আছে কিন্তু সেই অলঙ্কার ও উপমাই যখন সর্বেসর্বা" হয়ে উঠতে চায় "তখনই আশঙ্কার কথা"। আর এই অত্যুক্তি কিংবা

বাড়াবাড়িই নাকি ছিল ভারতশিল্পের লক্ষণ। আধ্যাত্মিক ভাববাদীরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন, বিদেশী ভাষায় কাব্য লিখে কে কবে যশস্বী হয়েছে। সুকুমারের মন্তব্য, তাহলে কি এই যুক্তি অনুসারে বিদেশী ভাষার চর্চাও নিষিদ্ধ। তিনি আরো বলেছেন, দুই ভাষার মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য, "আদর্শ ও উপায়ের আত্যন্তিক অনৈক্য সত্বেও ভিন্ন ভিন্ন চিত্রশিল্পের মধ্যে" এ ধরণের বিভিন্নতা কোথাও দেখা যায় না। "কারণ, চিত্রের ভাষা মূলত এবং স্বভাবত বিশ্বজনীন।" শব্দপ্রতিমা ও চিত্রপ্রতিমার প্রকাশভঙ্গীই আলাদা, একটা দিয়ে অন্যেকটার ব্যাখ্যা চলে না। শব্দ যেক্ষেত্রে ভূগোলের কিছু বন্ধন স্বীকার করে, চিত্রে সেই বন্ধন নেই। স্বভাবতই, যে বাংলাভাষা জানে না, তার পক্ষে বাঙালীর আঁকা ছবি বোঝা আদৌ দুষ্কর নয়! একথা আধ্যাত্মিক ভাববাদীরা বোঝেন নি যে, ভাষার বিভেদের কারণেই বৌদ্ধধর্ম দেশান্তরে নির্বাহিত হয়েই গিয়েছিল, শব্দ বা ভাষাবাহিত হয়ে যায়নি।

আবার সুকুমার এঁদের কথার ও কাজের মধ্যে নানা বিসংগতি লক্ষ্য করেছেন। স্বয়ং হ্যাভেলের মতে "অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি ইয়োরোপীয় পদ্ধতির সংমিশ্রণ।" সুকুমার বলেছেন যে, এর দ্বারা অবনীন্দ্রনাথ বা তাঁর ছাত্রদের ছবির ভারতীয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছে, একথা কেউ বলবেন না।

"কল্পনার দিব্য চশমাটির উপর অতিরিক্ত মমতাবশত চিত্রবিজ্ঞানের 'ঠুলি'টিকে" আবর্জনা জ্ঞানে ফেলে দিয়ে 'শিল্পের মধ্যে একটা বিশেষ অনন্যলভ্য 'দৈব' সম্পদ কল্পনা" করে "এই আদর্শই সকলের অবশ্যশিরোধার্য" বলে জেদ ধরলে তাতে যে আমাদের কোনো কল্যাণই হবে না, একথাও তিনি বলেছেন। চিত্র যে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে আসতে পারে না, একথা সুকুমারই এদেশে প্রথম বলেছিলেন।

দ্বিতীয় লেখাটিতে সুকুমারের বক্তব্য, আধ্যাত্মিক ভাববাদীরা শিল্পের "একটা অসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র"কেই ভারতশিল্প বলে থাকেন। তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিল্পের মধ্যে একটা অলীক দ্বন্দ্বেরও কল্পনা করে থাকেন। সংকীর্ণতা সংস্কৃতির গুণ নয় অথচ অর্ধেন্দ্রকুমারের মতে "পুরাণাদি-বর্ণিত কল্পলোকের বস্তুকল্পনাকে চিত্রে যথাযথভাবে (অর্থাৎ 'অক্ষরে অক্ষরে') অনুবাদ করাই ভারতশিল্পের উদ্দেশ্য।" এই অন্ধতাকেই সুকুমার আঘাত করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, এই আদর্শ কোথা থেকে এল? যার এই আদর্শে রুচি নেই, তার পক্ষে কি ভারতশিল্প বর্জনীয়? তাঁর মতে "রিয়্যালিজম্ শিল্পের মূল ভিত্তি, আইডিয়ালিজমে তাহার ব্যক্তিত্বের বিকাশ, এবং উভয়ের সমন্বয়ে তাহার পূর্ণ সফলতা।" বাস্তবতার সংঘর্ষে এলেই যে ভারতীয়শিল্পে অপঘাত ঘটবে, এমন আশঙ্কার কোনো কারণ সুকুমারের যুক্তিবাদী মন দেখে নি। শিল্প ও প্রকৃতির মধ্যে কৃত্রিম বিরোধের ফলেই যে উৎকেন্দ্রিকতা জেগে ওঠে, এ তিনি দেখেছেন; দেখেছেন যে, তখনই শিল্প "কতকগুলি ফ্যাশান, রচনাভঙ্গী ও ঢঙ্ (ম্যানারিজম্) মাত্রে পর্যবসিত" হয়ে ওঠে।

তিনি বলেছিলেন, রস অলৌকিক কিন্তু লৌকিকের জ্ঞান ছাড়া তার অবতারণা করা যায় না। কেননা জ্ঞানগত বাস্তবের রূপান্তর বা নূতন ধরণের সমাবেশেই কল্পনার জন্ম। কৃত্রিমতা পাশ্চাত্যের চিত্রবিজ্ঞানের প্রাণ বা প্রধান সম্পত্তি, একথা মনে করা ভুল। চিত্রের উৎপত্তি বস্তুজ্ঞান থেকে, প্রকৃতি থেকে; চিত্র ও ভৌতজগৎ পরস্পরবিরোধী নয়—এদের মধ্যে যোগসূত্র হচ্ছে মানুষের চেতনা ও কল্পনা। প্রকৃতির প্রস্থানবিন্দুকে অস্বীকার করে মানুষের কোনো যাত্রাই সম্ভব নয়।

সুকুমার যখন 'শিল্পে অত্যুক্তি' লিখেছিলেন তার মাত্র কয়েকমাস আগে, উনিশ শ' তেরো খ্রীষ্টাব্দে গীঅম্ অ্যাপোলিনোর কিউবিজম্-সম্পর্কিত বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। পিকাসো তখন কিউবিজমের চর্চা করে চলেছেন। সুররিয়্যালিজম্ তখনও ভবিষ্যতের ব্যাপার। উনিশ শ' বারো খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পোস্ট-ইম্প্রেশনিস্টদের প্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভূমিকা লিখেছিলেন রজার ফ্রাই। সুকুমার সে-সময় বিলেতে ছিলেন। মনে হয় এই প্রদর্শনী তিনি দেখেছিলেন। বিনোদবিহারী দাবী করেছেন যে, "ইমপ্রেশনিজম্ থেকে কিউবিজম্ পর্যন্ত বিশদ আলোচনা যে সময় ক্রামরিশ করেছিলেন তখন ভারতের শিল্পীসমাজ এ বিষয়ে সচেতন হন নি।"[২১] স্টেলা ক্রামরিশ শান্তিনিকেতনে পড়াতে এসেছিলেন উনিশ শ' একুশ খ্রীষ্টাব্দে। তারও এক বছর বাদে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে জার্মান এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের আঁকা মূল ছবির প্রদর্শনী কলকাতায় এসেছিল। ক্রামরিশের বক্তৃতা ও

এক্সপ্রেশনিস্টদের প্রদর্শনী সুকুমারের লেখাটি প্রকাশিত হবার সাত-আট বছর পরের ঘটনা। বাংলা শিল্পালোচনায় এই কারণে সুকুমারের ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সুকুমার বুঝতে পেরেছিলেন যে, একটি প্রচলিত রীতি অভ্যস্ত বা মামুলি হয়ে এলেই পরবর্তী একটি 'ইজমে'র উদ্ভব ঘটে থাকে। ইম্প্রেশনিজম থেকে শুরু করে পরপর এই সব ইজমে বারবার পূর্বতন রীতির অসারতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে। অভ্যস্ত জীবনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের চেষ্টা হয়েছে—কিন্তু অচিরে এইসব প্রতিবাদ আচরণীয় রীতির প্রতিষ্ঠা পেয়ে স্থিতাবস্থার সঙ্গে আপোস করেছে। ইম্প্রেশনিজম্, কিউবিজম্ প্রভৃতির প্রারম্ভিক প্রতিবাদকে আমরা যেমন স্বীকার করি, তেমনি তাদের ব্যর্থতাও আমাদের এই কথাই বলে যে প্রতিবাদ যদি জীবনবোধের গভীর থেকে উঠে না আসে, তাহলে তা সদর্থক হতে পারে না। তবে, বস্তুজ্ঞান বলতে সুকুমার বুঝেছিলেন ভৌতজ্ঞান বা জগৎজ্ঞান। মানবচেতনার বিকাশে ও সমাজের উন্নতির কাজে শিল্পের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি কোনো আলোচনা করেন নি। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আঙ্গিক-সর্বস্বতা কতখানি সামঞ্জস্যহীন, তাও তিনি বলেন নি।

ভারতীয় চিত্রকলা সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, তার সমর্থন আমরা পরবর্তীকালে পেয়েছি হ্যাভেলের পরে আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনের লেখায়। ব্রাউন লিখেছিলেন যে, এইসব ভারতীয় শিল্পীরা যাঁদের জন্য ছবি আঁকছেন বলে মনে করছেন, তাঁদের বাদ দিয়ে এগুলি মুষ্টিমেয় য়োরোপীয়দের কাছ থেকে সমাদর পাচ্ছে।[২২] সময় ও সমাজের বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে অতীতের পুঁথিপুরানকে আঁকড়ে ধরার ফলেই এই বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিয়েছিল।

সুকুমারের এই রচনাগুলির দৃষ্টিভঙ্গী পূর্বাপর শিল্পালোচনার থেকে স্বতন্ত্র। মুক্তদৃষ্টিতে যা তিনি দেখেছিলেন, পরে তার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়েছিল। সমাজ-ভাবনার সঙ্গে এই আবেগবর্জিত যুক্তিবাদী শিল্পালোচনার সমন্বয়ে একটি নূতন শিল্পালোচনার ধারার সূত্রপাতের অবকাশ রয়েছে।

খ. সুকুমার রায়ের ছবি

নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশন বা সচিত্রকরণের সূত্রে সুকুমার রায় যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন, সেগুলি আমাদের দু'জন পূর্ববর্তী লেখক-শিল্পীর কথা মনে করায়। এঁদের একজন লুইস্ ক্যারল এবং অপরজন এড্‌ওয়ার্ড লীয়র।

আজবদেশে অ্যালিসের দেখা কাণ্ডকারখানার ছবি লেখক ক্যারল স্বয়ং এঁকেছিলেন, আর এঁকেছিলেন স্যার জে. টেনিয়েল। টেনিয়েল অবশ্যই ক্যারলের চেয়ে দক্ষ শিল্পী ছিলেন। কিন্তু লেখকের ভিজুয়েলাইজেশন বা রূপকল্পনা এবং অপর একজন শিল্পীর রূপকল্পনায় তফাৎ কতখানি তা এই দুজনের আঁকা একই ঘটনার ইলাস্ট্রেশন দেখলে বোঝা যায়।

লীয়র আমাদের কাছে তাঁর উদ্ভট লিমেরিকগুলির ইলাস্ট্রেটর হিসাবে পরিচিত। তাঁর এই খ্যাতি তাঁর আসল পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে। লীয়র ছিলেন দক্ষ ল্যাণ্ডস্কেপ পেইন্টার বা নিসর্গের শিল্পী। তৎকালীন বড়লাটের আমন্ত্রণে আঠার শ' বাহাত্তর খ্রীষ্টাব্দে ইনি এদেশের দৃশ্য ও ঘটনার ছবি আঁকতে এসেছিলেন।

রোগশয্যায় সুকুমারের আঁকা সূর্যাস্তের গঙ্গার যে জলরং ছবি কার্তিক তেরো শ' ত্রিশ বঙ্গাব্দের সন্দেশে, তাঁর মৃত্যুর পর ছাপা হয়েছিল, সেটি তাঁর নিসর্গের ছবিতে দক্ষতার পরিচায়ক।

ক্যারল, লীয়র ও সুকুমার এই তিনজনই নিজেদের লেখা বইয়ের ইলাস্ট্রেশন নিজেরাই করেছিলেন। সমকালীন লেখা ও আঁকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের লেখা ও আঁকা ছিল দলছুট ও সৃষ্টিছাড়া। অভ্যস্ত সড়কে তাঁরা হাঁটেন নি। শিশুর সমবয়সীর মত এঁরা বয়স্কদের অসারতায় ভরা কৃত্রিম পৃথিবীকে তছনছ করেছিলেন। সমকালীন নর্মস বা বিধিব্যবস্থাকে প্রচণ্ডভাবে পরিহাস করে তাঁরা কলম ও তুলি ধরেছিলেন। লেখক-শিল্পীদের সেটাই ছিল হাতিয়ার।

সুকুমার নিসর্গের ছবি আঁকার দক্ষতাকে বিশদক্ষেত্রে অনায়াসে ব্যবহার করতে পারতেন। সমকালীন শিল্পীদের সারিতে তাহলে হয়ত তাঁকেও আমরা পেতাম। কিন্তু, তিনি বেছে নিলেন এমনই এক মাধ্যম, যা তখন কমার্শিয়াল আর্ট

যা বাণিজ্যিক শিল্পের এক্তিয়ারে পড়ে এবং যা 'শিল্পী'দের গৌরববাহী পথ হিসাবে তখনও বিবেচিত নয়। তাঁরই সমকালে গগনেন্দ্রনাথ চলতি সড়ক ছেড়ে আঁকছিলেন নবহুল্লোড়, অদ্ভুত লোক ও বিরূপ বজ্রের ছবি সমকালীন সমাজব্যবস্থাকে তীব্র কশাঘাত করে। গগনেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ ছিল সোজা ও সরাসরি, কিন্তু সুকুমারের ভঙ্গি ছিল তির্যক। এই কারণে সুকুমারের লেখা ও আঁকায় এসেছে রূপকধর্মিতা, যার আস্বাদন উদ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সেই বিষয় বা লক্ষ্য জানতে পারলে তার আস্বাদন সম্পূর্ণ হয়।

পূর্বের ও সমকালের ছোটোদের বইয়ের ইলাস্ট্রেশন দেখলেই সুকুমারের ছবির বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে আলাদাভাবে ধরা পড়ে। ইংরাজী বইয়ের ইলাস্ট্রেশন একাজে তাঁকে অবশ্যই প্রেরণা দিয়েছিল।

সাধারণত লেখক ও শিল্পী আলাদা ব্যক্তি হয়ে থাকেন। লেখকের কল্পরূপ বহুক্ষেত্রে শিল্পীর কল্পরূপের সঙ্গে মেলে না। লেখক ও শিল্পীর মানসিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা হবার কারণে অনেক লেখক নিজেই তাঁর লেখার সঙ্গে ছবি এঁকে এই সমস্যা দূর করে থাকেন। নিজের লেখার ছবি নিজে আঁকার কারণে সুকুমারের ক্ষেত্রে লেখক ও শিল্পীর কল্পরূপে কোনো সংঘাত বাধেনি।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় ঠাকুর-পরিবারের সদস্যদের যৌথ উদ্যোগে গত শতকের শেষে 'বালক' নামে ছোটোদের পত্রিকা বেরোত। হরিশ্চন্দ্র হালদার ছিলেন 'বালক'-এর ইলাস্ট্রেটর। তাঁর কাজের নমুনা হিসাবে দু'টি উদাহরণ আমরা দেখতে পারি। বৈশাখ বার শ' বিরানব্বই বঙ্গাব্দের 'বালক'-এ বিলাতি ইলুমিনেটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট বা অলঙ্কৃত পাণ্ডুলিপির ঢঙে ছাপা হয় রবীন্দ্রনাথের 'বল গোলাপ মোরে বল'। রবীন্দ্রনাথের হাতে লেখা এই গান/কবিতার চারপাশ ঘিরে হরিশ্চন্দ্র বিলাতি ঢঙে লতাপাতা এঁকেছিলেন, উপরে দিকে বৃত্তাকৃতি লতার মধ্যে দাঁড়িয়ে মেমসাহেবের ঢঙের একটি মেয়ে গোলাপের গন্ধ শুঁকছে। ঐ বছরের জ্যৈষ্ঠের 'বালক'-এর মুখপৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হল এক নাদুসনুদুস বাচ্চার ছবি, তার মাথাটি দেহের অনুপাতে বিকটাকৃতি আর তার হাতে নকশা করা বিরাট এক তাবিজ বাঁধা। ঐ সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট'-এর ইলাস্ট্রেশনে দেখা যাচ্ছে সিনসিনারি সাজ-পোশাক-সম্বলিত চলতি নাটকেরই দৃশ্য। আঁকার ক্ষমতা, রূপকল্পনা এবং রচনার মর্মোপলব্ধির অভাবেই এমনটি ঘটেছে।

তের শ' চোদ্দ বঙ্গাব্দে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার তাঁর ঠাকুরমা'র ঝুলির ছবি এঁকে কয়েকজন এনগ্রেভার বা তক্ষণকারদের দিয়ে ধাতুর পাতে তক্ষণ করিয়ে ছেপেছিলেন। এই ছবিগুলিতে ও তক্ষণে পঞ্জিকার ছবির চরিত্র ধরা পড়েছে। শিশুদের বইতে যুক্ত হবার মত কোনো বৈশিষ্ট্য এগুলিতে নেই।

গত শতকের শেষে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা রবীন্দ্রনাথের 'নদী ও বিম্ববতী' কবিতার ইলাস্ট্রেশনে কবির বর্ণনার প্রতি বিশ্বস্ত শিল্পীকে পেলেও শিল্পীর রূপকল্পনা সেখানে অনুপস্থিত। আঠার শ' ছিয়ানব্বই খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'ক্ষীরের পুতুলে'র জন্য অবনীন্দ্রনাথ যে ছটি রঙীন পাতাজোড়া ইলাস্টেশন করেছিলেন, তাতে বড়ো রাণীকে মনে হয় শাড়িপরা মেমসাহেব। অবনীন্দ্রনাথ এর আগের বছর বৈষ্ণবপদের অনুসরণে এঁকেছিলেন ইলুমিনেটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট-এর ঢঙে শুক্লাভিসার ছবি, যেটি আঁকার পরে তাঁর নিজেরই মনে হয়েছিল যেন শ্রীরাধিকার বদলে একটি মেমসাহেবকে শীতের রাতে শাড়ি পরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই'তে তাঁর নিজের আঁকা ছবির শেয়াল, কুমির প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমা'র ঝুলির শেয়াল, কুমির পাশাপাশি দেখলে বোঝা যায় যে, দক্ষিণারঞ্জনের ছবি বর্ণনামূলক আর উপেন্দ্রকিশোর বর্ণনা ছাড়াও এদের ভাবভঙ্গীর বাড়তি মজাও দেখিয়েছিলেন। দক্ষিণারঞ্জনের রাক্ষস-রাক্ষসী শিশুর পক্ষে ভীতিপ্রদ। ফাল্গুন, তের শ' একুশ বঙ্গাব্দের সন্দেশে সেকালের বাদুড়ের যে ইলাস্ট্রেশন সুকুমার করেছেন, তাতে আকাশের অতিকায় সেকেলে বাদুড়টির তুলনায় নিচের ছুটে পালানো মানুষটি অনুপাতে ছোটো বটে, তবে বাদুড়টা সেকালের হলেও কোট-প্যান্ট পরা মানুষটি যে একালের। হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরীর বিরাট ল্যাগ্ড্যাথেরিয়ামকে গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে চলেছে কত ছোটো একজন মানুষ। এরা শিশুদের ভয় দেখায় না। এই মজাদার ব্যাপার সুকুমারের রূপকল্পনার বিশেষত্ব।

সুকুমার একাধারে ছিলেন লেখক ও শিল্পী। তাঁর

অনেক ছবি দেখলে আমাদের মনে হয়, হয়ত লেখার আগেই ছবিগুলির ভিজুয়েলাইজেশন্ বা রূপকল্পনা শিল্পীর স্বভাবানুসারেই তাঁর মাথায় এসেছিল। লেখা এসেছিল পরে, পরিপূরক হিসাবে।

সন্দেশে ছাপা ও সন্দেশের বাইরে করা তাঁর ইলাস্ট্রেশনে কয়েকটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল, (এক) নিজের লেখার সঙ্গের ইলাস্ট্রেশনে তাঁর স্ফূর্তি ও সাবলীলতা দেখা যায়। এই ব্যাপার, অন্যের লেখার সঙ্গের ইলাস্ট্রেশনে, সবক্ষেত্রে বজায় থাকে নি। মনে হয়, অন্যের লেখার ইলাস্ট্রেশনের রূপকল্পনা তিনি সতর্ক হয়ে করেছিলেন। (দুই) ইলাস্ট্রেশনে তিনি রীতি-সাম্য বজায় রাখেন নি। নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনে রীতি-সাম্য থাকলেও অপরের লেখার ইলাস্ট্রেশনে সেইসব লেখার ভাব অনুসারে তিনি রীতি-পরিবর্তন করেছেন, যা সবক্ষেত্রে সার্থক হয় নি। (তিন) তাঁর ইলাস্ট্রেশন অবয়ব-প্রধান। অবয়বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অবয়ব ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বা রূপ ছাড়া কোনো বাড়তি জিনিসকে তিনি ছবিতে স্থান দেন নি। (চার) তাঁর লেখার সন্দেশ পাঠের ইলাস্ট্রেশন এবং বইয়ের অন্তর্ভুক্তির কালে সেই সব লেখারই ইলাস্ট্রেশন বদলানো হয়েছে দু'ভাবে।

প্রবাসী, আশ্বিন তের শ' একুশ বঙ্গাব্দে তাঁর 'ভাবুক সভা' কবিতার সঙ্গে আঁকা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পূর্ণিমা রাতে জলের উপর ঝুঁকে পড়া ডালে, হাতে পেনসিল ও 'চাঁদ' লেখা খাতা নিয়ে চন্দ্রাহত ভাবুক বসে আছে। চোখে চশমা, চুল উসকুখুসকু। উড়ুনির একপ্রান্ত নিচে, অপর প্রান্ত উপরে উড়ছে। এই কাব্যনাট্যের মজা ও ছবিটির মজা স্বতন্ত্রভাবে উপভোগ করা যায় এবং মনে হয় ছবিটির রূপকল্পনা বুঝি আগেই তাঁর মস্তিষ্কে এসেছিল। 'বুঝবার ভুল' কবিতার ছবি তিনটি কবিতামুক্ত কমিক্‌স্ট্রীপ হিসাবেও আলাদাভাবে উপভোগ্য। এটির এবং 'ছবি ও গল্প' কবিতার ছবিগুলির রূপকল্পনাও মনে হয় কবিতার আগেই তিনি করেছিলেন। 'ছবি ও গল্প' কবিতার পরীক্ষার গোল্লা, ছানাবড়া চোখ, রেগে আগুন, আহ্লাদে আটখানা প্রভৃতি শব্দ-প্রতিমার অ্যাবসার্ড ব্যাপার আক্ষরিক অর্থে কি দাঁড়ায়, তা এই ছবিতে চাক্ষুষ হয়ে উঠেছে।

আষাঢ় তের শ' ছাব্বিশ বঙ্গাব্দের সন্দেশে ছাপা দাঁড়ের কবিতার পৃষ্ঠাজোড়া রঙীন ইলাস্ট্রেশনে রয়েছে : লাল দেয়ালের উপর পাখি, নিচে পায়ে-শেকলবাঁধা দাঁড়ে বসে-থাকা মানুষ। ট্যাঁশগরু, হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরীর হ্যাংলাথেরিয়াম্, গোমড়াথেরিয়াম্, ল্যাগব্যাগনিস প্রভৃতি ছবিতে শব্দ আর ছবির মজা রয়েছে। এই রূপকল্পনায় আমরা তিনটি ব্যাপার লক্ষ্য করি। প্রথমটি হচ্ছে, আদিম অ্যানিমেশন মোটিফের ব্যবহার। এই আদিমতা প্রতিটি প্রাচীন ধর্মসমাজে এখনও রয়েছে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, পশু-রূপকের মধ্য দিয়ে মানব চরিত্রের ইঙ্গিত, যা এদের বিচিত্র নামেও রয়েছে। আর তৃতীয়টি এই যে, এইসব হলেও-হতে-পারত জন্তুদের রূপকল্পনায় তাঁর মনে হয়ত ফরাসী বিজ্ঞানী জর্জেস্ কুভিয়েরের ক্যাটাস্ট্রফি তত্ত্ব ছিল। বিবর্তনের পর্যায়ে এমন কিছু জন্তু-জানোয়ারের সম্ভাবনা ছিল যেগুলি সম্পর্কে সুকুমার মজাদার ধারণা করেছিলেন। হ-য-ব-র-ল-র কাক, ছাগল, কুমির বেড়ালের মধ্যেও তিনি মানুষের অ্যানিমেশন এনেছিলেন। শিশুর কল্পনায় প্রাণীমাত্রেই মানবিক দোষগুণসম্পন্ন—এই কথা তাঁর মনে এইসব রূপকল্পনার কালে ছিল।

নিজের লেখার ছবির রূপকল্পনায় তিনি বহুক্ষেত্রে লেখার অতিরিক্ত ইঙ্গিতে চলে গেছেন। লেখাবিমুক্ত এই প্রসারণের কারণে আলাদা ছবি হিসাবে তাঁর বহু ইলাস্ট্রেশন স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। বাক্-প্রতিমা বহুক্ষেত্রে চাক্ষুষ-প্রতিমার সঙ্গে মেলে না। একটি ঘটনার বিবরণ অনুসরণে আঁকা ছবি যেমন ঘটনা থেকে মাত্রাগতভাবে দূরে চলে যায়, সেই সঙ্গে একই ঘটনার বিবরণ অনুসারে বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ছবিতেও নানা তফাৎ হয়ে যায়। নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে সুকুমারের কাছে এইসব সমস্যা দেখা দেয় নি। প্রথমত, কিছু ছবির রূপকল্পনা আগে হওয়ায় লেখাই ছবিকে অনুসরণ করেছে। দ্বিতীয়ত, কিছু ছবির রূপকল্পনা লেখার ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও তিনি বাক্-প্রতিমার অনুসরণের অতিরিক্ত এমন কোনো ভাবভঙ্গীঅর্থ ছবিতে যুক্ত করেছেন যার ফলে ছবি স্বতন্ত্রভাবেও দেখা যায়। কানে-খাটো বংশীধর যে জুতোর তলায় বেড়ালের লেজ চাপা দিয়ে উপরন্তু ছাতার ডগা দিয়েও খোঁচাচ্ছে একথা কবিতাটিতে স্পষ্ট করে লেখা নেই, সঙ্গের

ছবিতে কিন্তু তা স্পষ্ট দেখানো হয়েছে। এখানে হয়ত ছবির রূপকল্পনা আগে এসেছিল। কবিতা থেকে আলাদা করে দেখলেও ছবির মজা থাকে। মেঘ মুলুকে ঝাপসা রাতে-র ছবির রূপকল্পনায় কবিতাটির বর্ণনা থেকে মুক্ত একটি জগৎ গড়ে উঠেছে। এর ফলে কবিতাটির অর্থ ও ব্যঞ্জনা আরও প্রসারিত হয়। শিল্পী তাঁর নিজেরই কবিতার বর্ণনার অনুগত ইলাস্ট্রেশন না-করে এমন এক আবোলতাবোল রাজ্যের রূপকল্পনা করেছেন যা অপরের ইলাস্ট্রেশনে পাওয়া যেত না। এই স্বাধীনতা অপর ইলাস্ট্রেটর নিতেও পারতেন না। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ভূমণ্ডলের মত গোল টেবিলে বই, কাগজ, স্কেল-কম্পাসে হাত দিয়ে বসে থাকা তত্ত্বজ্ঞানী বা বিজ্ঞানী চশমা কপালে তুলে আকাশের 'খেয়াল স্রোতে' ভেসে যাওয়া চিরকালের নবীন বাঁশি বাজিয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। এই বৃদ্ধ ও বালক একই সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানী ও শিশুর সমবয়সী সুকুমারেরই আত্মপ্রক্ষেপণ। শিশুদের কাছে এইসব ছবির সিচুয়েশন মজাদার, কিন্তু বড়দের কাছে এইসব আপাত মজার স্তরে স্তরে লুকিয়ে থাকা তাৎপর্য ধরা পড়লে, আজকের বয়স্ক পাঠক তাঁর শৈশবে দেখা এইসব ছবিকে অন্যভাবে দেখতে পান।

অন্য অনেক লেখকের লেখার ইলাস্ট্রেশনও সুকুমার করেছিলেন। মাঘ তের শ' একুশ বঙ্গাব্দের সন্দেশে চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খুকুর লেখা কবিতার ইলাস্ট্রেশনের বাচ্চাটি যেন ফ্যামিলি অ্যালবাম থেকে উঠে এসেছে। সুকুমার যে ক্যামেরাম্যান ছিলেন, এই ছবির দৃষ্টিকোণ তা বলে দেয়। তের শ' সাতাশ বঙ্গাব্দে সন্দেশে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশকালে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'খাতাঞ্চির খাতা'র ইলাস্ট্রেশন সুকুমার করেছিলেন। এতে রয়েছে একটি মানচিত্র, যা হালিশহরের অর্থাৎ হাল শহরের অর্থাৎ কলকাতার। এযেন শিশুর ভূগোল-জ্ঞানেরছবি, যেখানে সিংহিবাগান, শিকদারবাগান, মনোহরপুকুরে গলাগলি ; জানবাজার, মুরগীহাটা, পাতিপুকুর আর গোলিপুরে হাত ধরাধরি। কোম্পানিবাগানে মানুষওড়া গ্যাসবেলুন, কেল্লায় তোপ ছাড়াও পটলডাঙ্গা পটলাকৃতি, পাতিপুকুর পাতি-হাঁসের আকারের, মুরগীহাটা মুরগীর আকারের, বেনেপুকুর ষষ্ঠী পুজোর পুতুলের আকারের, মেছোবাজারের চৌহদ্দি মাছের মত। এই বাড়তি মজা সুকুমারের সংযোজন। এছাড়া যাত্রার নারদ, নারদের প্রবেশ, সোনাতোন প্রভৃতি ছবিতেও তাঁর সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। এই ব্যতিক্রমগুলি ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরের লেখার ইলাস্ট্রেশনে তিনি যেন আরেক সুকুমার রায়। হয়ত বর্ণনায় তিনি মজা পান নি কিংবা এই ধরণের ইলাস্ট্রেশনে তিনি স্বস্তি পান নি। ফলে এগুলিতে তাঁর আঁকা শিথিল, ভঙ্গী নিরাসক্ত। বৈশাখ তের শ' একুশ বঙ্গাব্দের সন্দেশে 'কৃষ্ণ মহাদেবকে জৃম্ভণ অস্ত্র মারিয়াছেন', ভাদ্র তের শ' ছাব্বিশের সন্দেশে 'রাজা শতানীকের মুক্তি', ঐ বছর চৈত্রের সন্দেশে 'এহি ভিক্ষায়' অঙ্গুলিমাল ও বুদ্ধের ছবিতে কম্পোজিশন্যাল ইন্টেগ্রিটি বা রচনাত্মক ঐক্য নেই, ড্রইংও আড়ষ্ট। এই ছবিগুলি যেন অপর কোনো সুকুমারের আঁকা।

নিজের লেখার ইলাস্ট্রেশনে সুকুমার রীতি-সাম্য রক্ষা করেছেন। তাঁর এইসব ইলাস্ট্রেশনের প্রতিটি রেখাই যেন তাঁর স্বাক্ষর। এস. আর. বা এস. রায় সই না থাকলেও এগুলিতে তাঁর রেখা ও রূপের স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। 'কৃষ্ণ মহাদেবকে জৃম্ভণ অস্ত্র মারিতেছেন', 'অঙ্গুলিমাল' কিংবা রেবতী নক্ষত্রের আকাশ থেকে খসে পড়ার ছবিতে অবনীন্দ্রনাথের ঘরাণার রীতি অনুসরণে প্রকাশ পেয়েছে দুর্বলতা ও যাত্রার ঢং। তের শ' ছাব্বিশ বঙ্গাব্দের সন্দেশে প্রিয়ম্বদা দেবীর ধারা-বাহিক গল্প 'পঞ্চুলাল'-এর সঙ্গে হয়ত সুকুমার নিজের লেখার মিল দেখেছিলেন। কুকুরের মত শেকল-গলায় মানুষ, মানুষের পোশাক পরে হেঁটে যাওয়া পাখি, মাথায় মোমবাতি নিয়ে শামুকের দরজা খোলা প্রভৃতি ছবির কল্পজগৎ, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের য়োরোপীয় শিল্পী, ফ্যানটাসির রূপকার হিয়েরোনিমাস্ বশ্-এর ছবির কথা মনে করায়। নরকের রূপকল্পনার ছলে বশ্ পৃথিবীরই ছবি এঁকেছিলেন। সুকুমারের উদ্ভট জগতের উপরিতল মজাদার হলেও এর গভীরে আমরা আমাদের চেনা জগৎকেই নূতন করে দেখি।

চরিত্রের বিশেষ ভাবভঙ্গী, অসংগতি, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির উপর তিনি জোর দিতেন। কাঠবুড়ো, গোঁফচুরি, খুড়োর কল, লড়াই ক্ষ্যাপা, ছায়াবাজি, কুমড়োপটাশ, সাবধান, বোম্বাগড়ের রাজা, ভুতুড়ে খেলা, হাত গণনা প্রভৃতি ছবিতে অবয়ব ও তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পটভূমির প্রয়োজনীয় আভাস ছাড়া অতিরিক্ত কিছু নেই। ঠিক যেটুকু

দেখাতে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, তাই তিনি দেখিয়েছেন। এদিক থেকে তাঁর ছবি লীয়র ও ক্যারলের কাছাকাছি। এই সব ছবিতে তিনি কমিক্যাল সিচুয়েশন তৈরি করেছেন অবয়বের বিশেষ ভাবভঙ্গী, অসংগতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে।

সন্দেশ পাঠে, 'আবোলতাবোল'-এর কয়েকটিতে, তাঁর লেখার সঙ্গে যে ইলাস্ট্রেশন ছিল সেগুলি তিনি বইয়ে ব্যবহার করেন নি। বইয়ের মধ্যে তিনি নতুন ক'রে ছবি এঁকেছিলেন। এই দু'প্রস্থ ইলাস্ট্রেশন দু'টি আলাদা মোড্ অফ পেইন্টিং-এ বা ধরণে আঁকা। সন্দেশ পাঠে তাঁর লেখার সঙ্গে আঁকা ছবি-গুলি ছিল সূক্ষ্ম রেখা ও সূক্ষ্ম হাফটোনের বিভিন্ন পর্দাবিন্যাসে আঁকা। আলোছায়ার মাত্রার তারতম্য এই সূক্ষ্ম হাফটোনের বিভিন্ন পর্দাবিন্যাসের দ্বারা বোঝানো হত। এছাড়া ক্রিস্ক্রস্ বা সূক্ষ্মরেখার কাটাকুটি দিয়ে ভৌল ও ঘনত্ব বোঝানো হত। ছবিগুলি ছিল আয়তাকার। এই আয়তক্ষেত্র সরুরেখার সীমা দিয়ে নির্দিষ্ট হত। এই সীমাসহ আয়তাকৃতি ও হাফটোনের পর্দাবিন্যাসের কারণে ছবিগুলিতে ফোটোগ্রাফ বা আলোক-চিত্রের আবহ তৈরী হয়েছিল। বইয়ে অন্তর্ভুক্তির কালে নূতন করে এই ছবিগুলি সুকুমার কেবল রেখায় আঁকলেন। এই রেখাও আগের রেখার চেয়ে অপেক্ষাকৃত মোটা, খস্খসে ও স্পৃশ্য গুণসম্পন্ন। হাফটোন আর ছবির চারপাশের রেখার সীমা বা রেগুলার এজ্ বর্জন করলেন। আগের ছবিগুলি ছিল হাফটোন ব্লকের উপযোগী। এবারের ছবি হল লাইন ব্লকের উপযোগী। আগের ছবিতে ছবির স্পেস্ বা জমি সীমা দিয়ে চিহ্নিত ছিল, এবারে সেই সীমা উঠে যাওয়ায় বইয়ের পাতার সবটুকু জায়গাই হল ছবির স্পেস্। আগের ছবি লেখার উপরে বা মধ্যে লেখার থেকে আলাদা ছিল, এবারের লে-আউটে সীমার বন্ধনমুক্ত ছবি ও কাব্যাংশে মেশামেশি ভাব তৈরি হল।

এই পরিবর্তন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু মজার ব্যত্যয় ঘটিয়েছে। সন্দেশ পাঠে গোঁফচুরি কবিতার ছবির চেয়ার-থেকে-উল্টে পড়া বড়বাবুর অবয়ব ছাড়া বাকি পটভূমিতে সূক্ষ্ম হাফটোন ব্যবহার ক'রে পটভূমির আয়তাকারকে সরু রেখা দিয়ে ঘেরা হয়েছিল। এই আয়তাকারের উপরদিকের অনুভূমিক রেখাকে একটু নিচে নামিয়ে বড়বাবুর শূন্যে তোলা হাতদুটি সেই আয়তাকার সীমা ঠেলে তুলে দেওয়া হয়েছিল। টি. ভি. বা সিনেমার পর্দার ঘের থেকে যদি শরীরের কোনো অংশ বেরিয়ে আসে, তাহলে যে মজা হয়, এই ছবিতে সেই মজা ছিল। হাফটোন ও আয়তাকার সীমা বাদ দেওয়ায় বইয়ের জন্যে আঁকা বড়বাবুর ছবিতে এই বাড়তি মজা পাওয়া যায় না।

ক্যারলের অ্যালিসের আজব দেশ, লীয়রের লিমেরিক, সুকুমারের আবোলতাবোল, খাইখাই, হযবরল ও অন্যান্য কবিতার কল্প-জগতের মধ্যে আমাদের চোখে সাম্য ধরা পড়ে, তাঁদের ছবির জগৎও যেন একই ভাব-তরঙ্গে বাঁধা। কারলের গ্রাইফন্ নামক হলেও-হতে-পারত জোড়কলম জীবটি সুকুমারের খিচুড়ি ও হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরীর জোড়-কলম জীবগুলির সমগোত্রীয়। সুকুমারের কুমড়োপটাশের বাদুড়ের মত ডালে-ঝোলা মানুষটি লীয়রের ছবির ডালে ফুটে ওঠা বাদুড়ের মত মানুষগুলির সমগোত্রীয়। সুকুমারের ভাবনার জোড়কলম জীবের অস্তিত্ব লীয়রের ভাবনায় সাম্য পেয়েছে। এঁদের তিনজনের ছবিতেই কল্প-জগতের আচ্ছাদন-টির আড়ালে আমরা আমাদের দৈনন্দিন চেনা জগৎ দেখতে পাই। লেখায় যেমন তাঁরা এক-একটি বিশেষ পরিস্থিতি তুলে ধরেছিলেন, ছবিতেও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এক-একটি পিক্টো-রিয়্যাল ইন্সিডেন্ট বা চিত্রিত পরিস্থিতি তৈরী করা। এই পরিস্থিতি শিশুর মনোজগতে অতি সহজে তৈরী হয়ে যায়, বয়স্কের কল্পনা বাস্তবকে এই রূপান্তরণে সহজে নিয়ে যায় না। বয়স্ক এই দেখা চেতনা ছাড়া দেখতে পারেন না। 'শিল্পে অত্যুক্তি' প্রবন্ধে সুকুমার বলেছিলেন, "প্রকৃতির কোনো একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত" করাটুকু যদি শিল্পী যথেষ্ট মনে করেন, তবে বলাটা অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ছবিতে এই সূত্র তিনি গ্রহণ করেছিলেন। ছবি ছিল তাঁর এমন একটি মাধ্যম, যার ভিতর দিয়ে তিনি চাক্ষুষ পরিচয়ের অতিরিক্ত এক চেতনা জাগাতে চেয়েছিলেন।

শিশুবয়সে তাঁর রচনা মানুষ যেভাবে উপভোগ করে, পরিণত বয়সে সেই মানুষ সেই লেখায় অন্য এক আস্বাদন পায়। এই কারণে তাঁর শিশুপাঠ্য লেখা সব বয়সেরই পাঠ-যোগ্য। সরস লেখার ভিতর দিয়ে শিশুকে তিনি আনন্দ, কল্পনার বেগ ও চিন্তার খোরাক দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর

ইলাস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য ছিল তেমনই আনন্দের ভিতর দিয়ে শিশুর কল্পনা উদ্দীপিত করা ও সৃজনধর্মিতার দিকে এগিয়ে দেওয়া। এই কাজে তিনি অনর্থক অলঙ্করণ ও ভাবালুতা বর্জন করেছিলেন। অলঙ্করণ ও ভাবালুতা কল্পনার বেগকে শিথিল করে। উপরন্তু ভাবালুতা চিন্তাকে যেমন আচ্ছন্ন করে তেমনি অলঙ্করণ অত্যুক্তির দিকে যেতে পারে। অপ্রয়োজনীয় রূপের বাহুল্য ও গৌণ সাজসজ্জা তাঁর ছবিতে স্থান পায় নি। তাঁর লক্ষ্য ছিল লেখা ও ছবির সম্মিলিত সংহতির দিকে, এবং একই সঙ্গে দুটি জিনিসেরই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত চরিত্রসৃষ্টির প্রতি। মূল বিষয়কে তিনি কোনো অনাবশ্যক সংযোজন দিয়েও বিক্ষিপ্ত হতে দেন নি। উদ্দাম কল্পনা যাতে উদ্দেশ্যহীন না হয়, এ বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। রূপকল্পনা, রূপচয়ন, রূপসন্নিবেশ, রেখা ও বর্ণের ব্যবহার—ছবির এই সমস্ত উপাদান ব্যবহারে তিনি সংযমের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর ছবি কখনোই আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করে না।

১। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; 'রবিবর্মা', সাধনা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০
২। 'চিত্র পরিচয়', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৪
৩। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : 'চিত্রপরিচয়', প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৭
৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ : জোড়াসাঁকোর ধারে, অবনীন্দ্র রচনাবলী, প্রকাশভবন, খণ্ড ১. ১৯৭৫, পৃ. ২৫৮
৫ ও ২১। বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় : আধুনিক শিল্পশিক্ষা, বিশ্বভারতী, ১৯৭২, পৃ. ৫৪
৬। Bishnu Dey & John Irwin : Jamini Roy, Indian Society of Oriental Art, 1944, p. 3
৭। বিষ্ণু দে : 'যামিনী রায়', সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, সিগনেট, ১৯৫২, পৃ. ২৩
৮। বিষ্ণু দে : 'নীরদ মজুমদারের জন্য', অম্বিষ্ট
৯। Klaus Fischer : 'The Calcutta Group', Marg, No 4, 1953, p. 69
১০। সুকুমার রায় 'শিল্পে অত্যুক্তি', 'ভারতীয় চিত্রশিল্প', বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ, সিগনেট, ১৩৬৩
১১। Peter and Linda Murray : The Penguin Dictionary of Art and Artists, p. 66
১২। Sam Hunter : Modern French Painting, Dell p. 199-200 ; The Penguin Dictionary of Art and Artists. p. 170-171
১৩। A. K. Coomaraswamy : The Aims of Indian Art, Broad Campden, 1908
১৪। Interview with J. Cousins, Rupam, July 1922
১৫। A. K. Coomaraswamy : The Dance of Shiva, Asia, 1956, p. 44 ; 'The Traditional Conception of Ideal Portraiture,' Christian and Oriental Philosophy of Art, Dover, 1956, p. 117
১৬। 'সতী', প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫
১৭। 'সম্পাদকীয়' প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৫
১৮। 'অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিঠি', প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩১৬
১৯। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাণী চন্দ : ঘরোয়া, রচনাবলী, খণ্ড ১, পৃ. ৭৪
২০। ed. P. Neogy : 'Art and Tradition', Rabindranath Tagore on Art & Aesthetics, Longmans, 1961, p. 58-64
২২। Percy Brown : Indian Painting, Y. M C. A. 1956, p. 65.

সহায়ক বই/পত্রিকা

১। Philip James : English Book Illustration 1800-1900, King Penguin, 1947
২। Surendranath Dasgupta : Fundamentals of Indian Art, Bharatiya Vidya Bhavan, 1954
৩। Travellers in the East, Sandoz (India), 1965
৪। সুকুমার সাহিত্য সমগ্র, খণ্ড ১ ও ২. আনন্দ
৫। 'সন্দেশ' পত্রিকার উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়-সম্পাদিত সংখ্যা।

অরবিন্দ পোদ্দার

প্রবন্ধে সুকুমার রায়

সুকুমার রায় মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। জীবন নামক 'অসমাপিকা ক্রিয়া'র প্রসন্ন স্বীকৃতি এবং মানব অভিজ্ঞতার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করার জন্য তাঁর আকূতি প্রবন্ধগুলিকে অনন্যতা দান করেছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সুকুমার রায় প্রবন্ধ রচনার বিশেষ অবকাশ পান নি। নন্‌সেন্স ভার্স বা আপাত অসংলগ্ন সৃষ্টিছাড়া বিষয়বস্তু নিয়ে কল্পনার ঐন্দ্রজালিক সম্মোহ রচনায় তাঁর অনন্যসাধারণ সফলতা বাংলার—শিক্ষিত বাঙালীর—ঘরে ঘরে পুরাকাহিনীর মর্যাদায়, বিস্ময়ে মমতায় শ্রদ্ধায় সুপ্রতিষ্ঠিত। সেই উদ্ভটের আনন্দে বিভোর শিশুমন, এবং বয়স্ক মনও, সব সময় সচেতন থাকে না যে বিজ্ঞানের উৎসাহী পাঠক ও ছাত্র হিসাবে তিনি অনুসন্ধিৎসু বিশ্লেষণী মননেরও অধিকারী ছিলেন। উদ্ভটের রসে একদিকে যেমন তিনি সকলকে উচ্ছ্বসিতভাবে মাতিয়েছেন, তেমনি 'সন্দেশ'-এর পাতায় উপহার দিয়েছেন বিজ্ঞানীদের জীবনী ও উদ্ভাবনের মানবিক গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী। একই সূত্রে গেঁথেছেন জিজ্ঞাসার কৌতূহল আর উদ্ভটের লাগামছাড়া স্ফূর্তি।

অবশ্য, কল্পনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন থাকে মননের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। সেই মন গদ্যের যুক্তি-কাঠামোর আশ্রয়ে অভিব্যক্তি লাভ করার সুযোগ পেয়েছে কম, তাঁর গদ্য প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই অল্প। কিন্তু যখনই ঐ মন গদ্যের শৃঙ্খলায় আত্মপ্রকাশ করেছে তখনই দেখা গেছে যে মননশীল গদ্যরচনায় তাঁর দক্ষতা কোন অংশেই ন্যূন ছিল না। বরং এই ধারণাই সুস্পষ্ট হয় যে, যদি এই বিভাগে আরও কিছু সময় তিনি ব্যয় করতে পারতেন তাহলে নিঃসন্দেহে প্রবন্ধকার রূপেও তিনি বিরল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতেন।

যে অল্প ক'টি প্রবন্ধ তিনি রচনা করে গেছেন তার প্রাথমিক পরিচয় গ্রহণ করলেই একটি সচেতন, গতিশীল এবং ঐতিহাসিক রূপান্তরের বোধসম্পন্ন মনের সাক্ষাৎ লাভ করা যায়। এই মন কালের প্রবহমান রূপটি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ও উৎসুক। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা যায়, যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে ও কালে খণ্ডিত করিয়াও, সংযোগসূত্ররূপে সমগ্র অখণ্ডতা ধরিয়া রাখিয়াছে" বিশেষ স্থানে ও কালে আবদ্ধ জড় মন তা উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ, চেতনার কর্ষণ হয় অবরুদ্ধ নতুবা পর্যাপ্ত হয় নি। মানব অভিযানের মধ্যে একটি আশ্চর্য গতিপ্রাণতা লক্ষ্য করা যায়, যা কোন বিন্দুতেই এসে বিশ্রাম গ্রহণ করে না। সেই অভিযানকে যদি সাধারণভাবে শুধু জীবন বলে অভিহিত করা যায়, তাহলেও অর্থগত কোন বৈষম্য দেখা দেয় না। সেই অবিশ্রান্ত গতিপ্রাণতার জন্য সুকুমার

রায় জীবনেরও একটি বিশেষ অর্থবহ তাৎপর্য গ্রহণ করেছেন। বলেছেন,

> কিন্তু জীবনেরও একটা রূপ আছে, সেটা হচ্ছে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপ।......অসমাপিকা হলেও ক্রিয়াপদটি অকর্মক নয়, কারণ ওর একটি উদ্দিষ্ট কর্ম আছে এবং সেই কর্মটি হচ্ছে আর্ট।

ঈষৎ লঘু সুরে রচিত এই প্রবন্ধটিতে জীবনের সৃষ্টিশীলতার লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট হয়েছে আর্ট, অথবা শিল্পের সুষমামণ্ডিত জীবন। আসল কথা, সৃজনধর্মী মনন যদি পূর্বোক্ত ঐ অসমাপিকা ক্রিয়াপদটির আন্তর সম্পদ উপলব্ধি করতে সমর্থ হয় এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সাধনে সমর্থ হয়, তাহলে ব্যক্তিক উপলব্ধি এবং শিল্পের সমস্যা অনেকাংশে মীমাংসিত হয়ে যায়।

কিন্তু, এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রবল অন্তরায় চেতনার পরাভূত অবস্থা, যা গতিহীন ভাষার প্রাণহীন আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত বসে থাকে। মানুষের ভাষা তার মনের সার্থক দর্পণ কিনা, বা চিন্তাকে যথাযথ প্রকাশ করতে পারে কি না, অথবা চিন্তা-নিরপেক্ষ ভাষার গৌরব কতটুকু, ইত্যাদি বিষয়ে নানাপ্রকার অভিমতের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট। তাঁর আপন কথায়, "ভাষা যে নিজের অর্থগৌরবেই সত্য, এ কথা ভুলিয়া সে যখন কেবল শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার অত্যাচার অনিবার্য। চিন্তা কোনোদিনই শব্দের দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে ও সম্যকরূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। সেইজন্যই এক-একটা সত্যকে পঞ্চাশবার পঞ্চাশরকম ভাষায় পঞ্চাশদিক হইতে দেখার আবশ্যক হয়।" আসল সমস্যা হলো, শব্দ ও অর্থের, অথবা শব্দ ও চিন্তার পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংশ্লেষের গতিশীলতা অক্ষুণ্ণ রাখা। তা বজায় থাকলেই "সৃষ্টিপ্রবাহের" নিরবচ্ছিন্নতা ও জীবনের গতিশীলতার সঙ্গে মানুষের ভাষা সংযুক্ত থাকতে পারে।

অপরপক্ষে, ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা হলো গতি হারিয়ে ফেলা। নির্দিষ্ট স্থানকালের বিন্দুতে বিধৃত মানবিক অভিজ্ঞতা ভাষা অথবা শব্দকে বিশেষ অর্থে মণ্ডিত করে; অভিধানে ব্যাকরণে স্থানলাভ ক'রে তা কালক্রমে স্থবিরত্ব অর্জন করে। ব্যাকরণের সূত্র অনুযায়ী যারা জীবনকে গঠন করতে চায় তারা ঐ নির্দিষ্ট অর্থসীমা কিছুতেই লঙ্ঘন করতে চায় না। ফলে, দেখা দেয় এক ধরণের নিষ্প্রাণ শব্দরতি, শব্দের নিকট প্রশ্নহীন আত্মনিবেদন। এর ফল দাঁড়ায়, সুকুমার রায়ের কথায়, "মানুষের চিন্তা আপনার উদ্দিষ্ট সার্থকতাকে ছাড়িয়া কতকগুলি বাক্যের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়।" "ভাষারূপ বাহনটার খাতিরে চিন্তা কেমন করিয়া পঙ্গুত্বলাভ করে"। ভাষার অত্যাচার, সম্ভবত বলা উচিত শব্দের সম্মোহ, চিন্তাকে বিপথে চালিত করে। শব্দের খাঁচায় আবদ্ধ চিন্তা 'অলৌকিক দ্বৈততত্ত্বের আকার ধারণ" করে। অর্থাৎ, মননশীল সত্তার মৃত্যু হয়। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করে জীবনের অসমাপিকা রূপটি কিন্তু নতুন নতুন অভিজ্ঞতায় বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়; নিজস্ব আন্তর গরজ যদি তার নিঃশেষিত হয়, বাইরের আঘাত তাকে পুনরায় চঞ্চল করে, নতুন লক্ষ্যের প্রতি তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সেইজন্যই নতুন পরিস্থিতি, পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার নিরিখে শব্দের প্রাচীন অর্থ অচল; তাই, ভাষাকে নতুন অর্থব্যঞ্জনায় ও ব্যাপ্তিতে পুনরায় সজীব করে তুলতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কোন একটি সত্যকে অথবা নির্দিষ্ট অর্থসীমায় আবদ্ধ বস্তুকে পঞ্চাশরকম দিক থেকে পঞ্চাশরকম ভাষায় পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা। এই কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুকুমার রায় বুদ্ধিমার্গীয় ক্ষেত্রে আশ্চর্য কালসচেতনতার পরিচয় দান করেছেন। যে বস্তুটির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হলো, সজীব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সজীব ভাষা ও চিন্তার উদ্বোধন এবং ব্যবহার।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে অভ্যাসে পঙ্গু মন প্রার্থিত সমন্বয় সাধনে বিমুখ, সুতরাং জীবনসাধনায়ও বিমুখ। অভ্যস্ত শব্দের মোহে সে কথা বলে, চলেও অবশ্য, কিন্তু সৃষ্টি করে না; অস্তিত্ব বহন করে সত্য, কিন্তু সকর্মক জীবনযাপন করে না। এ কথাটিকে তিনি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যক্ত করেছেন। লিখেছেন, "শব্দের গায়ে চিন্তার ছিটেফোঁটা যাহা লাগিয়া থাকে তাহাই যথেষ্ট, বাকিটুকু তোমার রুচি ও কল্পনা অনুসারে পরাইয়া লও। ছাতার নিচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে

আর দেখা হয় না।"

দেখা হয় না ব'লেই সংস্কারের জুজু সৃষ্টি করা হয়; সৃষ্টি করা হয় জীবন নামক অসমাপিকা ক্রিয়াপদটি সম্পর্কে এক বিভীষিকা। এই জুজু মানুষের মনকে নিরন্তর পীড়িত করে; মুক্ত চিন্তার পথ থেকে যেমন তাকে সরিয়ে আনে তেমনি সামাজিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারেও তা অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য, সমাজের স্থিতি অথবা গতি, সংরক্ষণ অথবা রূপান্তর, এই প্রশ্নের যে ঐতিহাসিক ব্যাপ্তি—সুকুমার রায়ের প্রবন্ধে তা তেমন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়। কিন্তু, ব্যক্তিক চেতনাকে বিমূঢ় ক'রে ঐ জুজু যে এক বিরাট অচলাবস্থার সৃষ্টি করে সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এর বিরুদ্ধেই তাঁর বলিষ্ঠ সমালোচনা, তাঁর প্রতিবাদ। মুখ্যত 'দেবেন দেয়ম্' এবং 'ভাষার অত্যাচার' শীর্ষক প্রবন্ধেও পরোক্ষে তিনি এ প্রসঙ্গে চমৎকার আলোচনা করেছেন। জুজুতন্ত্রের সামাজিক প্রভাব আমাদের দেশে কী মারাত্মক এক দুঃসহ প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছিল, যা এখনও লক্ষণীয়, তা তাঁর আপন ভাষায় প্রথমোক্ত প্রবন্ধ থেকে অংশত উদ্ধার করছি—

> এই দুর্ভাগ্য দেশে, জীর্ণতার পরিত্যক্ত কঙ্কাল যেখানে প্রাণের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়, এই জুজুতন্ত্রের শাসনও এইখানেই মারাত্মকরূপে প্রবল। এ জিনিষ যে অন্যদেশে নাই তাহা নয়, বাক্য ও চিন্তার ফেটিশ্ সকল দেশে সকল সমাজেই সুলভ। কিন্তু মোহের কবলে এমন নিশ্চেষ্ট নিরাশ্রয়ভাবে মানুষ আর কোথাও পড়িয়া থাকে না। লোকশাসন ও সমাজবিধির অপচার সর্বত্রই আছে কিন্তু তাহার এমন পাকপাকি প্রতিষ্ঠার আড়ম্বর আর সকলখানেই দুর্লভ।

যুগ যুগ ধরে অস্তিত্বশীল অবরুদ্ধ ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর এই অভিযোগ নিয়ে কোনই মতদ্বৈধতা নেই। সেই সমাজের মোহ-আবরণ ছিন্ন করে যাঁরা বহির্গত হয়েছিলেন এবং সৃষ্টি করেছিলেন এক গতিশীলতার বাতাবরণ, তাঁদের সংস্পর্শে, সেই ঐতিহ্যে তিনি লালিত হয়েছেন। কিন্তু, সে-কালের সেই প্রগতিশীলতা মুক্তবায়ু চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট উদার ছিল কি না, সে বিষয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। কারণ, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব সহৃদয় ছিল না। হয়তো বা সেখানেও তিনি জুজুতন্ত্রের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রাচীন এবং নবীন উভয়বিধ জুজুতন্ত্রকে সংযুক্ত করলে তাঁর মনোবেদনার গভীরতা অনুমান করা সহজ হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি ফ্রি উইল এবং ডেস্টিনীর দ্বন্দ্ব-সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, পুরুষকার ও অদৃষ্ট এর মধ্যে প্রকৃতই কোন বিরোধ নেই। বিরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে; করেছে শাস্ত্রবচনে অজ্ঞ মানুষেরা এবং তাদের "লৌকিক বুদ্ধি"। বলা বাহুল্য, মানুষের জিজ্ঞাসু মন আর বোধশক্তিকে হত্যা করতে পারলেই সমাজবিধায়কদের অস্তিত্ব নিরাপদ হয়। তাদের নিরাপত্তার দাবিতে যদি সামগ্রিক জীবন ও প্রাণের গতিশীলতা অবরুদ্ধ হয়, তাতেও তাদের কিছুই ক্ষতির কারণ ঘটে না। বিজ্ঞানও যে তার যুক্তিশৃঙ্খলার সহায়তায় কখনও কখনও এই জুজুতন্ত্র সৃষ্টি করে এই অভিযোগও তিনি উত্থাপন করেছেন। অবশ্য, এক্ষেত্রে বিজ্ঞান বলতে আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর একগুঁয়ে বিজ্ঞানবাদকে বুঝতে হবে, যে বিজ্ঞানবাদ ছিল অসহিষ্ণু এবং ভৌত নিয়মের অমোঘতায় দৃষ্টিহীন। সেই বিজ্ঞান "চৈতন্যকে খুঁজিতে আসে নাই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে, এবং সেই জন্যই পদে-পদেই জীবন্তজ্ঞানের সাক্ষ্য পাইয়াও সে তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছে" [চিরন্তন প্রশ্ন]। মানসিক বন্ধন ও গতিশীলতার বিরুদ্ধে এই ধরণের আক্রমণ—তা সে কর্মবাদ জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি আশ্রয় করেই আসুক অথবা বিজ্ঞানবাদকেই আশ্রয় করে আসুক— প্রতিরোধ করাই প্রাণশক্তির লক্ষণ। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার পক্ষে যেমন তা সত্য, সমষ্টিগত বা সামাজিক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও তা সত্য। গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "যেকোনো দিক দিয়াই জীবনের পথকে উন্মুক্ত করি না কেন, জ্ঞানের অন্বেষণই হউক কি প্রেমের চরিতার্থতাই হউক, জীবনের জাগ্রতবুদ্ধি যেখানে আপনার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করে, সকল দ্বন্দ্বের সকল সন্দেহের মোহরূপ সেখানেই খসিয়া যায়।"

মোহ আবরণ ত্যাগ এবং জীবনের জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করা—এই হল ব্যক্তিক অনুভবের মানস-জীবনের অভিব্যক্তি। জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে এর উদ্বোধন এবং ব্যবহারিক আচরণে এর

প্রতিফলন তাঁর কাম্য। এই সত্য উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে এমন একটি মনের পরিচয় লাভ করা যায়, যে মন কোন গোষ্ঠীবদ্ধ চিন্তার সংকীর্ণতা দ্বারা পীড়িত নয়, যে মন উদার, মুক্ত। বলা নিষ্প্রয়োজন, সুকুমার রায়ের আমলে তত্ত্ব-আলোচনায় ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রেক্ষিত ব্যবহার বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না ; তিনি নিজেও সে প্রেক্ষিত গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধিমার্গীয় জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে নিজেকে আবদ্ধ রেখেই তত্ত্ববিচার করেছেন ; তত্ত্বের সামাজিক পশ্চাৎপটকে বিচারের অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তথাপি, জীবন নামক অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রসন্ন স্বীকৃতি এবং মানব অভিজ্ঞতার জীবন্ত প্রবাহকে স্পর্শ করার জন্য তাঁর আকুতি তাঁর রচনাকে অনন্যতা দান করেছে। একটি সজীব মন ও চিন্তার স্পর্শ সত্যই পাঠককে "চমৎকৃত" করে।

'বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে সুকুমার রায়ের দুটি ইংরাজী রচনা স্থান পেয়েছে। একটি রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক। অপরটি 'দ্য বারডেন অব দ্য কমন ম্যান'। সাধারণ মানুষকে সর্বপ্রকার মানবিক সঞ্চয় থেকে বঞ্চিত করার ফলে মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে যে দ্বৈততার উদ্ভব, যুগ যুগ ধরে যা সভ্যতাকে বিদীর্ণ করে আসছে, স্বভাবতই দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে এর উচ্ছ্বাসময় আলোচনা প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে, মানব অভ্যুদয়ের স্বীকৃতিতে পূর্ণ তাঁর মন এই ভেবে নিশ্চিন্ত যে, সাধারণ মানুষ আজ জেগে উঠছে আর তা-ই যথেষ্ট [he has "positively appeared--that is enough"]। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবসম্পদ-সম্পর্কিত আলোচনায় ঐ আমলের পাঠকদের মধ্যে যে প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়, সুকুমার রায়ের আলোচনাও তার ব্যতিক্রম নয়, দেশকালাতীত যে পূর্ণতার কল্পিত আস্বাদনে তাঁরা তৃপ্ত হতেন, সেই তৃপ্তির স্বাক্ষর এখানেও বিদ্যমান। সেই একই আনন্দ, বিশ্বচরাচরব্যাপ্ত মুক্তির আনন্দ, চৈতন্যে স্থিতি। এই আলোচনায় অভিনবত্ব বিশেষ নেই, কিন্তু অভিনবত্ব আছে একটি মন্তব্যে। তা হলো, উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমি পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি প্রথম আমলের ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর মন্তব্য করেছেন ; বলেছেন, ওঁরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল এক গোষ্ঠী, ভয়ংকর রকমের হিন্দু-বিরোধী ও জাতীয়তা-বিরোধী। [The immediate consequence of this English education was the disastrous uprising of a group of reactionaries, violently anti-Hindu and anti-national in attitude.] ইয়ং বেঙ্গলদের সম্পর্কে সচরাচর বিদ্রোহী অভিধাটিই ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; সুকুমার রায় নির্দ্বিধায় তাঁদের বলেছেন প্রতিক্রিয়াশীল। এই অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য হোক বা না-হোক, এটি যে অতিশয় শাণিত এবং মর্মভেদী সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বিবর্তন এবং সাম্রাজ্যবাদ-সৃষ্ট বুদ্ধিজীবীদের চারিত্র বৈশিষ্ট্য, জীবনদর্শন, রাজনৈতিক ভূমিকা, ইত্যাদি পর্যালোচনা করলে এই মন্তব্যের স্বপক্ষে কিছু সাক্ষ্য-প্রমাণও উদ্ধার করা যেতে পারে। ঐ ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর যে কোন মোহ ছিল না, তা-ই তাঁর বুদ্ধিমার্গীয় স্বকীয়তার সাক্ষ্য বহন করছে।

যাই হোক, এইসব রচনা থেকে প্রাবন্ধিক সুকুমার রায় সম্পর্কে একটি মনোরম চিত্র উদ্‌ভাসিত হয় ; এখানে সৃষ্টিশীল মননের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে যুক্তিনির্ভর মনস্কতা, গতিশীলতার সঙ্গে সংস্কারমুক্ত চেতনা, যা আধুনিক মানসভঙ্গির জনক।

আশিসকুমার দে

বড়োদের গদ্য : সুকুমার শৈলী

সুকুমার-রচিত দু'টি প্রবন্ধের গদ্যশৈলী এ প্রবন্ধের আলোচ্য। এই প্রবন্ধগুলির মাধ্যমে সমাজে ও ব্যক্তিমনে প্রগতিহীনতার বিরুদ্ধে একটা দ্রোহবুদ্ধি জাগিয়েছিলেন সুকুমার, মূল প্রশ্নগুলিকে সরাসরি সামনে হাজির করেছিলেন। এ কাজে তাঁর গদ্যশৈলী ছিল বিষয়ানুগ : কোথাও তা বিতর্কের প্রয়োজনে বাঙ্‌মুখর, কোথাও সংযত আবেগে গম্ভীর, কোথাও পরিচিত শব্দে নতুন ব্যঞ্জনা সঞ্চারে সার্থক।

সুকুমার রায়ের বহু রচনার উদ্ধৃতি আমাদের মুখে মুখে ফেরে। শিশু কিশোর তাঁর কবিতা আবৃত্তি করলে আমরা আনন্দ পাই। অথচ তাঁর গদ্য বা কাব্যভাষা কোন্ গুণে আমাদের মন কাড়ে, তার হদিশ রাখি না। সৃষ্টির জগতের রসগ্রহণে আমাদের ক্লান্তি নেই। কিন্তু তার উপাদান বিচার, তার বিশেষ প্রকাশকৌশলের আলোচনায় রসের অমৃতপাত্র টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে, এমন একটা ভয় বোধহয় সুকুমার সম্পর্কে আলোচনায় অনাগ্রাহী করে। আমরা তাঁর গদ্যের অনিবার্য আকর্ষণ কোনখানে, ব্যক্তিত্বের নানা দিক কিভাবে গদ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তার খোঁজ নিতে চাই। এগুলো জানতে হলে শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদের স্তরগুলো পেরিয়ে যেতে হয়। লেখক কতটা ব্যাকরণ মানছেন বা ভাঙছেন, তার মধ্যে নিজের ভুবন তৈরী করছেন, এটা উপাদানের বিশ্লেষণ। সচেতন সামাজিক মন ওরই ফাঁকে নিজের অভিজ্ঞতা, দর্শনের বীজ বুনে দেয়। এরকম একটা পরিচয় নেওয়া কঠিন কাজ। শৈলী আলোচনার মধ্যে লেখকের পরিচয় আঁকতে না পারলে কিরকম বিপদ ঘটতে পারে, তার কিছু উদাহরণ নেওয়া যাক।

সমালোচক বা গদ্যের ঐতিহাসিক একজনের রচনা পড়ে ফতোয়া দেন—খাঁটি, সরল/জটিল, অনলংকৃত/অলংকৃত। এ-জাতীয় বিশেষণ বিচারের কাজ হাল্‌কা করে কিন্তু রচনার গভীরে এর প্রবেশ নিষেধ। এগুলি আসলে মন-গড়া কিংবা ব্যাকরণের অলংকার-প্রভাবের ছায়া। আবার যখন বলি ওঁর গদ্য সহজ/কঠিন, তখনও নিজের অলস মানসিকতার প্রতিচ্ছায়া দেখতে চাই।

পাঠকের সঙ্গে লেখকের যোগাযোগ একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু এর জন্য লেখক নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে সাংবাদিক-গদ্যের স্তরে নেমে আসতে পারেন না। বিপরীতে, সুধীন্দ্রনাথ বা কমলকুমারের গদ্যের দুর্বোধ্যতা আমাদের রসালো আলোচনার বিষয়। এঁরা যে প্রচলিত গদ্যপথ ছেড়ে নিজেদের যুক্তি ও সৃষ্টিকে অন্যতর করেছেন, এটা এড়ানোর চেষ্টা কুঁড়ের পক্ষেই সাজে। সুকুমার রায়ের কাব্যভাষার আলোচনায় (দ্র. এই সংকলনের 'আবোলতাবোল'-এর কাব্য-ভাষা/ভারতী সেন) দেখা গেছে যে এতে ব্যাকরণ-মানা বাক্যের সংখ্যা বেশী। অথচ তাঁর কবিতা যেখানে পৌঁছে দেয়, সেখানে অব্যাকরণেরই খেলা। এখানেই শৈলীসন্ধানের শুরু।

এ যেমন বিশেষণবাদীর নিজেকে বা পাঠকদের ঠকানোর চেষ্টা, তেমনি গদ্যশৈলী (ভাষণ, কথোপকথন, লিখিত) নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত দেখা যেতে পারে। আরিস্ততলের বলা গ্রেভ, মিড্‌ল, লো স্টাইল আদালতে, বিশ্রামাগারে বা স্নানাগারে জ্ঞানীদের ভাষাব্যবহারের স্থানভেদের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু তিন স্থলে যাঁরা কথা চালাচ্ছেন, তাঁদের বিশেষ বাক্‌ভঙ্গি (Register) অমিশ্র হতে পারে না। ওয়াল্টার পেটারের 'অপূর্ব শব্দতত্ত্ব', মিড্‌লটন মারির 'খাঁটি স্টাইল'-তত্ত্ব, কুন্তকের 'বক্রোক্তিবাদ', নথ্‌্রপ ফ্রাইয়ের শিষ্ট/লৌকিক ভাষাভেদ যতটা মন্ময় বা সাধারণ, ততটা তন্ময় নয়। এগুলো হয় অব্যাপ্তির দোষে দোষী কিংবা উলঙ্গ রাজার পোশাকধারণার মতো।

আর কিছু আলোচক আছেন যাঁরা লেখককে বিদেশী মার্কা না দিতে পারলে অস্বস্তিবোধ করেন। ফলে আমরা পাই বীরবলের ফরাসি, কিংবা সুধীন্দ্রনাথের জর্মান স্থাপত্যধর্মী গদ্য লেবেল। সুকুমার রায়ের ছোটদের রচনাকে কেউ যদি লীয়রী বলতে চান, তাহলে আমরা কম বিপদে পড়ি না। পাশাপাশি তাঁর বড়োদের জন্য লেখাকে কি বলবেন এঁরা, তা জানি না। বাংলায় ফরাসী, জর্মান বা লীয়রী ঢং এলে সেটা বাংলা থাকে কিনা এটা ভাবা উচিৎ। সুকুমার একটু ভিন্ন সুরে এই ধরণের অহেতুক নিরর্থক নামকরণের বিরুদ্ধে বলেছেন 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে।

পাঠক এতক্ষণে হতাশ হয়ে বলতে পারেন, তাহলে গদ্য-শৈলী কি? পদান্বয়, শব্দের বীপ্সা-গণনা (Frequency counting), প্রসঙ্গ ও ভাষার সমঝোতা, নূতন শব্দ সৃষ্টি, পুরোনো শব্দে নূতন মাত্রা যোগ, বক্তব্যের ভিন্নতায় লেখক সবসময় গদ্যমানকগুলি পাল্টাতে বাধ্য। তাহলে কি এগুলো নিয়মহীন? তাও নয়। পরিবর্তমান গদ্যশৈলীর রচয়িতার মানস-পটটি যদি সজাগভাবে ধরতে পারি, তবেই তা সার্থক শৈলীবিচার হবে। এ কাজে ভাষাবিজ্ঞান ফ্যালনা নয়। আবার লেখকের অভিজ্ঞতা, রুচি, মূল্যবোধ, পর্যবেক্ষণশক্তি, জীবনদর্শন সম্পর্কে সমালোচকের পরিচ্ছন্ন ধারণাও দরকার। প্রচলিত ব্যাকরণ, ভাষাজ্ঞান গদ্যের বাইরের গড়ন জানাবে। পাশাপাশি সমালোচকের ব্যক্তিরূপ সন্ধানের প্রক্রিয়াও চালু থাকবে। সুকুমারের গদ্যশৈলীতে সেই বহির্গঠন এবং অন্ত-র্গঠনের পরিচয় কিভাবে আছে, তা দেখবার জন্য আমরা তাঁর বড়োদের জন্য লেখা প্রবন্ধের গদ্য বিশ্লেষণ করব।

আমাদের আলোচনায় ছ'টি প্রবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, যাদের রচনাকাল ১৩১৭-১৩৩০ বঙ্গাব্দ। তেরো বছরের কালসীমায় লেখাগুলোতে তাঁর গদ্যশৈলী বিষয় অনুসারে লেখকমনের অপূর্ব প্রতিফলন ঘটিয়েছে। সচল মন ভাষা, দর্শন, শিল্প, দৈব সম্পর্কে আধুনিক জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে।

সুকুমার যখন একটি প্রবন্ধের নাম দেন 'ভাষার অত্যাচার' তখন বড়ো বিস্ময় লাগে। বস্তুর নামকরণের ব্যাপারটা যে জোর করে করা, এ নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানে একরাশ শক্ত শক্ত বই লেখা হয়েছে। সুকুমার এরকম একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়ের মর্ম বেঁধেছেন :

" 'গাধা' শব্দটা উচ্চারণ করিবামাত্র দশজন লোকে কোনো চতুষ্পদবিশিষ্ট সহিষ্ণু জীবের কথা ভাবিতে লাগিল" (পৃঃ ১৯)। ঐ চতুষ্পদী সহিষ্ণু জীবের আরও নমুনা আছে অথচ কোন গুণে 'গাধা' তার থেকে আলাদা? কষ্ট করে চেম্বার্স টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ডিকসনারীর পাতা উল্টে পাই "a sma[ll] usually grey, long-eared animal of the horse genus"। এই সংজ্ঞা প্রাণীটিকে খুঁজে বের করার পক্ষে যথেষ্ট কি? সুকুমার তাঁর ভাষা-সচেতনতা থেকে দেখিয়েছেন যে নামকরণ এক 'আজগুবি কাণ্ড'। কারণ, "নামের সঙ্গে নামীর সাদৃশ্য বা সম্পর্ক যে কোথায় তাহা আজ পর্যন্ত কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই" (ভাষার অত্যাচার, পৃঃ ১৯)।

যে বিষয়টি ভাষাবিজ্ঞানীদের কঠোর তর্কের বস্তু, তাকে কয়েকটা কথায় সরস গদ্যে তিনি বলতে পেরেছেন।

চিন্তা ও ভাষার যোগাযোগহীনতা, কতকগুলি বড়ো শব্দের আড়ালে তত্ত্বের ক্যাপসুলরূপ, চিন্তার অস্পষ্টতা বা মীমাংসার ভড়ংকে মানা সুকুমারের দৃষ্টিতে ভাষার অত্যাচার। তাঁর কথায় :

"এক-একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহন-রূপে। কিন্তু চিন্তার আদর তো চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই চিন্তার ক্ষেত্রে দাপা-দাপি করিয়া আসর জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি ভাষার

অত্যাচার" (পৃঃ ২০-২১)। ভাষা-চিন্তার সম্পর্ক, চিন্তার অভাব, ভাষার সর্বগ্রাসিতা আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত চারটি বাক্যে সুকুমার প্রকাশ করেছেন। তৎসম শব্দের প্রতি পক্ষপাত দেখালেও 'আসর', 'হট্টা', দাপাদাপি', 'জমানো' শব্দগুলো চলতি রূপ দিয়েছে। এরকম বিশ্লেষণ বিবেকানন্দ 'বাঙ্গালাভাষা' প্রবন্ধে শ্লেষদীপ্ত ভাষায় উপহার দিয়েছেন :

"ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান ; ভাষা পরে। হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভাল দেখায় ?...যত মরণ নিকট হয়, নূতন চিন্তাশক্তির যত ক্ষয় হয়, ততই দু-একটা পচাভাব রাশীকৃত ফুল-চন্দন দিয়ে ছাপাবার চেষ্টা হয়।"

উনিশ শতকের সাধুভাষায় যে ভাবনাহীনতা দেখা দিয়েছিল, তারই বিরুদ্ধে বিবেকানন্দর ঐ প্রবন্ধ। বিবেকানন্দের কাছে সাধুভাষার রূপ যেমন বিরক্তিকর, সুকুমারের প্রবন্ধটি লেখার মূলে তেমনি কিছু অংকপাতনিক সংজ্ঞার (Notational Term) অপব্যবহার-জনিত ক্ষোভ রয়েছে। ভাষার এই জটিলতা সম্পর্কে সরল ভাষায় সুকুমার লিখেছেন :

> শাস্ত্রে 'ত্যাগ' বলিতে কি-কি ছাড়িতে উপদেশ দেয় তাহা বুঝি আর নাই বুঝি আমরা ঐ ত্যাগ শব্দটার সঙ্গে ছাড়ার সংস্কারটুকুকে ধরিয়া রাখি। অমুক সংসার ছাড়িয়া পলাইয়াছেন, তিনি ত্যাগী ; অমুক এত টাকা দান করিয়াছেন, তিনিও ত্যাগী। কর্মফলাসক্তি কিছুমাত্র কমিল না, দেহাত্মবুদ্ধির জড় সংস্কার ঘুচিল না, প্রভুত্বের অভিমান ও অহংকার গেল না ; অথচ শাস্ত্রবাক্যেরই দোহাই দিয়া 'ত্যাগের মাহাত্ম্য' প্রমাণিত হইল। (ঐ, পৃঃ ২২)

সাধারণ, নিরীহ একটা শব্দের মোহ আমাদের ভাবপ্রকাশকে কিভাবে হাস্যকর ক'রে তোলে, তার উদাহরণ তিনি শাণিত গদ্যের আশ্রয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'ক্যাটালিটিক একশন', 'সোমনিফেরাস্ প্রিন্সিপ্লস্', 'মায়া', 'অবিদ্যা' প্রভৃতি শব্দের আড়ালে যুক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। আমাদের চিন্তার দীনতা সম্পর্কে তিনি দুটো বাক্যে লিখেছেন :

> আত্মতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে এক-একটা কথার সঙ্গে মানুষের সঙ্গত অসঙ্গত নানা প্রকার সংস্কার এমনভাবে জড়িত থাকে যে এক-একটা শব্দ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের অলক্ষিতে এক-একটা ব্যক্তিগত সংস্কারের প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্ম বলিতে, আত্মা বলিতে, হাজার লোকে হাজার রকম অর্থ করে, অথচ এই কথাগুলি লইয়া লোকে এমনভাবে মারামারি করে যেন অর্থ সম্বন্ধে আর কোনো মতান্তর নাই। (ঐ, পৃঃ ২৫)

এখানে দুটো বাক্য আছে। প্রথম বাক্যটির আবার মূল ও উপ—দুই অংশ। 'যে'...থেকে যে বাক্যাংশের শুরু সেটি হল প্রথমাংশের প্রতিক্রিয়ার ফলবর্ণন। আবার দ্বিতীয় বাক্যে 'অথচ'...থেকে যে অংশ সেটি বৈপরীত্যসূচক। কিন্তু প্রথম বাক্যের অর্থ বুঝতে যদিও আমাদের সময় লাগে, দ্বিতীয়টি তার চেয়ে কম সময়ে লেখকের মনোভাব জানিয়েছে।

সুকুমারের গদ্য শৈলীর উপর উনিশ শতকী রামেন্দ্রসুন্দরের অম্লমধুরে মেশানো তৎসম শব্দের শৈলীর প্রভাব কম নয়। যেমন,

> পুরানে লেখে গন্ধর্বেরা বাক্যভোজী, তাহারা নাকি শব্দ আহার করিয়া থাকে। এক হিসাবে, গন্ধর্বশ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড় কম নয়।...বিচারবুদ্ধির পাদুকাস্পর্শে বাক্যমাত্রসার প্লীহাজীর্ণ সংস্কারগুলির অপঘাত-মৃত্যুর আশংকা করিয়া আমরা এক-একটা শিখানো বুলিকে অতিরিক্ত যত্নের সঙ্গে যুক্তিতর্কসন্দেহের কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখি। (ঐ, পৃঃ ২৭)

বেশ কিছু উপমা আছে। তৎসম শব্দও বিস্তর। কিন্তু সাধু গদ্যের বাঁধন ভেঙে যে বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে, তা যেন মনের উপর চাবুক পড়ার মতো। সমস্ত প্রবন্ধটিতে ভাবপ্রকাশকে মনোগ্রাহী করার জন্য পরিমিত পদাভঙ্গির আশ্রয় তিনি নিয়েছেন।

যুক্তি, বুদ্ধি, বিজ্ঞানের পূজারী সুকুমার কখনও কখনও একই শব্দকে বারবার ব্যবহার করেন একই বাক্য বা অনুচ্ছেদে। এও কি তাঁর বলা 'শব্দের মোহ', না বিশেষ কোনো প্রকাশকৌশলের অঙ্গ ? যেমন,

> যেখানে মানুষ সৌন্দর্যবোধকই শিল্পের উৎস বলিয়া বুঝিয়াছে, সেইখানেই সৌন্দর্যের সন্ধান পড়িয়া গিয়াছে, সৌন্দর্য-পিপাসু মানুষ শিল্পরচনার জন্য প্রকৃতির রাজ্যে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া সৌন্দর্যের চয়ন করিয়া বেড়াইয়াছে।

সৌন্দর্যের আলোচনা, সৌন্দর্যের সাধনা, সৌন্দর্যের ধ্যান, আলোকের মহিমায় সৌন্দর্য, ছায়ার রহস্যে সৌন্দর্য, বর্ণের বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য, দেহের গঠনে সৌন্দর্য, প্রকৃতির নির্বাত গাম্ভীর্যে সৌন্দর্য, গতির মৃদুচঞ্চল ছন্দের মধ্যে সৌন্দর্য। এমনি করিয়া মানুষ বাহিরের সৌন্দর্যকে তন্ন-তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াছে, সাধনের ভিতর দিয়া, অনুভূতির ভিতর দিয়া, গভীর যোগের ভিতর দিয়া, সৌন্দর্যের পরিচয় গ্রহণ করিয়াছে, কখনো বিরাটভাবে তাহার সমগ্রতাকে, কখনো খণ্ড-খণ্ড করিয়া তাহার বিশেষ-বিশেষ প্রকাশকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে। (চিরন্তন প্রশ্ন, পৃঃ ৪১)

তিনটি বাক্যে 'সৌন্দর্য' শব্দটি এসেছে পনেরোবার। লেখক জোর দিয়ে বারবার শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই কারণে যে সৌন্দর্যবোধের নানা মহলের কথা তিনি বলতে চান। দ্বিতীয় বাক্যে সৌন্দর্য যেমন প্রধান শব্দ (তিনবার), তেমনি সৌন্দর্যের বিভিন্ন রূপ খোঁজার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি ক্ষেত্রে তা পরে এসে পাঠকের তত্ত্বভাবনাকে উদ্দীপ্ত করে। এখানে দশটি 'সৌন্দর্য' শব্দ একটি তালিকা নয়, বরং সচেতনভাবে নিজের ভাবনা উপস্থাপনের কৌশল। তৃতীয়বাক্যে সুন্দরের সন্ধান মানুষ কিভাবে স্থির করে, তারই গতিশীল বর্ণনা আছে অসমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে।

ভাষণের মতো গদ্যভঙ্গি সংযত আবেগে ব্যঞ্জনামুখর। তাঁর এরকম একটি গদ্যভঙ্গির উদাহরণ নেওয়া যাক :

তোমার শিল্পের নিয়ম, তোমার ক্যাননস্ অফ আর্ট, তোমার সৌন্দর্যের সংস্কার, তোমার ট্র্যাডিশনের নজীর, তোমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, যেখানে তুমি দাসখত লিখিয়াছ, সব ভাঙিয়া কেবল বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখ। দেখিবে এই নির্মমতার মধ্য হইতেই পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। কাহাকে অসুন্দর বলিয়া শিল্পরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে চাও ? (ঐ পৃঃ ৪৩)

রবীন্দ্রনাথের গদ্যভঙ্গিও সুকুমারে পাওয়া যায়। ঐ একই প্রবন্ধে উপলব্ধির গদ্যপ্রকাশে তিনি রবীন্দ্রনাথকে মেনে চলেন তাঁর কবিতাসূত্রে :

কেবল সেই আমিই আমি নই। এই সকল যাহার ছায়া আমি সেই সত্য বস্তু, আমার জীবনস্রোতের অনিত্যতার মধ্যে নিত্যরূপে আমিই বর্তমান, আমার অন্তর্নিহিত পূর্ণতার আদর্শের মধ্যে আমি, আমার জীবনের মূলগত সুখ-দুঃখাতীত আনন্দের মধ্যে আমি—

যে আমি স্বপনমুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি—

সেই আমিই প্রকৃত আমি। (ঐ, পৃ ৪৯)

পরিচিত শব্দের নবব্যবহারে গদ্যভাষায় সবলতা আনা তাঁর গদ্যশৈলীর আরেকটি বিশেষত্ব। যেমন,

অস্পষ্টতার আবরণ দিয়া মানুষ জীবনের সকল ক্ষেত্রেই নানারকম জুজু পুষিয়া থাকে। কতকগুলি পরিচিত নাম বা দু-দশটা প্রচলিত বচনকে গাম্ভীর্যের মুখোশ পরাইয়া এমন বড়-বড় আসনে বসাইয়া রাখে যে তাহাদের সম্বন্ধে তর্ক-বিচারের চেষ্টাও বেয়াদবির নামান্তর বলিয়া গণ্য হয়।... তর্কস্থলে প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা যখন আবশ্যক হয়, তখন এইরূপ দু-একটি জুজুকে অকস্মাৎ আসরে নামাইলে, তাহার ফলটি হয় ঠিক চলন্ত রেলগাড়ীর মুখে লালবাতি দেখইবার অনুরূপ। (দৈবেন দেয়ম্, পৃঃ ৫১)

'সুপারস্টিশন' শব্দের বদলে 'জুজু' প্রয়োগ আশ্চর্যভাবে সাধারণ শব্দটির মাত্রা বাড়িয়েছে। 'বেয়াদবি' শব্দটা বিদেশী হলেও বাক্যের বক্তব্যে মানিয়ে গেছে। আমরা যে অযুক্তির বিরুদ্ধে খুব কিছু বলতে পারি না, তার কারণ ঐ দৈব বা কুসংস্কারের নিষেধ। তর্কের রেলগাড়ি যুক্তির বাঁধাপথে অযুক্তির লালবাতি দেখে থমকে যায়—এই উপমাটি যেমন আধুনিক, তেমনই অব্যর্থ।

সেই পূর্বের প্রবন্ধসাহিত্যে, এমন কি আজকেও মাঝে মাঝে ইংরাজী শব্দের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গতি নেই। সুকুমারে এইজাতীয় প্রকাশ আছে :

ফ্রি উইল ও ডেস্টিনীর দ্বন্দ্ব-সমস্যা সকল দেশেই আছে এবং ছিল, কিন্তু তাহাতে আর কোথাও এমন নিষ্ফলতার বিভীষিকা ও অবসাদের সৃষ্টি হয় নাই। তাহার কারণ এই যে দৈবের বিচার-তত্ত্বকে পাকা কথায় গাঁথিয়া সিস্টেম বা তন্ত্রে পরিণত করিয়া জীবনের ভিত্তিমূলে বসাইয়া দিবার এমন অর্গানাইজড্ ব্যূহবদ্ধ আয়োজন আর কোথাও দেখা যায় না। (ঐ, পৃঃ ৫৫)

প্রথম বাক্যে ইংরাজী শব্দ দুটি জোরের সঙ্গে ব্যবহৃত (emphatic)। 'সিস্টেম' প্রয়োগ করা হয়েছে 'তন্ত্রে'-র পারিভাষিক সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহের জন্য অথবা লেখক ঠিক কাকে তন্ত্র বলেন তা বোঝানোর জন্য। 'অর্গানাইজড্'-ও সঠিক বাংলা পরিভাষার অভাবে এসেছে। এখনও পরিভাষা না মিললে এই ধরণের বাক্য আমরা লিখে থাকি। লেখক মাতৃভাষায় উপযুক্ত শব্দ না পেলে কেমন মিশ্র গদ্যশৈলী ব্যবহার করেন, এ তারই দৃষ্টান্ত।

শিল্প-সমালোচনার ভাষা কেমন হবে, তারও নমুনা সুকুমার 'শিল্পে অত্যুক্তি' এবং 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' প্রবন্ধ দুটিতে রেখেছেন। বর্তমান শিল্পসমালোচনা যেমন ব্যক্তিগত, তেমনি সার্থক ভাষার অভাবে নিষ্প্রাণ কিংবা কথার ফুলঝুরি। ছবি ছাড়া সবই সেখানে আলোচিত। কিন্তু সুকুমারের শিল্পসমালোচনার ভাষা-সংযম, শিল্প-আন্দোলনের ক্যানভাসে বিশেষ ছবিটি দেখার ক্ষমতা এতদিন বাদেও আমাদের বিস্মিত করে। ফিউচারিস্ট কার্লো কারার 'বিপ্লববাদী গ্যালীর শ্মশানযাত্রা' ছবিটির ব্যাখ্যা এরকম :

> সূর্যাস্তের অগ্নিগর্ভ রক্তচক্ষু যেমন সূর্যদেবের বিদায়-কালেও তাঁহার বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখে এবং পৃথিবীকে শাসাইয়া যায় যে, রৌদ্রের কশাঘাতে সকলকে উত্যক্ত করিবার জন্য কাল আবার আসিব, সেইরূপ বিপ্লব-বাদীর অন্তিমপ্রয়াণে একটা 'মরিয়া না মরে রাম' গোছের ভাব দেখানো হইয়াছে। বিরুদ্ধ রেখাবর্ণের উদ্ধত সংঘাত এবং ঘূর্ণায়মান আলোকচক্রে ছায়ামূর্তিগুলির উল্লসিত তাণ্ডব নৃত্যে মৃত্যুর বিভীষিকাকে একটা বিজয়দৃপ্ত ঝঞ্ঝনার মধ্যে ডুবাইয়া দিয়াছে। এখানে আমরা যাহা দেখিতেছি ইহা ভবিষ্য-শিল্পের একটা অপেক্ষাকৃত সংযত রূপ। ইহার 'পরিপূর্ণ' রূপের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া অনর্থক পুঁথি বাড়াইবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। (শিল্পে অত্যুক্তি, পৃঃ ৭৪)

যে ছবিটি বইয়ে ছাপা হয়েছে, সেখানে সাদা-কালো ছাড়া রং নেই। কিন্তু বিষয় নিয়ে সুকুমারের তীক্ষ্ণ সংযত বর্ণনা আমাদের শিল্প-সমালোচনার আদর্শ হতে পারে। ভবিষ্যবাদী-দের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য ('কয়েকটার খিচুড়ি বানাইয়া চিত্র-পটে ছড়াইয়া দাও') করেও ভালো ছবি সম্পর্কে ভাষাব্যবহার সার্থক হয়েছে। তৎসম শব্দের বিন্যাসের ফাঁকে 'শাসানো' কিংবা উদ্ধৃতি 'মরিয়া না মরে রাম' একটু শ্বাস ফেলবার জায়গা। ছবিটির বিষয়-গাম্ভীর্য সংস্কৃত শব্দের সহযোগিতায় সার্থক রূপ পেয়েছে। পাঠক বা দর্শকমনে ছবিটির গুণাগুণ নিমেষে সঞ্চারিত হয়।

সুকুমার যেমন বিশেষ ছবির কথা নিজের মত করে বলেন, তেমনি কিউবিস্ট্ বা 'চতুষ্কোণবাদের' মূল তত্ত্ব সোজা গদ্যে লেখেন :

> জীবদেহের সুগোল বর্তুলতাকে 'কিউবিস্ট' কতকগুলি সোজা রেখার আঁচড় ও একটানা বর্ণপ্রলেপে পরিণত করেন। রেখার উপর রেখা চাপাইয়া এক-একটি 'কিউবিস্ট' চিত্রে ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদির যে জঙ্গল রচিত হয়, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে কোথাকার মানচিত্র বা ক্ষেত্র-তত্ত্বের কোনো সিদ্ধান্ত বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। অসঙ্গত ঋজুতার টানে সকল ছন্দকে এবং রেখা ও গঠনের সৌন্দর্যজাত সকল সংস্কারকে একেবারে নির্মূল করিতে না পারিলে কিউবিস্ট নিশ্চিন্ত হন না। কারণ তিনি তো সভ্যতাসঙ্গত শিল্পমাত্রেরই কৃত্রিম জটিলতাকে ভাঙিয়া শৈশবের সহজ রেখার অনাবিলতাকে আবার শিল্পের মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে চান। (ঐ, পৃঃ ৭৫)

বিদেশী সমালোচকের উদ্ধৃতিহীন এই কিউবিজম-আলোচনা সরাসরি পাঠকমনে প্রতিক্রিয়া ঘটায়। একটা সূক্ষ্ম রসিক-তার ভাব 'জঙ্গল', 'মানচিত্র' বা 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' শব্দগুলির মধ্যে ধরা পড়ে। তিনি এরপর 'চিত্রপরিচয়ের বৃথা চেষ্টা' করেন নি। বরং পিকাসোর আঁকা 'বেহালাবাদক কুবেলিকের প্রতিকৃতি' সাজিয়ে দিয়েছেন আমাদের চোখের সামনে। বলার গুণে চতুষ্কোণবাদী চিত্রকলা মুহূর্তে প্রত্যক্ষরূপ পেয়ে যায়।

এযাবৎ গদ্যের উদাহরণগুলি যেমন লেখকের একপেশে মনের রচনা, তেমনি বিতর্কের কলে সুকুমারের গদ্যরূপ দেখতে পাই 'ভারতীয় চিত্রশিল্প' প্রবন্ধে। এখানে গদ্য পলেমিক ব'লে ব্যঙ্গমুখর, স্বাভাবিক চেতনাকে আহত করে :

> চিত্রের নায়কনায়িকার চোখে মুখে যদি একটু তন্দ্রার ভাব দেখা গেল অথবা চারিদিকে কুহেলিকার সৃষ্টি করিয়া শিল্পী যদি তন্মধ্যে একটু আলোকের আভাস দিলেন তবেই

কি আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত হইল ?...নায়ক বা নায়িকা যদি এনাটমি শাস্ত্রকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া তাহাদের অস্থিহীন অঙ্গভঙ্গীর কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি করিয়া বসেন তবে তো সোনায় সোহাগা। (ভারতীয় চিত্রশিল্প, পৃঃ ৮২)

'তন্দ্রার ভাব', 'আধ্যাত্মিকতার চূড়ান্ত', 'এনাটমি শাস্ত্রকে' বুড়ো আঙুল দেখালে, 'সোনায় সোহাগা' বাক্যবন্ধে ভারতীয় ছবির অলৌকিকতা ও নমনীয়তা ব্যাখ্যার অসারতা স্পষ্ট হয়েছে। এই তীক্ষ্ণ মননই ব্যঙ্গের তরবারি তোলে প্রতিপক্ষ অর্ধেন্দ্রকুমারের মতামতের প্রতি ঃ

অর্ধেন্দ্রবাবুর অভিধানে 'বিজ্ঞান' শব্দের অর্থ কি তাহা জানি না, কিন্তু সাধারণ লোকে বিজ্ঞান বলিতে সিস্টেমাটাইজড্ নলেজ বা সুনিয়ন্ত্রিত জ্ঞান বুঝিয়া থাকে।.. আলোকবিজ্ঞানের (অপ্টিকস্) ও তৎসংক্রান্ত শারীরবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সার্বজনীন সত্যের উপর চিত্রবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। (ঐ, পৃঃ ৮৭)

কিংবা শিল্পসমালোচনার অযথার্থ ভাষার প্রতি শাণিত শ্লেষ হানে ঃ

চিত্রের ভাষার যেখানে উৎপত্তি, যেটা তাহার মূল ভিত্তি, অর্ধেন্দ্রবাবুর ভারতশিল্প তাহার সহিত পরিচয় স্থাপন দূরে থাকুক তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেও নারাজ। অথচ এদিকে খুব একটা 'বিশিষ্ট ভাষায়' আত্মপ্রকাশ করিবার উৎকট চেষ্টাও রহিয়াছে। 'ঢাল নাই তলোয়ার নাই খামচা মারেঙ্গে।' (ঐ, পৃঃ ৮৯)

অন্যদিকে 'ক্যাবলের পত্রে' সবুজপত্রগোষ্ঠীর বক্তব্যহীনতা ও বের্গসঁপ্রীতি নিয়ে শ্লেষ সুকুমার-গদ্যকে নবতর চেহারা দিয়েছে। এপিগ্রাম-নির্ভরতাকে অদ্ভুত কাজে লাগিয়েছেন সুকুমার ঃ

ক. তারা আত্মসর্বস্ব আর আমরা আত্মাসর্বস্ব ; ওদের টাকা মাত্র ভরসা, আমাদের টাকা মাত্র ফরসা। (পৃঃ ৩০)

খ. ব্যর্গসঁ বলেছেন, মানুষের হাত পা কাটলেও সে বেঁচে ওঠে, কিন্তু তার মুড়োটা কেটে ফেললে আর সে বাঁচতে পারে না। মাথাটা যে ঘাড়ের উপর থাকে, ঘাড়ের পক্ষে তা আপত্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু ও বস্তুটি যদি ওখানে না থাকত তাহলে তাতে করে দেহটা লঘু হলেও আপত্তিটা আরো গুরুতর হত। (পৃঃ ৩২-৩৩)

গ. আমার কোনো-কোনো সমালোচক বলেন যে, আমার ভাষাটা খুব প্রাঞ্জল নয়। তার অর্থ বোধ হয় এই যে, আমার লেখা পড়লে তাঁদের প্রাণটা জ্বলে কিন্তু জল হয় না। (পৃঃ ৩৩)

বড়োদের জন্য সুকুমার রায় যে গদ্যশৈলী ব্যবহার করেছেন, তার বাক্যের স্পষ্টতা লক্ষণীয়। সাধারণত বড়ো বাক্য বিশেষ নেই। আবেগ প্রায় বর্জিত। বিজ্ঞানীর মতো যুক্তি বুদ্ধি বিশ্লেষণকেই হাতিয়ার করে ভাষা, বিজ্ঞান, দৈব, চিত্রকলা বিষয়ে নির্মোহ বক্তব্য-উপযোগী ভাষাব্যবহার আমাদের মত আবেগবানদের দেশে দুর্লভ না হলেও সুলভ নয়। বিশের দশকে এদেশে যে চিন্তার ঢেউ এসেছিল, তার যোগ্য সাধক হলেন সুকুমার রায়। তাঁর কলমের তীক্ষ্ণতায় আমাদের মতো দৈবায়ত্ত মানুষের কষ্ট হতে পারে। তাহলে কি যুক্তিবুদ্ধির উপর তাঁর অসামান্য আস্থা গদ্যকে নীরস করে তুলেছিল ? তা নয়। সরসতা যথেষ্ট আছে। গদ্যে বড়োদের জন্য বিশেষ লেখেন নি কিন্তু যে ক'টি প্রবন্ধ লিখেছেন তাতে তাঁর অনাবিল ঝকঝকে মনের চেহারা পূর্ণরূপ পেয়েছে। বাইবেলে আছে, 'Many are called but few are chosen'। গদ্যের আসরে ভিড় জমান অনেকেই নিজের চিন্তাহীনতাকে আড়ালে রেখে। সমাজে ও ব্যক্তিমনে প্রশ্নহীনতার বিরুদ্ধে একটা দ্রোহবুদ্ধি জাগিয়েছিলেন সুকুমার মূল প্রশ্নগুলিকে চোখের সামনে এনে। এখানেই তাঁর বড়োদের গদ্যশৈলীর বিশেষ পরিচয় নিহিত আছে।

১। সুকুমার রায়, 'বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ', সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৬৫,
: এর থেকে যাবতীয় উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে। প্রথম বন্ধনীভুক্ত পৃষ্ঠাসংখ্যা ঐ সংস্করণের পত্রাঙ্ক অনুযায়ী।

২। প্রথমদিকে গদ্যের আলোচনায় ব্যবহার-করা সূত্রগুলির উৎস অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য জানানো হল :
ক. আরিস্ততল, 'রিটোরিকস', ৩য় খণ্ড : ১২ পরি.
খ. পেটার, ওয়াল্টার, 'এপ্রিশিয়েশনস্' (স্টাইল পরি.)
গ. মারি, মিডলটন, 'দি প্রবলেম অব্ স্টাইল' (১৯২২)
ঘ. ফ্রাই, নর্থ্রপ 'দি ওয়েল টেম্পারড ক্রিটিক' (১৯৬৪),

মালিনী ভট্টাচার্য

'ভয় পেয়ো না': হাসি পাওয়ার গোড়ার কথা

বাস্তবকে কোনোভাবে অস্বীকার না করেও ভাষাগত ও চিত্রগত উদ্ভাবনের সাহায্যে বাস্তবের যে লঘুকরণ ও বিস্তার ঘটান সুকুমার, সেইখানেই তাঁর অনন্যতা। এই প্রক্রিয়ার সার্থক ফসলগুলির মধ্যে 'ভয় পেয়ো না' অন্যতম।

সুকুমার রায়ের বিষয়ে কিছু লিখতে গেলে যে প্রশ্নটা প্রথমেই মাথায় আসে, সেটা তাঁরই ভাষায় বলতে গেলে : 'ভাবছি মনে, হাসছি কেন ?' প্রশ্ন করা মানেই হাসিটা মুলতুবি রাখা, সেইজন্য অনেকে হয়তো প্রশ্ন করতেই নারাজ হবেন। কিন্তু এটাও মনে রাখা উচিত যে 'ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক্ করে'—এই দ্বিগুণিত আমোদটার জন্য এমন কি আহ্লাদীরাও তাদের হাসিতে একটি পংক্তির ছেদ মেনে নিয়েছিল। বস্তুত যে হাসিকে বেঁচে থাকতে গেলে বুদ্ধির প্রয়োগের আওতা এড়িয়ে থাকতে হয়, তার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। 'হাসছি কেন' এটা কিছুটা আঁচ করতে পারার পরেও সুকুমার রায়ের কবিতা পড়ে কিন্তু না হেসে থাকা যায় না।

প্রশ্নের উত্তর নিয়ে নিঃসংশয় হবার জন্যই এমন একটি কবিতা বেছে নিলাম, যার মালমশলাগুলিতে হাসির চাইতে তার বিপরীত ভাবই প্রবল। সুকুমার রায়কে যাঁরা 'নিছক শিশু-সাহিত্যিক' মনে করে খুশি নন, তাঁরা 'আবোলতাবোল'র কবিতাগুলির 'অর্থ' নিয়ে অনেক নাড়াচাড়া করেছেন, যদিও গ্রন্থকার তাঁর কৈফিয়তে বলেই দিয়েছিলেন যে 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়ালরসের বই......'। এঁদের বক্তব্য : 'আজগুবি'র মধ্যেও তো একটা যুক্তি থাকতে হবে, যেটা ছাড়া আজগুবি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আর আজগুবির অন্তর্নিহিত যুক্তিকে ওপর থেকে স্বয়ম্ভর মনে হলেও চূড়ান্ত বিচারে তার মূলসূত্রটিকে বাস্তবের মধ্যেই থাকতে হবে। 'রামগরুড়ের ছানা,' 'হুঁকোমুখো হ্যাংলা', 'লড়াই ক্ষ্যাপা', 'বাবুরাম সাপুড়ে' বা 'একুশে আইনে'র মধ্যে যাঁরা পরিচিত মুখ বা পরিচিত পরিস্থিতির ছায়া দেখতে পান, তাঁদের অর্থ-আবিষ্কারের উদ্যম অনেক সময় অত্যুৎসাহিতায় গিয়ে ঠেকলেও তাঁদের মূল দাবি নস্যাৎ করার মত নয়। শক্তি-মানের আদরে দুর্বলের প্রাণান্তকর অবস্থা ঘটার যে ছবি 'ভয় পেয়ো না' কবিতাটির উপজীব্য, তার মধ্যে তাঁরা যদি ইণ্টার-ন্যাশনাল মনিটারি ফাণ্ডের ভারতপ্রেমিকতার ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চান, তাহলে আমি তো অন্তত বেশি আপত্তি করব না।

করব না, কারণ ভাল কবিতার একটি লক্ষণই এই, যে কালভেদে বিভিন্ন বর্গের পাঠকের কাছে তার এমন এমন অর্থ বিকশিত হতে পারে, যা নাকি লেখকের সচেতন চিন্তার

চৌহদ্দিতেও ছিল না। যে ভাষা লেখক ব্যবহার করেন তা তো পুরোপুরি তাঁর নিজস্ব মস্তিষ্কপ্রসূত নয়, ব্যাকরণের প্রশ্ন বাদ দিলেও ভাষারীতি এবং ভাষার গঠন—তা সাহিত্যিক হোক, বা অসাহিত্যিকই হোক—ওঠে একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশের মধ্য থেকে, লেখক নিজেও যার শরিক। ভাষারীতির পিনদ্ধতা, তার পরস্পরসংবদ্ধতা, যে কোনো ভাষারীতির ভিতরকার যে সংগীত-সুষম যুক্তি তা যখন কবিতার মধ্যে ফলিত হয়, তখন তার অর্থসন্দর্ভ লেখকের উদ্দেশ্যকে অনেকটাই ছাপিয়ে যেতে পারে। সমাজশরীরে পরিবর্তনের পটভূমিকায় ভাষার ব্যবহার যখন দ্রুত বা মন্থরগতিতে বদলাতে থাকে, তখন একটি বিশেষ সাহিত্যিক সৃষ্টির বাঁধুনির মধ্য থেকেও নতুন নতুন অর্থের দরজা খুলে যাওয়া অসম্ভব নয়। 'ভয় পেয়ো না' কবিতাটির আঙ্গিকেও এরকম খোলা দরজা বার হবার সম্ভাবনা প্রচুর, তার অর্থবহতা নানাদিক থেকে বিকশিত হতে পারে। যেমন বহু লৌকিক ছড়ার ক্ষেত্রে এজিনিষ ঘটতে দেখা গেছে।

কিন্তু তারপরেও প্রশ্নটি থেকেই যায়। কারণ, শক্তিমান দুর্বলের মধ্যে বিসদৃশতার যে মূল ধুয়ো কবিতাটির থেকে বের করে আনা হল তা তো হাসির বিষয় না-ও হতে পারত। বস্তুত আঙ্গিকের মধ্যে বিষয়টির ভয়াবহতাই প্রাধান্য পেতে পারত। সুকুমার রায়ের আঁকা ছবিটির বাঁদিকে ছাতা হাতে যে ছোট্ট মানুষটিকে পালাতে দেখা যায়, তার কাছে তো এটা ভয়াবহই। বিষয়টিকে হাসির করে তোলা হল কিভাবে, এখানেই বোধহয় আমাদের আসল প্রশ্ন। নাকি আমাদের তাহ'লে বলতে হবে, যে এটা প্রকৃতপক্ষে হাসির কবিতাই নয়? 'অর্থসন্ধানী'দের বিরুদ্ধে আমাদের বোধহয় একটাই মূল নালিশ থাকতে পারে : যে, তাঁরা হাসির কবিতার পাঠোদ্ধার করতে গিয়ে অনেক সময় হাসিটাকেই বাদ দিয়ে দেন।

'ভয় পেয়ো না' কবিতার সঙ্গে ছবিটিকে পাশাপাশি রেখে একটু ভাল করে দেখলেই প্রথম যে জিনিষটি চোখে পড়ে তা হল ছবির মানুষটির ক্ষুদ্রতা। পাঠক, ঐ ক্ষুদে জীবটি কি আপনি হতে পারেন? ও তো লিলিপুট, ওকে তো ঠিক মানুষ ব'লেই ভাবা যায় না। কই, ওর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তো আপনি একাত্ম হতে পারছেন না; বরং ওর সম্বন্ধে আপনার একটু অবজ্ঞামিশ্রিত করুণাই হচ্ছে, মনে হচ্ছে ওইটুকু জীবকে একটু ভরসা দেওয়া উচিত। এবং পাঠ করতে গিয়ে দেখছেন, যে-উত্তমপুরুষের জবানিতে আপনি কবিতাটি পড়ছেন সে হল ঐ গুহা-থেকে-বেরিয়ে-আসা তিন শিং-ওলা বিরাট বিটকেল জন্তু। অর্থাৎ 'বাস্তবে' যদিও দুর্বলই আপনার আত্মার আত্মীয়, কবিতার 'উদ্ভাবনী গড়নের মধ্যে' আপনি অলক্ষ্যে শক্তিমানে রূপান্তরিত হচ্ছেন। আপনি কি ক'রে যেন সবকিছুতেই ভয় পাবার অবস্থান থেকে ভরসা দেবার অবস্থানে চলে আসছেন। আপনিই তো বলেছেন : 'ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারব না—'। এমন কি, 'অভয় দিচ্ছি, শুনছ না যে?' এই অংশে এসে আপনার গলা নাটকীয়ভাবে একটু চড়ে যাচ্ছে, আপনি যেন সত্যিই আপনার ক্ষমতার বোধটাকে বেশ উপভোগ করতে শুরু করেছেন। বাস্তব থেকে আহৃত মালমশলায় যে ভয়াবহতা আছে, তা কবিতার গঠনে হাল্কা হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু এটাও সব নয়। সত্যিই কি শক্তিমানের সঙ্গে একেবারে একাকার হয়ে যাই আমরা পাঠকরা? নাকি আমাদের দৃষ্টিতে অন্য মাত্রাও যোগ হয়? যেমন, ধরা যাক, লিলিপুটের ডানহাতে ধরা ঐ ছাতাটি। ছাতা কখনো মাথা আগলাতে ব্যবহার হয়, কখনো ব্যবহার হয় ভ্রমণসঙ্গী লাঠি হিসাবেও। কিন্তু এখানে কোনটাই নয়; উত্তোলিত ছাতাটিকে একহাতে খামচে ধরে জানমাল নিয়ে পালানোর যে ভঙ্গি আমরা দেখি, তাতে কি হঠাৎ একই সঙ্গে ক্ষুদে জীবটিকে আবার ভীষণ চেনা মনে হতে থাকে না? আয়তনে হলই বা ও আমার বুড়ো আঙুলের অর্ধেক, ঐ ছাতা হাতে ঊর্ধ্বশ্বাস পালানোর ভঙ্গিটি কি ওকে একান্ত মানবিক করে তোলে না? তারপর ছবিতে ওর গতিভঙ্গির সঙ্গে ওর পশ্চাদ্বর্তীর গতিভঙ্গির তুলনা করুন। বলা যায়, সামনের জন দৌড়চ্ছে শাঁইশাঁই করে, আর পেছনের জন চলছে হেলেদুলে, তার বেঢপ তিন শিং-ওলা মাথা, খাপছাড়া দেহ আর পশ্চাদ্দেশের বিরাট সজারু-কাঁটার ভার সামলে। তার চেহারা ইচ্ছাকৃতভাবেই এতটাই বিটকেল করে তোলা হয়েছে যাতে শক্তিমানের সঙ্গে পাঠকের একাত্মীভবন একটা গণ্ডির বাইরে আর এগোতে না পারে। তাছাড়া তার ডানদিকে হেলে-পড়া মাথার ভার বাঁ হাতের আদিম মুগুরটির সাহায্যে যেভাবে সামলাতে হচ্ছে তাতে এই জীবটিকে তার বিরাট আয়তন সত্ত্বেও ঈষৎ বোকা এবং অসহায় মনে

হয়। ছোট্ট মানুষটি ছোট্ট হলেও আসলে ওর চাইতে অনেক সক্ষম; বিবর্তনের ইতিহাসে সে এবং তার জ্ঞাতাই যে অগ্রগামী থাকবে সে-বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না।

এবারে যদি পাঠের ক্ষেত্রে ফিরে আসি, তাহলেও দেখা যাবে উত্তমপুরুষের জবানিতে যে অভয় দেওয়া হচ্ছে, তার ফাঁকে ফাঁকে নিরুক্ত কিছু স্বগত মন্তব্য গোঁজা রয়েছে—অর্থের যে মাত্রা ঐ বৃহদাকার জীবটির ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে। তার ফলে অভয়দানের তাৎপর্যই পাঠকের কাছে পাল্টে যায়, যদিও শিং-ওলা জীবটির জবানিতেই পাঠ চলছে, তবুও উচ্চারণের ভঙ্গিতে এবং স্বরক্ষেপে ব্যর্থকতা বা শ্লেষের অনুপ্রবেশ ঘটে। যেমন 'তোমায় আমি চিবিয়ে খাব ['ওরে বাবা! চিবিয়ে খাবে!'] এমন আমার সাধ্যি নেই!' এই পংক্তিটির মাঝামাঝি ভীত মানুষের ঐ স্বগতোক্তি উহ্য থাকায় বাক্যটির শেষাংশ অর্থের দিক থেকে খাটো হয়ে যায়। অভয়দানের আর কোনো মানেই থাকে না। ঠিক তেমনি, 'জানো না মোর মাথার ব্যারাম [স্বগতোক্তি : 'থেকে থেকে ক্ষেপে যায়?'] কাউকে আমি গুঁতোই না?' কিংবা 'আদর ক'রে শিকেয় তুলে [স্বগতোক্তি : 'অ্যাঁ, শিকেয় তুলে?'] রাখব তোমায় রাত্রিদিন' কিংবা 'মুগুর আমার হাল্কা এমন মারলে তোমায় [স্বগতোক্তি : 'খেলাচ্ছলে তবে মারতেও পারে এক ঘা?'] লাগবে না'—এই প্রত্যেকটি বাক্যেরই সম্পূর্ণ অর্থগ্রহণ করতে হলে কিন্তু আমাকে—অর্থাৎ পাঠককে ঐ উত্তমপুরুষের অবস্থান থেকে কিছুটা সরে দাঁড়াতে হবে, কারণ ও নিজে তো খুব অকপটেই অভয়দান করে যাচ্ছে।

উত্তমপুরুষ যে বিষয়ে অনবহিত সেই তাৎপর্যটি শেষের চার লাইনে গিয়ে চরম ব্যর্থকতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসে। এখানে অভয়দানটা সরাসরি দৈহিক জুলুমে গিয়ে দাঁড়ায়। জোর না খাটালে, ভয় না দেখালে ঐ ক্ষুদে অর্বাচীনটি যে কিছুতেই অভয়বাণীতে কান দেবে না ঠিক করেছে; কাজেই তার ঠ্যাংদুটো ধরে তার মুণ্ডু চেপে বসতে হবে, সপরিবারে তাকে কামড়ে দিয়ে তাকে চূড়ান্তভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তার ভয়টা একেবারেই 'মিথ্যে'। অনুপায়েই তো এটা করতে হচ্ছে; উত্তমপুরুষের যুক্তি নেহাৎই অকাট্য। কিন্তু এমন চমৎকার যুক্তিসম্মত বলেই তা পাঠকের হাসির উদ্রেক করে; কারণ শক্তিমানের সঙ্গে সাময়িকভাবে একাত্ম হয়ে পাঠক যেমন ভয় ভুলে গেছে, তেমনি শক্তিমানের বেহদ্দ বোকামিটাও উহ্য থাকা সত্ত্বেও তার অকপট অভয়দানের মধ্য দিয়েই পাঠকের কাছে পৌঁছে গেছে। শক্তিমানের যুক্তিটাকে কিছুটা ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছে সে। অর্থাৎ, শক্তিমান্ ও দুর্বলের পারস্পরিক সম্পর্কের যে প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিস্থিতি, চিত্র এবং ভাষা এবং স্বরভঙ্গিমার সংগঠনের মধ্য দিয়ে তার থেকে মুক্ত করে কিছুটা নিরাপদ দূরত্বে আমাদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারছি। বাস্তবে আমি কোনোমতেই যে অবস্থান নিতে পারি না, কবি তাঁর উদ্ভাবনীপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাকে সেই অবস্থান নিতে সাহায্য করেন, তবেই তো আমার হাসি আসে। শিল্পকৌশলের মাধ্যমে বাস্তবের এই আপেক্ষিক নিরাকরণই যে হাসির ফোয়ারা খুলে দিতে সাহায্য করে, এই দিকটা অনেক সময়ই অর্থসন্ধানীরা অবহেলা করে থাকেন। অথচ এই বিশেষ কবিতাটিতে শুধু নয়, 'আবোলতাবোলে'র প্রত্যেকটি ভালো কবিতাতেই সুকুমার রায় যেখানে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দেন তা হল ভাষাগত ও চিত্রগত উদ্ভাবনের সাহায্যে বাস্তবের এই লঘুকরণ, যদিও তা বাস্তবকে অস্বীকার করে না কোনোক্রমেই।

সুকুমার রায়ের লেখার কপিরাইট চলে যাওয়াতে, অথচ মূল ছবিগুলির ওপর বাধানিষেধ থাকার ফলে আজকাল সম্পূর্ণ নতুন ছবি সমেত 'আবোলতাবোলে'র নতুন নতুন সংস্করণ বার হচ্ছে। সিগনেটের 'আবোলতাবোল' বাজারে মেলে না, এই নতুন সংস্করণগুলি হবার ফলে অন্তত শিশুদের হাতে সেই কবিতাগুলি দেওয়া যাচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার সঙ্গে যে ছবি থাকে তা ঠিক এই কারণেই আমাদের চোখকে পীড়া দেয়। সুকুমার রায়ের ছবিগুলি বাস্তব জলহীন মেঘের মত হাল্কা সুন্দর পরিস্রুত রূপ নেয়, অথবা তার উপাদানগুলি দিয়ে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হয়, কিন্তু 'আবোলতাবোলে'র নতুন ছবিতে বাস্তবের অপ্রীতিকরতা আরো অপ্রীতিকর হয়ে ওঠে, মানুষ এবং অন্যান্য জীবের চেহারায় হয় মস্তান, নয় moron, নয় উন্মাদের লক্ষণ ফুটে বেরোতে থাকে। ছবিগুলো দেখে বাচ্চা-আঁৎকে ওঠার কথা, হাসি পাবার কথা নয়। 'উদ্ভট' বা 'খেয়ালরসে'র উৎস তো বাস্তবের কয়েকটি লক্ষণকে খুজিয়ে

ফাঁপিয়ে আতিশয্য সৃষ্টি করার মধ্যে নয়, উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে বাস্তবের একটি বিকল্প তৈরী করায়। বাস্তবের পিছনে যে 'যুক্তি তাকে অবাস্তবের ক্ষেত্রে' নতুনরূপে ব্যবহার করায়।

অর্থাৎ কবি একটা অনুমানের জগৎ গড়ে তুলছেন। যদি এরকম তিন-শিং-ওয়ালা, শজারু-কাঁটায় ভরা, গুহাবাসী, দ্বিপদ, মুগুর-হাতে কোনো জীব থাকে, আর তার হাতের চেটোর চাইতে একটু বড়, ক্ষীণকায় এক লিলিপুটকে সে যদি অভয় দিতে এগিয়ে আসে, তাহলে পরস্পরকে কিভাবে দেখবে তারা? এর চাইতে বেশী বৈসাদৃশ্য তো আর কিছুতে হতে পারে না। অথচ যেহেতু এটা 'যদি'র জগৎ এবং পাঠকহিসাবে এর চৌহদ্দির মধ্যে আমার অবাধ গতিবিধি, তাই এই কাল্পনিক অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে নতুন নতুন অবস্থানে নিজেকে রেখে আমি অনবরত সম্ভাব্যের গণ্ডি বাড়িয়ে যেতে পারি। মজাটা এই বিস্তৃতির মধ্যে। ধুয়োটা বাস্তবের থেকে আসতে পারে—নিশ্চয়ই আসতে হবে, কিন্তু বিস্তারটাই আসল।

যেসব শিল্পরস বাস্তব বিষয়বস্তুর সঙ্গে একটা দূরত্ব সৃষ্টি ক'রে, ইচ্ছাকৃতভাবে শিল্পের স্বতন্ত্র অবস্থানের ওপর জোর দিয়েই বেঁচে থাকে, হাস্যরস তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান একটি। বাংলাভাষার শরীর থেকে আজ হাস্যরস মনে হয় অনেকটাই উবে গেছে। 'ব্ল্যাক হিউমারে'র নামে আমাদের সাহিত্যে আজ যা পাচ্ছি তার কিছুটা হ্যাবলামি আর কিছুটা গেঁজিয়ে-যাওয়া নেতিবাদ। বাস্তবের গায়ে ব্যঙ্গের কড়া চাবুক বলে তাকেই আমরা প্রাণপণে বাহবা দিয়ে যাচ্ছি। আর অন্যদিকে আছে 'হাসি নিষেধ'-করা গোমড়ামুখো বিপ্লবীয়ানা। এটা হয়তো ঠিকই যে, যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে সুকুমার রায় তাঁর হাসি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, তার থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি; আমাদের বাস্তব আরো অনেক কঠিন এক বাস্তব।

কিন্তু ঠিক সেই জন্যই তো আজ হাস্যরসিকের প্রয়োজন আছে,—বাস্তবের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার বা তাকে কিঞ্চিৎ সহনীয় করার জন্য নয়, উদ্ভাবনীশক্তির সাহায্যে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে থাকা মাটি-কামড়ানো সীমিত প্রত্যক্ষের জগৎটাকে আয়ত্তে এনে তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলা করার জন্য, প্রত্যক্ষের দাস হওয়ার বদলে এক বিকল্প জগৎ তৈরী করে তার থেকে প্রত্যক্ষের নতুন নতুন তাৎপর্য আবিষ্কার করার জন্য। তথাকথিত 'ব্ল্যাক হিউমারে'র আস্তাকুঁড়-চাটা প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পেতে হলেও প্রকৃত হাস্যরসের জোরালো আত্মনির্ভরতা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের ভবিষ্যৎ যাঁরা তৈরী করবেন তাঁরা নিশ্চয়ই সুকুমার রায়ের নতুন সংস্করণ হবেন না, কিন্তু সুকুমার রায়ের কাছে তাঁদের শেখার থাকবে অনেক।

প্রবীর চট্টোপাধ্যায়

আবোলতাবোলের তিনটি কবিতা

সমসাময়িক রাজনৈতিক পটভূমিতে 'বাবুরাম সাপুড়ে', 'একুশে আইন' এবং 'ডানপিটে'—এই তিনটি কবিতার বিশ্লেষণ ক'রে লেখক দেখাতে চেয়েছেন কবিতাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য কী এবং সুকুমারের রাজনৈতিক সহানুভূতি কোন দিকে ছিল।

নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখার কৌশলই আর্ট—এঙ্গেলসের এই উক্তিটি স্মরণে রেখেও বলা যায়, পাঠকের মনে আর্টের ক্রিয়া শেষ হয়ে গেলে শিল্পী আর প্রচ্ছন্ন থাকেন না। আমাদের শৈশবের রহস্যঘেরা সময়ের কুমড়োপটাশ, ট্যাঁশগরু, বাবুরাম সাপুড়ে কিংবা পাগলা দাশুর স্রষ্টা সুকুমার রায় যতই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখুন নন্‌সেন্সের কুয়াশায়, একথা আজ বিশ্বাস করা শক্ত যে নিছক হাস্যরস-বিতরণই ছিল তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য। আবোলতাবোলের কবিতাগুলি সবই ১৯১৫ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে লিখিত। এগুলি রচনার পেছনে তাঁর যৌবনের যুক্তিসিদ্ধ মনন এবং যুগের প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক ও সংগত। এগুলির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তৎকালীন রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তি-মানসের উদ্ভট আচরণের অসংখ্য ছবি। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এমন রসাস্বাদিত যা সুকুমার রায়ের পূর্বে কিংবা পরে আমরা বাংলা সাহিত্যে পাই না। আশা করা যায়, "নিছক উদ্ভট রসের শিশুসাহিত্যিক" সুকুমার রায় সম্পর্কে পুনর্মূল্যায়ন শুরু হবে।

সুকুমার যখন 'সন্দেশে'র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ভারতবর্ষের কোটি কোটি নিরক্ষর দরিদ্র দেশবাসীর ভাগ্য সরাসরি জড়িয়ে গেছে যুদ্ধে। যুদ্ধশেষে স্বাধীনতালাভের আশায় সৈন্য, রসদ ও অর্থ দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শক্তিকে সাহায্যদানে তৎকালীন কংগ্রেস এগিয়ে আসে। সমস্ত প্রাচ্যের যুদ্ধের খরচ ইংরেজ ভারতবর্ষ থেকে শুষে নেয়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হতেই বোঝা গেল ইংরেজ ভারতবাসীদের শুধু মিথ্যে আশ্বাসই দেয় নি, দেশের উপর অত্যাচারের কব্জা সুদৃঢ় করতেও সে বদ্ধপরিকর। সন্ত্রাস-বাদী আন্দোলন দমনে একধারে হত্যা, জেল, দ্বীপান্তর চলতে থাকে, অন্যধারে ভারতরক্ষা আইন, সিডিসন কমিটির রিপোর্ট, রাউলাট কমিশন, প্রেস অ্যাক্ট প্রভৃতির মধ্যে স্বাধীনতার আশা বিলীন হয়ে গেলে, ভারতবাসীর মধ্যে দেখা দেয় হতাশা ও অপমান-বঞ্চনার ধিকিধিকি আগুন। জালিয়ানওয়ালাবাগ এই আগুনেরই বহিঃপ্রকাশ। সমস্ত দেশ তখন এক জ্বালামুখী আগ্নেয়গিরি। রাজনৈতিক ধারা হিসেবে তৎকালীন কংগ্রেসের মধ্যে 'নরমপন্থী' ও 'চরমপন্থী'দের বিরোধ তুঙ্গে এবং বাংলা দেশ যেহেতু বরাবর 'চরমপন্থী'দের ঘাঁটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে বিরোধ চলতেই থাকে। অন্যধারে এ পরিস্থিতির মধ্যে নতুন করে বিপ্লবী রাজনীতি—বালেশ্বরের ঘটনার পর যা সাময়িক স্তিমিত হয়ে পড়েছিল—তা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলনের শ্রেণীগত রূপ প্রকাশ পায়। 'নবযুগ' 'ধূমকেতু' 'লাঙল' পত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ দেশবাসীর পূর্ণ স্বাধীনতার আকাংক্ষা প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কংগ্রেসের 'চরমপন্থী'দের ঘনিষ্ঠতা, অসহযোগ আন্দোলন এবং গান্ধী-নেতৃত্বের দুর্বলতা, আপোস-মনোভাব সমস্ত দেশকে নতুন যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়ে দেয়। সুকুমার রায়ের সাহিত্যচর্চার কাল এটাই।

আবোলতাবোলের সব কবিতাগুলোর মধ্যেই হাস্যরসের আড়ালে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ এবং যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুকুমারের এই ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু তৎকালীন যুগের শিক্ষা, রাজনীতি, সামাজিক কাঠামো, আচার-ব্যবহার থেকে শুরু করে শব্দের খেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। ডারউইনের বিবর্তনবাদতত্ত্ব থেকে শুরু ক'রে হিন্দুসমাজের কৌলিন্য-প্রথা—কিছুই বাদ যায়নি। প্রতিটি কবিতার সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এ পরিসরে অসম্ভব বলে আমরা পরিচিত তিনটি কবিতাকে বেছে নিতে পারি।

'বাবুরাম সাপুড়ে'র সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠক আশৈশব পরিচিত। কবিতাটি 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩২৮ সনের আষাঢ় সংখ্যায় 'বাপ্‌রে' নামে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত 'বাপ্‌রে' নামের মধ্যে শ্লেষ ও ব্যঙ্গের তীব্রতা সরাসরি উপস্থিত বলে, নাম পাল্টে কবি নিজেকে বেশি আড়াল করতে চেয়েছেন।

সাপুড়ে সাপের কারবারী; আর বিষাক্ত সাপ ধরা এবং খেলা দেখানো শৌর্য বীর্য নির্ভীকতার ও বীরত্বের পরিচায়ক। বাবুরাম কিন্তু ঝোলার মধ্যে যে সাপ রাখে তা দাঁত-নখ-চোখ-হীন। সে সাপ নড়ে-চড়ে না, ছোটে না এমন কি ফোঁস্ করতেও জানা নেই তার। কোন উৎপাত নেই তার। এ ধরণের "জ্যান্ত" সাপ মেরে বীরত্বে আস্ফালন করতে চায় কিছু কিছু লোক। এই ধরণের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে সমস্ত কবিতাটি শ্লেষ ও ব্যঙ্গে ভরপুর। কবিতাটি ১৯২১-এর জুন-জুলাই মাসে লেখা। এর আগে ১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। কংগ্রেসের নরমপন্থীরা বরাবর আন্দোলনের এমন পন্থা বেছে নিতেন যাতে কোন ঝুঁকি থাকত না। কোথাও কোনো ঝুঁকি বা প্রতিরোধ দেখলে এই সব কাপুরুষরা বিচলিত হয়ে পড়তেন। এমন সব মানুষের হাতেই ছিল আন্দোলনের নেতৃত্ব।

গান্ধীর এক জীবন-চরিতকারের মতে, "দেশে হিংসার যে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল, তা নির্বাপিত করা ছিল তাঁর কাজ। তিনি মনে করতেন ভারতের সবচেয়ে বড়ো বিপদ হলো বিশৃঙ্খল জনতাতন্ত্র। তিনি যুদ্ধ ঘৃণা করতেন। জনগণের বিদ্রোহ তাঁর নিকট ছিল অতিশয় অকল্পনীয় ব্যাপার। একে তিনি কাণ্ডজ্ঞানহীনদের আইন, কাণ্ডজ্ঞানহীনদের বিদ্রোহ ইত্যাদি বয়ানে নিন্দিত করেছেন।" কিন্তু ভারতরক্ষা আইন, সিডিশন কমিশনের রিপোর্ট, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর দেশের পরিস্থিতি কেমন ছিল? কোন্ পটভূমিকায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন? বৈপ্লবিক মনোভঙ্গি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল অতিদ্রুত গতিতে। ১৯২০ সনের অভূতপূর্ব মন্দা ১৯২১ সনের গণ-বিদ্রোহে পরিণতি লাভ করে। এই আন্দোলনের ব্যাপক বিস্তার দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বভাবতই গণ-বিদ্রোহের পথ ধরে। শ্রমিক ও কৃষকগণও আপন অধিকার অর্জনে সংগ্রামের পথ ধরতে বাধ্য হয়। ১৯২১ সনে আনুমানিক ৪০০টি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগদান করেন পাঁচ লক্ষাধিক শ্রমিক। জামসেদপুরে টাটাদের কারখানায় প্রায় তেইশহাজার শ্রমিক মাসখানেকের জন্য ধর্মঘট করেন। মেদিনীপুরে কর-বন্ধ আন্দোলন সংগঠিত হয়; পাঞ্জাবে আকালী কৃষকগণ বিত্তবান মোহান্তদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ১৯২১ সনের মার্চ মাসে একটি গুরুদ্বারে সমবেত শিখ তীর্থযাত্রীদের উপর অকস্মাৎ পুলিশী হামলা হয়, এবং বেশ কয়েকজন তীর্থযাত্রীকে গুলি ক'রে হত্যা করা হয়। ফলে গ্রামাঞ্চলেও আকালী কৃষকদের আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এপ্রিল মাসে মহারাষ্ট্রের মুলসি-তে কৃষকরা তাঁদের দাবিদাওয়া মীমাংসিত না হলে সত্যাগ্রহ করার হুমকি দেন। স্বভাবতই গান্ধী এবং কংগ্রেসের নরমপন্থীরা বিচলিত হয়ে পড়েন। আন্দোলন সত্যকার ঝুঁকির পথে চলে যাওয়ায় তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা চেয়েছিলেন সেই সাপ যার "নেই কোনো উৎপাত", যে "খায় শুধু দুধভাত"। সেই সাপকে "তেড়ে মেরে ডাণ্ডা" ঠাণ্ডা করে দিতে চেয়েছিলেন তাঁরা। তার বদলে ঘটল চৌরিচৌরার ঘটনা। তৎক্ষণাৎ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে হাঁফ ছাড়লেন গান্ধী এবং বীরের মত আশ্রয় নিলেন জেলে।

সুকুমার রায় বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি রাজনীতিও করেন নি। সহিংস গণজাগরণের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল বলে জানা যায় না। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধী-নেতৃত্বের সাজানো লড়াই এবং ঝুঁকি না-নেওয়ার মানসিকতাকে তিনি বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি।

পক্ষান্তরে 'একুশে আইন' কবিতায় শ্লেষ, ব্যঙ্গ মোটেই তির্যক

নয়, অপেক্ষাকৃত সরাসরি। কবিতাটি 'সন্দেশে' প্রকাশ হয় ১৩২৯ সনের ভাদ্রসংখ্যায়, ইংরাজী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট-সেপ্টেম্বর। নজরুল তখন সাধারণ মানুষের মনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় 'নবযুগ' পত্রিকায় চরমপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে অসহযোগ আন্দোলন থেকে গান্ধী সরে আসার পর দেশ জুড়ে ঔপনিবেশিক অত্যাচার প্রবল থেকে প্রবলতর হয়েছে। সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থানে ভীত বৃটিশসিংহ দেশের তরুণ, যুবক ও বিপ্লবী শক্তিকে দমন করার জন্য একের পর এক আইন তৈরী করতে থাকে। হত্যা, গ্রেপ্তার, দ্বীপান্তর চলে নির্বিচারে। এমনকি সংবাদপত্র ও লেখক-সাহিত্যিকরাও এ রোষ থেকে বাদ যান নি। 'নবযুগ', 'ধূমকেতু' এবং নজরুলের উপর প্রথম থেকেই ইংরেজের কড়া দৃষ্টি ছিল। ১৯২২ সালে তাঁর 'যুগবাণী' ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদপুষ্ট 'ধূমকেতু' প্রকাশিত (১২ আগস্ট ১৯২২) হবার সঙ্গে সঙ্গে নজরুল গ্রেপ্তার হবেন বলে দেশের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এই 'ধূমকেতু' পত্রিকায় নজরুলের 'আনন্দময়ীর আগমনে' (প্রকাশ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২) প্রকাশের অভিযোগে কবিকে ঠিক আটাশ দিনের পরই গ্রেপ্তার ক'রে, জেলে ভরে রাখা হয়। সুকুমার রায়ের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা এখানে উল্লেখযোগ্য। 'একুশে আইনে'র প্রকাশের কিছুকাল পর নজরুল গ্রেপ্তার হন। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তাঁর কল্পনা মিলে যায়: "যে সব লোকে পদ্য লেখে/তাদের ধরে খাঁচায় রেখে...।" সমস্ত কবিতাটির মধ্য দিয়ে ইংরেজ শাসনের ভয়াবহ অত্যাচার ও রোষের ছবি দেখতে পাই আমরা। সান্ধ্য আইন, গ্রেপ্তার, প্রেসের প্রতি কড়া নজর, লেখকের স্বাধীন মত-প্রকাশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা—সবই ফুটে উঠেছে কবিতাটিতে। এমনকি,সন্দেহবশে, বিনাবিচারে সাধারণ নাগরিকরাও যে কি হেনস্থা হয়েছে, তা বোঝা যায়—"চলতে গিয়ে কেউ যদি চায়/এদিক্ ওদিক্ ডাইনে বাঁয়/রাজার কাছে খবর ছোটে/পল্টনেরা লাফিয়ে ওঠে/ দুপুর রোদে ঘামিয়ে তায়/একুশ হাতা জল গেলায়।" ১৯১৬ সালে প্রবর্তিত ভারতরক্ষা আইনের নামে যে অত্যাচার চলেছিল জনজীবনের উপর, 'একুশে আইন' তার ঐতিহাসিক ছবি।

তৃতীয় কবিতা 'ডানপিটে'। কবিতাটি 'সন্দেশ' পত্রিকায় ১৩২৬-এর ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং সারাভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কয়েকমাস পরে লেখা। 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলনের প্রতি সূক্ষ্ম সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায় এ কবিতায়।

"বাপ্ রে কি ডানপিটে ছেলে। /কোন্ দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে/একটা সে ভূত সেজে আঠা মেখে মুখে/ঠাঁই ঠাঁই শিশি ভাঙে শ্লেট দিয়ে ঠুকে/অন্যটা হামা দিয়ে আলমারি চড়ে/ খাট থেকে রাগ করে দুম্ দাম্ পড়ে।"

এই ডানপিটে ছেলে দুটি সহজ পথে চলে না। ফাঁসি, জেল যেতে এদের ভয় নেই। একজন মুখে আঠা মেখে শ্লেট শিশি ভাঙে, অন্যটা হামাগুড়ি দিয়ে আলমারিতে উঠতে চায়। এই দুই ভাই কি বাংলার দুই বিপ্লবী সংস্থা 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন' ? এ দুজনের জন্যই হয়েছিল চরমপন্থার মধ্য দিয়ে, আত্মত্যাগের শপথ নিয়ে। পাঞ্জাব এবং বাংলা, তৎকালীন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের শক্ত ঘাঁটি—এ দুই ডানপিটে জাতিকেও দুইভাই হিসেবে দেখা যেতে পারে। হামা দিয়ে আলমারি চড়া যায় না, যে কোন সময়েই সমূহ পতনের সম্ভাবনা, তবুও ডানপিটে ছেলেদের একজন এ পথ বেছে নিচ্ছে। "বাপরে কি ডানপিটে ছেলে।/ শিলনোড়া খেতে চায় দুধভাত ফেলে / একটার দাঁত নেই, জিভ দিয়ে ঘষে / এক মনে মোমবাতি, দেশলাই চোষে।" ছেলেরা স্বভাবতই দুধভাতে আসক্ত, কিন্তু এ অদ্ভুত ছেলেরা তা হেলায় সরিয়ে দিয়ে শিলনোড়ার মত কঠিন বস্তু গিলতে চায়। বাংলা ও পাঞ্জাবের হাজার হাজার যুবক সেদিন দুধভাত ফেলে শিল-নোড়া গিলতেই ছুটে গেছল। দাঁত না থেকেও চুষেছিল মোমবাতি এবং দেশলাই। লক্ষ্য করার বিষয় 'মোমবাতি' এবং 'দেশলাই' শব্দদুটি। সুকুমার রায় ঐ শব্দ দুটির মধ্য দিয়ে বারুদ দিয়ে খেলা অর্থাৎ অগ্নিযুগকে বোঝাতে চাইছেন। "আরজন ঘরময় নীল কালি গুলে / কপ্ কপ্ মাছি ধরে মুখে দেয় তুলে।" মাছি গেলার অর্থ যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা-, তা-ই তারা কপ্ কপ্ ক'রে গিলছে। নিজের প্রতি মায়া মমতা নেই, টম চাচাদের খুন করার জন্য ডানপিটে ছেলেরা বদ্ধপরিকর। "বাপ্ রে কি ডানপিটে ছেলে / খুন হত টম চাচা ওই রুটি খেলে / সন্দেহে শুঁকে বুড়ো মুখে নাহি তোলে / রেগে তাই দুই ভাই ফোঁস্ ফোঁস্ দোলে।" বোমা

গুলি পিস্তল ইত্যাদির সাহায্যে যেভাবে অগ্নিযুগের বাংলা ও পাঞ্জাবের দামাল ছেলেরা ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল, 'ডানপিটে' সেই পটভূমিকায় লিখিত। ইংরেজ সেদিন এই দামাল ছেলেদেরই সিংহাসনের একনম্বর শত্রু মনে করত। 'দুধভাত' খাইয়ে এদের রাখা যায় না, এরা 'শিলনোড়া' গেলে। "নেড়াচুল খাড়া হয়ে রাঙা হয় রাগে / বাপ্-বাপ্ বলে চাচা লাফ দিয়ে ভাগে।" নেড়া চুলের খাড়া হবার সম্ভাবনা নেই তবু তা রাগে রাঙা হচ্ছে এবং চাচার প্রাণ ভয়ে ওষ্ঠাগত। অরবিন্দ ঘোষ, ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং যদুগোপাল, যতীন দাস থেকে শুরু ক'রে অনুশীলন, যুগান্তরের অসংখ্য ডানপিটে ছেলের রাঙা হওয়া রাগে বাপ্ বাপ্ বলে টমচাচারা অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের রাজনৈতিক পথ সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলেও, নির্বিশেষে প্রায় সবাই এঁদের আত্মত্যাগ এবং বীরত্বকে সম্মান জানিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এ পথের সঙ্গে কোনদিন একমত না-হয়েও লিখেছেন 'ঝড়ের খেয়া', সুকুমার রায় নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন 'ডানপিটে'।

বিষ্ণু বসু

চলচিত্তচঞ্চরি

জীবনবিচ্যুত, বাগাড়ম্বর সর্বস্ব বাঙালী সভাসমিতি আশ্রয়ী মন প্রতি সুকুমার রায়ের তীব্র ক্রোধ ব্যক্ত হয়েছে 'চলচিত্তচঞ্চরি' নাটকে। যে-'কমন ম্যান'কে তিনি খুঁজেছিলেন জীবনের নিজস্ব 'লজিকে' ভবদুলাল তারই প্রতিভূ। এ চরিত্রে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পের চরিত্রের প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়।

এক

চলচিত্তচঞ্চরি প্রথম বেরিয়েছিল 'বিচিত্রা' পত্রিকায়।[১] তার প্রায় চারবছর আগে সুকুমার রায়ের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। বিচিত্রায় চলচিত্তচঞ্চরির জন্য গুটিকতক ছবি এঁকেছিলেন যতীন্দ্রকুমার সেন ওরফে নারদ।

'আবোলতাবোল'র প্রথম সিগনেট সংস্করণে চলচিত্তচঞ্চরি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এ নাটককে প্রথম জনপ্রিয় করেন 'রূপকার' নাট্যগোষ্ঠী ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। সন্তোষ দত্তের ভবদুলাল এবং সবিতাব্রত দত্তের ঈশান গানে অভিনয়ে প্রযোজনাটি জমিয়ে দিয়েছিল।

চলচিত্তচঞ্চরি ঠিক কত সালে সুকুমার লিখেছিলেন তা বোধহয় বলা যায় না। 'সুকুমার রচনা সমগ্র'তে সম্পাদক জানিয়েছেন এটি নাকি লেখা হয়েছিল 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'-এর সমকালে অর্থাৎ ১৩২১ সালে।[২]

দুটি কারণে এ তথ্য সঠিক বলে মনে হয় না। প্রথমত, ১৩২১ সালে (ইং ১৯১৪ খ্রী) যদি একটি লেখা হয় তাহলে এটি লেখার পরেও সুকুমার প্রায় ন'বছর বেঁচেছিলেন। অথচ এমন একটি ধাঁধানো লেখা তিনি না ছাপিয়ে ফেলে রেখেছিলেন, একথা মেনে নেওয়া কঠিন। অবশ্য এমন যদি হয় এ-নাটকে যাঁদের তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন তাঁরা কেউ কেউ চারপাশের চেনাজানাদের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন, তাহলে না-ছাপানোর একটা কারণ থাকতে পারে। তবে ব্যঙ্গে তো তেমন সম্ভাবনার সুযোগ সবসময় থেকেই যায় এবং তেমন ধরণের লেখা, এমন কি, সুকুমার রায়ের অন্যত্রও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। তাই কোপটা শুধু চলচিত্তচঞ্চরির উপরই পড়বে কেন ?

দ্বিতীয়ত, এ-নাটকে সভাসমিতির হাস্যকরত্ব নিয়ে যেভাবে বিদ্রূপ করা হয়েছে তার কিছু ঐতিহাসিক উৎস খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার ব্যাপারে ব্রাহ্মদের মধ্যে তুমুল বিতণ্ডা হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবীণ নবীন সভ্যরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন এবং প্রচুর বিতর্ক চলে। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে গোলযোগ যদিও চলছিল ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কিন্তু ব্যাপারটি চরমে উঠেছিল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ। মনে হয়, এরই অভিঘাতে নাটকটি লেখা হয়েছিল। সে-হিসাবে রচনাকালকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টেনে নেওয়া যেতে পারে।[৩] অর্থাৎ ১৯১৭ থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে

কোনো এক সময়ে এটি লেখা হয়েছিল।

চলচিত্তচঞ্চরিতে দুটি সভার কথা আছে। সাম্যসিদ্ধান্ত সভা এবং শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম। অবশ্য শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমের চেহারা ও চরিত্র সভার চাইতে কিছু আলাদা। কিন্তু তার মধ্যেও সভার বৈশিষ্ট্য বেশ খানিকটা রয়ে গেছে। তাছাড়া দুটো প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল খোঁজার জন্য বেশি ভাবতে হয় না। আবার শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম পুরোপুরি সভা নয় বলেই তাকে ব্যঙ্গের কেন্দ্রে রাখেন নি সুকুমার, এমন সিদ্ধান্তও করা চলে হয়তো।

প্রশ্ন এই, সুকুমার রায় এধরণের সভাসমিতির উপর ক্ষিপ্ত হলেন কেন? তিনি নিজেই তো এধরণের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। অবশ্য সৃষ্টিশীল লেখক মাত্রেই নিজের স্খলন পতন ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন থাকেন। সুকুমার রায়ও ছিলেন। বরং একটু বেশী পরিমাণেই ছিলেন। নিজেকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবার মতো তির্যক দৃষ্টিও তাঁর ছিল। তবু শুধু মাত্র এর মধ্যে বোধহয় উত্তরটি খুঁজলে চলবে না।

আসলে সভাসমিতির বিরুদ্ধে একটা বিরূপ মনোভাব বাঙালীদের মধ্যেই বহুদিন ধরে গড়ে উঠেছিল। এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে উনিশ-শতকী নবজাগরণে নতুন মূল্যবোধ বাঙালীর জীবনে যে উত্তেজনা আর তরঙ্গ তৈরি করেছিল তার বেশ কিছু অংশ প্রকাশ পেয়েছিল সেকালের সভাসমিতিগুলোর মধ্য দিয়ে। সমাজবিজ্ঞানীরাও বলেন, সভাসমিতির কাজই হলো 'পেশাদারী আগ্রহ নিয়ে জ্ঞানের উন্নয়ন'[৪] ঘটানো। কিন্তু আমাদের নবজাগরণজাত উদ্যম অনেকটাই সীমিত থেকেছিল শুষ্ক তত্ত্ব-আলোচনায়, যেহেতু দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ও রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে বাঙালীর তেমন কোনো যোগ ছিল না। তাই জীবন-বিচ্ছিন্ন বাগাড়ম্বর স্বাভাবিক কারণেই জাতির জীবনে প্রশ্রয় পেয়েছিল। অজস্র সভাসমিতির কর্মচাঞ্চল্যের মধ্য দিয়ে গত শতকের সামাজিক ভাঙাগড়ার প্রতিফলন ঘটেছিল একথা যেমন ঐতিহাসিক সত্য, তেমনি আবার তার অর্থহীন প্রাচুর্য অনেক সময়ে হাস্যকর হয়ে উঠত এ তথ্যও মিথ্যে নয়। সেই উনিশ-শতকেই স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে কঠিন বিদ্রূপ করেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি [ঈশ্বরচন্দ্র] আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই, তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায় তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন...।"[৫] ঈশ্বরচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হতেন কিনা বলা যায় না তবে বঙ্কিমচন্দ্র যে হয়েছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই তাই লিখেছেন, "কলিকাতা ছাড়িলেও নিস্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঞ্জিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠ-সঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জনী, বিলে বিলবাসিনী এবং মাচার নীচে অলাবুসমপহারিণী সভাসকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।"[৬] সভাগুলোর নামকরণের মধ্যে যে ঝাঁঝ, বিদ্রূপ ও শব্দগত হুল্লোড় রয়েছে তা যেন অনায়াসে সুকুমার রায়েও খাপ খেয়ে যায়। সাম্যসিদ্ধান্ত সভার নামটি যেন একটুর জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্রের নজর এড়িয়ে গেছে।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র নয়, এমন কি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেও ব্রাহ্মসমাজেরই অন্যতম প্রবীণ ও প্রধান ব্যক্তি আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, এমন একটি সভা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যার ঘোষিত উদ্দেশ্য হবে যেকোনো সভাসমিতির ধ্বংসসাধন। এ সভার নাম হবে 'সভানিবারণী সভা'। যেখানেই কোনো সভার সভ্যরা একসঙ্গে বসবে অমনি সভানিবারণীর সভ্যরা লাঠি সোটা নিয়ে সেখানে ছুটে যাবে এবং গায়ের জোরে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবে।[৭]

শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো প্রবীণ স্থিতধী মানুষ যদি এব্যাপারে এতটা বিচলিত হতে পারেন তাহলে সুকুমার রায়ের মতো সচেতন তরুণদের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে সুকুমার রায়ের ঘনিষ্ঠতার কথা তো সকলেরই জানা। চলচিত্তচঞ্চরি রচনার প্রেক্ষিত হিসেবে উদ্ধৃত মন্তব্যগুলি মনে রাখা যেতে পারে।

তবে মনে হয়, শুধু কিছু অনির্দিষ্ট ক্ষোভ সুকুমার রায়কে এ তীক্ষ্ণ নাটকটি লেখায় প্রবৃত্ত করে নি। সমকালীন ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণতা ও দলাদলি তাঁকে উত্তেজিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সদস্য

করার প্রস্তাবে ব্রাহ্মদের মধ্যে যে তুমুল মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, তা অনেক তরুণ ব্রাহ্মের সঙ্গে সুকুমারকেও অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ করেছিল। প্রভাবশালী ব্রাহ্মদের একটি অংশ মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ আদৌ ব্রাহ্মই নন। তাঁর লেখা প্রেমের গান ব্রাহ্মভাবাদর্শের বিরোধী।[৮]

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্রাহ্মদের এ লড়াই চলছিল ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

যাই হোক, তরুণ গোষ্ঠীর নেতা হিসেবে সুকুমার প্রবীণ ব্রাহ্মদের এ মনোভাব বরদাস্ত করতে পারেন নি। উদার মানবিকতায় পুষ্ট সুকুমার যে-কোনো ধরণের সংকীর্ণতাকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম ছিলেন। তিনি জানতেন, "মিথ্যা দৈবের অন্ধসংস্কারে মানুষ ডুবিয়া আছে"[৯] এবং "বিজ্ঞানের জুজু যখন টিকিতত্ত্ব ও গঙ্গাজল মাহাত্ম্যের সমর্থনেও অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন দৈববাদ যে বিজ্ঞানের দোহাই দিবে সেটা কিছুই বিচিত্র নয়।"[১০] তাই "আগে তাহার মোহসংস্কার ভাঙিয়া দেখ, আগে জীবনকে এই অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার কর।"[১১] শ্রীখণ্ডদেব ও সত্যবাহনদের দল সংস্কারকেই বিজ্ঞান বলে চালাতে চায়, সুকুমার তা স্বীকার ক'রে নেবেন কেন? তিনি জানেন, "জীবনের যে কোন দ্বন্দ্ব জীবনের মধ্যেই আপনার সর্বোত্তম সমাধান লাভ করিয়া থাকে। কারণ, জীবনের একটা তত্ত্ব লজিক আছে, তাহা তত্ত্বের লজিককে চিরকালই অতিক্রম করিয়া যায়।"[১২] চলচিত্তচঞ্চরিতে সুকুমার এ স্বতন্ত্র লজিক হাজির করেছেন। যে 'কমন ম্যান'-কে[১৩] তিনি খুঁজেছেন নিজস্ব লজিকে, ভবদুলাল তারই প্রতিভূ হয়ে এস্টাব্লিশমেণ্টের বিরুদ্ধে ফেটে পড়েছে। চলচিত্তচঞ্চরি সুকুমার রায়ের সংকটময় ও সংঘাতপূর্ণ মননেরই তির্যক অভিব্যক্তি। ভবদুলাল সুকুমার-সৃষ্ট এমন একটি চরিত্র যাতে লেখকের ব্যক্তিত্বের আরোপ ঘটেছে সবচাইতে বেশি।

দুই

রাগ বানাতেন সুকুমার। "হয়তো কারো উপর রাগ হয়েছে অথচ তার শোধ নিতে পারছি না, তখন দাদা বলত 'আয়, রাগ বানাই।' বলেই সেই লোকটির সম্বন্ধে যা তা অদ্ভুত গল্প বানিয়ে বলতে আরম্ভ করত, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বলতাম। তার মধ্যে বিদ্বেষ কিংবা হিংস্রভাব কিছু থাকত না, সে ব্যক্তির কোনও অনিষ্ট চিন্তা থাকত না, শুধু মজার মজার কথা। যত রকম বোকামি হতে পারে সবকিছু সেই লোকটির সম্বন্ধে কল্পনা করে আমরা হেসে কুটিপাটি হতাম।"[১৪] চলচিত্তচঞ্চরিও সুকুমার রায়ের এমনই একটি রাগ-বানানোর দলিল। এবং পুণ্যলতার সাক্ষ্য মেনেও ভাবতে ইচ্ছে যায় এ-নাটকে যাদের নিয়ে রাগ বানানো হয়েছে তারা সুকুমারের চেনা লোকই হয়তো, তাই সব মজা তাঁর রাগকে চাপা দিতে পারে নি। পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'-য় সত্য যেমন প্রবল চেষ্টায় হাসিটাকে কান্নায় রূপান্তরিত ক'রে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিল, সুকুমারও তাঁর ক্রোধকে হাসিতে পাল্টে নিয়ে চলতে চেয়েছেন এ নাটকে। তবে তাঁর এ চেষ্টা যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এমন বলা যায় না। কেননা প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর রাগ ফুটে বেরিয়েছে। চলচিত্তচঞ্চরি সুকুমারের সবচাইতে ক্রুদ্ধ রচনা।

চলচিত্তচঞ্চরি নামটির সঙ্গেই সম্ভবত সুকুমারের কিছু ক্রোধের অনুষঙ্গ এসে যায়। একটি অসমাপ্ত রচনায় রয়েছে—

চলে চটপট চকিত চরণ, চোঁচা চম্পট নৃত্যে,
চলচিত্রিত চিরচিন্তন, চলে চঞ্চল চিত্তে।...
চলে চকমকি চোখের চাহনে, চঞ্চরী-চল-ছন্দ,
চলে চীৎকার চাবুক চালনে, চপেট চাপড়ে চণ্ড।[১৫]

চলচিত্তচঞ্চরি প্রভৃতি অনুপ্রাসের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই যেন চাবুক চালানো আর চণ্ড চাপড়ের কথা তাঁর মনে চলে এসেছে। এ চাবুক কথার চাবুক। তা তিনি তুলে দিয়েছেন ভবদুলালের সংলাপে। রাগের প্রমাণ রয়েছে প্রায় সারা নাটকটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সাম্যসিদ্ধান্ত সভার সদস্যদের সঙ্গে শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম থেকে প্রত্যাগত ভবদুলালের সংলাপ—

ভবদুলালঃ...এই তো সেদিন আমায় বলছিলেন ঈশান আর সত্যবাহন দুই সমান—এ বলে আমায় দেখ আর ও বলে আমায় দেখ। আরে দেখব আর কি? এরও যেমন কানকাটা খরগোসের মতন চেহারা, ওরও তেমনি হাঁ-করা বোয়াল মাছের মতন চেহারা। [চতুর্থ দৃশ্য]

একথা শ্রীখণ্ডদেবের না ভবদুলালের ? অবশ্যই ভবদুলালের। অন্তত শেষ দুটো লাইন ত বটেই। ভবদুলাল শুধু ঈশান ও সত্যবাহনকে কানকাটা খরগোস বা হাঁ-করা বোয়াল মাছ বলছে না, সোমপ্রকাশ নিকুঞ্জ জনার্দন কারুকেই ছাড়ছে না। ফলে সোমপ্রকাশ হলো 'কোলা ব্যাঙ', জনার্দন 'ছাগলা দাড়ি' এবং নিকুঞ্জ 'ডাবাহুঁকো'।

সত্যবাহন : কি! এত বড় আস্পর্ধা! আমায় কান-কাটা খরগোস বলে!

ভবদুলাল : না, না, আপনাকে তো তা বলেননি, আপনাকে বোয়াল মাছ বলেছে।

নিকুঞ্জ : কি অসভ্য ভাষা! আমায় কিছু বললে ?

ভবদুলাল : আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—তা, বললে, নিকুঞ্জ কোন্‌টা ? ঐ ছাগলা দাড়ি, না যার ডাবাহুঁকোর মতো মুখ.

নিকুঞ্জ : আপনি কি বললেন ?

ভবদুলাল : আমি বললাম ডাবাহুঁকো। [চতুর্থ দৃশ্য]

পাছে কেউ সন্দেহ ক'রে ভুল বোঝে তাই ভবদুলাল নির্দিষ্ট করে জানিয়েছে কে কোন্‌টা অর্থাৎ কাকে সে কী মনে করে! তাই টিপ্পনি হিসেবে জুড়ে দিয়েছে, 'আরে দেখব আর কি ?'

অন্যভাবেও ভবদুলালের রাগ প্রকাশ পেয়েছে। সদিকাশি হল্‌দিজ্বর যার হয়েছে তার না-ভুগে মরাই উচিত—এ সিদ্ধান্ত ভবদুলালের স্বরচিত সংগীতেই রয়েছে। ভবদুলালের নিজের লেখা দুটো গান নাটকে আছে—একটি হলো 'ও হরি-রামের খুড়ো' এবং অপরটি সমাপ্তিসংগীত 'সংসার কটাহ তলে।' দুটোতেই ধ্বংস ও মৃত্যুর কথা এসেছে। ঈশান অবশ্য ব্যঙ্গ না ধরতে পেরে মন্তব্য করেছে, 'হ্যাঁ যেরকম গান—একটু জোরজার না করলে মরবে কেন ?' [প্রথম দৃশ্য] এ কথায় ভবদুলাল অন্তত এটুকু 'মরাল সাপোর্ট' পেয়েছে যে একটু জোরাজুরি না করলে অবাঞ্ছিতের নিধন সম্ভব নয়। তাই

সংসার কটাহ তলে জ্বলে রে জ্বলে...

খেলে কাঁচা কচু জ্বলে চুলকানি, জ্বলে রে জ্বলে। [চতুর্থ দৃশ্য]

ভবদুলাল সাম্যসিদ্ধান্ত সভায় কাঁচা কচু হিসাবেই দেখা দিয়েছে। নির্বিচারে চালিয়ে গেছে তার সংহারকার্য।

সভা বা আশ্রম—দুজায়গাতেই মধ্যমণিদের কথার সূত্র ধরে যেসব ভবদুলালী তুলনা হাজির করা হয়েছে সেগুলোতে প্রায় সর্বদাই প্রহারের প্রসঙ্গ এসেছে এবং মনে হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়েই। তাই সেজোমামা গব্যঘৃতের কথা শুনে ছাতের সমান লাফ দিয়ে 'তেড়ে মারতে' আসে, পাটনায় শিক্ষকতাকালে ছাত্রদের 'পিটিয়ে' তার 'হাত টনটন, কাঁধে ব্যথা' হয় এবং দোষ না করেও শুধু নীরব থাকার অপরাধে বালক ভবদুলাল মাস্টারের 'মার' খায়। অর্থাৎ পরিস্থিতি অনুযায়ী নীরব থাকাটাও অপরাধ হতে পারে। জয়রামের মোষ 'গুঁতো মারলে' বোঝা যায় 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ'। 'চ' শব্দটি প্রায় চাবুকের মতো 'কেন্দ্রগতং নিবিশেষং চ'-কে গিয়ে আঘাত করে। এবং ভবদুলালের মনোভাব আরো বেশি স্পষ্ট হয় যখন সে জানায় শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম থেকে চলে আসার সময় সে একটি ছেলের কান মলে দিয়ে এসেছে। প্রয়োজন অনুসারে সে কান মলতেও পিছ-পা নয়।

অর্থাৎ ভবদুলাল আগাগোড়াই সচেতন। সে জানে সে কি করতে চাইছে। 'রূপকার' গোষ্ঠী যখন নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিল, তারা ভবদুলালকে অনেকটা 'আলাভোলা বাবাজির চেলা' হিসাবেই দেখেছিল। ভবদুলাল যা বলে বা করে যেন না জেনেবুঝেই করে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে ভণ্ডুল পাকিয়ে বসে। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়, বরং উল্টো। নাটকে ভবদুলালই একমাত্র আত্মসচেতন চরিত্র। দাশু সম্পর্কে স্বয়ং সুকুমার রায় যে-সন্দেহ জাগিয়ে তোলেন ('দাশু সত্যি সত্যি পাগল, না, কেবল মিচ্‌কেমি করে।'[১৬]) ভবদুলালও প্রায় একই ধরণের মন্তব্য ডেকে আনে যেন। নিতান্ত হাবাগোবা হলে সত্যবাহনের কথায় ভবদুলালের এমন প্রতিক্রিয়া হ'ত না :

সত্যবাহন : ব্যাপারটা কি জানেন, খণ্ড-সিদ্ধান্ত হচ্ছে যাকে বলে পৃথগ্‌-দর্শন।...এ নয়, ও নয়, তা নয়, সব আলগা, সব খণ্ড খণ্ড—এই সাধারণ ইতরলোকে যেমন মনে করে।

ভবদুলাল : (স্বগত) দেখলে! আমার দিকে তাকিয়ে বলছে সাধারণ ইতর লোক! [প্রথম দৃশ্য]

প্রখরভাবে সচেতন ও আত্মমর্যাদা-জ্ঞানসম্পন্ন না হলে ভবদুলাল এ উপলব্ধিতে পৌঁছোতে পারত না। পরিস্থিতিতে কোনো ধরণের ধোঁয়াটে ভাব রাখতে চান নি বলেই নাট্যকার এ সংলাপটিকে স্বগতোক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

আসলে সরলতা ও বোকামি ভবদুলালের ভান। এবং এখানেও সুকুমারের কিছু ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের আরোপ ঘটেছে। পুণ্যলতার স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় এক 'স্টাইলিশ' মাসী সুকুমার ও তাঁর ভাইবোনদের কায়দাদুরস্ত করে তুলতে চাইলে তিনি তাঁকে কিভাবে জব্দ করেছিলেন। "শেষটায় দাদা বিদ্রোহ করল। অত্যন্ত বোকার মত মুখ করে, হাঁ করে কুঁজো হয়ে এসে বসল, দুই হাতে মুঠো করে কাঁটা-চামচ খাড়া করে ধরে খটাখট শব্দে খেতে আরম্ভ করল, তাড়া খেয়ে অতি সন্তর্পণে কাঁটা চামচ ঠিক করে ধরতে গিয়ে 'কি যেন কি করে' হাত ফসকে চামচ-কাঁটা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে গেল। সোজা হয়ে বসতে বলাতে, চেয়ারের দুই হাতলে ভর করে আস্তে আস্তে কষ্টে সৃষ্টে খাড়া হওয়া মাত্রই হঠাৎ 'কেমন করে যেন' পিছলে শরীরটা সড়াৎ করে টেবিলের নীচে চলে গেল আর চিবুকটা ঠকাস করে টেবিলে ঠুকে গেল।—মাসী যতই ধমক ধামক করে, দাদা ততই হাঁদার মত মুখ করে ক্যালক্যাল করে তাকায়—"।[১৭] পুরো বর্ণনাটা চার্লি চ্যাপলিনকে মনে পড়িয়ে দেয়। "তিক্তবিরক্ত হয়ে মাসী আমাদের স্টাইলিশ করবার চেষ্টা ছেড়ে দিল"।[১৮]

ভবদুলালের প্রকৃতিগত মিল অবশ্য রয়েছে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে, চার্লি চ্যাপলিনের সঙ্গে নয়। চার্লি ঘটনা থেকে ক্রিয়া নিংড়ে আনেন, নাসিরুদ্দিন কথাকেই ক্রিয়া করে তোলেন। সুকুমারও কথাকে ক্রিয়ায় পরিণত করার কৌশল জানতেন। নাসিরুদ্দিনের গল্পের প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে। বইটির নাম 'টেলস অব দ্য খোজা'—অনুবাদ করেছিলেন মিসেস এউইং (Mrs Ewing)। এ বই সুকুমারের হাতে এসেছিল কিনা জানা নেই। তবে নাসিরুদ্দিনের অন্তত একটি গল্পের সঙ্গে সুকুমারের 'জীবনের হিসাব' কবিতার আশ্চর্য মিল রয়েছে। কবিতাটি 'সন্দেশ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল ১৩২৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় (১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। এ গল্পটি প্রায় হুবহু পাওয়া যায় ইদ্রিশ শাহ পরিবেশিত মোল্লার গল্পে।[১৯] অবশ্য একটি ফরাসী লোককথাতেও এ গল্পের হদিশ মেলে।[২০] মোল্লার ভাণ্ডার থেকে তা ফরাসী লোককথায় আশ্রয় পেয়েছিল কিনা তা অবশ্য বলা যায় না।

মোল্লার আপাতনিরীহ গল্পগুলোও ভবদুলালের মতোই ব্যঙ্গমুখর। নানালোকে সে গল্পের নানা অর্থ করতে পারে তবে শেষ অর্থখানি সরাসরি নির্ভুলভাবে লক্ষ্যে গিয়ে বেঁধে। নাসিরুদ্দিনের অন্তত দুটি গল্পের কথা এখানে উল্লেখ করা যায় যা অবিকল ভবদুলালী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। নাটকে দেখা যায়, অনেক সময়েই তথাকথিত গম্ভীর বিষয় নিয়ে ঘোর আলোচনা চলার মধ্যে চলতি প্রসঙ্গকে আঁকড়ে ধরে ভবদুলাল কোনো পুরোনো অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যাপারটার মাত্রা পাল্টে যায়, সমস্ত গম্ভীর পরিস্থিতি এক লহমায় হাস্যকর ও অকিঞ্চিৎকর বলে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। সেজোমামা-গব্যঘৃত প্রসঙ্গ, জয়রামের ঘোষ প্রভৃতি যে-কোনো মন্তব্য একথা প্রমাণ করে। ব্যাপারটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে ঈশানের 'সমীক্ষা সাধন' চলার সময়ে। 'সমীক্ষাচক্র' থেকে ঈশান জানায় কিভাবে সৃষ্টিতে ভেজাল পড়ছে। তখন

> ভবদুলাল : আপনি চলে আসার পর আমি দেখলাম সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে, সেই ভেজাল ক্রমাগত ঠেলে উপর দিকে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না আর গুমরে গুমরে কেঁপে উঠছে। আর কে যেন ফিস-ফিস করে বলছে—শেক দি বট্‌ল্‌, শেক দি বট্‌ল্‌। [দ্বিতীয় দৃশ্য]

ভবদুলাল শুধু এখানেই থেমে থাকে না, এর পরেই প্রসঙ্গ টেনে সে ছেলেবেলার বেড়ালে (না কি, সজারু) কামড়ানোর গল্প ফেঁদে বসে। ক্রুব্ধ ঈশান সমীক্ষাচক্র ছেড়ে চলে যেতে চাইলে—

> ভবদুলাল : আর একটু শুনে যান—গল্পটা ভারি মজার।
> ঈশান : দেখুন, এটা হাসবার এবং গল্প করবার জায়গা নয়।
> ভবদুলাল : তাই নাকি? তবে আপনি যে এতক্ষণ গল্প করছিলেন? [দ্বিতীয় দৃশ্য]

ঈশান গল্প করছিল কিনা সে অন্য কথা, কিন্তু ভবদুলাল যে গল্প বলেই পরিবেশের গাম্ভীর্য গুলিয়ে দিতে চায় সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। 'সমীক্ষাচক্র'কে গল্পবলার আসর বলে ধরে নেওয়ার মধ্যেই তার নষ্টামি বুদ্ধির পরিচয় মেলে। নাসিরুদ্দিনও প্রায় একইভাবে সরাইখানায় আত্মকথনের আসরে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। গল্পটি পুরোটাই তুলে দেওয়ার যোগ্য :

যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকরা সরাইখানায় বসে নিজেদের বীরত্বের গল্প বলছে। একজন বলল, 'তলোয়ার দিয়ে কত শত্রু যে

ঘায়েল করেছি তার আর লেখাজোকা নেই।' অন্যরাও একই ধরণের বাহাদুরির গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। নাসিরুদ্দিন তখন বললেন, 'আমিও একবার লড়াইতে তলোয়ারের এক কোপে ঘ্যাচাং করে এক ব্যাটার ঠ্যাং কেটে দিয়েছিলাম।' একজন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আরে তুমি ঠ্যাং কাটতে গেলে কেন? মুণ্ডুটা কাটলেই তো পারতে?' 'মুণ্ডু থাকলে তো কাটব', নাসিরুদ্দিনের জবাব, 'সেটা তো আগেই কেউ কেটে নিয়ে গিয়েছিল।'

নাসিরুদ্দিনের শেষ সংলাপটি নিমেষের মধ্যে সব কিছুর মাত্রা পাল্টে দেয়। যুদ্ধ, বীরত্ব প্রভৃতি জগৎসংসারের ব্যাপারগুলি তুচ্ছ ও হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়। নাসিরুদ্দিন শুধু যে সমবেত সৈনিকদের ব্যঙ্গ করছে তা নয়, যে-কোনো যুদ্ধের গাম্ভীর্যকেও অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করে দিচ্ছে। ভারতীয় যোগীর কাহিনীটিও একই ধরণের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেছে। 'ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের সেবাই তার ধর্ম'—যোগীর এ উপলব্ধিকে সমর্থন করে নাসিরুদ্দিন জানায় কিভাবে ঈশ্বর-সৃষ্ট একটি মৎস্য একবার তার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। বিমুগ্ধ যোগীর আগ্রহে গল্পটি ব্যাখ্যা ক'রে নাসিরুদ্দিন জানালেন, 'একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বড়শীতে একটি মাছ ওঠে, আমি সেটি ভেজে খাই।'[২১] অহিংসা, জীবে দয়া, সমপ্রাণতা প্রভৃতি গালভরা বুলি—যা অহরহ প্রচারিত হয় কিন্তু কেউ মানে না—এককথায় যেন নস্যাৎ হয়ে গেল।

ভবদুলালও প্রায় একই কায়দায় সভাসমিতি, আশ্রমবাসী সমীক্ষাচক্রের সভ্যদের মধ্যে বিধ্বংসী কাণ্ডকারখানা চালিয়ে গেছে অবলীলায়, অকুতোভয়ে। সাম্যসিদ্ধান্ত সভার নাজেহাল সদস্যরা অবশেষে ক্ষিপ্ত হয়েছে, ভবদুলালকে প্রায় শরীরী আক্রমণেও কুণ্ঠিত হয় নি তারা। তাদের সমবেত হামলায় চলচিত্তচঞ্চরির পাতাগুলো লুণ্ঠিত ও ছিন্ন হয়েছে। এ সব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধেও ভবদুলাল কিন্তু অদম্যই থেকে গেছে। তার অকুণ্ঠিত ঘোষণা,

> ভবদুলাল ঃ খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তা কি হয়েছে। আবার লিখব—চলচিত্তচঞ্চরি—লাল রঙের মলাট—চামড়া দিয়ে বাঁধানো। তার উপরে বড়-বড় করে সোনার জলে লেখা—চলচিত্তচঞ্চরি—পাবলিশড্ বাই ভবদুলাল। [চতুর্থ দৃশ্য]

খেয়াল রাখতে হবে, সুকুমার নিজের লেখাটির নামও দিয়েছেন—চলচিত্তচঞ্চরি। অর্থাৎ যেন জানিয়ে দিতে চান কেউ যদি তাঁর রচনার উপরও হামলা করে তাহলেও তিনি দমে যাবেন না। সত্যবাহন ঈশানের মতো আত্মসর্বস্ব অহংকারী মানুষগুলোকে ব্যঙ্গ করা থেকে কেউ তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারবে না।

বোধ করি, এটাই সুকুমার রায়ের চ্যালেঞ্জ।

১। বিচিত্রা' শ্রাবণ, ১৩৩৪ সাল

১৬। সুকুমার রায় সমগ্র রচনাবলী ২য় খণ্ড/ধশিং। পাবলিশিং কোম্পানী [অক্টোবর ১৯৭০] পৃষ্ঠা ১৭২

৩। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অবশ্য স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, চলচিত্তচঞ্চরি লেখা হয়েছিল সুকুমার রায়ের বিলেত যাওয়ার আগে অর্থাৎ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের আগে [দ্র বৈজ্ঞানিক, বৈশাখ ১৩৭২]। এ তথ্য সঠিক বলে মনে হয় না। কেননা ঐ লেখার অন্যত্রও স্মৃতিবিভ্রমের প্রমাণ আছে।

৪। 'Societies, learned and literary—associations of individuals with a common professional interest, intended to promote learning. The Columbia Encyclopaedia, Vol 1.

৬। বঙ্কিম-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড/সাহিত্য সংসদ, ফাল্গুন ১৩৬৬/পৃ: ৮৪৫-৪৬

৭। 'It seems necessary that a society should be established, with the declared object of putting down societies. Its name should be Sabha Nibarani Sabha or a society for preventing the foundation of societies, and its members should find themselves to rush with arms and sticks into all places where members of any society meet and disperse them by force'. Shivanath Sastri : Men I have seen, 1919.

৮। দ্রষ্টব্য, সুশোভন সরকার—রবীন্দ্রনাথ। কিছু স্মৃতি, দেশ, ২৪ এপ্রিল ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১১

৯, ১০, ১১, ১২, ১৫। সুকুমার রায় : বর্ণমালা তত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৬৩, পৃ: ৬০-৬৩, ১৩

১৩। সুকুমার রায় : The Burden of the Common Man, তদেব, পৃষ্ঠা ১১১—১২০

১৪, ১৭, ১৮। পুণ্যলতা চক্রবর্তী। ছেলেবেলার দিনগুলি, নিউস্ক্রিপ্ট, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃষ্ঠা ৫৫, ৮২

১৯। Idries Shah : The Sufis/Doubleday & Company, New York 1964/p.58

২০। Henry Pourrat : A Treasury of French Tales/George Allen & Unwin Ltd. London/p 55-57 ; গল্পটির নাম The Tale of the Learned Man and the Boatman.

২১। সত্যজিৎ রায় : মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প, সেরা সন্দেশ : সম্পাদক, সত্যজিৎ রায়, পৌষ ১৩৮৮, পৃষ্ঠা ১২০

স্মৃতিচারণ ঃ সুশোভন সরকার

সাক্ষাৎকারটি ৮.৭.৮২ তারিখে গৃহীত হয়। ২৫.৭.৮২ তারিখে সুশোভন সরকার এটি সংশোধন ও অনুমোদন করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, মুদ্রিত আকারে এটি দেখে যেতে পারলেন না তিনি।

প্রস্তুতিপর্ব ঃ সুকুমার রায়কে খুব কাছ থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল যাঁদের, আপনি তাঁদের অন্যতম। আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, সুকুমার রায় মানুষটি কেমন ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব ?

সুশোভন সরকার ঃ ছাত্রদের নিয়ে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটা সংগঠন ছিল—'ছাত্র সমাজ'। তাতাদা ছিলেন তার মধ্যমণি। আমরা ছিলাম তাঁর চেলা। তাতাদা আসলে খুবই serious প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। নিছক 'মজার লোক' বলতে যা বোঝায় তিনি তা ছিলেন না। 'ছাত্র সমাজ'-কে reform করবার জন্য তাতাদা উঠেপড়ে লেগেছিলেন। তখন সমাজের কর্তব্যবিধির মধ্যে সবই ছিল 'না'—থিয়েটার দেখবে 'না', সিগারেট খাবে 'না'—এমনি আরো কত 'না', সব এখন মনেও নেই। তাতাদা আন্দোলন শুরু করে দিলেন—কী কী করব 'না', সে তো বুঝলাম, করব কী কী ? তিনি একটা positive programme দিলেন—সাংস্কৃতিক, সমাজসেবামূলক ইত্যাদি কাজের।

তাতাদা তো খুব গম্ভীর লোক ছিলেন, নিজের মজার মজার লেখাগুলোও খুব গম্ভীর হয়ে পড়তে পারতেন। তাতে যেন মজাটা আরো বাড়ত।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে, সমাজের আদর্শের সঙ্গে তিনি নিজেকে একেবারে জড়িয়ে রেখেছিলেন। ওটা তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

প্রস্তুতিপর্ব ঃ কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে ওঁর ধারণা যে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়েছিল তার কিছু কিছু প্রমাণ এখন পাওয়া যাচ্ছে। যেমন, ১৯২০'র ২৩শে আগস্ট প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা একটি আট পাতা জোড়া চিঠিতে উনি খুব তীব্র, আবেগময় ভাষায় বলেছেন, এই যে আনন্দের, অমৃতের কথা সর্বদা বলা হচ্ছে, চারপাশে তাকিয়ে এসব কথার কোনো বাস্তব তাৎপর্য তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি বলেছেন যে এই যুগের মানুষের "আশার প্রদীপ নির্বাপিত" হয়ে গেছে, তারা "আশা করতে জানেনা।" তিনি একটা "rampant, morbid pessimism"-এ আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সমস্ত "cherished illusions" ভেঙে পড়ছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, সুকুমার রায় বলছেন যে এই ভাবনা তাঁর "নতুন নয়, অল্পবয়স থেকেই এ চিন্তা রয়েছে"।

শুধু তাই নয়, সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে সুকুমারের ব্যক্তিগত ডায়েরী—'হিজিবিজি খাতা'—দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের। তাতেও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কাজকর্ম সম্পর্কে

তাঁর তীব্র মোহভঙ্গের কথা রয়েছে। এক জায়গায় বলছেন, "ideal obscured by false analogies".

এর থেকে কিন্তু সুকুমার রায়ের একেবারে অন্য একটা চেহারা বেরিয়ে আসছে।

সুশোভন সরকার ঃ চিঠিটার কথা আমি সম্প্রতি শুনেছি। ওটা কী উপলক্ষ্যে লেখা?

প্রস্তুতিপর্ব ঃ রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের honorary member হিসেবে নির্বাচন করা নিয়ে।

সুশোভন সরকার ঃ ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সমাজে ঐ ঘটনাটা নিয়ে প্রচণ্ড তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ আবার ভাঙে আর কী। তখন বয়স্কদের আর তরুণদের দুটো গোষ্ঠী হয়ে গিয়েছিল। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, নবদ্বীপচন্দ্র দাস এঁরা সব ছিলেন বয়স্কদের দলে। আর তাতাদা, প্রশান্তচন্দ্র মহলানাবিশ এঁরা ছিলেন তরুণ দলের নেতা। তরুণদের পক্ষ থেকে সাধারণত প্রস্তাব উত্থাপন করতেন তাতাদা, আর তাঁকে সমর্থন করতেন প্রশান্তচন্দ্র। বয়স্ক দলের সঙ্গে এঁদের এমনই বিরোধ, যে যে-প্রস্তাবই তাঁরা আনুন, বয়স্কদের পক্ষ কোনো না কোনো একটু technical ফ্যাকড়া তুলে তাকে out of order ক'রে দেন। তরুণদল প্রস্তাব করলেন যে রবীন্দ্রনাথকে সমাজের honorary member করা হোক। বয়স্করা এর তীব্র বিরোধিতা করলেন। তাঁরা তো রবীন্দ্রনাথকে ব্রাহ্ম বলে মনে করতেন না। প্রশান্তচন্দ্র 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' বলে এক পুস্তিকা লিখলেন। তাতে একটা liberal humanist অবস্থান থেকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগস্থাপনের উপকারিতা প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা একটা deadlock-এ পৌঁছে গেল। Split প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াল। ১৯২১-এর জানুয়ারীতে তাতাদার নেতৃত্বে তরুণদল স্থির করেন যে সমাজের মাঘোৎসবে তাঁরা যোগ দেবেন না, আলাদা উৎসব করবেন। আমার মনে আছে, প্রশান্তচন্দ্রের ঘরে আমরা ক'জন বসে আছি, এমন সময় ঢুকলেন কৃষ্ণকুমার মিত্র। বললেন, "কী আলোচনা করছ?" আমাদের spokesman তাতাদা বললেন, "আপনাদের অন্যায়ের প্রতিবাদে কী করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা করছি।" কৃষ্ণকুমার বললেন, "এসব ক'রে কী হবে? তোমরাই দায়িত্ব নাও, আমরা সরে যাচ্ছি।" তাতাদা বলে উঠলেন, "আগে আপনাদের অন্যায়গুলো withdraw করুন, তারপর সকলে মিলে স্থির করা যাবে কী করা হবে।" কৃষ্ণকুমার তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "শুনছি তোমরা নাকি আলাদা উৎসব করার কথা ভাবছ?" তাতাদা জবাব দিলেন ঃ "হ্যাঁ, আলাদা উৎসব করব।"

এবং সত্যি সত্যিই আলাদা উৎসব শুরু হয়েছিল। হয়েছিল প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরীর বাড়ির ছাদে।

অবস্থাটা এইরকম জায়গায় এসে যখন দাঁড়িয়ে গেল, তখন সমাজের eminent lawyer-রা compromise formula দিলেন যে একটা referendum হোক। শেষ পর্যন্ত compromise একটা হয়েছিল।

এই তিক্ততার ব্যাপারটা চলেছিল অনেকদিন ধরে। তাতাদাকে এটা নিশ্চয়ই ভেতরে ভেতরে খুবই আঘাত দিয়ে থাকবে। কারণ তাতাদা ছিলেন sentimental, প্রশান্তচন্দ্রের মতো কাটা-কাটা কথার মানুষ নয়। কাজেই এইরকম একটা তিক্ততার পরিস্থিতিতে তাতাদার মতো লোকের পক্ষে ঐরকম চিঠি লেখা খুবই সম্ভব।

চিঠিটা তো বলছ ১৯২০'র আগস্টে লেখা। তার প্রায় ৮/৯ মাস পরে, ১৯২১'র মে'র শেষে আমি B.A. পাশ করে দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েছি। তখন তাতাদার ঘরে স্যানিট্যারিয়ামে সাত দিন কাটিয়েছিলাম। তাতাদা তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সেই কারণেই বোধহয় দার্জিলিং গিয়েছিলেন। সাত দিন পর আমি অবশ্য অন্য সস্তা ঘরে উঠে যাই। যাহোক, সেইসময় খুব আড্ডা মেরেছি। তখন কিন্তু তাঁর মনের এইসব তিক্ততার এতটুকুও আভাস পাইনি। ঐ সময়েই মনে আছে একদিন তাতাদা শোনালেন তাঁর নতুন কবিতা—বাবুরাম সাপুড়ে।

প্রস্তুতিপর্ব ঃ সুকুমার রায়ের যে 'ননসেন্স', তার মধ্যে সমসাময়িক বাস্তবের তির্যক আভাস একেবারেই নেই বলে কি মনে হয় আপনার? যেমন এই 'বাবুরাম সাপুড়ে' কবিতায়, তখনকার রাজনৈতিক ঘটনাবলীর কোনো প্রতিফলন?

সুশোভন সরকার ঃ সেভাবে ভাবতে চাইলে ভাবতে পারো। তবে আমি তাতাদার কাছে কখনো রাজনৈতিক বিষয়ের কোনো

আলোচনা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া তখন ঐসব ব্যাপারে আমার নিজেরও তো কোনো আগ্রহ ছিল না।

তবে, নানান সামাজিক ব্যাপারের প্রতি ব্যঙ্গ তো তাতাদার লেখায় থাকতই। 'চলচিত্তচঞ্চরী' নাট্যকের কথা মনে পড়ছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মূল সংগঠনের পাশাপাশি কয়েকটি 'fraternity' তৈরী হয়েছিল —যেমন, Educational Fraternity, Social Fraternity, Literary Fraternity। উদ্দেশ্য ছিল, ব্রাহ্মসমাজের বাইরে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কাছাকাছি যাঁরা আছেন, তাঁদের involve করানো। একবার আমরা স্থির করলাম Fraternity-তে নাটক করব। তাতাদাকে বললাম। তাতাদা গম্ভীরমুখে পাণ্ডুলিপি থেকে পড়ে শোনালেন নাটক। পাণ্ডুলিপি থেকে খাতায় কপি করে নিয়েছিলাম, মনে আছে। এই 'চলচিত্তচঞ্চরী' নাটকে তো ধরো ব্রাহ্মসমাজের ভেতরকার জ্ঞানমার্গ বনাম ভক্তিমার্গের যে বিরোধ তার reflection রয়েছে। আর শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রম হয়তো শান্তিনিকেতনের গুরুভজা আশ্রমের প্যারডি। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন।

প্রস্তুতিপর্ব : Burden of the Common Man—প্রবন্ধে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ সম্পর্কে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এক ধরণের সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। সুকুমার রায়ের এই দিকটা সম্পর্কে আপনার কিছু মনে পড়ে ?

সুশোভন সরকার : Burden of the Common Man উনি পড়েন ছাত্র-সমাজের একটি সভায়। আমি ছিলাম সেখানে। তার মধ্যে একটা লাইন মনে পড়ছে : Blessed is the Common Man ..

না, এটা তাতাদার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বলে আমরা মনে করিনি। এটা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই tradition—'সাধারণ' কথাটার মধ্যেই সেই ইংগিতটা আছে। আমরা মনে করতাম, ব্রাহ্ম আন্দোলনের অন্যান্য ধারার সঙ্গে ঐখানেই আমাদের তফাৎ। 'তত্ত্বকৌমুদী'র মাথায় শাস্ত্রীমশাইয়ের সেই "মহাসাধারণতন্ত্রে"র কথা আদর্শ হিসেবে ছাপা হতো।

প্রস্তুতিপর্ব : ১৮৭১ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী যে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছিলেন, যার আদর্শ ছিল "অন্যায়ের উপর ন্যায়ের, অসাম্যের উপর সাম্যের, রাজশক্তির উপর প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠা দ্বারা পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।"—কথাটা কি তার থেকেই নেওয়া ?

সুশোভন সরকার : আমার মনে হচ্ছে সেযুগে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকার উপরে কতকগুলি সংকল্প ছাপা হত, তার মধ্যে ছিল "পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা"র কথা।

শুভ্র ঘোষ

সুকুমার রায়ের ব্রাহ্মমত

বাহ্যিক পরিচয়ে উৎসাহী ব্রাহ্ম হলেও কোনো সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে সুকুমারের মন বাঁধা পড়েনি। এদিক থেকে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুগামী। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সংকীর্ণতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন শূন্যগর্ভ শব্দনির্ভর আদর্শের নিরর্থকতার প্রতি। সম্প্রতি-আবিষ্কৃত একটি চিঠিতে এবং তাঁর ডায়েরীর পাতায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভিতরে ভিতরে এক কঠিন যন্ত্রণা তাঁকে কাতর করতে থাকলেও বাইরের চেহারায়, পরিচিতিতে সুকুমার রায় আজীবন একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম ছিলেন, একথাই আমরা জানি। আশৈশব ব্রাহ্ম পরিবেশে লালিত সুকুমারের ব্রাহ্ম পরিচয় এতোটাই বিস্তৃত ছিল যে হিরণকুমার সান্যাল তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, "...অন্য একটি ক্ষেত্রে সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্ব যেন আরো বেশি করে প্রকট হয়েছিল ও আমাদের আশ্চর্যভাবে স্পর্শ করেছিল। ওঁকে আরো বেশি করে 'আরো বড় ক'রে' পেলাম। সেই ক্ষেত্রটি হ'ল ব্রাহ্মসমাজ" (পরিচয়ের কুড়ি বছর, পৃঃ ১৬৬)। হিরণকুমারের সাক্ষ্যে 'আরো বড় করে পাওয়া'র এই কথাটি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কৈশোরে পারিবারিক গণ্ডিতে 'নন্‌সেন্স ক্লাব' আর পরবর্তী জীবনে 'মণ্ডে ক্লাব'-এর পরিবেশেই আমরা সুকুমারকে বেশি করে চিনেছি, সুকুমার রায়ের ব্যক্তিত্বকে ধরবার চেষ্টা করেছি। হাস্য-পরিহাসময় পরিবেশে কৌতুকবোধের দীপ্তিতে সুকুমারের জীবনবোধ ও শিল্পচেতনার সন্ধানও করতে চেয়েছি, কিন্তু ব্রাহ্ম সুকুমার রায়কে নিয়ে তেমন কি ভাবতে চাই আমরা? অথচ হিরণকুমারেরা সুকুমারকে পেয়েছিলেন তাঁদের সমাজে নেতা হিসাবেই, যে-যুবসমাজ ব্রাহ্মসমাজের আঙিনায় গড়ে উঠেছিল।

ছাত্র-যুবদের জন্য বহুকাল আগেই গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মদের 'ছাত্রসমাজ' শিবনাথ শাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। উদ্দেশ্য ছিল নানান কাজেকর্মে, সমাজসেবায় ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদের নৈতিক চরিত্রকে সজীব রাখা। ছাত্রবয়স থেকে সুকুমারও ছিলেন এই ছাত্রসমাজের সভ্য আর স্বভাবগুণে ক্রমে হয়ে উঠেছিলেন তারই অগ্রগণ্য নেতা। সমসাময়িক বন্ধুরাও তাঁর চরিত্রের মাধুর্য ও ঔদার্যে তাঁর স্বাভাবিক নেতৃত্বকে মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। 'ছাত্রসমাজে'র নিয়মকানুন-আদবকায়দায় বেশ কিছু সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন সুকুমারেরা, এ নিয়ে যথেষ্ট আন্দোলনের সূচনাও হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজে। স্বভাবতই সবসময়েই তরুণদের সব দাবি মেনে নিতে পারেন নি সমাজের প্রবীণ নেতারা। এ-সবের সূত্র ধরে সমাজের বড়োদের সঙ্গে যুবসমাজের তিক্ততাও তৈরী হয়েছে বেশ কয়েকবারই। যদিও স্নিগ্ধ, সদালাপী সুকুমারের আশ্চর্য ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ বড়োরাও অনুভব করতেন। ঘটনার বা বাদবিসংবাদের তিক্ততা সুকুমারের প্রতি আকর্ষণ কমাতে পারত না।

সুকুমার রায় ছাত্রসমাজের উৎসাহী নেতা তো ছিলেনই, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে তুলেছিলেন আরেক 'যুবসমাজ'। সেই যুবসমাজ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় তৎপর হয়েছিল, শিল্প-ছন্দ-সুষমায় সমাজের আদর্শকে বাঁধতে চেয়েছিল নতুন ক'রে। পেরেছিলেন কতটুকু সেটা বিচার-বিবেচনার বিষয় হতে পারে, কিন্তু স্বল্পায়ু জীবনে সুকুমার যে চেষ্টায় মেতেছিলেন নিরন্তর, তার প্রমাণ অজস্র। সাহিত্যের আড্ডা, আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা, সঙ্গীতচর্চা ছাড়া সমসাময়িক সামাজিক সাংস্কৃতিক নানান সমস্যার আলোচনায় যেমন এই সমিতির সভ্যরা ছিলেন মুখর, তেমনি সমাজের নানান ব্যবস্থাদির সংস্কার সাধনেও এঁরা ছিলেন তৎপর। যুবসমাজের উদ্যোগে হয়েছিল কয়েকটি ফ্রেটারনিটি—এডুকেশনাল, ডিভোশনাল, সোস্যাল, লিটারেরি।

সুকুমারের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মরা 'ছাত্রসমাজে'র নিয়মকানুনগুলি সংস্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯১৮-এর মাঝামাঝি সময়ে তৈরী হয়েছিল Admission Form Revision কমিটি। সুকুমার এই কমিটির একজন ডেলিগেট বা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের রীতিনীতিতে, ভাবাদর্শে যে প্রাচীনতার, স্থবিরতার ছাপ অনুভব করতেন সুকুমারেরা, বিদ্রোহ ছিল মূলত তারই বিরুদ্ধে। সমাজের দৈনন্দিন কাজকর্মে, প্রবীণদের চিন্তাদর্শে প্রায়ই টের পাওয়া যেত এসব স্থবিরতা। একটা নিদর্শন দেওয়া যাক্। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী' তে একজন প্রবীণ সমাজপতি একটি চিঠিতে অভিযোগ জানিয়েছিলেন একবার, "যে সকল ব্রাহ্ম রঙ্গালয়ে গমন করেন, তাঁহারা তাঁহাদের অব্রাহ্মোচিত ব্যবহারের সমর্থন জন্য এক নূতন যুক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অভিনয় এক সুকুমার বিদ্যা, যে স্থানে এই বিদ্যার চর্চা হয়, সে স্থানে গমন করিলে কি পাপ হয়? বিদ্যার চর্চা ও অনুশীলন কি পাপ?

"ইঁহারা একটা তত্ত্ব একেবারেই ভুলিয়া যান; সব কলার শ্রেষ্ঠ কলা যে নীতি, সব বিদ্যারই একমাত্র লক্ষ্য যে পবিত্র জীবনলাভ, গীতিকলার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগবশতঃ এ চিন্তা তাঁহাদের মনে উদিত হয় না, অথবা উদিত হইলেও তাঁহারা উহা উপেক্ষা করেন। এ চিন্তার উদয় হইলে অন্তরের বিবেকের নিষেধবাণী অবশ্যই শুনা যায়, এবং তাহা হইলে আর রঙ্গালয়ে যাইয়া বারাঙ্গনা বিলাস দর্শন করিয়া কলাদর্শন-পিপাসা চরিতার্থ করা সম্ভব হয় না।..." (অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৯২০, ৩০ মে)। এর সঙ্গে তুলনা করা যাক সুকুমার রায়ের জীবনের এই ঘটনাটির। লীলা মজুমদার লিখেছেন, "তখন নতুন চলচ্চিত্র হয়েছে, অবিশ্যি নির্বাক ছবি, তারো অনেক বিরোধী। সুকুমারদের একজন শিক্ষক বায়োস্কোপের নিন্দা করাতে, সে আপত্তি জানিয়ে বলেছিল যে সব ছবি তো মন্দ হয় না, ভালো ছবিও হয়। এক রকম জোর করেই তাঁকে 'লে মিজারাবল' দেখিয়ে ছাত্র শিক্ষকমহাশয়ের মত বদলিয়ে দিয়েছিল" (সুকুমার রায়, পৃঃ ১৯)।

বস্তুত গন্ডিবদ্ধ ব্রাহ্মসমাজের শুচিতা বজায় রাখার জন্য ব্যস্ত সমাজসেবীরা যেন আরেক সংকীর্ণতার পথ খুঁড়ে চলেছিলেন। ধর্ম আচার-শাসনের কূপমণ্ডূকতা নয়, নিস্তরঙ্গ জীবনবোধও নয়, জীবনকে উপভোগ করার সানন্দ মাধ্যম। ধর্ম জীবনের ব্যাপ্তি ঘটায়, প্রসারিত করে মানুষের রুচিবোধ, তার দৃষ্টিভঙ্গি।—প্রতিদিনের সমাজে বক্তৃতা-উপাসনায় এসব কথার ফুলঝুরি থাকলেও সুকুমারেরা বুঝতে পারছিলেন যে বাস্তবিক জীবনচর্যায় সেসব আদর্শের তেমন কোন প্রতিফলন ঘটছে না। আর তাই ছাত্রসমাজের সভ্যপদ পাওয়ার সময় 'মদ খাব না, সিগারেট খাব না, পাবলিক থিয়েটারে যাব না'—এ-জাতীয় শপথ গ্রহণে 'অ্যাডমিশন রিফর্ম কমিটি'র ডেলিগেট সুকুমার রায় দেখেছিলেন কেবল নঞর্থক মনোভাব। জানতে চেয়েছিলেন 'কী কী করব' সেকথা কেন বলা হয় না।

সুকুমার রায় সর্বার্থেই আধুনিকতার পরিপোষক। তাঁর শিল্পবোধে, সাহিত্যসৃষ্টিতে যেমন তা স্পষ্ট, তাঁর ধর্মবিশ্বাসের জগতেও তা প্রতিফলিত। 'আধুনিকতা' শব্দটি এখানে কী অর্থে ব্যবহৃত হ'ল তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে। কেবল রঙ্গালয়ে শিল্প উপভোগ করার অধিকারটুকু আদায় করতে পারলেই বোধহয় আধুনিক হয়ে ওঠা যায় না, শুদ্ধশিল্পের রস ভোগ করতে গেলে যে মানসিকতার বিকাশসাধন প্রয়োজন, যুগের সঙ্গে তাল রেখে যে অভ্যাসগুলি গড়ে তোলা প্রয়োজন তারই সীমিত অর্থে আধুনিক হয়ে ওঠা বলা যেতে পারে আপাতত। সুকুমার যে তাঁর সময়ের সঙ্গে, যুগবোধের সঙ্গে

নিজেকে খাপ খাওয়াতে চেয়েছিলেন তার আভাস যেমন তাঁর রচনায় দৃষ্ট, তেমনি প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাটো অনেক ঘটনাতেও তার অজস্র প্রমাণ। প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্র একবার সুকুমারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার জীবনের আদর্শ কি? সুকুমার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন, 'সিরিয়স ইণ্টারেস্ট ইন্ লাইফ'।

এই 'সিরিয়স ইণ্টারেস্ট ইন্ লাইফ'-এর সন্ধান করেছিলেন সুকুমার রায় ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস ও কাজের মধ্যেও। ছাত্রসমাজ ও যুব সমাজের আন্দোলনের মধ্যে সেই ধারণাই অব্যাহত দেখতে পাওয়া যায়। ছাত্রসমাজে এক প্রাতঃকালীন উপাসনায় সুকুমার তরুণ সতীর্থদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "...মানুষের আদর্শ ও সাধনা কেমন করিয়া যুগে যুগে আপনাকে নূতনতর বিচিত্রতর রূপে অন্বেষণ করে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের পত্রে পত্রে তাহার সাক্ষ্য বর্তমান।... আজ মনে হয়, যেন ব্রাহ্মসমাজের নূতন যুগসন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। মনে হয়, এ যুগ 'সে যুগে' পরিণত হইতে চলিয়াছে, মনে হয় বিদায়োন্মুখ যুগের পশ্চাতে সহস্র প্রশ্নভারাক্রান্ত কি এক নূতন যুগ আসন্নপ্রায়। মনে হয়, যে নবীনতার উৎস একদিন ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবনী সুধাসিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল, নবযুগের আবেষ্টনের মধ্যে আবার তাহাকে নূতন করিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে। মনে হয়, জীবনের মধ্যে সে উৎসকে খুঁজিয়া পাইতেছি না। মনে হয়, দশজনের জীবনের সংগ্রাম ও শুষ্কতা, দশজনের অতৃপ্তি ও নিরাশা, যদি ব্যাকুলভাবে তাহার প্রয়াসী হয়, বুঝি সে প্রার্থনার মধ্যে তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না।

"যে যুবক, যাহার বয়স অপরিণত, জীবন যাহার সম্মুখে —তাহার ধর্ম্ম এক কথায়, এই যুগের ধর্ম্ম, বর্তমানতার ধর্ম্ম" ('যুবকের জগৎ', তত্ত্বকৌমুদী—২৯ এপ্রিল, ১৯১৭)।

শুষ্ক, গতিহীন, বৈচিত্র্যহীন জড় জীবনের প্রতি আসক্তি যে সুকুমারের কখনই ছিল না তা 'বর্তমানতার ধর্ম', 'যুগের ধর্মে'র প্রতি তাঁর অবিচল আস্থাই বারবার জানিয়ে দেয়। ভারতের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ব্রাহ্মআন্দোলনের মূল শক্তি 'আপনাকে নূতনতর বিচিত্রতর রূপে অন্বেষণের' মধ্যেই নিহিত—একথা সুকুমার খুব গভীরভাবেই বোঝার চেষ্টা করেছিলেন। আর সেই কারণেই বর্তমানতার, জীবনের গতিশীলতার, বাধাবন্ধহীন মুক্তবুদ্ধির কথা বারবার সুকুমারের চিন্তায় স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। 'দেবেন দেয়ম' কিংবা 'চিরন্তন প্রশ্ন'-জাতীয় অন্যান্য মননশীল প্রবন্ধগুলিতেও সুকুমারের এই অন্বেষণের পরিচয়ই আমরা পাই। 'তন্ত্র-তন্ত্রের জুজু', 'মিথ্যা দৈবের অন্ধসংস্কার'-এর শাসনে যেভাবে আমাদের সমাজ বাঁধা তার থেকে মুক্তি না ঘটলে যে এদেশের সব আন্দোলনই মিথ্যা, সুকুমার তা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। আর সত্যান্বেষণ ও আত্মজিজ্ঞাসার সূত্র খুঁজতে গিয়ে 'চিরন্তন প্রশ্ন' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "কোথায় অন্বেষণ করিব? কিসের অন্বেষণ করিব? অন্বেষণ তো নিরন্তরই চলিয়াছে কিন্তু আমাদের অন্বেষণ মূল প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে কই? বাস্তবিক আমাদের অন্বেষণ প্রশ্নেরই অন্বেষণ—প্রশ্নকে যখন ঠিক ধরিতে পারি তখন উত্তর পাইতে আর দেরি হয় না। মানুষের চিন্তা, মানুষের সাধনা, মানুষের সামাজিক-রাজনৈতিক সকল প্রকার প্রয়াসের মধ্যে প্রশ্নটাকে বারবার নানাদিকে নানা বিচিত্ররূপে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। যাহার মধ্যে প্রশ্ন এরূপে জাগে তাহার নিকট অন্বেষণের একটা পথ খুলিয়া যায়, কিন্তু সে পথ যে দেখে নাই তাহার অন্বেষণ কেবল একটা অস্থির অনিশ্চিততার মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়, 'এই পাইলাম' 'এই যে আলো' 'এই আমার পথ' বলিয়া যেকোনো একটা অবান্তর আপাততৃপ্তিকর উপায় ও মীমাংসাকে আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়। সেই জন্যই আমাদের সাধনা পদে-পদেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।" (বর্ণমালাতত্ত্ব ও বিবিধ প্রবন্ধ, পৃঃ ৩৯)। আত্ম-অনুসন্ধানের এই সচেতনতায় প্রশ্নের চিরন্তনতা কেবল সুকুমারের সজীবতাকে প্রমাণ করে না, কারুর যদি সন্দেহ হয় এই প্রবন্ধ পড়ে যে সুকুমারের চিন্তায় অজ্ঞেয়বাদী সংশয়ের ছায়াও পড়েছে, তাহলে কি ভুল হবে?

'হিন্দু-ব্রাহ্ম' বিতর্ক

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের নানা স্তরে, তা রাজনৈতিক আন্দোলন, কি সংস্কার-আন্দোলন অথবা ধর্মীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেই হোক, একটা সংকট বারবার দেখা দিয়েছে; তা হল আত্মপরিচয়ের সংকট (identity crisis)।

নানা ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও বহুজাতিভিত্তিক এই বিরাট ভারতবর্ষীয় সমাজে এই সংকট প্রায় অনিবার্যই ছিল। তার ওপর ছিল বৈদেশিক নানা জাতির রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চাপ। ফলে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষীয় সমাজে উনিশ শতকে যখনই কোনো আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সামাজিক বা ধর্মীয় সংস্কারের নতুন বোধ দেখা দিয়েছে, তখনই ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক কিংবা ঐতিহ্যগত ঐক্যের প্রশ্নে নানান সংশয় দেখা দিয়েছে। ব্রাহ্ম আন্দোলনেও এই প্রশ্ন উঠেছে বারবার। মূলত ব্রাহ্ম আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল জীর্ণ, সংস্কারাবদ্ধ পৌত্তলিকতার উপাসক হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধন করা। আঘাতের দ্বারা বহুস্তরবদ্ধ হিন্দু-সমাজের কুরীতি, খণ্ডতা ও বিকৃতির অবসান ঘটানো। পরোক্ষভাবে ইংরেজ মিশনারিদের ব্যাপক ধর্মান্তরকরণের সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টাও যে এই আন্দোলনের অব্যবহিত সূত্র ছিল না, তাও বলা যায় না। ফলে ধর্মসংস্কারে, সমাজচেতনায় নবযুগের যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারের প্রসার ঘটানোতেই প্রগতিবাদী ব্রাহ্ম আন্দোলনের মূল চরিত্র ধরা পড়ে।

রামমোহন থেকে শুরু ক'রে শিবনাথ শাস্ত্রী পর্যন্ত অব্যাহত এই ধারায় অবশ্য নানা বাঁকও আছে। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় সমাজ ও শিবনাথ শাস্ত্রী-দের সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে তা পরিস্ফুট। সংগঠন-গত বা মতবাদগত বহু পার্থক্যের মধ্যে একটি ছিল ব্রাহ্ম-সমাজের আত্মপরিচয়গত মতামতের ভিন্নতা। হিন্দুধর্মের সংস্কার করাই তার ঐকান্তিক লক্ষ্য হলেও হিন্দু ঐতিহ্য বা হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করবে কিনা, এই ছিল বিতর্ক। দেবেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনায়, হিন্দুদের পৌত্তলিকতার তিনি ছিলেন চরম বিরোধী। কিন্তু সে-বিশ্বাস তাঁকে হিন্দুসমাজের সংস্কার কর্মে এগিয়ে দেয় নি। ফলে আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্তব্য ছিল যে তাঁরাই কুসংস্কারহীন প্রকৃত হিন্দু। অন্যদিকে কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৮১ সালে তরুণ সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মরা বের করেছিলেন 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা কৃষ্ণকুমার মিত্রর নেতৃত্বে। শুধু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা নয়, হিন্দুসমাজের উগ্র ও আমূল (radical) সংস্কারই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজও, ততোটা উগ্র না হলেও, এই সংস্কারপন্থার ধারা বজায় রাখতে চেয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ছিল : ব্রাহ্মসমাজ শুধু প্রচলিত সনাতন হিন্দুধর্মের বিরোধী নয়, ব্রাহ্মধর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বাহিত স্বতন্ত্র বিশ্বধর্ম। স্বভাবত ব্রাহ্মসমাজের ভিন্ন ভিন্ন এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রায়শই হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্ককে ঘিরে নানান তর্কবিতর্ক গড়ে উঠত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও সে-তর্কের নিবৃত্তি ঘটে নি। সুকুমার রায়ও একবার জড়িয়ে পড়েছিলেন এই তর্কে তাঁরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে।

তর্কটি তৈরী হয়েছিল ১৯১৪ সালে তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায় অজিতকুমারের একটি প্রবন্ধকে ঘিরে।[১] ঐ প্রবন্ধ তিনি লিখে-ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিরঞ্জন নিয়োগীর আরেক প্রবন্ধের প্রতিবাদে। প্রতিবাদ এই যে নিরঞ্জন নিয়োগী তাঁর প্রবন্ধে ব্রাহ্মধর্মের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন ব্রাহ্মগোষ্ঠীর মধ্যে যে ঐক্যসাধনের গুরুত্বের কথা লিখেছেন তাতে আদি সমাজের নামোল্লেখ করেন নি, সম্ভবত নিরঞ্জন নিয়োগীর মতে তাঁরা সঠিক ব্রাহ্ম নন এই অজুহাতে। অজিতকুমার চক্রবর্তী এরই প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছিলেন হিন্দু ব্রাহ্ম সম্পর্ক বিষয়টি যথেষ্ট বিস্তৃত ক'রে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মদের হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্কের এই বিরোধকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথকেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল একাধিকবার নানান তর্কে। ১৮৯১ সালের জনগণনার সময়ে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কারভাবেই সরকারকে জানিয়ে-ছিলেন যে ব্রাহ্মরা মূলত হিন্দু। পরবর্তী সময়ে ১৯১২-তে লেখা 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য বিস্তৃত করেই জানা গেল। কিংবা তারও আগে ১৩১৭-এর ১২ মাঘে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পঠিত 'ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মধর্ম ও তার সংস্কার আন্দোলন-কোন্ পর্যন্ত সার্থক এবং কোথায় তার সীমা তা চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। সম্প্রদায়গতভাবে ব্রাহ্মদের পৃথক কোন অস্তিত্ব নেই, হিন্দুসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের আত্মপরিচয়ের প্রকাশ ঘটতে পারে না—সে-কথাই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে। লিখেছিলেন, "ব্রাহ্মসমাজকে, তার

সাম্প্রদায়িকতার আবরণ ঘুচিয়ে দিয়ে, মানব-ইতিহাসের এই বিরাট ক্ষেত্রে বৃহৎ করে উপলব্ধি করবার দিন আজ উপস্থিত হয়েছে।"

১৯১১ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রেও নানান ভাবে এই মনোভাব ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমেরিকা থেকে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি আমাদের সমাজের (আদি ব্রাহ্মসমাজ) গোঁড়া সভ্যদের ত্যাগ করেছি কারণ তাঁরা হিন্দুসমাজের দোষকে গ্রহণ করে হিন্দুসমাজ ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করেছিলেন। তেমনি আবার অন্য সমাজের (নববিধান ও সাধারণ) যাঁরা গোঁড়া তাঁরা সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্যবশতঃ হিন্দুসমাজকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ ক'রে স্বজাতীয় সমাজের সুতরাং নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলকে আঘাত করবেন—এও কোনো মতে চলবে না—এই জন্যেই আদি ব্রাহ্মসমাজকে আমরা তার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিতে চাই। এই জন্যেই আমি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এর যোগ রেখে এর মধ্যে একটি নূতন অথচ উদার প্রাণ সঞ্চয় করতে চেয়েছিলুম—এই জন্যেই আমি একান্তভাবে কামনা করি শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে তোমার যোগ কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত না হয়। তাঁদের দ্বারাই আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ উন্নতি প্রত্যাশা করি। আমরা অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের সংকীর্ণ সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে চাইনে। আমরা তাঁদের চেয়েও বড় হতে চাই" (রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ২৮০)।

'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্রাহ্মদের নিবিড় বন্ধনের কথা উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, "...বস্তুত ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব সমস্ত হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। হিন্দুসমাজেরই নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে তাহারই বিশেষ একটি মর্মান্তিক প্রয়োজনবোধের ভিতর দিয়া তাহারই আন্তরিক শক্তির উদ্যমে এই সমাজ উদ্বোধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ আকস্মিক অদ্ভুত একটা খাপছাড়া কাণ্ড নহে। যেখানে তাহার উদ্ভব সেখানকার সমগ্রের সহিত তাহার গভীরতম জীবনের যোগ আছে। বীজকে বিদীর্ণ করিয়া গাছ বাহির হয় বলিয়াই সে গাছ বীজের পক্ষে একটা বিরুদ্ধ উৎপাত নহে। হিন্দুসমাজের বহুস্তরবদ্ধ, কঠিন আবরণ একদা ভেদ করিয়া সতেজে ব্রাহ্মসমাজ মাথা তুলিয়াছিল বলিয়া তাহা হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধ নহে, ভিতর হইতে যে অন্তর্যামী কাজ করিতেছেন, তিনি জানেন তাহা হিন্দুসমাজেরই পরিণাম।" অতএব রবীন্দ্রনাথের মতে "হিন্দুব্রাহ্মরা হিন্দুই অর্থাৎ যে ব্যক্তি হিন্দু সে ব্রাহ্ম হইলেও হিন্দু, ব্রাহ্ম না হইলেও হিন্দু।"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি গোঁড়া প্রবীণ ব্রাহ্মদের অনেকেরই পছন্দ ছিল না। 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধের প্রতিবাদে 'তত্ত্বকৌমুদী' পত্রিকায় (১ বৈশাখ, ১৩১৯) লেখা হল, "...ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু কিনা, এ কথা বিচার করিবার অধিকার আদি ব্রাহ্মসমাজের কাহারও নাই, উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডী অনেককাল অতিক্রম করিয়াছেন।"

হিন্দুসমাজের প্রচলিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের সংস্কারকর্মে আদি ব্রাহ্মসমাজের যে নিরুৎসাহী মনোভাব ছিল, রবীন্দ্রনাথ আনুষ্ঠানিকভাবে আদি সমাজভুক্ত হলেও সে দৃষ্টিভঙ্গি যে অনুমোদন করেন নি, তা ওপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকেই বোঝা যায়। ব্রাহ্মসমাজের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তীব্র সমালোচক ছিলেন তিনি। হিন্দুসমাজের সংকীর্ণ কুরীতিগুলি পরিহার ক'রে ব্রাহ্মআন্দোলন যে বিশ্বজনীনতার অন্বেষণে সচেষ্ট সেই ধারার অব্যাহত রূপ ধরতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মহাজাতির প্রাচীন ঐতিহ্যকে ভুলে না গিয়ে। এইখানেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য, তাঁর আত্মপরিচয় অন্বেষণের বিশিষ্ট সূত্র।

রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য অজিতকুমার চক্রবর্তী 'তত্ত্ববোধিনী' (জুন ১৯১৪) পত্রিকায় হিন্দু-ব্রাহ্ম সম্পর্ক নিয়ে যে দীর্ঘ বিশ্লেষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা স্বাভাবিকভাবেই ছিল একান্তভাবে রবীন্দ্রানুসারী। তবে নববিধান ও সাধারণ সমাজের গোঁড়া ব্রাহ্মদের সংকীর্ণতা ও উগ্র স্বাতন্ত্র্যের সমালোচনা করতে গিয়ে এই প্রবন্ধে যে-ঝোঁক অজিতকুমার প্রকাশ করেছেন তাতে হিন্দু ঐতিহ্য ও হিন্দুত্বের বোধ যেন হিন্দুয়ানির স্তরেই মাঝে মাঝে নেমে আসে। ব্রাহ্মদের সম্প্রদায়গত বিরোধের দুর্বলতাটিও যেন রচনার মেজাজে ফুটে

বেরোয়। ১৮৭২ সালের তিন আইনের বিবাহপদ্ধতির তিনি যে শাণিত আক্রমণ করলেন তাতেও বোঝা গেল যে তিনি 'হিন্দু ঐতিহ্য' 'হিন্দু সংস্কৃতি' শব্দগুলিকে মাঝে মাঝে বেশ আলগা-ভাবেই ব্যবহার করেন। ফলে অজিতকুমারের এই বিশ্লেষণকে কেন্দ্র ক'রে বিতর্ক প্রায় অনিবার্যই হয়ে উঠল। সাধারণ সমাজের প্রবীণ নেতা গুরুচরণ মহলানবিশ যেমন আক্রমণ করলেন এই প্রবন্ধকে সমাজের প্রচলিত গোঁড়া দৃষ্টিকোণ থেকে, তর্কে প্রবৃত্ত হলেন সুকুমার রায়ও—অন্য এক বোধের প্রতিষ্ঠার জন্য।

অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখেছিলেন, "নানা কারণে ব্রাহ্ম-সমাজ বৃহৎ হিন্দুসমাজ হইতে অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহার ধর্মানুষ্ঠান, তাহার সামাজিক ক্রিয়াকর্ম-পদ্ধতি সমস্তই সম্পূর্ণরূপে বৈদেশিক অনুকরণে গঠিত না হইলেও, কতক পরিমাণে যে গঠিত এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রাণহীন আচার ও অনুষ্ঠানের নাগপাশবন্ধন খুলিয়া ফেলিবার জন্য যে সময়ে তরুণ ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবল তাগিদ আসিয়াছিল সেই সময় হইতেই হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের শাশ্বত রূপটি কি তাহা আর ব্রাহ্মসমাজে জিজ্ঞাস্য হয় নাই। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ তাহার কাছে প্রবল বন্ধনের বিভীষিকার মূর্তি ধরিয়াই আছে।" হিন্দু ধর্ম ও সমাজের এই 'শাশ্বত' রূপের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলেই ব্রাহ্মসমাজ, অজিতকুমারের ভ যায়, হয়ে পড়েছিল "পূর্বাপরবিচ্ছিন্ন স্বদেশবিচ্ছিন্ন জাতীয়তার বন্ধনবিচ্ছিন্ন একটা স্বপ্নপদার্থ"। আর এই বিচ্ছিন্নতার সমস্যা যদি মেটাতে হয় ব্রাহ্মসমাজের, তাহলে "এই দেশের চিন্তা, সাধনা, শিল্প, রসবোধ প্রভৃতি সকল প্রকারের জাতীয় প্রাণোপকরণসমষ্টির সহিত তাহাকে একাত্ম হইতে হইবে—নতুবা তাহার পক্ষে ব্রাহ্মধর্মের মর্মের মধ্যে প্রবেশলাভ কখনই সম্ভাবনীয় হইবে না। সুতরাং ব্রাহ্মকে অহিন্দু বলার মত এত বড় অসঙ্গত কথা আর কিছুই হইতে পারে না।" এই যুক্তিশৃঙ্খলের আশ্রয়েই অজিতকুমার চক্রবর্তী সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে "ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হিন্দু-সমাজেরই আদর্শ, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই শ্রেষ্ঠ রূপ এই কথা অস্বীকার করিয়া একটা কৃত্রিম ও অস্বাস্থ্যকর বিচ্ছেদ সৃজন করিবার জন্য আজ ব্রাহ্মসমাজ দেশের মধ্যে অত্যন্ত শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।"

আগেই বলা হয়েছে যে অজিতকুমারের এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে যে বিতর্ক শুরু হল সুকুমার রায় তাতে অগ্রগণ্য প্রধান প্রতি-বাদী হলেও, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা মতামত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচলিত মত বলে মনে হয় না। মনে হয় না এই কারণেই যে সুকুমার দ্বিধাহীন ভাষায় অজিতকুমারের বক্তব্যের প্রতিবাদে জানান, "আমরা ব্রাহ্মরা যে হিন্দু—অর্থাৎ আমাদের 'জাতি পরিচয়' যে হিন্দু, ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দুসমাজেরই অভিব্যক্ত প্রকাশ, এবং ব্রাহ্ম আদর্শ যে মূলতঃ হিন্দু আদর্শেরই পূর্ণ বিকশিত রূপ—এই সকল অত্যন্ত মামুলী সত্য" আর নতুন করে জানবার বা বোঝবার কোন প্রয়োজন নেই। শুধু তাই নয়, বহুকালব্যাপী ব্রাহ্মদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এই বিতর্কে "যাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু বলেন এবং যাঁহারা বলেন না দুয়ের মধ্যেও যে অনেকস্থলেই আসলে খুব একটা মতগত পার্থক্য আছে" তাও তিনি মনে করেন না। বস্তুত এই বক্তব্য থেকেই বোঝা যায় সুকুমারের মতের বিশিষ্টতা। ব্রাহ্মদের হিন্দু বা অহিন্দু এই সমসমস্যা যে সমাজে মস্ত সমস্যা নয়, নামের দ্বন্দ্ব মিটে গেলেই যে সমাজের সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে তাও তাঁর কখনো মনে হয় নি। আর সেই কারণেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গেই জানাতে চান, 'হিন্দু ও ব্রাহ্ম শব্দের নানারূপ সংজ্ঞা ও তাৎপর্য অবলম্বন করিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম হিন্দু, অহিন্দু, ব্রাহ্মহিন্দু, হিন্দুব্রাহ্ম প্রভৃতি পরিচয়ে পক্ষপাতী হইয়াছেন সত্য, কিন্তু এই সকল মত-বিভিন্নতায় কেবল ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, এ বিষয়ে 'ব্রাহ্মসমাজের মত' বলিয়া কোন একটা বিশেষ মত ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মসমাজ আপনাকে হিন্দু বলেন না, অহিন্দুও বলেন না...।" আদি-নববিধান-সাধারণ সমাজের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব যা মতপার্থক্যের বিষয়টিকে খানিকটা উপেক্ষাই যেন করতে চান সুকুমার এই কথা বলে। তাঁর উপেক্ষার হেতু আপাতভাবে বুঝতে অসু-বিধে হয় আমাদের, যেমন হয়েছিল অজিতকুমার চক্রবর্তীরও। কিন্তু সে-সংশয় কেটে যায় যখন সুকুমার এরই প্রেক্ষিতে বলেন, "ব্রাহ্মসমাজের আত্মবিস্মৃতি ঘুচান আবশ্যক একথা সর্বতোভাবে স্বীকার করি কিন্তু হিন্দুসমাজের সহিত 'বিচ্ছেদ'ই যে এই বিস্মৃতির মূল কারণ একথা একেবারেই বিশ্বাস করি না,

কারণ এ বিস্মৃতি হিন্দুসমাজের অস্থিমজ্জাগত। জাতীয়তা-বোধ বা হিন্দুত্ব বোধ, আর হিন্দু নামে বা হিন্দুত্বের কোন বিশেষ পরিচয়ে গৌরববোধ, এই দুইটাকে আমি অনেকটা স্বতন্ত্র জিনিষ বলিয়াই মনে করি। ব্রাহ্মসমাজের হিন্দুত্ব 'বোধ'টা উজ্জ্বল না হইলেও, হিন্দুসমাজের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং উভয়ের মধ্যে যোগ রক্ষা করা যে আবশ্যক, এ 'জ্ঞান'টা তাহার বিলক্ষণ আছে, এবং জাতীয়তার আটঘাটও সে একেবারে বন্ধ করিয়া বসে নাই। আপনাকে হিন্দু বলিতে পারিলেই যে হিন্দুত্বের সংস্কারটা প্রকৃত হিন্দুত্ব বোধে পরিণত হয় না, হিন্দুসমাজই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।"

প্রকৃতপক্ষে 'হিন্দুত্বের সংস্কার' আর 'প্রকৃত হিন্দুত্বের বোধ' যে এক জিনিস নয়, এ কথা অজিতকুমারও লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কেন্দ্রীয় সমস্যাও এইটিই। কিন্তু সাধারণ জীবনচর্যার মতামতে ব্রাহ্ম হিন্দু নির্বিশেষে সকলেই যে অনেক সময়ে এ-দুয়ের পার্থক্যের সীমারেখাটি লুপ্ত করে দেন এবং এমন কি সমাজের নেতৃবর্গও যে তাতে তত্ত্বের ইন্ধন যোগান—সেই সমস্যার দিকে নজর রেখেই অজিতকুমার তাঁর যুক্তিজাল বিস্তার করেছিলেন। সুকুমারও এই সমস্যাকে পরোক্ষে স্বীকার করে নেন অন্য এক সতর্কতায়। তিনি লেখেন,

> আমাদের দেশে বলে যে তত্ত্বকে লাভ করিতে হইলে গোড়ায় একবার সব সংস্কারবিযুক্ত হইতে হয়; সেইরূপ আপনাকে এবং আপনার যথার্থ পরিচয় তত্ত্বকে লাভ করিবার জন্যই ব্রাহ্মসমাজকে একবার একটা আপাতবিরুদ্ধতার মধ্য দিয়া তাহার হিন্দুত্বের সংস্কারকে ভাঙিতে হইয়াছিল। এ কথা সত্য যে মাঝে মাঝে এক-একটি উৎসাহী ব্রাহ্মের প্রচার-তৎপরতায় ব্রাহ্মসমাজের অত্যন্ত নিরীহ কথাগুলিও উৎকট ও ভয়াবহ হইয়া উঠে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের দোহাই দিয়া যিনি যাহা বলেন তাহাই কিছু ব্রাহ্মসমাজের মত হইয়া দাঁড়ায় না।...

প্রতিপক্ষের দুর্বলতা দেখাবার অত্যুৎসাহে অজিতকুমার চক্রবর্তী যখন লেখেন যে হিন্দুসমাজের ঐতিহ্য ও ইতিহাস-বোধ থেকে বিচ্যুত হওয়ায় 'অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজ' শিল্প-সাহিত্য-দর্শন ইত্যাদির চর্চায় সৃষ্টিশীলতার উদ্যমও হারিয়ে ফেলেছে, সুকুমার তার তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ করেন: "অজিতবাবু অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজকে কি পরিমাণে জানেন বা বুঝিয়াছেন, সে প্রশ্ন তুলিব না; কিন্তু অজিতবাবুকে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করি, তিনি একবার সমালোচকের আসন হইতে নামিয়া আসুন—এবং ব্যক্তিবিশেষ বা পত্রিকাবিশেষ কোথায় কি মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন, সেকথা ভুলিয়া গিয়া, যেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ-শক্তি আপনাকে জানিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহারই মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়া দেখুন। নিয়মচক্রে তৈল প্রদান করা, এখনও ব্রাহ্মসমাজে মনুষ্যত্বের চরম ব্যবসায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। 'দেশের ইতিহাস, শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব' তাহার দ্বার হইতে হতাশ হইয়া ফিরিবার কোন কারণ দেখে নাই। বলিতে কি, মতের ও সম্প্রদায়ের বন্ধন ও বাক্যের আড়ম্বর ব্যতীতও সেখানে দেখিবার এবং শিখিবার জিনিষ যথেষ্ট আছে; এবং অজিতবাবু সহসা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না—সৌন্দর্যবিজ্ঞান বা রসবোধ জিনিসটাও সেখানে একেবারে অপরিচিত নহে।"

অজিতকুমারের সমালোচনার খোঁচায় সুকুমার কী উত্তর দিয়েছিলেন সেটুকু জানার জন্যই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি নয়, উদ্ধৃত এই বক্তব্যে সুকুমার ব্রাহ্মসমাজের পরিবেশে কী চেয়েছিলেন, কোন্ আদর্শের সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন তার খানিক আভাসও বোধহয় পাওয়া যায়। 'নিয়মচক্রে তৈল প্রদান করার' দীন অভ্যাস যে তাঁর অভিপ্রেত উদ্দেশ্য ছিল না সেটুকুও আমরা বুঝে নিতে পারি। আর এই সূত্রেই সুকুমার ব্রাহ্মসমাজের 'প্রাণশক্তি'র অন্বেষণের পদ্ধতির কথা জানিয়ে যখন বলেন—"ব্রাহ্ম সমাজ আগে তাহার নিজ স্বরূপকে চিনিতে শিখুক, নিজের চিন্তা ও জ্ঞান, সাধনা ও অনুভূতির দ্বারা আপনাকে উপলব্ধি করুক। সে হিন্দু, কি অহিন্দু বাহিরের জগতের কাছে তাহার পরিচয়-লক্ষণ কি, ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধানের জন্য ব্যস্ত না হইলেও তাহার কোন ক্ষতি নাই। আসলে যাহা মানুষের একান্ত পরিচয়, তাহার ব্যাখ্যা বা নাম-করণ চলে না—তাহাকে পরিচিতের পর্যায়ভুক্ত করাতে বিশেষ কোন লাভ নাই।"—তখন বোঝা যায় কেন সুকুমার ব্রাহ্মদের হিন্দু নামরূপ পরিচয়-লক্ষণ নিয়ে মোটেই ব্যতিব্যস্ত হন না।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের যে দৈন্য, যান্ত্রিকতা

সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা অনুভব করেছিলেন, 'হিন্দু নাম-রূপ পরিচয়-লক্ষণ' কে সমস্যা সমাধানের সূত্র হিসেবে গ্রহণ না করে সুকুমারও সে-সংকীর্ণতার কথা এই বিতর্কের শেষাংশে স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে জাতীয়তা-বোধ ব্রাহ্মসমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও সমাজের সমস্যার গুরুত্ব তাতে মোটেই কমে নি। আসলে "ব্রাহ্মসমাজ যে আপনার সম্বন্ধেই উদাসীন হইয়া বসিয়াছে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা। আপনাকে জানিবার জন্য সে যথার্থই ব্যাকুল হউক তবে ত সে আপনার প্রাণশক্তিকে জানিবে ও 'ব্রাহ্মধর্মের মৃত-সঞ্জীবনী রস'কে লাভ করিবে। এ ব্যাকুলতা কোথা হইতে আসে তাহা জানিনা ; কিন্তু একটা নামের ধূয়াকে ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা করিয়া তুলিলে এ জিনিষ আসিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না।"

আর এর সঙ্গে অজিতকুমার চক্রবর্তীর প্রবন্ধের প্রতিবাদে এই সুদীর্ঘ বক্তব্যের উপসংহারে সুকুমার একথাও লিখে-ছিলেন, "ব্রাহ্মসমাজ এককালে যাহাই থাকুক, আজ সে অতি-মাত্রায় গতিশীল নহে, স্থিতিশীলতার ব্যাধি তাহার হাড়ে হাড়ে। কোথা হইতে প্রাণের বেগ আসিয়া এ দৈন্য ঘুচাইবে, তাহা নির্দেশ করিয়া বলা আমার সাধ্যাতীত। ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ জীবনে ইহার উত্তর অন্বেষণ ছাড়া যথার্থ কার্যকরী আর কোন মীমাংসার কথা আমি জানি না।"

'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই'

১৯১২-এর ২৫ জুলাই-এ বিলেত থেকে লেখা একটি চিঠিতে সুকুমার তাঁর ছোট বোন টুনি অর্থাৎ শান্তিলতা চৌধুরীকে জানালেন, "গত সোমবার এখানের একটা ক্লাবে, East West Society-তে, "The Spirit of Rabindranath" বলে একটা paper পড়লাম। লোক মন্দ হয়নি, Quest কাগজের Editor Mr. Mead (যিনি এখানে রবিবাবুর lecture সব arrange করেছিলেন)—তাঁর প্রবন্ধটা খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি সেটা Quest-এ ছাপাচ্ছেন।"[২] সুকুমারের বয়স তখন পঁচিশ।

এই লেখাটি রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে যতখানি সাহায্য করে আমাদের তার চেয়েও বেশি সাহায্য করে বোধহয় সুকুমারকেই বুঝতে। সৃষ্টিশীল লেখকমাত্রের প্রবন্ধের ধরণই অবশ্য তাই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির পটভূমি ও জগৎটাকেই, সুকুমার যাকে বলেছেন 'formative influences of tradition and environment', বিচার করতে চেয়েছেন লেখক তাঁর এই প্রবন্ধটিতে। হিন্দুধর্ম ও ঐতিহ্যের মৌলিকতা যে "intense consciousness of the absolute and fundamental unity" তার অন্বেষণ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীলতার সঠিক ঐশ্বর্য। সুকুমার লেখেন, "Tagore's poetical career has been, consciously or unconsciously, a crusade against the ever-recurring bondage and tyranny of forms and conventions and sophisticated creeds that hamper the growth of the spirit and deny the self its proper fulfilment in the unfettered attainment of truth." আর বৈষ্ণবদর্শনের প্রেক্ষিতে সমালোচকরা যখন রবীন্দ্রসাহিত্য বিশ্লেষণ করে বলেন যে রবীন্দ্রনাথ আসলে "restatement of Vaishnava thought in his own experience" সুকুমার অস্বীকার করেন না বৈষ্ণব প্রেমতত্ত্বের এই ছোঁয়া রবীন্দ্রনাথের আত্ম-জিজ্ঞাসায়, তাঁর অমোঘ সৃষ্টিতত্ত্বের আস্তিকতার মিস্টিক ঐতিহ্যে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেন এসব কথার সীমিত অর্থ। সুকুমারের মনে হয় সেখানে "If we consider, not merely the poetry of a particular period of his life, but the whole of his literary activity, we are driven to the conclusion that Rabindranath is not the slave of any particular school of thought, that he is not the exponent of any particular system or 'ism' and that he is, first and foremost, an exponent of the mystery of life and only incidentally a Vaishnavist or Vedantist, an idealist or realist. In fact, the unfettered evolution of his poetry was possible only through a constant shaking off of the limiting influences of mere tradition

and sophisticated life."

বিচিত্র দর্শন, বিচিত্র মত ও তার সিদ্ধির নানান উপায়ের সম্মেলনে হিন্দুধর্মের যে গড়ন, তার কেন্দ্রীয় শক্তিস্বরূপ অখণ্ড চৈতন্য বা পরম সত্তার সন্ধানই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্বের উপজীব্য। এবং সেই গভীর ঐতিহ্যবোধেই যে হিন্দুত্বের সঠিক সাধনা সুকুমার রবীন্দ্রসাহিত্যে তাকে বলেছেন 'priceless legacy of Hindu thought'। এই প্রবন্ধ রচনার বছর দুয়েক বাদেই অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর হিন্দু ব্রাহ্ম সমস্যা নিয়ে যে তর্ক তাতে আপাতভাবে আমাদের মনে হয়েছিল সুকুমারের চিন্তার স্ববিরোধিতার কথা, তা যে নিতান্তই অমূলক এই প্রবন্ধই তার প্রমাণ।

বস্তুত এই দিক থেকেই আমাদের মনে হয় যে সুকুমার রায় হিন্দুত্বের ঐতিহ্য কৃত্রিম ভাববিলাসে বর্জন করেন নি, উপেক্ষা করেন নি সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষে আত্মপরিচয়ের ঐতিহ্যগত ভাববন্ধন। আর সেই কারণেই রবীন্দ্রসাহিত্যের মর্ম বুঝতে গিয়ে সুকুমার তাঁর ধর্মীয়, দার্শনিক, আদর্শগত বোধের ঐতিহ্যসূত্রটি অন্বেষণ করেন, খানিকটা যেন নিজের বিশ্বাসের ভিত্তি খোঁজেন পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবী সভায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, দেখাতে চান প্রাচ্যে হিন্দুত্বের সাধনার ঐতিহ্য কেমন করে ফুটে ওঠে রবীন্দ্রচেতনায়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশক পর্যন্ত ব্রাহ্মআন্দোলনের ব্যাপকতা শিক্ষিত নাগরিক চেতনায় পুরোদস্তুর বজায় ছিল, সাধারণ সমাজের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হয়েছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। দেবেন্দ্রনাথের ইচ্ছায় রবীন্দ্রনাথ বেশ অনেককাল আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কাজ করেছেন। তবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে সে-কাজ তিনি কর্তব্য হিসেবেই পালন করেছিলেন, তার বেশি কোনো উৎসাহ ছিল না এবং উৎসাহ হ্রাস পেতে পেতে তাঁর জীবদ্দশাতেই আদিব্রাহ্মসমাজের নিত্যকাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে এরই মধ্যে আবার ১৯১১-১২তে রবীন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে আদিসমাজের আত্মিক সম্পর্ক তৈরি করে সমাজের সংস্কারসাধনে তৎপর হয়েছেন। 'তত্ত্ববোধিনী'তে শুষ্ক তত্ত্বালোচনার পরিবর্তে চিন্তা-ভাবনায় সৃজনশীল মানবিকতাবোধ আমদানির চেষ্টাও ছিল। তবে এসব কাজে, রবীন্দ্রনাথের অখণ্ড বিশ্বধর্মে, মানবিকতার ধর্মচিন্তায় ও বিশেষত সাম্প্রদায়িকতার বন্ধনমুক্তিতে সমসাময়িক ধার্মিকেরা অনেকেই কিন্তু বিশ্বাসহীনতার প্রশ্রয় দেখতে পেয়েছেন। ভেবেছেন, এসব নেহাৎই ভাববিলাসী কবির ধর্ম, কেননা তিনি ধর্ম বিষয়ে কোন গুরুউপদেশ গ্রহণ করেন না, তাঁর ধর্মীয় ভাষণ কোন ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ-সমন্বিত হয়ে ওঠে না। অতএব এই দৃষ্টি নিতান্তই বস্তুতন্ত্রহীন। এই অভিযোগ ছিল যেমন গোঁড়া হিন্দুদের, গোঁড়া ব্রাহ্মরাও তাঁকে স্বীকার করেন নি।[৩] কিন্তু একই ধারায় অনেকেই যে আবার রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল উদার সার্বভৌমিকতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন তাও দেখা যায়। বিশেষত তরুণদের মধ্যে তাঁর প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর ধর্মবোধের যে অচ্ছেদ্য রূপ, যুগমানসিকতার আশ্রয় থেকে যে উত্তরণের দাবি ছিল তাঁর চিন্তায়-সাধনায়, তা ছিল তরুণসমাজের অনুপ্রেরণার বিষয়। এরই ফলে অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় যেমন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমিক, তেমনি সুকুমার রায়, কলিদাস নাগ, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের মত আরও অনেকেই ছিলেন তাঁর ভাবানুগত আদর্শের সন্ধানী।

এরই প্রেক্ষিতে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের নেতৃত্বে তরুণ ব্রাহ্মদের দাবি উঠল, রবীন্দ্রনাথকে সমাজের সম্মানিত সদস্যপদে বরণ করে নিতে হবে।[৪] ব্রাহ্মসমাজের সংবিধানে এরকম সম্মানিত সভ্যপদ নেওয়ার নীতি ও রীতি চালু ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই সভ্যপদ দেওয়ার কথা উঠতেই সমাজের কার্যনির্বাহক সমিতির একাংশ আপত্তি জানালেন খুঁটিনাটি টেকনিক্যাল তর্ক তুলে। সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত হল এমন দু-একটি চিঠি যাতে বোঝা গেল রবীন্দ্রনাথের সভ্যপদ বিষয়ে তরুণদের দাবি স্বীকারে প্রবীণ ব্রাহ্মরা নিতান্তই অপারগ। প্রসংগত উল্লেখ্য, তরুণদের দাবি শুধু এইটুকুই ছিল না, সুকুমারেরা চেয়েছিলেন সমাজের গঠনপ্রণালী ও নিয়মতন্ত্রের আরও অনেক সংস্কার। ১৯১৭-এর ১৪ জানুয়ারির 'তত্ত্বকৌমুদী'তে কার্যনির্বাহক সমিতির সভার বিচার্য বিষয়সমূহের যে নোটিশ প্রকাশিত তাতে উল্লেখ আছে এসব সংশোধনী

প্রস্তাবের ঃ

"...শ্রীযুক্ত সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন ঃ

১. শ্রীযুক্ত স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য নিয়োগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে এই সভা কার্যনির্বাহক সভাকে অনুরোধ করিতেছেন।

২. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গঠনপ্রণালী, নিয়ম ও অবান্তর নিয়মাবলীর বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য এবং আবশ্যিক হইলে সে সকলের পরিবর্তন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হউক।

৩. (ক) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১০ম নিয়ম অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভায় বিবেচনা ও চূড়ান্ত মীমাংসার্থ কোন বিষয় উপস্থিত করিবার সভ্যদিগের যে অধিকার আছে, অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন বিষয়ক ৭ম অবান্তর নিয়ম কোন সভ্যকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

(খ) নিম্নলিখিত পরিবর্তন করিতে অনুরোধ করা হউক ঃ

(অ) ৬ষ্ঠ অবান্তর নিয়মে Verdict (নিষ্পত্তি) কথাটি তুলিয়া দেওয়া হউক ও তাহার পরিবর্তে এই কথাগুলি বসান হউক ঃ

'অঙ্গীভূত প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় কোনও বিষয় নির্দ্ধারণ'

(আ) ৭ম অবান্তর নিয়ম পরিত্যক্ত হউক।"

খুঁটিনাটি আইনকানুনের সংশোধনের জন্য এইসব দাবি প্রমাণ করে, রবীন্দ্রনাথের সম্মানিত সদস্যপদের দাবি ছাড়া আরও অনেক সংস্কারসাধনের উদ্যমের কথা। ছাত্রসমাজের নানা ব্যাপার সংস্কারের জন্য আরও যে অনেক দাবি ছিল সুকুমারদের, তাও আমাদের অজানা নয়।

কিন্তু তরুণদের এসব দাবি স্বীকার্য ছিল কি সমাজের নেতাদের? ছিল না যে সর্বতোভাবে বা অধিকাংশেই তাও জানা গেল 'তত্ত্বকৌমুদী'র ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত আর দুই চিঠিতে। সমাজের শ্রদ্ধেয় নেতা ললিতমোহন দাস লিখলেন, "...উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ইঁহাদের প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি ভাব যেন দেখা যায়, অধ্যক্ষসভা ও কার্যনির্বাহক সভার উপর যেন ইঁহাদের ততোটা আস্থা নাই ; তাঁহাদের উপর যে সকল কার্যের ভার আছে, তাহার অনেকটা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে আনাই যেন বাঞ্ছনীয়। হয়ত আমার এ অনুমান ভুল ; কিন্তু যদি আমার অনুমান ঠিক হয়, তবে সেরূপ ভাব বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্মসমাজে ত' প্রতিনিধি ব্যতীত কার্য সম্পাদিত হয়ই না, কোনও প্রজাতন্ত্র রাজ্যেও প্রতিনিধি দ্বারা ব্যতীত জনসাধারণ দ্বারা সাক্ষাৎভাবে রাজ্যশাসন সম্ভবপর নহে।"

আর দ্বিতীয় চিঠিতে অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সদস্যপদ বিষয়ক প্রস্তাবের নানা সাংবিধানিক অসুবিধার কথা উল্লেখ করে তরুণ ব্রাহ্মদের মনোভাবের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে লিখলেন, "স্বহস্তনির্মিত গৃহে অগ্নিদান করা কখনও প্রকৃতিস্থ জনের কার্য্য নহে ; মস্তিষ্কের বিকার জন্মিলেই আত্মহত্যা সম্ভব হয়। ব্যক্তি অপেক্ষা যে সমাজ বড়, সমাজরক্ষার জন্য যে ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, সমাজ যে আমাদের বাসগৃহ ও আরামস্থল, ইহার মঙ্গল যে আমার মঙ্গল, ইহার স্থিতিতে যে আমাদের স্থিতি -- এই অতি প্রয়োজনীয় সত্য সকল সভ্যেরই স্মরণে রাখা নিতান্ত কর্তব্য। সমাজদ্রোহী হওয়া আর আত্মদ্রোহী হওয়া একই কথা।"

এই কথাগুলি কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ ললিতমোহন বা অবিনাশচন্দ্রের ছিল না। তরুণদের বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রবীণ সমাজনেতারা অনেকেই এই মনোভাব পোষণ করতেন। রবীন্দ্রনাথকে সমাজে সদস্যপদ দেওয়া নিয়ে প্রকাশ্যভাবেই আপত্তি করেছিলেন বহু প্রবীণ নেতাদের মধ্যে নবদ্বীপচন্দ্র দাস, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আর তরুণদের নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। সঙ্গে ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়, কালিদাস নাগ, হরকুমার গুহ, সুশোভন সরকার প্রমুখ আরও অনেকে।

১৯১৭-তে কার্যনির্বাহক সমিতিতে এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হল না, আন্দোলনের নিবৃত্তিও হল না, বরং তা যেন বেড়েই চলল। সমাজের সভা-সমিতি ছাড়িয়ে ব্রাহ্মপরিবারগুলিতেও বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ল। সীতাদেবী তাঁর 'পুণ্যস্মৃতি'তে এ-কথারই উল্লেখ করে লিখলেন, "এই সময় (১৯২০) কবিকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্য করার প্রস্তাবে প্রবীণ ও নবীন দলের ভিতর মহা ঝগড়া বাধিয়া গেল। এই ঝগড়া বেশ

কিছুদিন চলিয়াছিল।...বিশ্বের বরণীয় মহাপুরুষকে একটা সাধারণ সম্মান দেখাইতে ইঁহাদের কেন যে অত আপত্তি ছিল, তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই, এখনও পারি না। ইহা লইয়া সমাজে ও অনেকের পারিবারিক জীবনেও যে কত ঝগড়াঝাঁটি হইয়া গেল তাহার ঠিকানা নাই।" (পৃ, ২১৯)

কিন্তু কেন এই ঝগড়া, রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণে সমাজে বাধা কিসের—গুটিকয়েক টেকনিক্যাল ওজর ছাড়া—সে-কথা কিন্তু জানালেন না ব্রাহ্মনেতারা। দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চলার পর ব্যাপারটা যখন তুঙ্গে— ১৯২১এ প্রশান্তচন্দ্রের লেখা পুস্তিকা 'কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই' প্রকাশিত হলে—'তত্ত্বকৌমুদী'তে প্রকাশিত হল কিছু চিঠিপত্র আর তাতেই জানা গেল প্রবীণ নেতাদের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে।[৫] আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি চিঠিতে উল্লেখ করলেন, কবি হিসেবে দেশবরেণ্য নেতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ আদর্শস্থানীয় হলেও ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণযোগ্য নন কারণ :

(১) 'ব্রাহ্মরা একেশ্বরবাদী হিন্দু' রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ব্রাহ্মধর্ম-বিরোধী। (২) রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মপ্রচার পদ্ধতিকে স্বীকার করেন না। (৩) হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতি, বিশেষ ভাবে স্ত্রীশূদ্রাদির প্রতি প্রাচীনব্যবস্থা সমর্থন করেছেন অর্থাৎ তিনি স্ত্রীজাতিকে নিম্নস্তরে রাখতে ইচ্ছুক এবং শূদ্রদের উচ্চ-ধর্মাধিকারে বঞ্চিত করতে চেয়েছেন। (৪) রবীন্দ্রনাথ নিজের কন্যাদের বাল্যবিবাহ দিয়েছেন যা ব্রাহ্মদের আদর্শ-বিরোধী। (৫) ব্রাহ্মদের মধ্যে যারা তিন আইন মতে রেজেস্টারি করে বিয়ে করতে অসম্মত তাতেও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আছে। (৬) তিনি নিজেকে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত করতে রাজি নন। এবং সর্বোপরি প্রেমের গান রচয়িতা, 'গোরা'র মত উপন্যাসের লেখক হিন্দুব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সঠিক ব্রাহ্ম ছিলেন না।

কার্যনির্বাহক সমিতি মত না দিলেও তরুণদের আন্দোলনের তীব্রতায় শেষ পর্যন্ত ১৯২১-এর মার্চমাসে শহর ও মফস্বলবাসী সমস্ত সভ্যদের রেফারেণ্ডামে রবীন্দ্রনাথ সমাজের সম্মানিত সভ্য নির্বাচিত হলেন। পক্ষে ছিল ৪৯৬টি ভোট আর বিপক্ষে ছিল ২৩২টি ভোট। মজার কথা, ভোটা-ভুটির এই সংখ্যাতত্ত্ব নিয়েও বিতর্ক হয়েছিল প্রশান্তচন্দ্রের সঙ্গে প্রবীণ নেতাদের। আর বহু লোক যে এ-ভোটাভুটিতে অংশ-গ্রহণ করেন নি, রুচিতে বেধেছিল বলে অথবা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রবিরোধী সমাজ-নেতৃত্বের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, সে-কথাও জানা গেল ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্রের একটি চিঠিতে। জনৈক প্রবীণ ব্রাহ্মের চিঠির উল্লেখ করে প্রশান্তচন্দ্র লিখেছেন : "যিনি চিঠি লিখে-ছিলেন, তাঁকে আমাদের সমাজে সকলেই শ্রদ্ধা করেন—তাঁর বয়স প্রায় ৭০। আমাদের সমাজে শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থান কোথায় আপনি জানেন, কাজেই এ চিঠিতে যে কতখানি বলা হয়েছে, আমাদের সমাজের পক্ষে, তাও আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা অনেক চিঠি পেয়েছি। যাঁরা বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন তাঁদের কাছ থেকেও অনেক চিঠি পেয়েছি; তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বলেছেন যে, আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই; কিন্তু গণ্ডগোলের জন্য বিরুদ্ধে মত দিচ্ছি, এরকমভাবে ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে তাঁকে টেনে আনায় তাঁর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করাই হবে। ৭০% এর উপর ভোট স্বপক্ষে এসেছিল—এত বিরোধ সত্ত্বেও। নেতৃস্থানীয় জনকয়েক লোকে যদি এরকম একটা কাণ্ড না বাধিয়ে দিতেন তবে ৯৫% ভোট যে স্বপক্ষে হত তা ত আমাদের সন্দেহ নেই।..." আর নবীন প্রবীণদের এই মনোমালিন্য যে কতদূর প্রসারিত ছিল, আদিনাথ চট্টো-পাধ্যায়ের আরেক চিঠির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই তা বোঝা যায় : "ঠাকুর মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্মানিত সভ্যরূপে গ্রহণের অনুরোধের প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে হয় নাই। সভায় উপস্থিত অধিকাংশ সভ্যের অভিপ্রায় অনুসারেই হইয়াছে। সে কারণে এ ব্যাপার লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ ও কার্য নির্ব্বাহক সভার সভ্যগণের মধ্যে অতি অপ্রীতি-কর মনোমালিন্য উপস্থিত হইয়াছে। মনোমালিন্য এরূপ মর্মান্তিক আকার ধারণ করিয়াছে যে, তাহাকে শুধু মনোমালিন্য নাম দিলে তাহার ঠিক স্বরূপ বর্ণনা হয় না। তাহা অতি শোচনীয় বিচ্ছেদজনক ও প্রাণহানিকর বিবাদ রূপে পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ, আমাদের ভিতরকার এক বিশেষ ব্যক্তি—আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের একান্ত পক্ষপাতী ও অকৃত্রিম অনুরাগী সভ্য, প্রচারক এবং ব্রাহ্মসাধনাশ্রমের পরিচালক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র

দাস মহাশয়—এ ব্যাপারে এমন দারুণ আঘাত—এমন ব্যথা পাইয়াছেন যে তিনি এই উপলক্ষ্য হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল সংস্রব পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার নিকটে পত্র লিখিয়াছেন" (তত্ত্বকৌমুদী, ২৯ জানুয়ারি ১৯২১)।

একটি চিঠি

"...আমার মনে হচ্ছে কি একটা drastic irrevocable step আমি নিয়েছি—যার full import আমি এখনও বুঝতে পারছি না। কেন এরকম মনে হচ্ছে আমি তার কোন explanation খুঁজে পাচ্ছি না। তাছাড়া তোমাদের fraternity ইত্যাদিতে আমার লোভ ছাড়তে পারব না বোধহয়। কেবল একটা morbid আশঙ্কা হচ্ছে পাছে কেউ কিছু বলতে বসে। সেরূপ কোন আশঙ্কার কোন কারণ ঘটতে দিও না।...' ৬

অন্যতম সুহৃদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা সুকুমার রায়ের একটি চিঠির অংশবিশেষ এটি। চিঠিটি লেখা ১৯২০-সালের ২৩ অগাস্টে। একান্তভাবে প্রশান্তচন্দ্রকে তাঁর মনের গোপন সত্যি কথাগুলি জানাবার জন্যই সুকুমারের এই চিঠি। চিঠির ওপরে স্পষ্টাক্ষরে লিখেছিলেন এ-চিঠি গোপন রাখার কথা, চিঠির বয়ানেও ছিল তার বারবার উল্লেখ।

কিন্তু কি ছিল তাঁর 'drastic irrevocable step'? চিঠিটি আদ্যোপান্ত পড়লে আমরা সেই কথাই জানতে পারি বিস্তৃত, বুঝতে পারি দলাদলি, সঙ্কীর্ণতা, বাগাড়ম্বরের ব্রাহ্ম-পরিবেশ তিনি সহ্য করতে পারছেন না আর। ভিতরে ভিতরে তাঁর বিশ্বাসের ভিৎ যে আলগা হয়ে গেছে তাও টের পাওয়া যায় স্পষ্টতই এই চিঠির সর্বাঙ্গে, এক তীব্র অবসাদ—morbidity—তাঁকে যে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে সে কথাও স্পষ্ট করে লেখেন বারবার। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে আর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছুক নন তিনি, অব্যাহতি চান সমাজের সব আনুষ্ঠানিক পদগুলি থেকে, আর সেই সঙ্কল্পের প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রয়োজন প্রশান্তচন্দ্রের ঐকান্তিক সাহায্য—এই কথাগুলিই সুকুমার স্পষ্ট করে লিখে জানান গভীর বেদনা থেকে তাঁর এই ঐতিহাসিক গোপন চিঠিতে। প্রসঙ্গত আরও একটি বোধ, মৃত্যুচিন্তা, এ-চিঠিতে প্রকাশ করেন সুকুমার। বন্ধু অজিত-কুমার চক্রবর্তীর অকাল-মৃত্যু প্রসঙ্গেই যেন সেই মৃত্যুচিন্তা সুকুমারের কাছে এক গভীর দার্শনিকতার মাত্রা পেয়ে যায়। আর এ-চিঠি পড়তে পড়তে আমাদের মনে পড়ে যায় রবীন্দ্র-নাথের সেই অভিজ্ঞতার কথা, যে-কথা তিনি লিখেছিলেন রোগ-শয্যায় সুকুমারকে শেষ দেখে আসার ঘটনাটি ব্যাখ্যা ক'রে সুকুমারের স্মৃতিতর্পণ সভায়, "...মহাপুরুষেরা বলেছেন শত্রুকেও আত্মবৎ দেখতে হবে, অসত্য বলে এ'কে উপহাস করতে পারব না। এই সত্যকে আমি আয়ত্ত করতে পারিনি বলে এ'কে আমার সাধনার মধ্যে গ্রহণ করতে হবে। কেননা পূর্ণ স্বরূপের বিশ্বে আমরা ফাঁক মানতে পারব না। এই কথাটি আজ এত জোরের সঙ্গে আমার মনে বেজে উঠেছে, তার কারণ সেদিন সেই যুবকের মৃত্যুশয্যায় দেখলুম সুদীর্ঘকাল দুঃখভোগের পরে জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর মতো অত বড়ো বিচ্ছেদকে, প্রাণ যাকে পরম শত্রু বলে জানে, তাকেও তিনি পরিপূর্ণ করে দেখতে পেয়েছেন" (শান্তিনিকেতন)।

মৃত্যুচিন্তা থাকলেও, এ-চিঠিতে কিন্তু সেই কথাটিই আমাদের কাছে বড় হয়ে ওঠে না। ধার্মিক জীবনের প্রাত্যহিকতায়, সমাজের পরিমণ্ডলে যে "morbid pessimism" তাঁকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলছিল সেই অভিজ্ঞতার কথাই বড় হয়ে ওঠে সুকুমার রায়ের এই চিঠিতে। হতাশা, অবসাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ১৯২০-র অগাস্টে যখন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আন্দোলন সমাজপ্রাঙ্গনে প্রায় মুখোমুখি লড়াই-এর স্তরে পৌঁছে যাবার সম্ভাবনা, তখন তিনি এ-চিঠিতে প্রায় অভিমান করেই প্রশান্তচন্দ্রকে জানিয়ে দেন, "অনেকানেক কাজ অসম্পূর্ণ বা অর্ধসম্পূর্ণ হয়ে আছে আমি জানি। তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিও না। I decline to think about Khasi mission, about Rabibabu's election..." ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়, এ. এম. বোস মেমোরিয়াল বক্তৃতাসভার উল্লেখ করেও সুকুমার জানান তাঁর গভীর যন্ত্রণাবোধের কথা। ঠিক করেছিলেন কিছুতেই বক্তৃতা করবেন না আর এ-সব উপাসনাসভায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের আহ্বানে বলতেই হল কিছু কথা। মনে মনে ঠিক করা ছিল বলবেন তাঁর সত্যিকারের বোধের কথা, যে যাই মনে করুন

না কেন। কিন্তু পারলেন না শেষ পর্যন্ত, বহুকালের অভ্যাসের চাপে, সামাজিকতার সম্মানে বলতে হল সেই আশা, আলো, আনন্দ আর optimism-এর প্রচলিত শব্দের ভাল ভাল তত্ত্ব-কথা। এক নিদারুণ ক্লান্তি, দুঃসহ যন্ত্রণা আর এক ভয়ঙ্কর ক্রোধ যেন ফুটে বেরোয় সুকুমারের এসব অভিজ্ঞতার বর্ণনায় যা এই চিঠির ছত্রেছত্রে প্রকট।

সুকুমারের এই ক্রোধ, আশাহত অভিজ্ঞতা, আজীবন লালিত বিশ্বাসে এক গভীর ক্লান্তির ছাপ কি শুধু এই চিঠিতেই ধরা পড়ে? এমন জিজ্ঞাসা বোধহয় অমূলক নয় সুকুমার-পাঠকের কাছে। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনায় শ্লেষের পরিচয় তেমন নেই এ-কথা বিশ্বাস করলেও 'চলচিত্তচঞ্চরি' যে তির্যক ভঙ্গিতে সুকুমারের সবচাইতে ক্রোধোদ্দীপ্ত রচনা আর তার অব্যবহিত সূত্র যে ব্রাহ্মপরিমণ্ডলের অভিজ্ঞতা সেটা ত' বোঝা যায় এ-চিঠির কথা জানা না থাকলেও। তবে অনেক ঘটনার ছায়া তাঁর বিভিন্ন রচনায় পাওয়া গেলেও, কোন ঘটনাই যে সরাসরি তাঁর প্রত্যক্ষ আক্রমণের বিষয় হয়ে ওঠে নি সে-কথাটা মনে রেখেই আমাদের এই অনুমান। আর তাছাড়া কে না জানে শৈশবে সুকুমারের সেই 'রাগ বানানো' খেলার গল্পটা যা তাঁর সৃষ্টিশীল রচনা বোঝার ক্ষেত্রে ক্রমে এক সূত্রই হয়ে ওঠে।

'সমগ্র শিশুসাহিত্য'-এর (আনন্দ) ভূমিকায় সত্যজিৎ রায় কিন্তু আমাদের দেখিয়ে দেন সুকুমারের আরেক রচনার কয়েক ছত্রে এই আশাভঙ্গের কথা। তিনি লিখেছেন, "সমাজের আদি-পর্বের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তাঁকে যেমন উদ্বুদ্ধ করত, মনে হয় ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁকে হতাশ করেছিল সমকালীন কিছু আদর্শচ্যুতির দৃষ্টান্ত। তাঁর একেবারে শেষদিকের রচনা ছোটদের জন্য পদ্যে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস 'অতীতের ছবি'-র শেষ কয়েকটি ছত্রে এই কারণেই বোধহয় একটা হতাশার সুর লক্ষ করা যায়।" ঠিকই ধরেন সত্যজিৎ সুকুমারের এই আশাহত সুর ১৯২২-এর জানুয়ারি মাসে মাঘোৎসব উপলক্ষে লেখা দীর্ঘ কবিতার শেষ কয়েকটি পংক্তিতে। সুকুমার-পাঠকের কাছে অবশ্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎ-কর সুকুমারের এই ফরমায়েসী লেখা। বিষয়বস্তু উপস্থাপনার ভঙ্গি ও বিন্যাস এতোটাই দুর্বল যে একে চেনাই যায় না প্রায় সুকুমারের রচনা হিসেবে। মজার কথা এই যে, হতাশার কথা ব্যক্ত হলেও সমকালীন ব্রাহ্ম পাঠকেরা কিন্তু অপছন্দ করেন নি এই রচনাকে। তাঁর মৃত্যুর পর 'প্রবাসী'র স্মৃতিচারণে দুর্বল এই রচনার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়, আর এই লেখা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ১৩২৯-এর ২৫ মাঘ-এ কালীকৃষ্ণ ঘোষ চিঠিতে লেখেন সুকুমারকে, "বালক-বালিকাদের জন্য 'অতীতের ছবি' নাম দিয়া যে একখানা পদ্যময় ছোট বহি বাহির করিয়াছ তাহা পাঠ করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলাম।...যাহারা তোমার বর্তমান রুগ্নাবস্থার কথা জানে তাহারা তোমার হৃদয়ের বল দেখিয়া স্তম্ভিত ও উৎফুল্ল হইবে।" (সমগ্র শিশুসাহিত্য, গ্রন্থপরিচয়)

যে-চিঠির প্রসঙ্গে এলো এইসব কথা সে-চিঠি কিন্তু প্রকাশিত হয় নি এখনও কোনখানে। চিঠির পূর্ণাঙ্গ বয়ান প্রকাশ করা গেল না বর্তমান প্রবন্ধেও। তবে প্রশান্তচন্দ্র ও পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় ছাড়া আর কেউ জানতেন না এই চিঠির প্রসঙ্গ— এরকমই আমাদের অনুমান ছিল। কিন্তু সেই অনুমানেও সংশয় জাগে যখন সুবিমল রায় 'প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য রচনা'য় লেখেন, "কলকাতায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে প্রথম সুকুমারের স্মৃতি-সভায় রবীন্দ্রনাথ সভাপতি হয়েছিলেন। সেই সভায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ সুকুমারের লেখা একটি চিঠি পড়ে শোনান। চিঠিখানি সুকুমারের অসুখ (কালাজ্বর) আরম্ভ হবার সাতমাস আগেই সুকুমার প্রশান্ত-বাবুকে লিখেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, অতদিন আগেই সুকুমার সেই চিঠিতে লিখেছিলেন যে তাঁর জীবনে একটা গুরুতর পরিবর্তন আসছে বলে তিনি বুঝতে পারছেন আর তাঁর পৃথিবীর দিনও ফুরিয়ে আসছে (পৃ. ৯৬)।"

সময়, বিষয় এবং প্রাপক সব তথ্যই মিলে যাচ্ছে। তবে কি এই চিঠিই পড়া হয়েছিল সমাজের ঐ স্মৃতিসভায়? সুকুমারের মৃত্যুর পর তাহলে কি জানতে পেরেছিলেন ব্রাহ্ম-নেতারা সুকুমারের চিন্তার বাঁক, তাঁর অবসাদের কথা?

বিশ্বাসহীনতা, অবসাদগ্রস্ততার ফলে চিন্তার এই অবশ্যম্ভাবী বাঁক যে এসেছিল সুকুমারের জীবনে, তার প্রমাণ কিন্তু সুকুমারের ডায়েরীর[7] কোন কোন পৃষ্ঠায়ও। এই ব্যক্তিগত ডায়েরীর নাম সুকুমার দিয়েছিলেন হিজিবিজি খাতা, ফালতো খাতা, জাবেদা খাতা আরও কত কি। এই খাতার কয়েকটি

পৃষ্ঠা ওল্টালেও সুকুমারের অবসাদ, প্রশ্নকাতর ক্ষুব্ধ মনের পরিচয় আমরা পাই। উদ্ধৃত করা যাক এরই একটি পৃষ্ঠা :

কে আমরা? ব্রাহ্মসমাজে জন্মিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াছি ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছি, কিন্তু জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পাই নাই ইহাই আমাদের পরিচয়।

কি আমাদের প্রশ্ন? প্রশ্ন এই যে, সে বস্তুটা কি, এবং সে বস্তু কোথায় যাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই সংগ্রাম? প্রশ্ন এই যে, এই ব্রাহ্মসমাজ চক্ষের সমক্ষে যাহাকে দেখিতেছি—সে কোন্ বার্তা বহন করিতে চায়—তাহার সংগ্রামের সার্থকতা কোথায়?

প্রশ্ন করি কাহার কাছে? প্রশ্ন করি ব্রাহ্ম সাধারণের কাছে, যাঁহারা তৃপ্ত যাঁহারা অতৃপ্ত সকলের কাছে। অতীতের সঞ্চয়ভারে যাঁহাদের জীবন পরিপূর্ণ তাঁহাদের কাছে এবং অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশা ও আশঙ্কায় যাঁহাদের বর্তমান জীবন চঞ্চল, তাঁহাদের কাছে। নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হইবার সত্য মিথ্যা দাবী যাঁহাদের আছে তাঁহাদের নেতৃত্ব মাহাত্ম্যে আঘাত করিয়া প্রশ্ন করি, আত্মপ্রতারিত সমাজের তুচ্ছতায় যাঁহারা ক্ষুব্ধ ও সংযম-ভ্রষ্ট তাঁহাদের অস্থিরতার দোহাই দিয়া প্রশ্ন করি।

এসব তথ্যের ভিত্তিতে চকিতে আবার মনে পড়ে 'চিরন্তন প্রশ্ন' প্রবন্ধটির কথাই। ভিতরে ভিতরে অজ্ঞেয়বাদীর সংশয়ের ছায়া যে-প্রবন্ধে পড়ে উঠছিল বলে আমাদের মনে হয়েছিল। কিম্বা মনে পড়ে অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে বিতর্কে সুকুমারের বক্তব্যের শেষ কথাগুলি : "ব্রাহ্মসমাজ এককালে যাহাই থাকুক, আজ সে অতিমাত্রায় গতিশীল নহে, স্থিতিশীলতার ব্যাধি তাহার হাড়ে হাড়ে"। তাহলে কি ব্রাহ্ম আন্দোলনের স্থবিরতা, নিয়মসর্বস্বতা ও ভ্রষ্টতা সুকুমারের দার্শনিক-অধ্যাত্মবোধকেও সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছিল? এ-কথার স্পষ্ট উত্তর হয় ত' নেই আজ আমাদের কাছে। জীবনের যে-'turning point'-এ পৌঁছে তিনি তৈরি হতে চেয়েছিলেন আর-এক জীবন শুরু করার জন্য তার সম্যক প্রকাশের আগেই 'সমাজের' স্বভাবনেতা সুকুমার রায় আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, সেইটিই সবচেয়ে বড় ট্র্যাজিক ঘটনা।

১। বিতর্কটি 'তত্ত্ববোধিনী'র জ্যৈষ্ঠ, ১৮৩১ শকাব্দ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মসমাজের সমস্যা'-কে কেন্দ্র ক'রে। পরপর বেশ কয়েক সংখ্যায় এই প্রবন্ধ ও অন্যান্যের মতামত প্রকাশিত হয়েছে। সুকুমার রায়ের প্রতিবাদ-প্রবন্ধটি এবং অজিতকুমারের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৮৩৬-এ। আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় সুকুমারের প্রত্যুত্তর। পরের সংখ্যায় অজিতকুমারের বক্তব্য এবং এই নিবন্ধেই তিনি জানান যে সমস্যার মৌলিক প্রশ্নে দেখা গেল সুকুমারের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই, বিরোধ শুধু কয়েকটি গৌণ বিষয়ে।
'হিন্দু-ব্রাহ্ম' প্রশ্নটি নিয়ে এই বিতর্কের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন 'ভক্ত ও কবি' প্রবন্ধে (দেশ, সাহিত্যসংখ্যা, ১৩৭৬): "১৩২১ সালের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রসঙ্গক্রমে বিষয়টি পুনরুত্থাপন করেন, তাতে রবীন্দ্রনাথের মত সমর্থিত হয়, এবং বিষয়টি নিয়ে অনেক বাদ প্রতিবাদ চলে।" এ কথাতে মনে হয় যেন এই বিতর্কে মুখ্য প্রতিবাদী সুকুমার রায় রবীন্দ্রবিরোধী বক্তব্যের অনুসারী, বস্তুত আমাদের কিন্তু অন্য কথাই মনে হয়।

২। লীলা মজুমদার : সুকুমার রায়, পৃষ্ঠা ১১৪।
এই চিঠিতে উল্লিখিত তারিখের পাশে গ্রন্থকার একটি '?' চিহ্ন রেখেছেন। হয়তো '২৫ জুলাই' অংশটি চিঠিতে অস্পষ্ট থাকার কারণে।

৩। 'রবীন্দ্রজীবনী'র ২য় খণ্ডে 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ' (২০২-২০৬), 'ধর্মের নবযুগ' (২৭ ২৭৯), 'তত্ত্ববোধিনী পর্ব' (২৮০-২৯৫)-শীর্ষক আলোচনাগুলিতে প্রভাতকুমারের বক্তব্য অনুসরণ করা হয়েছে।

৪। এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ ক'রে David Kopf তাঁর The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind' গ্রন্থে লিখেছেন, 'From a tract written by Mahalanobis in 1921, on 'Why we want Rabindranath', we find nothing new ideologically on the proposition that 'Brahmoism represents the new Hinduism.' What was new and intriguing was the implication that Rabindranath, then sixty years old, had completely captured the imagination of younger Brahmos like Mahalanobis. One act of youthful courage by Rabindranath, which enhanced his stature among the young, was the dramatic surrender of his Knighthood following Jallianwala Bagh massacre in Punjab on May 30, 1919'. এই মন্তব্য আমাদের অবাক করে এইজন্য যে এ আন্দোলন ত' শুরু হয়েছিল ১৯১৭-তেই। আর তাছাড়া এ-কথা অন্য কারুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও সুকুমার-প্রশান্তচন্দ্রের ক্ষেত্রে তেমন যথাযথ নয়।

৫। চিঠিপত্রগুলি বেরিয়েছিল ১৮৪২-৪৩-এর বিভিন্ন সংখ্যায়। আন্দোলনের পক্ষে লিখেছিলেন সতীশচন্দ্র রায়, হেমকুমার গুহ আর বিপক্ষে আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

৬। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত এই চিঠি আমরা দেখেছি শ্রীকৃষ্ণরূপ চক্রবর্তীর কাছে।

৭। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে অংশবিশেষ উদ্ধৃত।

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'শেক দি বট্‌ল্! শেক দি বট্‌ল্!'

ইচ্ছে হ'লে একে তুমি 'আজগুবি' বলতে পারো, কিন্তু আমি এমন উদ্ভট কথাবার্তাও শুনেছি
যার মধ্যে ঠিক অভিধানের মতোই কাণ্ডজ্ঞান পোরা আছে। —অ্যালিসকে লাল রানী

১

ধর্মতলায় কম খালি ?

সে-কোন্ ক্রুশমন্তর আওড়াইলে ভেতো বাঙালি সেখানে চাকরি জুটাইতে পারে ?

কেন ? ইংরেজ-প্রবর্তিত ঔপনিবেশিক শিক্ষায়-দীক্ষায় সড়গড় হইলে—তাহা কোনো কাজে লাগুক চাই না-লাগুক, তাহা নিছক কিছু ধারাপাত বা বোধোদয় মুখস্থ করাক বা না-করাক, তাহা সত্যি-সত্যি হাতে-কলমে কিছু শেখাক বা না-শেখাক—ডিগ্রিখানা তবু চাই। ডিগ্রিখানাই শেষ লক্ষ্য, অথবা আদত চাঁদমারি—কেননা ডিগ্রি জুটিলেই হাতে-নাতে পুরস্কার, ধর্মতলায় কাজটা বাগানো যাইবে, সাহেব-সুবোররাইটার হওয়া অতঃপর কে আটকায়, কেরানিগিরি তো হাতের মুঠায়।

তো নন্দলাল—না, ডি. এল. রায়ের নহে, সুকুমার রায়ের নন্দলাল—তবে উভয়েই একই মহাজন কী না, কে জানে—তাহার নেহাৎই মন্দ কপাল। সে ভূগোলে তালেবর, ইতিহাসে ওস্তাদগোছের, কেবল অঙ্কটাই কেমন যেন ধাতে সয় না। অথচ সংস্কৃতে'র প্রাইজ লুঠিয়া লইয়া ক্ষুদিরামের কী দেমাক, দ্যাখো! 'ঠিক আছে। দেখা যাবে এবার—একবার ক্ষুদিরামকে দেখে নেব।' চেষ্টার অসাধ্য আর কী আছে—চেষ্টা করিলে সংস্কৃত পড়ার বই আর অর্থপুস্তকটাকে সে কি আর কবজা করিতে পারিবে না ? খুব পারিবে। তাহা ছাড়া সম্ভবত ন্যায়শাস্ত্রেই তো বলিয়াছে যে ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ।

অতঃপর নন্দলাল আদা-নুন (সঙ্গে হয়তো গোলমরিচের গুঁড়াও ছিল অল্পবিস্তর) গলায় ঠাসিয়া সে-বছর উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। সব সে মুখস্থ করিবে, কেননা তাহাকেই তো বলে অধীত বিদ্যা।

কিন্তু বেচারার নেহাৎই পোড়াকপাল। পরীক্ষার পর হেড-মাস্টার মহাশয় একতাড়া কাগজ বগলদাবা করিয়া ক্লাসে আসিয়া গম্ভীরভাবে জানাইলেন- হেডমাস্টার মহাশয়েরা যৎ-কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া থাকেন

'এবার দু-একটা নতুন প্রাইজ হয়েছে আর অন্য বিষয়েও কোনো-কোনো পরিবর্তন হয়েছে।'

এই বলিয়া তিনি পরীক্ষার ফলাফল পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে দেখা গেল, ইতিহাসের জন্য কে যেন একটা রূপার মেডেল দিয়াছেন। ক্ষুদিরাম ইতিহাসে প্রথম হইয়াছে, সে-ই ঐ মেডেলটা লইবে। সংস্কৃতে কোনো প্রাইজ নাই।

হায়! হায়! নন্দর অবস্থা তখন শোচনীয়। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল সে ছুটিয়া গিয়া ক্ষুদিরামকে কয়েকটা ঘুঁষি লাগাইয়া দেয়। কে জানিত এবার ইতিহাসের জন্য প্রাইজ থাকিবে, আর সংস্কৃতের জন্য থাকিবে না। ইতিহাসের মেডেলটা তো সে অনায়াসেই লইতে পারিত।

কে জানিত দেশে এবার ডাক্তারবদ্যির কদর বাড়িবে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের সমাদর হইবে, আর্কিটেক্টদের এমনই পোয়াবারো ঘটিবে যে তাহারা চাই কি সাহিত্যের কাগজও ফাঁদিয়া বসিতে পারে—কিন্তু, হায়, হায়, বেচারা ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ারদের কেহ পুঁছিবেও না—তাহাদের সব কেরামতি তো বিদ্যুৎসংকটেই স্বতঃপ্রকাশ। এই বছর চাই অর্থনীতির ডিগ্রি, দর্শনবিদ্যার নহে। দার্শনিকেরা এ-বছর নিছকই বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাইবে।

সংক্ষেপে ইহাই নন্দলালের উপাখ্যান। কিন্তু একা নন্দলালের কি? আমাদের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদটিই তো বুর্জোয়া, তথাকথিত গণতান্ত্রিক, শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে নন্দলালের দুর্দশার সমান্তর খুঁজিয়া পাইয়াছে।—শিক্ষা যেখানে আত্মবিকাশ বা আত্মপ্রকাশের সহায়ক নহে, সেখানে, বলাই বাহুল্য, এইরূপ গোলযোগ হামেশা ও হরদম দেখা দিবে। কিন্তু মুশকিল এইখানে যে সমালোচনাটি হইবে কোন্ ভাষায়, কী ভাবে? অসংগতির উন্মোচন ঘটিবে কী ভাবে? একটা উপায় অবশ্য আছে, ঈশপের ভাষা, ইথিওপিয়ার যে-দাস এককালে গ্রীক মুক্তপুরুষদের নন্দনদের যে-ভাষায় কাণ্ডজ্ঞান শিখাইত। যে-ভাষায় এককালে লা ফঁতান তাঁহার আমলের তালগোলপাকানো সমাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বাপু বাছা করিয়া ডাকিয়া বলিলেও বক্তব্য যদি তেমন মুখরোচক না-ঠেকে, তো শুনিবে কে? যদি অবশ্য হাস্যরসের মোড়কে বাঁধিয়া দেয়া যায়, তবে হয়তো শ্রোতার অভাব ঘটিবে না। এইভাবেই পুরোহিতেরা ইস্তফা দেন নিজের কাজে, হইয়া ওঠেন বিদূষক বাচস্পতি। ভাঁড়েরা তো এক অর্থে পদচ্যুত পুরোহিতই অথবা ভবিষ্যতের পুরোহিত।

পরিবেশ বা পরিস্থিতি যখন উদ্ভট, অসংগত, কিম্ভূতকিমাকার, তখন ইহারই মধ্যে মোক্ষম চপেটাঘাতটি কষাইতে পারে এমন লোক, যাহার উভয়বলিতা আমাদের সহজে বুঝিতে দেয় না মানবকটির আসল অভিপ্রায়টি কী। এই জন্যই এই পরিবেশ স্বভাবতই দাবি করে দাশু অথবা ভবদুলালের উপস্থিতি—এমনকী ইহাদের লালনও করে। কে ইহারা? পাগল, না সেয়ানা? বেকুবের বেহদ্দ, না চালাকিতে চিকচাকন চৌকশ? মিচকে, ফাজিল, ইয়ার্কিবাগীশ? ইহাদের যথার্থ সংজ্ঞার্থ কী হইবে, ভাবিয়া-ভাবিয়া হবু-গবু সবাই কুপোকাৎ, অথবা চিৎপাত। এই যে ইহারা সহজে আত্মপরিচয় দিতে চাহে না—যেমন ধরা যাউক মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের প্রতিনিধি বড়োলাট বাহাদুর অনুমোদিত ছাড়পত্রের দরখাস্তে দিতে হয় ইহা কেমনতর হেঁয়ালি? সেখানে বেশ তো বলিতে হইত নাম, পিতার নাম, ধাম, জাতীয়তা, পেশা, গাত্রবর্ণ, অক্ষিতারকার বর্ণ, কেশবর্ণিমা, বিবাহিত কি না—হইলে স্ত্রী কয়টি, অথবা শনাক্তীকরণের ইহা ছাড়াও আর-কোনো বিশেষ চিহ্ন বিদ্যমান কি না ইত্যাদি সাতকাহন। মুশকিল বাধে তখন, যখন এতসব খুঁটিনাটি জানিবার পরেও ইহাদের ঠিক স্পষ্ট করিয়া চেনা যায় না। আর তাহার কারণ তো আর কিছুই নয়, ইহাদের এই রহস্যময় (কিংবা আসলে হয়তো তেমন ধাঁধা-জাগানোও নহে) উভয়বলিতা। ইহারা কি রসিক পুরুষ? সোডার মতন কেবলই ভশভশ করিয়া ইহাদের মধ্য হইতে হাস্যরসের ফোয়ারা ছুটিতেছে? না কি ইহারা দুঃখে কাতর, শোকে মোহ্যমান? বেবাক লোকে সম্ভবত বুঝিবে না 'কেউ-বা বুঝে পুরোপুরি কেউ বা বুঝে আধা,' তবে প্রশ্নটি শেষ অব্দি সোজাসুজি এইখানেই আসিয়া দাঁড়ায়—কে ইহারা—ভাঁড়, না পুরোহিত?

একদা মার্ক্সপন্থী (অধুনা মুক্তচিন্তার ধ্বজাধারী) পান্ লেশেক কোওয়াকোভ্স্কি আদ্যোপান্ত বখিয়া যাইবার আগে এই বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছিলেন। দাশুর বা ভবদুলালের পাগলামি—বা বোকামিটাই—একটা জীবনদর্শন, জীবনকে দেখিবার উপভোগ করিবার উপায়। কোওয়াকোভ্স্কি বলেন:

> ভাঁড় বলে তাহাকেই, উচ্চ সমাজে যাহার আনাগোনা ও মাখামাখি, অথচ তৎসত্ত্বেও যে উহার অংশ নহে, সে [বরং] সেই সমাজের সবাইকেই নানা তিক্তকষায় কথা

শুনায়। সে যদি এই সমাজের অংশ হইত, তবে তাহার পক্ষে এ-কার্য সম্ভব হইত না; তাহা হইলে সে নেহাৎই বৈঠকখানার [বা চণ্ডীমণ্ডপের] সেই ব্যক্তিটিতে পর্যবসিত হইত যে কেবলই পরনিন্দা করে, লোকের ছী-ছি কেলেঙ্কারির তিল-কে বিশদ করিয়া তাল করিয়া শুনায়। ভাঁড়কে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতে হইবে, তথাকথিত সুষ্ঠু সমাজকে বাহির হইতে অবলোকন করিতে হইবে, যাহাতে সে সব সাক্ষী-সাবুদ অপ্রমাণ করিতে পারে, যাহাতে সে চরম বিধান যে আসলে বরং না-বিধান তাহা দেখাইতে পারে। সেইসঙ্গে তাহাকে কিন্তু এই সুঠাম সমাজেই ঘুরাঘুরি করিতে হইবে যাহাতে সে ইহার স্বর্ণীয় ধেনুগুলিকে জানিতে পারে, এবং সুযোগ পাইলেই যাহাতে অম্লবিষম কথাগুলি শুনাইয়া দিতে পারে।...ভাঁড়েদের দর্শনই হইল যাহাকে সমাজ অকাট্য বা সুনিশ্চিত বিধান বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সন্দেহ খোঁচাইয়া তোলা; চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় যাহাকে প্রমাণিত করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহার অন্তর্লীন অসংগতিগুলিকেই সে উদ্‌ঘাটিত করে; যাহাকে কাণ্ডজ্ঞান বলিয়া আপাত চোখে দেখা যায় তাহাকে উপহাস করাই তাহার উদ্দেশ্য আর [এই ভাবেই] সে উদ্ভটের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া বসে সত্যকে।

অর্থাৎ, ইয়ান কোট যেমন বলেন, ভাঁড়ামি একটি জীবন-দর্শন, এবং সেই সঙ্গে একটি জীবিকাও। আর এইভাবেই সে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে আবিষ্কার করিয়া বসে উদ্ভটকে, কিম্ভুতকে, কিমাকারকে। ইহারই অপর পৃষ্ঠে রহিয়াছে পুরোহিত, সে সর্বনাশ দেখিয়া কাঁদিয়া উদ্বেল, অন্য-কেও সে শোকাহত বা স্তম্ভিত বা আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতে চায়, লালন করিতে চায় পুরাতন বাঁচনরীতি। কিন্তু হুবহু পুনরাবৃত্তি ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য নহে; যাহা শোকান্তিক, তাহা দ্বিতীয় আবির্ভাবে হইয়া ওঠে প্রহসন—এবং তৃতীয় বারে তাহাও সে হয় না—হইয়া ওঠে নেহাৎই কিম্ভুত। তখন ধাক্কা, ল্যাং, চিৎপটাং চমকপ্রদ দার্শনিক চারিত্র্য অর্জন করিয়া বসে।

ভাঁড় পায়ের তলা হইতে শক্ত মাটি—অথবা শূন্যে দোদুল্যমান দড়িদড়া—চমৎকার হাতসাফাই করিয়া সরাইয়া দেয়। পুরোহিত এই ঝোঝুল্যমান দড়িদড়া এতই পছন্দ করে যে উহা দ্বারা শক্তসমর্থ জাল বানাইয়া আমাদের আটকাইয়া রাখিতে চাহে—অথবা চাহে যে চিৎপটাং পড়িলেও ঐ জাল যেন আমাদের রক্ষা করে। অন্তত বিশ্বাস করাইতে চায় যে উহাই আমাদের রক্ষা করিবে। একজন হো-হো করিয়া হাসে, অট্টহাসি যদি নাও হয় খিলখিল। কখনো-কখনো এমনকী হাসির ছলে উদ্গার করিয়া দেয় দীর্ঘায়িত শুষ্ক ঘর্ঘরধ্বনি; অপরজন বক্তৃতা করে ফতোয়া দেয়, বুঝাইতে চায় কেন বর্তমান অবস্থা বজায় রাখা উচিত অথবা কেন কোন্ বদমায়েশকে ঐ ভুড়ঘরে নুন খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলা উচিত ছিল।

ভাঁড়েরা কাজকারবার ফাঁদে উপস্থিত বুদ্ধিতে, উদ্ভাবনী শক্তির নৈপুণ্যে, উপহাসে পরিহাসে। তাহাদের ভাষায় হেঁয়ালি থাকে, তবে তাহা পুরাপুরি দুর্বোধ্যও নয়। কখনো-বা তাহারা অবস্থায় জট পাকায়, প্যাঁচ কষায়, কথায় কথা কাটে, ফন্দি আঁটে; কথায় তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিবার জো নাই; আর কথা—সে কি সহজে থামিতে চায় না কি—'ছুটলে কথা থামায় কে' --এবং কাটা ঘায়ে নুন ছিটায়। সেই-যে নিস্পনি কবি শিন্‌কিচি তাকাহাসি বলিয়াছিলেন, সম্ভবত ভাঁড়েদের সাতকাহন বিচার করিবার আগে সেই কথাগুলি স্মরণ করিয়া লওয়া ভালো:

> আমি তোমার কথাগুলিকে
> নিছক কথা বলিয়া ধরি না।
> মোটেই না।
>
> আমি শুধু শুনি
> তোমাকে কথা বলায় কে—অথবা কী—
> সে যাহাই হৌক না কেন
> আমি শুধু তাহাকেই শুনি।

মোক্ষম কথাই বলিয়াছেন তাকাহাসি। শুনিতে যদি হয় তো শোনা উচিত, সে-কোন তাগিদ, অবস্থা, পরিস্থিতি কাউকে

দিয়া কথা বলাইয়া লয়। কথা এবং তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য—ইহা লইয়া বিস্তর ঘোরপ্যাঁচ তো আছেই। যাহা আপাত কর্ণে অর্থহীন প্রলাপ বা নিরর্থক বকবকানি বলিয়া মনে হইতে পারিত, তাহাই হইয়া ওঠে জব্দ করিবার ফন্দি, নাকাল করিবার ফিকির, শান দেয়া ঝকঝকে চকচকে ধারালো অস্ত্র। কথাতেই কথার প্যাঁচ কাটিতে হয়। কিংবা ছবিতেও, যেমন করিয়াছিলেন জার্মানির ভিলহেল্ম বুশ, ছবি ও ছড়া দুয়োতেই যিনি একযোগে ষাঁড়ের চক্ষুটিতে তীর বিঁধাইয়াছিলেন। ক্রিস্টিয়ান মোর্গেনস্টের্ন (হয়তো সুকুমার রায় প্রসঙ্গে তাঁহার নাম মনে পড়া অযৌক্তিক নহে, বিশেষত তাঁহার ফ্রিডেল ও ক্ষাজিল কবিতাগুলি যদি মনে থাকে) সেই জন্যই বলিয়াছিলেন :

> Our language is the most bourgeois thing about us ; to strip off the bourgeois conventions in which we have taken refuge is the most urgent task of the future.

ভাবীকালের এই জরুরি কর্মটি সম্পাদন করিতে পারে কেবল তাঁহারাই। আর এই কর্মই সম্পাদন করিয়াছিলেন সুকুমার রায়, তাঁহার 'ভাবুকসভা'য় এবং 'শব্দকল্পদ্রুমে'।

২

কে তবে সুকুমার রায়কে দিয়া কথা বলাইয়া লইয়াছিল? ইহা বুঝিতে পারিলেই বোধকরি আমরা বুঝিতে পারিব কী কথা তিনি বলিতে চাহিয়াছিলেন, এবং কোন্ ভাষায়। অ্যালিসকে লাল রানী গায়ে পড়িয়া পরামর্শ দিয়াছিল : 'Take care of the sense, and the sounds will take care of themselves'। সুকুমার রায়ের ভাষার খেলা আসলে এই 'sense'-এরই যত্ন লইবার চেষ্টা—যদি ইহা নন্‌সেন্স শোনায় তো এই ধ্বনি, বলাই বাহুল্য, উঠিয়া আসিয়াছিল সামাজিক নানাবিধ অসংগতির প্রতিবিধানের তাগিদ হইতে।

বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা একটা ধাপ্পা চালাইবার সযত্ন প্রয়াস করিয়াছিল : 'লেখাপড়া করে যে / গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে।' যেহেতু ফিউড্যাল যুগে গাড়িঘোড়া চড়িবার অধিকার আসিত জন্মসূত্রে, ভগবানের সপ্রশ্রয় বদান্যতায়, অতএব বুর্জোয়া জিগির গোড়ায় বোধ হইয়াছিল প্রায় বৈপ্লবিক। এবং ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে যখন ইহারই পরিমার্জিত ঔপনিবেশিক সংস্করণ লেলাইয়া দেয়া হইয়াছিল, তখন কর্তাদের অভিপ্রায় ছিল—না, গাড়ি-ঘোড়া চড়িবার সুযোগ ততটা করিয়া দেয়া নয়—বরং কন্‌ভেয়ার বেল্ট হইতে কেরানির পর কেরানি নির্গত করা, শৌখিন ভাষায় যাহাদের বলা হইত রাইটার, লেখক (তাহাদের জন্য একটি ভবনও তৈরি করা হইয়াছিল; সেটি এখনও বহাল তবিয়তে আছে), এবং মাছিমারাদেরই ছিল যারপরনাই সমাদর। আর এই বিখ্যাত লেখাপড়া করিবার সুযোগও কি সকলে পাইত? বিবিধ শুমারি সম্বন্ধে যাঁহারা ওয়াকিবহাল, তাঁহারাই সম্যক অবগত আছেন সে-কোন্ শ্রেণীর লোক এই লেখাপড়া করিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তৎসত্ত্বেও, ছেঁড়া কাঁথা ও অতুল ঐশ্বর্যের ধাপ্পাটি চালু করিবার সুবিধা আছে বিস্তর। যদি তোমার মেধা, অধ্যবসায়, ধৈর্য, অক্লান্ত পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি বিবিধ চারিত্রিক গুণপনা থাকে, তবে তুমি পরিবেশের প্রতিকূলতা জয় করিতে পারিবে। না-পারিলে বুঝিতে হইবে তোমার মনের গড়নেই কোথাও বিষম গোলযোগ ঘটিয়া গিয়াছিল, তাই তুমি শ্রীযুক্ত অমুকের পুত্র নিতান্তই চামচিকা হইয়াছ, তোমার আর কী করিয়া পার্থিব উন্নতি হইবে, বলো। তোমারই স্বভাবদোষে এইরূপ ঘটিল, নয়তো পদ্ধতি বা ব্যবস্থায় তো কোনো ফাঁকি ছিল না। এই সর্বরোগহর শিক্ষা-ব্যবস্থার আরকটুকু গলাধঃকরণ করাইবার জন্য, ইহার গুণপনা ব্যাখ্যানা করিয়া কত যে কেতাব শিশুপাঠ্য, বা শিশুর মতো সরল শাদাসিধা বয়স্কদের পাঠ্য—রচিত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাতে এইরূপ ডজন-ডজন বই ছিল। এবং সাহেবদের অনুকরণ—কে না জানে—এতদ্দেশীয় মহাজনগণের পরম আরাধ্য। এই অবস্থায় একটি খতিয়ান প্রস্তুত করা যাক—স্মৃতি বা গ্রন্থপঞ্জিকে বেশি না-ঘাঁটাইয়াই, ধরুন এই শতাব্দীর গোড়া হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অব্দি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার রচনা করিয়াছিলেন 'চারু ও হারু' (১৯১২), 'ফার্স্ট বয়' (১৯২৭), 'লাস্ট বয়' (১৯২৭), 'উৎপল ও রবি' (১৯২৮), 'কিশোরদের মন' (১৯৩৩); যোগীন্দ্রনাথ সরকার 'মোহনলাল' (১৯১৪?); যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুরস্কার' (১৯২৬), 'মন্টু' (১৯২৬), 'মায়ের বুকে' (১৯২৬); নোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'বিদ্রোহী বালক' (১৯৩৪);

সুধাংশু দাশগুপ্ত 'পুরস্কার প্রতিযোগিতা' (১৯৩৮?); নীহাররঞ্জন গুপ্ত 'রাজকুমার' (১৯৩৮); 'শঙ্কর' (১৯৪০?); দীনেশ মুখোপাধ্যায় 'দুঃখজয়ীর জয়যাত্রা' (১৯৪০), শচীন্দ্র মজুমদার 'হারানো দিন' (১৯৪১) ইত্যাদি। তালিকা আরো বাড়ানো যায়, তবে প্রয়োজন নাই। এই বইগুলির মধ্যে প্রধানত যে সমাজতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, তাহার বিপরীত চিত্র অবশ্য চল্লিশের যুগেই ফুর্তিতে শুরু করিবে। রজত সেনের 'মাকড়শা' (১৯৪৫) পুরাপুরি অন্য চিত্র তুলিয়া ধরিবে। অরূপ, ওরফে স্বামী প্রেমঘনানন্দর 'জ্যান্ত ভূতের দল' (১৯৪৪) আরো একটি কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র রচনা করিবেন। আর খগেন্দ্রনাথ মিত্রর 'ভোম্বোল সর্দার' (১৯৩৭-৭৬), 'মধুমতীর বাঁকে' (১৯৪৪), 'বন্দী কিশোর' (১৯৪৮) ও 'রক্তমেঘ' (১৯৪৭) এমন জগতের সন্ধান দিবে যেখানে বালকগণ অর্থাভাব বা দারিদ্র হেতু পড়িবারই সুযোগ পায় না (যেমনটি দেখিয়াছিলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাটির ছেলে' উপন্যাসে, যাহা 'মৌচাকে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়াছিল ১৩৪৯ সালে)—অথবা গাঁ ছাড়িয়া টাটানগরে শিল্প শ্রমিক হইবার উদ্দেশ্যে পলায়ন করে, অথবা রসিদ আলি দিবসে পুলিশের গোলাগুলির মুখোমুখি আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেইসব বই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য এই নিবন্ধের অবতারণা নয়। আমরা শুধু মোটামুটি ভাবে বাংলা শিশুসাহিত্যের একটি ধারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছি—সুকুমার রায়কে যে-ধারার মধ্যে কল্পনা করিতে পারিলে আমরা ভালো করিব।

'সন্দেশ' পত্রিকাকে কেহ-কেহ বাংলা শিশুসাহিত্যের স্বর্ণ-যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুত, 'মৌচাক', 'রামধনু' বা আরো পরবর্তীকালে কামাক্ষীপ্রসাদ-দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রংমশালে'র সহিত 'সন্দেশে'র চারিত্রিক পার্থক্য স্পষ্টই চোখে পড়ে। কিন্তু সুকুমার রায়ের সমস্ত লেখা তো কেবল 'সন্দেশে'ই বাহির হয় নাই—যেমন 'ভাবুকসভা' বাহির হইয়াছিল 'প্রবাসী'তে, ১৩২১-এ; তাছাড়া কোনো রচনা প্রকাশিত হইয়াছে মরণোত্তর,—যেমন 'চলচিত্তচঞ্চরি, "বিচিত্রা'য় (আশ্বিন, ১৩৩৪)।

আমরা যে উপরে এলোমেলো, অসংলগ্ন গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করিয়াছি, তাহার পিছনে কী অভিপ্রায় কাজ করিয়াছে, তাহা আমরা পূর্বেই ইঙ্গিত করিয়াছি। অর্থাৎ বাংলা শিশু-সাহিত্যের প্রধান ধারাটির মধ্যে সুকুমার রায়ের স্থান কোথায়, তাহাই আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করার জন্য ঐ গ্রন্থপঞ্জির অবতারণা। কী ছিল এই বইগুলিতে? দক্ষিণারঞ্জন শিক্ষাব্যবস্থার গুণকীর্তন করিয়াছেন 'চারু ও হারু'তে; ছেঁড়া কাঁথায় শায়িত বালককে তোড়ায় বাঁধিয়া দিয়াছেন সার্থকতা ও সাফল্যের স্বপ্ন। দুঃখী চাষীর ছেলে হারু ভালো করিয়া পড়া করে, বৃত্তি পায়, মেডেল পায়, উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি হইবে, এই ইঙ্গিতেই কাহিনীর পরিসমাপ্তি। পক্ষান্তরে, আদৌ পড়া করে না চারু। জমিদারের দুলাল, বড়োলোকি দেখায়, চালিয়াতি করে, দেমাকে মাটিতে প্রায় আক্ষরিকভাবেই পা পড়িতে চায় না, কেবলই দুষ্টামিতে মন, ইয়ারবক্‌শি জুটিয়াছে যত রাজ্যের ত্যাঁদড়গুলি, তাহাদের কেহ পৌঁছেও না, বরং শেষটায় তাহাদের মাথায় গাধার টুপি পরাইয়া দেয়া হয়। বোঝা যায়, তাহারা অচিরেই পুরাপুরি গোল্লায় যাইবে। ঠিক এইমতো দেখা যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'মোহনলাল' উপন্যাসে। যাহারা পড়া-শুনা করে না তাহারা বখিয়া যায়, শেষটায় থানাপুলিশ হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড। 'দুঃখজয়ীর জয়যাত্রা' উপন্যাসে দুঃখিনী মায়ের আঁচলের নিধি, দারিদ্র নিপীড়ন নির্যাতন সহ্য করিয়া কেবল মন দিয়া পড়ে, এবং অবশেষে ডেপুটি সাহেব হইয়া ফিরিয়া আসে দেশে, অতএব 'ওরে তোরা জয়ধ্বনি কর'। ডানপিটে ছেলে, দুরন্ত, বিচ্ছু—অকস্মাৎ হার্দ্য পরিবর্তনের ফলে তাহার সুমতি আসে (যেমন দেখাইয়াছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় 'শয়তানের সুমতি' গ্রন্থে, ১৯৩৯)। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অথবা যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদাহৃত কেতাবগুলিও এইরূপ সাবধান-করা কাহিনী, অথবা আদর্শ শিক্ষাব্রতী বালকের স্থিরচিত্র। কী শিক্ষা, কেন শিক্ষা, কেমনতর শিক্ষা এ সম্বন্ধে এইসব কেতাবে কোনো প্রশ্ন নাই। দক্ষিণারঞ্জনের 'চারু ও হারু'তে রচনার ভঙ্গি ছিল লৌকিক কথাসাহিত্যের, ধরনটা প্রায় রূপকথার,—অন্যরা, হুবহু নয় বটে, তবে এই রূপকথাই শুনাইয়াছেন—কেননা লেখাপড়ার মূলমন্তরে কেহ ডেপুটি হয়, ঐ মন্ত্র না-আওড়াইলে অন্যদের রসাতলে ভরাডুবি হয়। পরে অবশ্য আরো একটি ছক রচিত হইয়াছিল: তাহাতে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছিল বিলাতি পাবলিক স্কুলের আদর্শ (যাহা বস্তুত প্রাইভ

ভেট ও এক্সক্লুসিভ স্কুলই—তাহাতে পড়িতে পারেন জবাহরলাল নেহরু অথবা মনসুর আলি খান পাতৌদিরাই)। টমাস হিউজের 'টম ব্রাউন' হইতে শুরু করিয়া পি. জি. উড্হাউসের মাইক ও স্মিথের (স্মিথের নামের বানান Psmith—পি অনুক্ত) কাহিনীপর্যায়ঃ 'বয়েজ ওউন পেপার' বা ঐজাতীয় সাময়িকপত্রগুলি যাহা পরমোৎসাহে ছাপিত। বেশি বলিবার প্রয়োজন নাই, শুধু এইটুকু উল্লেখ করিলেই চলে যে সুধাংশু দাশগুপ্তের 'পুরস্কার প্রতিযোগিতা' বা শচীন্দ্র মজুমদারের 'হারানো দিন' এইজাতীয় রচনার চমৎকার নিদর্শন। পূর্বেই বলিয়াছি, অবস্থার কিঞ্চিৎ বদলও হইতেছিল—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রজত সেন (অথবা শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'গভীর ভেতরে' ১৯৪৭) প্রমুখের রচনা ঠিক এই স্বপ্নটিকে, এই রূপকথাটিকে, পুরাপুরি বিকাইতে চাহে নাই। এমনকী দক্ষিণারঞ্জনেরও কোনো-কোনো রচনায় অস্বস্তির ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সুকুমার রায়ের আগে-পরে এই যে বাংলা শিশুসাহিত্যের চিত্র, ইহাকে মনে রাখিলেই সুকুমার রায়ের ইস্কুলের ছেলেদের গল্পগুলি অথবা নাটকগুলির মর্মার্থ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে। 'ঝালাপালা' বা 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে তিনি খুলিয়া দেখান কেমনতর শিক্ষা, কেন এই শিক্ষা বা কাহাদের জন্য শিক্ষা। তাঁহার স্কুলের পন্ডিতমশাই জমিদারের কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করিবার জন্য প্রত্যহ ধরনা দেন, তোষামোদ করেন—যেমন ধরুন কোনো পন্ডিত তাঁহার বই উৎসর্গ করেন প্রধান মন্ত্রী, অথবা শিক্ষাসচিব, নিদেন ডি. পি. আইকে। এই স্কুলের ছাত্র কেষ্টার পক্ষেই বলা সম্ভব 'লেখাপড়া করে যেই/ গাড়িচাপা পড়ে সেই'। পড়া মানেই মুখস্থ বিদ্যা, এবং কী মুখস্থ করিতে হইবে, না, 'আই গো আপ, ইউ গো ডাউন', যাহার প্রকৃত অর্থ পন্ডিতমশাই বলিয়া দেন ঃ

> 'আই'—'অক্ষি' কি না চক্ষুঃ, 'গো'—গয়ে ওকার গো—গৌ গাবৌ গাবঃ, ইত্যমরঃ, 'আপ্' কি না আপঃ সলিলং বারি অর্থাৎ জল—গরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কি না গরু কাঁদিতেছে। কেন কাঁদিতেছে? না 'উই গো ডাউন', কি না 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা—'গো-ডাউন' অর্থাৎ গুদোমখানা—গুদোমঘরে উই ধরে আর কিছু রাখলে না, তাই না দেখে, 'আই গো আপ'- -গরু কেবলি কান্দিতেছে।

এই ব্যাখ্যা শুনিয়া ঘটিরামের 'বিকট হাস্য'—সুকুমার রায় জানান। ঠিক এইরূপই বলেন 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে শ্রীখণ্ডদেব, যিনি আধুনিক 'মেটাসাইকোলজিক্যাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স' অনুসারে শিক্ষা দিয়া থাকেন, যাঁহার আশ্রমের বৈজ্ঞানিক প্রণালী হইল 'গ্রাজুয়েটেড সাইকো-থীসিস অব ফোনেটিক ফর্‌ম্‌স', যাহার দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি গোরু দোহন করেন ঃ

> গো, রু। 'গো' মানে কী? 'গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্র-দিঙনেত্রঘৃনিভূজলে', গো মানে গরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কী। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কী? 'রব রাব রুত রোদন' কর্ণেরৌতি কিমপিশনৈর্বিচিত্রং', 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত 'সুখ দুঃখ ক্রন্দন সব ঘুরতে ধুনতে ছন্দ ছন্দে বেজে উঠছে—মিউজিক অভ দি স্ফীয়ার্স—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন ক'রে কী অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে।

স্বভাবতই এহেন সুন্দর শিক্ষাব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হইলে, সবাই না-হোক, কারু-কারু মামাতো ভাই গবর্মেন্টে চাকরি পায়। তবে সে-চাকরি বজায় রাখা দারুণ কঠিন কম। কেননা মামাতো ভাইয়ের পিশতুতো ভাই যদি ভুলক্রমেও কোনো কালোয়াতি গান শোনে, যাহার বয়ান এইরূপ ঃ

> হায়রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্ত হইল
> অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধুলায় পতিত হইল
> যে দেশের শ্রেষ্ঠতার এতসব ভূরি ভূরি প্রমাণ বর্তমান
> আজকাল তাকেই কিনা—সব অবজ্ঞা করিতেছে—
> এবং দেখাচ্ছে সবাই মর্তমান
> কোথা সেই তিরিশ কোটি আটান্ন ই লক্ষ
> সাড়ে চোদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান

সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে
সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো
দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে !

তবে, গবর্মেণ্ট বাহাদুর এমনই জনমানস তৈরি করিয়াছেন যে ইহা শুনিবামাত্র কেহ আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিয়া ওঠে : 'এই সিডিশাস !' আর ইহা শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় তড়াক করিয়া লাফাইয়া ওঠেন :

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কী বললে ? রাজদ্রোহসূচক ? অ্যাঁ ?
খেঁটুরাম। তবেরে ! সিডিশাস গান কচ্ছিস কেন রে ?
দুলিরাম। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবমেণ্টের চাকরি করে।
খেঁটুরাম। হ্যাঁরে, ওর মামাতো ভাইয়ের চাকরি ঘোচানি কেন রে ?

এই যখন অবস্থা, দেশোদ্ধার শুধু তখনই সম্ভব, যদি বাবুরাম সাপুড়ে কোনোমতে গবর্মেণ্টের দাঁত-নখ-শিং-চুঁশ-ফোঁশ করিবার ক্ষমতা বিলোপ করিয়া দিয়া রেকাবিতে সাজাইয়া গুছাইয়া ফরমায়েশ মাফিক স্বরাজ আনিয়া হাতে তুলিয়া দেয়। গান্ধী এবং তাহার চেলারা পরে যেমনতর স্বরাজ চাহিবেন গোলটেবিলের বৈঠকে। অথবা যদি ব্যাঘ্রশাবককে পিঞ্জরের মধ্যে রাখিয়া উপর হইতে দু-নলা বন্দুক আনিয়া হাতে তুলিয়া দেয়, তবেই গবর্মেণ্টের সহিত যৎকিঞ্চিৎ মোকাবিলা করা যায়। কিন্তু ঐরূপ ফরমায়েশ মাফিক পরিবেশ যতক্ষণ-না সৃষ্টি হয়, ততক্ষণ 'আপনারা যেখানে বলেন—কেন্দ্রগতং নিবিশেষং, আমরা সেখানে বলি—কেন্দ্রগতং নিবিশেষঞ্চ', কেননা 'একটা কেন্দ্র চাই তো'।

কেন্দ্র না-থাকিলেই সর্বনাশ। সৃষ্টিতে ভেজাল পড়িবেই—এবং মুখ দিয়া ট্যাঁ-ফোঁও বাহির হইবে না, আর সেই ভেজাল গাঁজাইয়া উঠিয়া ক্রমাগত ঠেলিয়া-ঠেলিয়া উপর দিকে উঠিতে চাহিবে, কিন্তু উঠিতে পারিবে না, অনবরত গুমরাইতে থাকিবে। এই অবস্থায় কেহ যদি ঘটিরামের মতো বিকট হাস্য না-করে, এবং ভবদুলালের মতো কী-যেন-কী হয়, তবে সে-ই শুধু শুনিতে পাইবে, গুহ্য গূঢ় আসল কথাটি : 'শেক দি বট্‌ল্‌ ! শেক দি বট্‌ল্‌ !'

সুকুমার রায়ের রচনায় এই বোতলগুলাই খুব কষিয়া ঝাঁকানো হইয়াছিল। সাধারণত এই ঝাঁকানি, ধাক্কা, অথবা ল্যাং কষান ভাঁড়েরাই।

৩

টিল অয়লেনস্পিগেল ছিলো ফাজিল ছন্নছাড়া
মাড়ায় না উড়ুয়ে পায়ে এ-পাড়া সেই পাড়া।
পুরুৎ এবং কোতোয়ালে দোস্তি গলায়-গলায়—
পাঁচজনাকে রোজ ক্ষ্যাপিয়ে সমাজ তারাই চালায়—
টিল অয়লেনস্পিগেল বাজায় তাদের নামে কাড়া—
হা-রে-রে-রে ড়া-ড়া।

টিল অয়লেনস্পিগেল ছিলো ঢাক্‌লাগানো সং,
এই এখানে ঐ ওখানে, কতই যে তার ঢং।
সাক্ষীসাবুদ সমেত যত পাড়ার মাতব্বর
টিলের কাছে নাস্তানাবুদ- এটাই জোর খবর।
টিল অয়লেনস্পিগেল তাদের ফাঁস করে ভড়ং- -
দেশবিদেশে ঘণ্টা বাজে : ঢং ঢঙা ঢং ঢং।

টিল অয়লেনস্পিগেল (ইংরেজ সাহেবরা তাহাকে আপন করিয়া লইয়া বলে টিল আউলগ্লাস)—এই ছোকরাকে লইয়া সেই ষোড়শ শতাব্দী হইতে কত-যে গল্পকাহিনী ছড়া-গাঁথা-পাঁচালি রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাকে লইয়াই রিখার্ড স্ট্রাউস তাঁহার সিম্ফনিক কাব্য 'টিল অয়লেনস্পিগেলের হৈ-হল্লোড়' (টিল অয়লেনস্পিগেল্‌স্‌ লুস্টিগে স্ট্রাইশে) রচনা করিয়াছেন, এমিল নিকোলাউস ফন রেজ্‌নিচেক রচনা করিয়াছেন তাঁহার অপেরা। কে এই টিল ? সে ক্লাউন, সং, ভাঁড়, বিদূষক, আপদ--লোককে নাস্তানাবুদ করিয়া বেড়ায়, মহাজ্ঞানী মহাজনদের জব্দ করে, আস্ত জার্মানির এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল, সে জানিত কেমন করিয়া টান-টান চিক্কণ দড়ির উপর দিয়া হাঁটিতে হয়, কেমন করিয়া সব ভণ্ডামি, ধাপ্পা, চাটুকারিতা ও স্বার্থপরতার চিচিং ফাঁক করিয়া দিতে হয়। রুটিওলা, মুচি, জ্যোতিষী, দর্জি, ডাক্তার,

কামার, রসুইকর, পুরুৎ, ছুতোর, কশাই, কয়লাওলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক—এমন-কোনো কাজ বা পেশা নাই যাহাতে এই বহুরূপী ছোকরা হাত দেয় নাই—এমন-কোনো বৃত্তি বা পেশার লোক নাই, যাহাদের সে ফ্যাসাদে ফ্যালে নাই। প্রায় চার্লি চ্যাপলিনের ছন্দে ছন্নছাড়াটির মতোই তাহার বিচিত্র কীর্তি-কলাপ, আত্মরক্ষার অবিশ্রাম হাস্যকর চেষ্টা। ইহারই সহিত তুলনা করা চলে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের, যাহার লীলাভূমি, বিচরণভূমি, ছিল ইরান-তুরান হইতে রুশদেশ অব্দি বিস্তৃত। ইহারা মরিয়াও মরে না—তাই যুগে-যুগে তাহাদের নামে নিত্য-নতুন গল্প চালু হইয়া যায়, তাহারা হইয়া ওঠে কিংবদন্তির অমর নায়ক। বস্তুত, এই ধরাধামে তাহারা কখনো সশরীরে আবির্ভূত হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। বীরবল যদি-বা সত্যই থাকিয়া থাকেন, গোপাল ভাঁড় কি কদাপি কৃষ্ণনগরে অথবা অন্য কোথাও ছিলেন? অথচ কে তাঁহাদের বিচিত্র কীর্তি-কলাপের কাহিনী না-জানে? তাঁহাদের সকলেরই পদ্ধতি ছিল বিস্ময়করভাবে একইরকম: ধাক্কা, ল্যাং, চিৎপটাং, অথবা ঘাড় ধরিয়া সজোরে আছড়ানি আর ঝাঁকানি।

ভবদুলাল সত্যই শুনিয়াছিল ফিশফিশ করিয়া কে যেন বলিতেছে: 'শেক দি বট্‌ল্। শেক দি বট্‌ল্!'

৪

কাকতাল মাত্রেই চমকপ্রদ, তাজ্জব-করা; কোনো-কোনোটি অধিকতর। তাহারই একটি হইল সুকুমার রায় ও ইয়ারোস্লাভ হাশেকের জীবৎকাল—একজন জন্মিয়াছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে, ভারতের ন্যায় উপনিবেশে, অপরজন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যে, চেখদেশে—১৮৮৭তে—এবং দুইজনেরই মৃত্যু ১৯২৩। (এখানে অবশ্য জনান্তিকে ফ্রান্‌ৎস কাফকার কথাও বলা যায়; সাকিন প্রাহা, তারিখ ১৮৮৭-১৯২৪। কাফকার রসিকতা আরো নির্মম, আরো নিষ্ঠুর; তাঁহার রচনায় মানুষের মৃত্যু হয় অমানুষিক, অথবা গলায় ছুরির কোপ পড়িবার আগে মানুষ আবিষ্কার করে যে সে কুকুরের ন্যায় মরিতেছে। কাফকা তাঁহার দিনপঞ্জিতে তো বলিয়াই গিয়াছিলেন: 'Capitalism is not only a state of the world, but also a state of the soul' এবং তাঁহার রচনায় অমানুষিক মৃত্যু-গুলি আরো ভয়াবহ কিম্ভুতকিমাকার বিচ্ছিন্নতাবাদী জগতের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে।)

সত্য যে, সুকুমার রায় ও ইয়ারোস্লাভ হাশেকের মধ্যে হাশেকের জীবন তুলনামূলকভাবে বর্ণবহুল: তাঁহার জীবন-কথা লইয়াই একটি রোমাঞ্চকর ও হাস্যমুখর কাহিনী ফাঁদিয়া বসা যায়, এক ফোঁটাও রং চড়াইবার হয়তো দরকার পড়ে না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও রায় ও হাশেকের রচনাসাদৃশ্য নেহাৎ উপেক্ষা-যোগ্য নহে। হাশেক যখন 'প্রাণিজগৎ' সাময়িকপত্রটির সম্পাদক, তখন তিনি এমন-সব পশুপক্ষী সম্বন্ধে স্বকপোল-উদ্ভাবিত পরিচিতি লিখিতেন, এই ভূমণ্ডলে যাহাদের অস্তিত্ব নাই; কিন্তু খোদার উপর এই খোদকারি সাময়িকপত্রের মালিকেরা মোটেই সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া কিছুদিন পরেই বরখাস্ত হন। সুকুমার রায়ও—না, কোনো 'প্রাণি-জগৎ' বা 'জীববিদ্যা'র কাগজে নহে, তবুও—আর্থার কনান ডয়েলের অধ্যাপক চ্যালেঞ্জারের প্যারডি করিয়া হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরি লিখিয়াছেন—এবং হয়তো এডওয়ার্ড লিয়ারের স্বচিত্রিত উদ্ভিদবিদ্যা বা প্রাণিবিদ্যার বইও তাঁহার অগোচর ছিল না—নামগুলির মক্-লাতিন ভঙ্গিমা তাহারই ইঙ্গিতবাহী। তবে তাঁহার খিচুড়ি প্রাণীগণও খোদার উপর খোদকারির চমকপ্রদ নমুনা—শব্দের তোড়জই শুধু নয়, ছবিরও জোড়কলম এবং সেখানে তিনি বাঘে-গোরুকেও একঘাটে জল খাওয়াইতে পেছ-পা হন নাই।

মুশকিল এই যে, এখন বিশ্বসাহিত্যে ইয়ারোস্লাভ হাশেক 'শাবাশ সেপাই শ্‌ভেইক ও যুদ্ধে তাহার পোড়াকপাল' উপন্যাসটির জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার অন্যান্য রচনার সহিত চেখভাষী ভিন্ন অন্য মানুষদের পরিচয় কিঞ্চিৎ স্বল্প। তৎসত্ত্বেও যাঁহারা 'টুরিস্ট গাইড' পড়িয়াছেন (তাহার দুই একটি গল্প 'হরবোলা'/দুইতে প্রকাশিত হইয়াছে) তাঁহারাই সুকুমার রায়ের সহিত তাঁহার রচনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ করিবেন। তাহা ছাড়া হাশেক উদ্ভাবিত শ্‌ভেইকের সহিতও সুকুমার রায়ের নানা চরিত্রের মিল মনে না-পড়িয়া পারে না। বিশেষত ভবদুলাল ('চলচিত্তচঞ্চরি') অথবা বিশ্বম্ভর ('শব্দকল্পদ্রুম') কিংবা মিচকে দাশু ('পাগলা দাশু') কেদার-রামকানাই-হরিরাম ('ঝালাপালা') প্রভৃতির টিপ্পনী ও ফোড়ন; আপাত অবান্তর ও অসংলগ্ন সাত কাহন ফাঁদা ইত্যাদি

শেক দি বট্‌ল্‌। শেক দি বট্‌ল্‌।

ইত্যাদি বিষয়ের মিল কাহার না মনে পড়িবে। আর উচ্চ-পর্যায়ের দার্শনিকতা, ধর্ম, পুলিশ, ধর্মাধিকরণ, আমলাতন্ত্র ও একুশে আইন—ইত্যাদি প্রসঙ্গকে তাঁহারা যেভাবে তুলাধুনা করিয়াছেন, তাহাতেও ভাবভঙ্গি ও মেজাজের মিল চোখে পড়ে। অবশ্য তাহার প্রধান কারণ এটাই যে—

সঙের ভাষা, রং তামাশা
ক্ষিপ্র, ফিচেল, আজব, খাশা
এবং কিছু কীর্তিনাশা।

তফাৎ শুধু এইখানেই যে শ্‌ভেইক বেচারিকে প্রথম মহাযুদ্ধের ডামাডোলের ভিতর প্রচণ্ড ও প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, যাতে তাহাকে কস্মিন্‌কালেও ফুটে যাইতে না-হয়।

৫

শুনা যায়, রবীন্দ্রনাথের মনে হইয়াছিল 'ভাবুকসভা'য় নাকি তাঁহার উদ্দেশে বঙ্কিম কটাক্ষ আছে; কিংবা 'চলচিত্তচঞ্চরি'তেও—যেখানে নাকি ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ দলাদলির উদ্ভট অবস্থাই পরিস্ফুট হইয়াছে—এবং একদলের পাণ্ডা নাকি ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 'আদৌ বিচিত্র নহে/ শুনি বিজ্ঞজনে কহে'। তবে এ-কথা বলিতে বাধা নাই 'ভাবুকসভা' বা 'চলচিত্তচঞ্চরি'-তে বর্ণিত ব্যাপার-স্যাপারের তাৎক্ষণিক কোনো উপলক্ষ বা চাঁদমারি যদি থাকিয়াও থাকে, ইহারা কিন্তু সাময়িকতাকে অতিক্রম করিয়াছে। এইজন্যই যে ঐরূপ ব্যক্তিবর্গের এখনও তেমন অভাব ঘটে নাই। তবে অন্য-একটি দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত সুকুমার রায়ের সম্পর্ক কীরূপ ছিল, তাহা গভীরতর অভিনিবেশ দাবি করে। নিছক রঙ্গ অথবা কৌতুক ছাড়াও শ্লেষ-ব্যঙ্গ, পরিহাস, শ্লেষ, উপহাস বা তির্যক কটাক্ষ সুকুমার রায়ের রচনার বহুকৌণিক অর্থময়তার সম্বল, তাহার খানিকটা তিনি নিশ্চয় পাইয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিক-কার রচনা হইতে, আমাদের মনে পড়িয়া যায় 'হাস্যকৌতুক', 'ব্যঙ্গকৌতুক', 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা', কিংবা গৌড়ানন্দ কবি ভণিত 'হিংটিংছট', এমনকী 'পঞ্চভূতে'রও সুরসিক হাস্যোজ্জ্বল তর্কাতর্কি। ভাষার কারিকুরি, শব্দের বিন্যাস, উদ্ভাবনী শক্তি, ক্ষিপ্র চপল চালচলন এইসব দিক দিয়া সমান্তর নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নহে। মজার কথা এটাই যে রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে 'সে' বা 'খাপছাড়া'র যুগে কিন্তু তাঁহার গুরুমারা চেলাটিরই কসরৎ কারদানির অনেক আত্মসাৎ করিয়াছেন—ছবিতেও, লেখাতেও—অবশ্য তাহাতে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের শীলমোহর বসাইতে তাঁহার ভুল হয় নাই। খুব কম ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কনিষ্ঠ লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। গুরু-শিষ্যের এই পারস্পরিক সম্বন্ধটি বিশ্লেষণ করিলে হয়তো বাংলা কৌতুক-রচনার অনেকগুলা ক্রিয়াকৌশলই আবিষ্কার করা সম্ভব।

অবশ্য ইহা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথের 'খাপছাড়া' পর্যায়ের রচনা অনেক বেশি পরিশীলিত, 'শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ', আত্মসচেতন। সুকুমার রায়ের রচনায় যে স্বতঃস্ফূর্ত সহজ সাবলীল ভঙ্গি আছে (যদিও যাঁহারাই সুকুমার রায়ের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কাটাকুটির বহর লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন) তাহা রবীন্দ্রনাথের লেখায় নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য এবং অভি-প্রায়ও সম্ভবত ছিল ভিন্নতর। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিরা তাহাদের উদ্ভট প্রাতিস্বিকতা লইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দেয়, কখনো-কখনো রবীন্দ্রনাথ তাহাদের উদ্দেশে খোঁচা মারিতেও ছাড়েন না। কিন্তু সুকুমার রায়ের রচনায় উদ্ভট ও আজব ব্যক্তি বা প্রাণী থাকিলেও তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ, সংগঠন, শিক্ষা-ব্যবস্থা, বাঙালির ভীরুতা ও ভণ্ডামি; 'মুখেন মারিতং জগৎ' অথচ কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা—এ হেন যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য সুকুমার রায় তাহারই উদ্দেশে ল্যাং কষাইয়াছেন আর ভব-দুলালের শ্রুত ব্যবস্থাপত্রটি অনুসারে বোতল ঝাঁকাইয়াছেন। তাহার ফলে ইহার কথা বসিয়া গিয়াছে উহার মুখে, উহার হুল ইহার গায়ে; কাহার ল্যাজা কাহার মুড়া কে জানে, কিন্তু সব জট পাকাইয়া যায়; দলাদলি, ঈর্ষা, ভড়ং ও ধাপ্পা-বাজির মধ্যে উচ্চদার্শনিক ভাষণের পরিবর্তে আসিয়া হাজির হইয়াছে ধোপার হিসাবের খাতা, ময়লা কাপড়ের সংখ্যা প্রকাশ্যেই কাচিবার জো হইয়াছে। কাজের কাজটি করিবার নাম নাই, কিন্তু ভাবের প্রাবল্যে ডিস্‌পেপসিয়ার চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। কেহ নিজের ঢাক নিজেই পেটায়; কেহ চাকরির খুড়োর কল—অথবা গাধার নাকের ডগায় লটকানো গাজর—সামনে রাখিয়া এগোয়; তুচ্ছ কারণে প্রায় লঙ্কাকাণ্ড বাধে আর কি, কিন্তু পুলিশ ডাকিবার কথা বলিলেই সব উত্তেজনা নিমেষের মধ্যে ঠাণ্ডা; শব্দকল্পের মনোহারী তোড়ায় বাঁধিয়া সবাই

প্রায় যাহা শোনায় তাহা বস্তুত ঘোড়ার ডিমই; কথায় কথায় প্যাঁচ কাটে; পুঁথি-পড়া বিদ্যা নৌকা ডুবিলে বাঁচায় না—অথবা ইহাও বলে না পাগলা ষাঁড়ে তাড়া করিলে কিং কর্তব্য; মালপোয়াটুকু অন্য কাহারও গালে পড়িলেই এই প্রপঞ্চময় সংসার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা হাপিশ হইয়া যায়; রাজার কুমার না-হৌক রাজার পিশি ক্রিকেট খেলিয়া চলেন—না, ভিউস বলে নহে, কুমড়ো দিয়া; জজসাহেব আদালতে ঘুমায়; ফিচেল খাঁকে না-পাওয়া গেলেও চার আনা খরচ করিলেই ঢের সাক্ষীসাবুদ জুটিয়া যায়, অথবা হাতের কাজটি ফেলিয়া টিফিনের আগে একটু ঘুম দিলে খাবার-দাবার অনেকটাই লোপাট, আর হারুদের আপিশে... বলাই বাহুল্য, এমতাবস্থায় এ-দেশে যে একুশে আইন বলবৎ রহিবে তাহাতে আর বিচিত্র কী। শুধু কাণ্ড দেখিয়া রুমালী বিড়াল তাহার হাসিটুকু ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যায়।

শেক দি বট্‌ল্‌! শেক দি বট্‌ল্‌! কেন এই ব্যবস্থাপত্র, তাহা হয়তো বেবাক লোকে বুঝিবে না, কেহ-বা আধাআধি বুঝিবে, আর তাহারাই ইহাকে বলিবে আচানক আজগুবি হাচাভুয়া আরো কত কী - টেরও পাইবে না যে সুকুমার রায় মঞ্চে তাহাদেরই ধরিয়া বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিয়াছেন, বুঝিবে না যে মঞ্চে অনিশ্রাম পঞ্চভূত টালমাটাল পায়ে চমকপ্রদ নৃত্য করিয়া চলিতেছে।

শঙ্খ ঘোষ

অসম্ভবের ছন্দ

কোন গুণে সুকুমার রায়ের কবিতা কবিতা হিসেবে স্পর্শ করে আমাদের; রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের সমধর্মী রচনার তুলনায় সুকুমারের উৎকর্ষ, কী তাঁর অসম্ভবের ছন্দ;—এসবই বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য।

ইংরেজ সুরিয়ালিস্ট কবিরা অনেক সময়ে ভেবেছেন, টেনিসনের চেয়ে বড়ো কবি ছিলেন বরং এডোয়ার্ড লিয়ার। বিশুদ্ধ এক আজগবি জগতের স্রষ্টা হিসাবে লিয়ার বা লুইস ক্যারলের মহিমার কথা সকলেই মানবেন। কিন্তু কেবল সেই উদ্ভটের হিসেবে নয়, কবিতার হিসেবেই যদি লিয়ারের কথা ভাবতে চান কেউ, ব্যাপারটাকে প্রথমে মনে হতে পারে একটু-বা বাড়িয়ে বলা। কেন তবু ও-রকম মনে হতো ওই কবিদের? তার একটা কারণ নিশ্চয় এই যে আপাত-আজগবি এই জগৎটা আমাদের অনেকদিনের লালিত কিছু অনড় অভ্যাসকে ভেঙে দেয়, ভেঙে দেয় অনেক সুসামাজিক যুক্তি, আর এই যুক্তির মধ্য দিয়ে আলতোভাবে তা ছুঁয়ে যেতেও পারে কোনো সত্যকে। তাই, যাকে আমরা আজগবি বা উদ্ভট বা ননসেন্স বলি, গভীরতর অর্থে তার সঙ্গে এক আত্মীয়সম্পর্ক গড়ে ওঠে সুরিয়ালিজম আন্দোলনের। সে-আন্দোলনের কবিরাও ইন্দ্রিয়শাসন বা যুক্তিশৃঙ্খলের বাধা পেরিয়ে জীবনের প্রচ্ছন্ন এবং মূল চেহারায় পৌঁছতে চেয়েছিলেন একদিন। এটা স্বাভাবিক যে তাঁদের কাছে টেনিসনের চেয়ে বেশী মর্যাদা পাবেন এডোয়ার্ড লিয়ার বা লুইস ক্যারলের মতো লেখকেরা।

ঠিক তেমনি, আমাদের দেশেও, পূর্বতন অধিকাংশ কবির বিষয়ে যিনি নিতান্ত উদাসীন, সেই জীবনানন্দ তাঁর মুগ্ধতা জানান সুকুমার রায়ের 'অনন্যসাধারণ শক্তি'র কথা ভেবে। মনে হয় তাঁর: 'সুকুমার রায়ের স্বকীয়তার কথা যতই ভাবা যায় ততই বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে থাকতে হয়।' হাসির জগতের শিল্পী হিসেবে সুকুমার রায়ের প্রতিভা যে মুগ্ধ করছে কাউকে, এটা বিশেষ করে বলবার মতো কোনো কথাই নয়। কিন্তু জীবনানন্দ কি কেবল কৌতুকের দিক থেকেই দেখতে পাচ্ছিলেন এই কবিকে, না তার চেয়ে বেশি কিছু? 'পাগলা দাশু'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন সুকুমারের 'অবিমিশ্র হাস্যরসে'র কথা, তিনিও লক্ষ করেছিলেন এ-কবির 'সুনিপুণ ছন্দের বিচিত্র ও স্বচ্ছন্দ গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অভাবনীয় অসংলগ্নতা'। প্রতিভার 'স্বকীয়তা'র কথাও বলেন রবীন্দ্রনাথ, যে-স্বকীয়তা তিনি দেখেন তাঁর 'বিশুদ্ধ হাসির দান'-এর মধ্যেই। কিন্তু জীবনানন্দ যখন লেখেন সুকুমার রায়ের প্রসঙ্গে, তখন নিজের ধরনেই তাঁর মনে পড়ে 'আমাদের এই পৃথিবীর ভিতরেই আরো অনেক পৃথিবীর' প্রসঙ্গ। এ-পৃথিবীকে খুঁজে পায় কোনো সৃষ্টিপরায়ণ মন, তার মধ্য দিয়ে সে-মন ধরে

দেয় আমাদের পরিচিত জগতেরই একটা 'কুয়াশাচ্ছন্ন অথবা বিদ্যুতান্বিত' রূপ। 'কিন্তু'—বলেন জীবনানন্দ—'সুকুমার রায়ের পৃথিবী আবোলতাবোল-এ যা সত্য হয়ে ফলে উঠেছে তা মোটেই আমাদের চেনাজানা পৃথিবী কিংবা তার প্রতিচ্ছবির মতো বাস্তব না হয়েও তেমনি পরিচিত ও তেমনি সত্য।'

সৃষ্টিপরায়ণ অন্য মনের তুলনায় সুকুমার রায়ের একটা স্বাতন্ত্র্যই দেখেন জীবনানন্দ, কিন্তু সে-স্বাতন্ত্র্য নিছক হাসির কারণেই নয়, বাস্তব না হয়েও সত্যকে ধরবার ভিন্নতর একটা বৈশিষ্ট্যে। এই বৈশিষ্ট্যে সুকুমার রায়ের লঘু জগৎ হয়ে দাঁড়ায় উপলব্ধিরও এক জগৎ। অনভ্যস্ত পাঠক একদিন সুরিয়ালিজমের আন্দোলনে দেখেছিলেন কেবল অর্থহীন আবোলতাবোল, জীবনানন্দের মতো আধুনিক কবিরা একদিন ধিক্কৃত হচ্ছিলেন অসংলগ্ন প্রলাপ বলার দায়ে। আর জীবনানন্দের মতো কেউ কেউ উদ্ভট এই ছড়াছবির মধ্য দিয়েও পেয়ে যাচ্ছিলেন বাস্তবে-অবাস্তবে মেশানো একটা গণনীয় পৃথিবী, সৌন্দর্যের কোনো চকিত স্ফুরণ, কবিতারই কোনো অন্য ধরনের স্বাদ।

লিয়ার বা সুকুমার রায়ের মতো লেখকেরা তাই ঘুরে বেড়ান একই সঙ্গে দুই ভিন্ন তলে : ছোটোদের আর বড়োদের দুই তল, রঙ্গের আর সত্যের দুই তল। সুকুমার রায়ের বিষয়ে আরো একটু এগিয়ে হয়তো বলা যায় : খেয়ালের আর কল্পনার দুই তল। এ দুই তলের মিলনেরই একটা ইঙ্গিত ধরা আছে 'আবোলতাবোল'-এর সূচনা-কবিতায়। সে-কবিতায় খ্যাপামিকে আহ্বান করেন সুকুমার রায়, যেমন রবীন্দ্রনাথও একদিন করবেন তাঁর 'খাপছাড়া'য়। বৃদ্ধের খোলস খসিয়ে সেখানে একটু চপলতা করতে চাইবেন রবীন্দ্রনাথ, বলবেন, 'মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক', আর তার কৈফিয়ৎ হিসেবে জানাবেন যে বিধির চারটে মুখে আছে চার রকমের রীতি। একটাতে দর্শন, একটাতে বেদ, একটাতে কবিতা, আর 'একটাতে হো হো রবে/পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বসিয়া।' রবীন্দ্রনাথের ছিল স্বতন্ত্র বহু মুখচ্ছবি, তাই এদের এত আলাদা করে নিতে পেরেছিলেন তিনি, কিন্তু সুকুমার রায়কে একই মুখে ধরতে হয় এই কবিতা আর পাগলামি, তাই 'খেয়ালখোলা'কে ডাক দেন তিনি 'স্বপনদোলা'য়। খ্যাপার গানে যে কোনো মানে নেই সুর নেই, সেকথা বলবার পরেই তিনি লিখতে পারেন 'উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন্ সুদূর'-এর মতো নিছক রোম্যান্টিক কোনো লাইন। অসম্ভবের গানই তিনি করেন বটে, কিন্তু তারই ভিতরে ভিতরে তিনি রেখে যান সেই অসম্ভবের এক ছন্দকেও। সেইখানে তিনি কবি।

২

কবিতার মধ্য দিয়ে আমরা জীবনের একটা গড়ন খুঁজে নিতে চাই, পেতে চাই জীবনযাপনের একটা মানে। খানিকটা অগোচরে, খোঁজার এই কাজটা শুরু হয়ে যায় আমাদের ছেলেবেলা থেকেই। টুকরো টুকরো অসংলগ্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে একটু একটু করে বড়ো হয় একজন, নিজের মনে বানানো তার অবস্থা জগতের সঙ্গে বড়োদের চালচলনের কোনো সামঞ্জস্য খুঁজে পায় না সে, কিন্তু খুঁজতে চায়। সে বুঝতে চায় নিজেকে, বুঝতে চায় তার চারপাশকে।

কিন্তু কীভাবে সে তা বুঝবে? এ কি অভিভাবকের কোনো উপদেশবাক্যের মধ্য দিয়ে সম্ভব? এ কি রচিত কোনো নীতিসুধার মধ্য দিয়ে সম্ভব? সেটা বরং অনেকসময়ে উলটো কাজই করে, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এই এক নিয়মের ছক তার মনকে বরং বিরূপ করেই তোলে। ছোটোরা তাদের অবস্থা মনের সঙ্গী করে নেয় শিল্পের জগৎকে। ছবিতে ছড়ায় রূপকথায় খামখেয়ালে তারা তৈরি করে নেয় একটা সমান্তরাল পৃথিবী, সেইখান থেকে তাদের কাছে জেগে উঠতে থাকে বাস্তব জীবনের একটা মানে।

ছোটোদের জন্য লেখা তাই খুব শক্ত কাজ। লেখক যদি মনে করেন চলতি সমাজের মূল্যগুলিকে ভাঙতে চান তিনি, ছোটোদের মন থেকে সরিয়ে দিতে চান ভুল সংস্কারগুলিকে, আর এইভাবে তার সামনে সাজিয়ে দিতে চান জীবনযাপনের একটা স্বাস্থ্যময় ছবি, তাহলে কীভাবে সেটা করবেন তিনি? এই ভাঙার কাজটাও যাতে রূঢ়ভাবে আঘাত না করে কোনো কিশোরমনে, যাতে খুব সাবলীলভাবেই সে পৌঁছতে পারে বোধে, সেইদিকে তাঁর লক্ষ্য চাই তাই। তাই অনেকসময়ে তাঁকে খুঁজে নিতে হয় হাসির চাল, খেয়ালখুশির হালকা হাওয়ায় তিনি করতে পারেন সেই কাজ, আর বাঁচতে শেখানোর সে-কাজে সবচেয়ে বড়ো দায়িত্বটাই হয়ে ওঠে সবকিছুর সঙ্গে নিজের

কোনো যোগ দেখানো। সুকুমার রায়ের হাসির জগৎ এই যুক্ত করার যুক্ত হবার জগৎ।

'সবাই নাচে স্ফূর্তি করে সবাই গাহে গান/একলা বসে হাঁড়িচাঁচার মুখটি কেন ম্লান?' এই প্রশ্ন থেকে এক সংলাপ-ধারা শুরু হয়েছিল 'সঙ্গীহারা' কবিতায়। শালিখ মাছরাঙা বা পায়রা কোকিল চন্দনা টুনটুনি, সবারই আছে কোনো-না-কোনো দোষ, এই ভেবে একলা হয়ে আছে একজন, কেননা সবারই সে খুঁৎ পেয়েছে, 'নিখুঁৎ কেবল নিজে'। এইসব হাঁড়িচাঁচা অথবা রামগরুড়ের কাছে পৃথিবীতে সবই কেবল সরিয়ে দেবার জিনিস, কিছুই আর আপন করে নেবার মতো নয়। যেন তারই একটা উলটো দিক হিসেবে সুকুমার রায় আমাদের শোনান 'তুমিও ভাল আমিও ভাল'র তালিকা, কিংবা 'হাসছি মোরা হাসছি দেখ'র উচ্ছ্বাস, আর অন্যদিকে আমাদের সামনে সাজিয়ে ধরেন বাতিকগ্রস্তদের এক দীর্ঘ মিছিল। বাতিকে-ভরা তাঁর পৃথিবীর প্রায় সব চরিত্রেরই থেকে যায় কোনো-না-কোনো খুঁৎ, সামাজিকের সুভদ্র হিসেবের বাইরে থেকে যায় তারা, কিন্তু তাদের আমরা দেখতে শিখি অনেকটাই প্রশ্রয়ের চোখে, নৈকট্যের টানে, হাসির ঔদার্যে। আর, হয়তো-বা, তাদের দিকে তাকিয়ে নিজেদেরও আমরা দেখতে শিখে যাই ছোটোবেলা থেকেই। সুকুমার রায়ের এইসব হাসি অনেক-সময়ে নিজেকে নিয়েই হাসি, নিজের একটা সম্ভাব্য রূপকে নিয়ে।

সম্ভাব্য এইসব রূপ নিয়ে একে একে এখানে দেখা দিতে থাকেন হেড-অফিসের বড়োবাবুটি, খোশমেজাজের গায়ক ভীষ্মলোচন, আজব কল বানানো চণ্ডীদাসের খুড়ো, লড়াই-খ্যাপা পাগলা জগাই, গোটা ছয় জ্যান্ত রোগীর খোঁজে হাতুড়ে ডাক্তার টিফিন রক্ষায় সাবধানী চালধারী, বুঝিয়ে বলার নেশায় মাতা বুড়ো, স্কুটোস্কোপধরা উৎসাহী বিজ্ঞানী, ষাঁড়ের তাড়ায় বিহ্বল কেতাবসর্বস্ব পণ্ডিত, শনির তাড়ায় ত্রস্ত নন্দখুড়ো, আর এই রকমই অনেক অনেক। এসব চরিত্রের মধ্যে অনেকসময়েই থেকে যায় আলতো একটা সমালোচনা, ব্যক্তিগত বা সামাজিক কোনো অসংগতির দিকে চকিত দৃষ্টি-পাত, এমন কী সরাসরি কোনো সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়েও একটা-কোনো কৌতুক। সেই অর্থে নিশ্চয় এরা নিছক খেয়াল নয়। সন্দেহ নেই যে লড়াইখ্যাপা পাগলা জগাই উঠে আসছে পৃথিবী-জোড়া প্রথম যুদ্ধেরই পট থেকে। 'সাত জার্মান জগাই একা', তবুও যে সে তিড়িং বিড়িং নাচে, তার সঙ্গে নিশ্চয় আমরা মিলিয়ে নিতে পারি 'সন্দেশ' পত্রিকায় আরো একটি গদ্য-লেখাকে ('বিলাতে শিখ সৈন্য'), ওই কবিতাটির পর-পরই ছাপা হয়েছিল যে-লেখা, যেখানে একজন সৈন্য চিঠি লিখছে তার বাবাকে: 'বোমা গায় লাগিল না, তাহার হাওয়াতেই শার্দুল সিং মরিয়া গেল। তারপর অসংখ্য জর্মান আসিল, আমরা তাহাদিগকে মরিয়া ফেলিলাম......রাত্রে তাহারা আবার আসিয়া বিজলীতে আসমান ঝলসাইয়া ফেলিল...আমরা আবার তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলিলাম।...সেখানে একটা গাছ আছে, সেই গাছে হরেক জাতের সিপাহীর টুকরা বোমার চোটে হাওয়ায় উড়িয়া আসিয়া ঝুলিতে থাকে। হিন্দুস্থানী পাগড়ী আর সাহেবদের টুপী আর বুট সব সেখানে আছে।' এর পাশাপাশি সাজিয়ে দেখলে, 'ভীষণ লড়াই হলো/পাঁচ ব্যাটাকে খতম করে জগাই দাদা মোলো'র মতো লাইন বিশেষ একটা তাৎপর্য পায় নিশ্চয়ই। কিন্তু ভিতরের সেই যোগ সত্ত্বেও এর ঝোঁকটা সমালোচনার দিকে তত নয়, যতটা আগ্রহ কেবল মজাদার এই আচরণগুলিকে সাজিয়ে দেখার দিকে।

এটাও লক্ষ করবার যে এসব বাতিকগ্রস্তদের অনেকেই বেশ বুড়ো। ছোটোদের চোখে বয়স্কদের ধরনধারণকেই মনে হয় উদ্ভট, লিয়ারের লিমেরিকগুলিতে প্রায়ই কেন্দ্রে থাকে বাহাত্তুরেরা: লম্বা-নাকের বুড়ো বা দাঁতখিঁচুনি বুড়ো, ট্রেনফেলকরা বা মগডালে-চড়া বুড়ো, খরগোশের বা ঝড়িঙের পিঠে বুড়ো। সুকুমার রায়ও তেমনি দেখান কাঠবুড়ো বা কাতুকুতুবুড়ো খুঁৎধরাবুড়ো বা মগজহীন উলটো-নাচের বুড়োদের ভিড়। এদের বেলায় নামের সঙ্গেই গেঁথে দেওয়া আছে বুড়ো শব্দটি। অন্য অনেক সময়ে শব্দটি হয়তো নেই কিন্তু বিবরণে আর ছবিতে বোঝা যায় যে, সব বাতিকই পৌঁছচ্ছে তাদেরই বয়সের গণ্ডিতে। স্বাভাবিক এখানে কেবল একজন, বদ্যি বুড়ো। সারাদিন না খেলে তার খিদে পায়, চোখ দিয়ে সে দেখে, কান দিয়ে শোনে। এতই সে স্বাভাবিক যে সেটাই এক অস্বাভাবিক কাণ্ড।

আর ছোটোরা কী করে আবোলতাবোলের এই দেশে?

তারা কখনো আহ্লাদী কখনো ডানপিটে কখনো কাঁদুনে, তারা কেউ ভুল করে কেউ ঝগড়া করে, হিংসুটে কেউ, কেউ-বা লোভী, আর তাদের অনেকেরই নিশ্চয় কেতাবের সঙ্গে আড়ি। এইখানে এসেই সুকুমার রায়ের শিশুকিশোর পাঠকেরা মস্ত এক বিস্তার পেয়ে যায়, 'ভালো ছেলে' হবার সুনৈতিক দায় থেকে মুক্তি পেয়ে যায় তারা, পরম স্বস্তিতে দেখে যে তাদেরই মতো ছেলেমেয়েদের সংসারে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ছে তারা, তাদেরই মতো পদে পদে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যারা, অন্যকেও অপ্রস্তুত করে তোলে কখনো-বা।

চরিত্রের—এমনকী শরীরেরও—কয়েকটি মজাকে সাজিয়ে দেখবার ধরণটা লিয়ার থেকেই পেয়েছিলেন সুকুমার, এটা হয়তো অনুমান করা যায়। লিমেরিকগুলিতে নাকের দৈর্ঘ্য নিয়ে যে ব্যতিব্যস্ততা প্রায়ই দেখতে পাই, তাও এসে পৌঁছবে আমাদের কবির হাতে : 'এক যে ছিল সাহেব তাহার/গুণের মধ্যে নাকের বাহার', আর সেই নাকে মুলো ঝুলিয়ে গাধার পিঠে চলতে থাকবেন সাহেব। অন্যদিকে, 'আবোলতাবোল'এর বাতিকগ্রস্তদের একটা প্রধান বাতিক যে কেবল অনিচ্ছুকদের তাড়া করে বেড়ানোতে, তার অনেক নজির মিলবে রবীন্দ্রনাথের 'হাস্যকৌতুক'এর মধ্যে। 'বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,/অর্থাৎ কিনা লাগছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে' এসব ব্যাখ্যা থেকে অথবা 'অবুঝ' কবিতায় 'শ্মশানঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর' কথাটির মানে বোঝাবার ধরণ থেকে আমাদের অবধারিত মনে পড়ে 'সূক্ষ্মবিচার'এর চণ্ডীচরণকে, কিংবা 'আর্য ও অনার্য'র চিন্তামণিকে, অথবা 'গুরুবাক্য'র শিরোমণিকে। তেমনি, 'গন্ধবিচার' পড়তে গিয়েও 'জুতা আবিষ্কার' বা 'হিংটিংছট'এর রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়া একেবারে অসম্ভব নয়। অর্থাৎ, এই চরিত্রমিছিলে একটা দিক আছে যেখানে সুকুমার একক নন, অনৃণীও নন।

কিন্তু এইসব চরিত্রের সঙ্গে জীবজগৎ আর কাল্পনিককে মিলিয়ে নিয়ে যে খ্যাপামি ছড়িয়ে দেন তিনি, তার প্রবলতায় অনুজই আবার হয়ে দাঁড়ান উত্তমর্ণ, তখন অগ্রজেরাই যেন অনুসরণ করেন তাঁকে। ১৯৩১ সালের 'সন্দেশ' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'সে' গল্পটির সূচনা হলো যখন, তাঁর রচনায় তখন থেকে দেখা দিচ্ছে নূতন একটা উদ্ভটের ভঙ্গি, যেখানে তিনি চাইছেন 'বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই'। অনেকদিন পর নির্ভেজাল এই হাসির মরিয়া চেষ্টায় স্মৃতিরত্নমশায়ের গোলকাঁপার থেকে হাঁচিয়েন্দানি কোরুক্ষুণা পর্যন্ত অনেক কিছুই শুনতে পাই আমরা 'সে' গল্পের অসম্ভব হিসেবে। এই অসম্ভবের সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের মনে সুকুমার রায়ের রীতি যে কাজ করে কিছুটা, তা লক্ষ করা শক্ত নয়। সংগতিহীন-ভাবে এক থেকে আরেকটায় ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে চলবার ভঙ্গিতেই শুধু নয়, হাঁচয়েন্দানি ধরনের শব্দকল্পনাতেও সুকুমার রায়ের হ্যাংলাথেরিয়াম বা চিল্লানোসোরাসের কথা মনে পড়তে পারে কারো, প্রভেদ কেবল এই যে একজন মানুষ, অন্যেরা জীব মাত্র। গেছোবাবা আর গেছোদাদার নামের সাদৃশ্যটাও নিশ্চয় উড়িয়ে দেবার নয়। আর তারপর, 'খাপছাড়া' বা 'ছড়া'য় যখন পৌঁছবেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর রচনায় তখন সুকুমার রায়ের চলাচল আরো প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে এইসব উচ্চারণে : 'জজ বলে, গোঁফ পেলে রবে মোর সম্মান' (ছড়া ৪) বা 'রাম-ছাগলের গম্ভীরতা কেউ করে না মান্য' (ছড়া ১) কিংবা দণ্ড-বিধান হিসেবে 'জাপান হতে শ্বেত কাক খুঁজিয়া/নাসাপথে পাখা দাও গুঁজিয়া/হাঁচি তবে হবে শত শত বার/নাক তার শুচি হবে ততবার' (ছড়া ১)। সুকুমার রায় জানবার পর এসব লাইন আমাদের আর অপরিচিত লাগে না।

কেবল রবীন্দ্রনাথ নন, অবনীন্দ্রনাথও তাঁর শেষ পর্বে যখন 'কল্পনার হিস্টিরিয়া'য় ভরিয়ে দিতে চান লেখা, তিনিও হয়তো কিছু ইশারা-ইঙ্গিত পান সুকুমার রায়ের সান্নিধ্য থেকে। তাঁর 'খাতাঞ্চির খাতা' ছাপাও হয়েছিল 'সন্দেশ' পত্রিকায়। সুকুমার রায় বেঁচে ছিলেন তখন, আর এ-গল্পের জন্য ছবিও এঁকে দিয়েছিলেন তিনি। অবনীন্দ্রনাথের আরো অনেক লেখার মতো 'খাতাঞ্চির খাতা'তেও আছে ভাবানুবাদ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক যে তাঁর স্বাধীন বর্ণনা-কল্পনাও জুড়ে আছে এর মধ্যে। এ-বইটির নিকটসময় থেকে তাঁর লেখায়ও আমরা দেখতে পাব মেজাজের একটা বদল। দেখব যে নিবিড় স্বপ্নাচ্ছন্নতার মণ্ডল থেকে, আবেশ বা কারুকার্যের রঙিন বা ধূসর পৃথিবী থেকে নিজেকে তিনি সরিয়ে আনছেন উদ্ভটের রঙ্গে, যেখানে পুঁথিতে-পালায় গল্পে-কবিতায় কেবলই উজ্জ্বল আর রঙ্গময় হয়ে উঠছে তাঁর কলম। সেসব রচনায় মর্যাদাময় অনেক

পৌরাণিক চরিত্রকে একটানে তিনি নামিয়ে আনতে পারেন অবাধ পরিহাস্যতায়, কিষ্কিন্ধ্যা বা লঙ্কাকে মিলিয়ে নিতে পারেন জোড়াসাঁকোর আশেপাশে, এবং লিখতে পারেন :

> যেমনি এই কথা বলা, অমনি পুজোর কোশা ছুঁড়ে মেরেছে ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের মাথায়। বিভীষণ চিৎপটাং— তেলো ফেটে রক্তপাত। পড়ে পড়েই বলছেন—লক্ষ্মণ, শীঘ্র বেটাকে পেড়ে ফেল।
>
> (মহাবীরের পুঁথি)

অথবা সেখানে তুড়িজুড়ি গান গায় :

> পাগলে কি না বলে রামছাগলে কি না খায়
> রামঃ, কান দিতে নাই লোকের কথায়।
>
> (যাত্রাগানে রামায়ণ)

কিংবা :

> চুপ দোন চুপ দোন রামচন্দ্র এসতেছেন
> পদশব্দ হতেছেন শ্রবণগোচর।
>
> (ঐ)

বা কুম্ভকর্ণের সংলাপ :

> কুম্ভকর্ণ অবতার রক্ত খায় ভারে ভার
> কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ ব্রহ্মরক্ত তপ্ত তপ্ত
> শক্ত শক্ত দুষ্মার হাড় আছে ক্রুস তার
> কুম্ভ কুম্ভ কুম্ভ করে পার।

তখন, এসব অংশের পাশে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এর রচয়িতাকে মনে পড়তে পারে একবার। এটা হয়তো কাকতালীয় নয় যে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এ-ধরনের লেখাগুলি শুরু করেছিলেন 'সন্দেশ' পত্রিকায় 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ছাপা হবার বেশ কিছু পর থেকে।

অথচ, কৌতুকের চরিত্রে এঁদের রচনার পরিণাম ঠিক একরকম হয় না। অবনীন্দ্রনাথের পালাপুঁথিগুলি ভরাট হয়ে উঠছে ঘটনার পর ঘটনায়, খ্যাপামির পর খ্যাপামিতে যেন শেষ নেই তার। রবীন্দ্রনাথেরও গল্পছড়া কখনো শব্দের খেলায় কখনো চরিত্রের সমাবেশে ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে কেবলই। কিন্তু সুকুমার রায়ের লাবণ্য আর স্বাচ্ছন্দ্য সেখানে নেই। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা লেখার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন একবার, পরিমাণসামঞ্জস্য রাখতে পারেননি বলে তাঁর কবিতা আটকে গেছে গদ্যের সীমাতেই। সেই কথাটিকে আমরা ঘুরিয়ে আনতে পারি এখানে, রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের কৌতুকসৃষ্টির সমস্যাতেও। 'সে' এক হিসেবে নিশ্চয় স্মরণীয় রচনা, 'খাপছাড়া' বা 'ছড়া'র মধ্যে শব্দে-ছন্দে-প্রতিমায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত শক্তির ঝলকানি দেখতে পাব নিশ্চয়, কিন্তু এর কোনোটাতেই মন খোলা-একটা জায়গা পায় না, উপাদানের বাহুল্যে একটু-যেন আড়ষ্ট হয়ে আসে তাদের কল্পনা। সত্যজিৎ রায় অনুযোগ করেন, রবীন্দ্রনাথের ছড়ার প্রথম লাইনেই যখন দেখি 'শিখ' তখনই আমাদের কৌতূহল চলে যায় মিলের দিকে, বক্তব্যটা হয়ে যায় গৌণ। সেকথা অনেকসময়ে ঠিক বটে, কিন্তু এই মিলের দিকেই যে রাবীন্দ্রিক ছড়ার একমাত্র টান তা নয়, আর অন্যপক্ষে সুকুমার রায়ের লেখাতেও মিলের চমৎকারিত্ব মাঝে মাঝে আমাদের মন কাড়ে। মর্যাদায়/লজ্জা পায়, বক্তৃতা/সত্যি তা, শাঁখচুনি/ডাকছনি, দিন সে/হিংসেয়, চিৎপটাং/পিঠ-সটান, ঘেঁষটে/ভস্তে, নাচন পায়/আচমকায়, বা এই ধরনের মিলে সুকুমার রায়ও আমাদের চমকে দেন মাঝে মাঝে। কথাটা বরং এই যে, বক্তব্যের বা ছবিরই একটা ঠাসবুনোট তৈরি হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের ছড়ায়, অতিবাচন এখানেও ভর করে তাকে, আর তাঁর খেয়ালটাও যেন গড়ে ওঠে প্রায় বুদ্ধির জোরে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন বটে 'বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই', কিন্তু সেই বুদ্ধির চাতুর্য এখানে পদে পদে আচ্ছন্ন করে তাঁকে। খেয়ালী হিসেবে খেয়ালের জগতে যান না তিনি, সেটাকে বানিয়ে তোলেন কুশলী হিসেবেই। আর অবনীন্দ্রনাথের খেয়াল আসে অজস্রতায় ঝাঁপিয়ে, কুশলতাকে যেন তখন গ্রাহ্য করেন না একেবারেই, স্রোতের টানে ভেসে চলেন সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে, আর সেই কারণে সেখানেও খেই হারিয়ে ফেলে ছোটোদের মন। সুকুমার রায় জানেন এ-দুয়ের মধ্যে কোনো সামঞ্জস্যের পথ। কৌশলকে কীভাবে লুকোতে হবে আর বলতে হবে কতটুকু, সে-বিষয়ে তাঁর পরিমিতিবোধই তাঁর সবচেয়ে বড়ো সম্বল।

'পাগলা দাশু'র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'তাঁর ভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য ছিল সেইজন্যেই তিনি তার বৈপরীত্য এমন খেলাচ্ছলে দেখাতে পেরেছিলেন।' এখানে এই 'সেইজন্যেই' অব্যয়টি লক্ষ করবার মতো। এও আমাদের মনে পড়ে যে লুইস ক্যারল বা লিয়ারও ছিলেন এই-

রকমই 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির' মানুষ, আর তাঁদের হাসির জগৎ গড়ে উঠেছিল এরই সঙ্গে এক আড়াআড়ি সম্পর্কে। বৈজ্ঞানিক এই মন মানবচরিত্রের অনুপুঙ্খগুলিকে দেখতেও পায় যেমন, তেমনি তাকে খেয়ালের মধ্যে সাজিয়ে নিতে পারে রচনাগত এক যাথার্থ্যে।

এই যাথার্থ্যে, তাঁর ছড়াগুলির শব্দ আর ছন্দ বিষয়ে কেবলই সতর্ক থাকতে হয় সুকুমারকে, স্বতঃস্ফূর্ত খুশির ওপর নির্ভর করেন না তিনি। 'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি'র মতো লেখাটির মজাও যে তৈরি করতে হয়েছিল কত বদলের মধ্য দিয়ে, মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি থেকে সকলেই দেখতে পাবেন সেটা। কিন্তু কেবল পাণ্ডুলিপি থেকে মুদ্রণে নয়, পত্রিকা থেকে বইতে নেবার সময়েও রোগাচ্ছন্ন কবি নিজেকে যে কতটাই ব্যস্ত রাখেন এই শোধনের কাজে, 'সন্দেশ'এর সঙ্গে 'আবোলতাবোল'-এর লেখাগুলি মিলিয়ে দেখলে তা বোঝা যায়। বোঝা যায় যে, পত্রিকাপাঠকদের প্রশ্রয় পাবার পরেও সুকুমার রায় তৃপ্ত হন না নিজে, গ্রহণবর্জনে সচেতন রাখেন তাঁর বৈজ্ঞানিক/শিল্পী মনকে। এই সচেতনতায় 'সাবধান' কবিতার 'মহামহোপাধ্যায় গজিয়েছে পুচ্ছ'র মতো অংশকে ছেড়ে দেন হয়তো একটু ভারি শোনাচ্ছে বলেই। ছেড়ে দেন 'দেখ না পাঁড়েজি সেথা স্নান করে নিত্য/তবু তো সারে না তার বায়ু কফ পিত্ত'র মতো দুটি লাইনও, কেননা এ-কথাটার একটা বাস্তব সংগতি আছে, মানে হয়ে যায়, গোটা কবিতার সঙ্গে বেমানান লাগে সেটা। ছেড়ে দেন 'কুমড়োপটাশ' থেকে শেষ স্তবকের অকারণ বিস্তার: 'কুমড়োপটাশ চটলে পরে ঘটবে তখন কি যে/বলব কি ছাই বুঝাই কারে বুঝতে না পাই নিজে', কেননা এর সব কথাটাই বলা আছে এর আগে সারগর্ভ শব্দ তিনটিতে: 'বুঝবে তখন ঠেলা'।

শেষ এই কবিতাটিতে অবশ্য বাড়ানোও আছে একটা টুকরো। চারের স্তবকটা লেখা হয়েছে নূতন ক'রে, আর তারই ফলে আমরা পেয়েছি 'হুঁকোর জলে আলতা গুলে লাগায় গালে ঠোঁটে'র মতো অনবদ্য লাইন। একটি-দুটি এ-রকম নূতন লাইনে অথবা ঈষৎ পালটে দেওয়া লাইনে কতখানি যে বদলে যায় স্বাদ, তার আরো দু-একটি উদাহরণ বলা যায় এখানে। আজ ভাবাই শক্ত যে 'গোঁফচুরি'র প্রসিদ্ধ শেষ লাইন-দুটি আগে ছিল:

গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো বোঝা?
'গোঁফের আমি গোঁফের তুমি এই ত বুঝি সোজা।'

'বোঝা'র বদলে 'কেনা' শব্দটি আসবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসে যায় একটা বাড়তি মাত্রা, গোঁফের স্বাধীন সত্তা, আর 'তাই দিয়ে যায় চেনা'র ঘোষণাটি গোটা রচনাকে তুলে নিয়ে যায় চির-স্মরণীয়তায়। কিংবা ধরা যাক 'কাঠবুড়ো'। দুটি লাইন বর্জিত হয় এখানেও, বেশ কয়েকটি শব্দেরও হয় বদল। কিন্তু সেসব বদলের চেয়ে অনেক জোর নিয়ে দেখা দেয় সামান্য একটি হেরফের, যখন 'আকাশেতে ঝুল নাই, কাঠে কেন গর্ত' থেকে সবে এসে লেখা হলো 'আকাশেতে ঝুল ঝোলে কাঠে তাই গর্ত'। প্রথমটিতে দুয়ের মধ্যে কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই। আকাশেও কোনো অসংগতি নেই, কাঠেই বা তবে গর্ত থাকবে কেন, এই সহজ প্রশ্ন সেখানে। কিন্তু আকাশে ঝুল আছে বলেই কাঠের মধ্যে গর্ত দেখা দিল, এই সম্পর্কের সৃষ্টিতে ছবিটির একেবারে মেজাজের বদল হয়ে গেল মনে হয়।

এই লেখাটি থেকে অবশ্য অন্য একটি ছোটো সমস্যার সামনেও পৌঁছই আমরা। এখানে বর্জিত একটি অংশ: 'কাঠকে যে কাষ্ঠ কয়, এত বড় অন্যায়', আর 'পূর্ণিমার রাত' পালটে হলো 'একাদশী রাত'। শেষ পরিবর্তনটা কেবল আলো কমাবার জন্যেই নয়, মাত্রা কমাবার জন্যেও বটে। প্রথমটির বর্জনও ছন্দসংগতির কারণেই। চারমাত্রা, ছমাত্রা, আর নানা বিন্যাসের স্বরবৃত্তের ছন্দসিদ্ধ এই কবি কীভাবে যে ওই 'কাষ্ঠ' আর 'পূর্ণিমা' ওখানে লিখতে পেরেছিলেন, সেই এক সমস্যা। দ্রুততা? আকস্মিকতা? প্রথম পাঠে এ-রকম অল্প-সল্প স্খলন আরো যে ঘটত তাঁর, 'অতীতের ছবি' নামের দীর্ঘ অসম্পূর্ণ এবং অশোধিত রচনাটির মধ্যে তার কিছু চিহ্ন থেকে গেছে। চিহ্ন থেকে গেছে 'বিষম কাণ্ড' ধরনের কোনো-কোনো লেখাতেও, যেখানে স্বরবৃত্ত-মাত্রাবৃত্তে আছে এক অস্থির চলাচল। 'তড়বড়িয়ে বুক ফুলিয়ে শুতে যাচ্ছেন রাস্তে'র পরেই সেখানে দেখা দেয় 'তেড়ে হন হন চলে তিন জন জেন পল্টন চলে'। বইতে নেবার সময়ে এসব নিশ্চয় সামলে তুলতেন তিনি, তবু, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সমকালে ছন্দের টুংটাং না করেও ছন্দো-বৈচিত্র্যে যিনি ভরে রেখেছেন লেখা, তাঁর এ-রকম দু চারটি অন্যমনস্কতাও বিস্ময়কর লাগে।

শব্দ আর ছন্দের ধ্বনিগত আকর্ষণ সুকুমার রায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, অনুকার শব্দে ভরে আছে তাঁর লেখা, শব্দ-ব্যবহারের ব্যাকরণগত কৌতুকও তিনি ধরিয়ে দিতে চান পাঠকদের, এসব কথা ঠিক। কিন্তু সঙ্গেসঙ্গেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে এখানে আছে তাঁর দ্বিতীয় স্তরের রচনা, অন্তত সুকুমার নিজে নিশ্চয় মনে করতেন তা। আমরা লক্ষ করব যে 'সন্দেশ'এর পাতা থেকে যখন তাঁর প্রথম বইটির রচনা নির্বাচন করছেন তিনি, তখন রচনার বা প্রকাশের কোনো কালক্রম মানেননি সেখানে, বহু রচনা থেকে অল্প কয়েকটিকেই সাজিয়ে তুলেছেন তখন। সে-নির্বাচনে 'খিচুড়ি' আর 'শব্দ-কল্পদ্রুম' ছাড়া আর কোনো লেখাই নেই যেখানে পাঠককে ভর করতে হবে কেবল শব্দের খেলাস বা নানার্থক ক্রিয়াপদের দৃষ্টান্তে। সত্যি বলতে, এই ক্রিয়াকৌতুক বেশিক্ষণ তার টান ধরে রাখতে পারে না, 'খাই খাই'এর মতো রচনাকে একটু অস্বস্তিকর দীর্ঘ বলেই মনে হতে থাকে, মনে হতে থাকে কেবল লঘুচালে এক তালিকাতৈরির ছল, প্রকারান্তরে যেন ব্যাকরণ শেখানো।

সেই লেখাগুলিকে ছেড়ে দেন সুকুমার রায়। ছেড়ে দেন সেইসব লেখাও, যেখানে আছে সরল কবিত্ব, রাবীন্দ্রিক পদ্ধতিতেই যেখানে তিনি লিখতে পারেন 'আজব খেলা' বা 'মেঘ', 'আনন্দ' বা 'শিশুর দেহ'। 'শিশুর দেহে মূর্তি নিল আমার ভালবাসা' 'যে আনন্দ সকল সুখে যে আনন্দ রক্তধারায়' 'মাথায় জটা মেঘের ঘটা আকাশ বেয়ে ওঠে' বা 'ভোরের ছবি মিলিয়ে দিল দিনের আলো স্নেহে'র মতো উচ্চারণে তেমন স্বতন্ত্র কোনো মহিমা নিশ্চয় নেই। কিন্তু 'সন্দেশ' পত্রিকায় যখন ছাপা হচ্ছে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'ফলের কবিতা'র ছন্দোবদ্ধ তালিকা, কিংবা সত্যেন্দ্রনাথের 'তাতারসির গান', কিংবা নজরুলের 'রবিমামা দেয় হামা গায় রাঙা জামা ঐ'-এর মতো যাথার্থ্যহীন ছবি, যেসব লেখায় কেবল কাল্পনিকতা আছে কিন্তু কল্পনা নেই কোনো, তখন সুকুমার রায়ের ছোটো ছোটো ওই লেখাগুলি তাঁর সহজ কবিপ্রকৃতির একটা স্পষ্ট পরিচয় দেয়। আর, এ কবি একেবারে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন তখন, যখন উদ্ভটের সঙ্গেই একাকার করে নিতে পারেন তাঁর এই কবিতার মন।

উদ্ভটের সঙ্গে কী ভাবে মিলিয়ে নেওয়া যায় কবিতা?

আমরা যখন পড়ি 'বেড়াল মরে বিষম খেয়ে, চাঁদের ধরল মাথা' তখন মন থাকে শুধু খ্যাপামির প্রান্তে। কিন্তু তার পরেই যখন 'হঠাৎ দেখি ঘরবাড়ি সব ময়দা দিয়ে গাঁথা' তখনই সেই অসম্ভবের মধ্যে দেখা দিতে শুরু করে এক ছন্দ। চাঁদ শব্দটির সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্না এগিয়ে আসছে লেখাটিতে, আর সেই জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি যেন কোমল করে নিচ্ছে তার চেহারা, তখন তাকে 'ময়দা দিয়ে গাঁথা' বলে মনে করলে যে-খ্যাপামি আমরা পাই তা কবিতারই অন্য নাম। চোখের সামনে একটা রূপ ভেসে ওঠে তখন।

এ লেখাটি অবশ্য, বলেই দেওয়া আছে, একেবারে মৌলিক নয়। কিন্তু এরই ধরন আমরা হঠাৎ-হঠাৎ দেখতে পাব সুকুমার রায়ের নিজস্ব রচনাতেও, সেইখানে বুঝতে পারি সমকালীন অন্য ছড়াকারদের সঙ্গে—এমনকী লিয়ারদের সঙ্গেও—তাঁর চরিত্রগত প্রভেদ। সেইখানে, গ্রীষ্ম বা বর্ষার লঘু বর্ণনার চালে হঠাৎ তিনি লিখতে পারেন 'তেড়ে আসে পালাজ্বর পৃথিবীর পাত্রে' 'তপ্ত ভীষণ চুলা জ্বালি নিজ বক্ষে' অথবা 'পৃথিবীর ছাত পিটে ঝমাঝম বারিধার'। ভূতুড়ে খেলার অবিশ্বাস্য সব আদুরে উপকরণের মধ্যে অনায়াসে তিনি মিলিয়ে নিতে পারেন 'জোছন হাওয়ার স্বপ্নঘোড়ার চড়নদার'কে। লুব্ধবেড়ালের মালপোয়া খাবার ইচ্ছের সঙ্গে দেখা দেয় 'গাছপালা মিশমিশে মখমলে ঢাকা' কিংবা 'জটবাঁধা ঝুলকালো বটগাছতলে/ধকধক জোনাকির চকমকি জ্বলে'। হাসির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে তাঁর রামগরুড়ের ছানা এড়িয়ে চলতে চায় দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িকে, মেঘের কোণে কোণে হাসির বাষ্পকে, অথবা সেই-সব কোণকে, যেখানে

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
জোনাক জ্বলে আলোর তালে
হাসির ঠারে ঠারে।

যদি কোনো পাঠক না জানতেন যে কোন্ লেখা থেকে নেওয়া হচ্ছে এই লাইনকটি, অনায়াসে তিনি একে ভাবতে পারতেন এক স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক বর্ণনার আয়োজন। এইসব কবিতার নজিরেই বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন যে সুকুমার রায়কে 'কবি

বলে না-মানতে হলে কবি কথাটায় অন্যায়ভাবে সীমানা টানতে হয়।'

কেবল এই কয়েকটিতে নয়। 'বুড়ীর বাড়ী' কবিতাটি যখন পড়ি, সে কি নিছকই আবোলতাবোল হয়ে থাকে? থুরথুরে বুড়ির যে ঝুরঝুরে পোড়ো ঘরটি গড়ে উঠছে এ কবিতায় ধ্বনিতে-ছবিতে সে-রকম একটি আশ্চর্য বাস্তব ঘরের ছবি বাংলা কবিতাতে খুব সুলভ নয়। ষোলো লাইনের এই রচনায় হসন্ত-ধ্বনিগুলির (গালভরা চালভাজা ঝুরঝুরে থুর-থুরে ঝুলকালি মিটমিটে পিঠখানা খকখক ঠকঠক ঝাঁটদিলে কাঠকুটো ছাদগুলো বাদলায়) এমন অবিরল প্রয়োগ আছে যে, কাঁচা ওই ঘরের নড়বড়ে ভাবটা পর্যন্ত ধ্বনির মধ্য দিয়ে দেখা দিতে থাকে, পাঠকেরও এখানে 'ভর দিতে ভয় হয় ঘর বুঝি পড়ে'। সুতো দিয়ে বেঁধে রাখবার মতো কিংবা কাঁটা দিয়ে এঁটে নেবার মতো কত ঘরই তো পথে পথে দেখতে পাই আমরা —কলকাতার পথে—যেখানে 'ঝাঁট দিলে ঝরে পড়ে কাঠকুটো যত', যেখানে 'ছাদগুলো ঝুলে পড়ে বাদলায় ভিজে' আর 'একা বুড়ী ঠেকা দেয় কাঠি গুঁজে নিজে।'

বিশেষের মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে তোলাটাই কবিতার একটা দায়। খামখেয়ালের জগতের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে সে-কাজটা যে কত সহজেই করে যান সুকুমার রায়, তার অন্য দু-একটি নমুনা আছে 'কাঠবুড়ো' বা 'ছায়াবাজি'র মতো লেখাতেও। যখন আমরা তাঁর 'মেঘ' বা 'মেঘের খেয়াল'এর মতো কবিতায় নানারকম মেঘের কথা শুনি, তখন সেটা প্রত্যাশিতই থাকে, তার গোটা সুরটাই মূলত বর্ণনার। সেখানে তাঁর কবির চোখ কখনো দেখে 'কচি কচি থোপা থোপা মেঘেদের ছানা', ডানা মেলে চলে যায় তারা, কিংবা কখনো দেখে 'বুড়ো বুড়ো ধাড়ি মেঘ ঢিপি হয়ে' উঠছে, দেখে 'জটাধারী বুনো মেঘ' আর তার পর এক 'ঝুলকালো চারিধার'। এর মধ্যে হাসির কথাটা নেই, একমাত্রিক চালেই চলছে এ লেখা, আকাশের মেঘ 'পলে পলে কত রং কত রূপ ধরে' সেইটেই কবি জানিয়ে দিতে চান এখানে। কিন্তু 'ছায়াবাজি' বা 'কাঠবুড়ো'ও কি নয় এমনি রূপেরই কথা? এসব লেখায় সুকুমার রায়ের বাইরের চালটা সেই বাতিকগ্রস্ত মানুষদের ওপর ভর করছে, ছায়ার সঙ্গে কুস্তি করছে একজন, সেদ্ধ করে ভিজে কাঠ চেটে খাচ্ছে একজন। কিন্তু আরেকটা ভিন্ন মাত্রায় এ রচনাগুলি আমাদের সামনে পৌঁছে দিচ্ছে দেখবারই একটা চোখ।

গাছের সবুজকে আমরা সবুজ বলেই জানি, নীল বলেই জানি আকাশের নীলকে, কিন্তু দেখতে যে জানে সে দেখে ওই সবুজেরই মধ্যে কত ভিন্ন রকমের সবুজ, নীলে কত ভিন্ন রকমের নীল। ছায়ারও কি নেই তেমনি নানারকম রূপ? রোদের ছায়া আর চাঁদের ছায়া কি এক হতে পারে? আর এই প্রশ্নটা মনে জাগবার পরেই দেখি কৌতুকের ওই 'ছায়াবাজি' কবিতায় পরতে-পরতে খুলে যাচ্ছে 'শিশিরভেজা সদ্য ছায়া' 'গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া' 'হালকা মেঘের পানসে ছায়া'। আর তখন বুঝতে পারি যে এখানে একজন কবিরই চোখ ঘুরছে 'ছায়ার পিছু পিছু', আর দেখতে পাচ্ছে কেমন করে প্রহরে প্রহরে ছটফটিয়ে সরে যায় ছায়া, আর নানারকমের রূপ নিয়ে হয়ে ওঠে 'পাতলা ছায়া, ফোকলা ছায়া, ছায়া গভীর কালো।' 'চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া' 'আমড়া গাছের নোংরা ছায়া' 'তেঁতুল-তলার তপ্ত ছায়া' আর 'মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া'দের দেখতে শিখবার পর আমরাও কি এমনি এক ছায়াবাজিতে নেমে পড়তে চাই না? কাঠবুড়ো যে ভরপুর হয়ে আছে নানারকম কাঠের তত্ত্বগন্ধেস্বাদে, সেটা অবশ্যই ও কবিতার কৌতুকের ছটা, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে কাঠ জিনিসটাকেও কি নূতন করে দেখতে শিখছি না আমরা? দেখছি না ফাটা কাঠ ফুটো কাঠ, টিমটিমে আর জ্যান্ত কাঠের স্পর্শগ্রাহ্য প্রভেদটুকু?

'আবোলতাবোল'-এর সূচনা-কবিতায় ভরসা দেওয়া ছিল যে এ বইতে আমরা পাব 'বেঠিক বেতাল'কে, কিন্তু ওরই সঙ্গে 'স্বপনদোলা'রও ইঙ্গিত ছিল সেখানে। গোটা বইটি পড়বার পর যখন শেষ কবিতায় পৌঁছই, সেখানেও শুনি 'তাল বেতালে খেয়াল সুরে'র কথা, সেখানেও আরেকবার আসে পনদোলা। কিন্তু শেষের এই লেখাটিতে স্বপ্নের জায়গা বেশি, সেখানে কবি সুরের নেশায় দেখতে পান ঝরনাকে, ধ্বনিতে-গন্ধে-দৃশ্যে একাকার করে দিয়ে সেখানে তিনি শুনতে পান 'আলোয় ঢাকা অন্ধকার/ঘণ্টা বাজে গন্ধে তার।'

এইখানে এসে বুঝতে পারি কেন অনেক সুরিয়ালিস্ট কবির কাছে ননসেন্সকে মনে হয় এত আপনজগৎ। অন্ধকারের গন্ধে ঘণ্টা শুনতে পাওয়া কি উদ্ভট কথা না কবিতার কথা?

সীতানাথ বন্দ্যো যে আকাশের গায়ে টকটক গন্ধ পেয়েছিল আর বৃষ্টির পর পেয়েছিল তার মিষ্টি স্বাদ, সে কি কেবল উদ্ভটের এলাকাতেই বন্দী হয়ে আছে, না কি খুলে গেছে কবিতারও দিকে? আর এইখানে এসে, 'শব্দকল্পদ্রুম'এর মতো লেখাকেও একবার উলটো দিক থেকে ছুঁতে ইচ্ছে করে। ফোটা বা ছোটা শব্দগুলির যাথার্থ্যতাতেই মন না রেখে, হয়তো লক্ষ করতে পারি যে ফুল ফোটার বা হিম পড়ারও শব্দ আছে একটা, আছে গন্ধ ছুটে যাওয়ারও অদৃশ্য একটা ছবি। ধ্বনিকৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে এ কবিতায় সেখানেও একবার চলে যাই আমরা।

এটা ঠিক যে এই ধরনের রচনা অল্পই আছে 'আবোল-তাবোল'এ বা তাঁর অন্যান্য কবিতায়। কিন্তু এই প্রবণতা থেকে চেনা যায় তাঁর প্রতিভার দিক। এই প্রবণতাতেই সমস্ত বিশ্বটা জীবন্ত হয়ে থাকে তাঁর সামনে, সেটা ছড়িয়ে যায় তাঁর সব লেখাতেই। ছায়াধরার খ্যাপা মানুষটি সব রকমের ছায়াকে দেখতে পাচ্ছিল তাদের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যে, সুকুমার রায়ও আলাদা করে দেখছিলেন সব রকমের মানুষ, সব রকমের ছবি। কাঠবুড়ো জানত কোন্ কোন্ কাঠের কী স্বভাব, সুকুমার রায়ও প্রায় তেমনিভাবেই যেন বাজিয়ে বাজিয়ে জেনে নেন কোন্ শব্দের কী স্বভাব। আর তারপর, প্রতিটি এই শব্দ প্রতিটি এই মানুষ তাঁর চোখের সামনে জীবনময় হয়ে চলতে থাকে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ওলটপালট একটা সম্পর্ক তৈরি করে দেন তিনি, আর সম্পর্কের এই আনন্দই তাঁর কাছে আসে অফুরান এক হাসির রূপ নিয়ে। তখন, একসঙ্গে এসে দাঁড়ায় চাঁদের কলা ভোম্বার মাকু জেলের দাঁড় নৌকো মানুষ পিঁপড়ে মানুষ রেলের গাড়ি তেলের ভাঁড়, এর সবটাই হয়ে ওঠে ভালো, সবটাকেই তিনি করে নেন আপন, আর সেইখানে, সব অসম্ভবের মধ্যে, তিনি পেয়ে যান তাঁর এক ছন্দ।

১। একটি তথ্য এখানে মনে রাখবার যোগ্য। জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সন্দেশ'-এ ছাপা হয়েছিল একটি ধাঁধা ছাপাইবার পাতায়। 'কাঁধের পাশাপাশে আমি সদা সাথে ঘুরি/সারাদিন বহু রূপে বহু লুকোচুরি কখন দেখিবে বামে কভু আগে পিছে বিনা দোষে লুটাই সব চরণের নীচে।...' পরের সংখ্যায় ছাপা হলো এর উত্তর 'ছায়া'। আর সেই সঙ্গে বইয়ের 'ছায়াবাজি'র এই লেখাটি।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

'হুলোর গান'

মালপোয়া-বিলাসী, দুষ্টবুদ্ধি চরিত্রের অধিকারী হুলোর জন্ম হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাচায়। সেই হুলোর ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং তার 'হুলোস্টিকস্' নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক

প্রজাতিতত্ত্ব : হুলোলজি

কবিতার নিচে তারিখ নেই। তাই হুলোস্কোপ তৈরী করা গেল না। কোন এক কৃষ্ণপক্ষের মাঝরাতে পূবদিকে আধখানা মালপোয়ার মত চাঁদ যখন দেখা দিয়েছে, সেই রহস্যময় গা-ছমছম-করা আলো-অন্ধকারে বস্তু ও মায়ার আলোড়নে হুলোর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে।

হুলোর বংশগৌরব কংসকৌরবের চেয়ে হয়তো বা একটু কম, হয়তো বা সারমেয়ের দিকে কৌলীন্য ও প্রাচীনত্ব একটু বেশি গা ঘেঁষে যায়, তবু এই তুচ্ছ মানবজীবন ও তুচ্ছতর শিল্প-সাহিত্যে হুলোর আধিপত্য স্মরণ করলে রোমাঞ্চ অনুভব করি। বিশেষজ্ঞরা তাই অতি যত্নের সঙ্গে কঠোর পরিশ্রমে হুলোলজি তৈরী করেছেন। প্রথমেই ব'লে রাখা ভালো, গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণের আগে হুলো ছিলো বাঘের মেসোমশাই। পাঁচহাজার বছর ধ'রে মানবসংসারে আতিথ্য নিয়ে আজ সে হৃতগৌরব এবং নানাবিধ অপযশের অধিকারী—অরণ্যের অধিকার-বঞ্চিত হুলো আজ ডারউইন সাহেবের জন্যই হয়তো বা রান্নাঘরের পাশে ভাঙা পাঁচিলের উপর ডন-বৈঠক করে।

হুলোলজিস্টদের মতে মিশর থেকেই প্রথম হুলোসম্পদনা ছড়িয়ে পড়ে সারা ইয়োরোপে। গৃহপোষ্য প্রাণী হিসেবে তাকে ইঁদুর তাড়াবার কাজে ব্যবহার করা হোতো। এটাও মানুষের জঘন্য কার্যকলাপের অন্তর্গত। ইয়োরোপীয় হুলোদের পূর্ব-পুরুষ যদিও মিশরবাসী, মিশরের হুলো'রা উত্তর আফ্রিকার হুলোদের (Felis Lybica) উত্তরসূরী। একালের বহুরূপে সম্মুখে তোমার যে হুলোবাবাজিরা দাপটের সঙ্গে হুলোটিকস্ চালিয়ে যাচ্ছে, পণ্ডিতদের মতে এরা হচ্ছে Felis Catus; গড় ওজন নয় থেকে চোদ্দ পাউণ্ড, এদের রঙ যে কত রকমের তা বর্ণনায় শেষ করা যাবে না। বিশেষজ্ঞদের মতে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ-শোভিতরা (Angora) একটু কমজোরি হয়। সেদিক থেকে আমাদের হুলোটি, আঁকা ছবিতে যা দেখা যাচ্ছে, বেশ মজবুত ব'লে মনে হয়, কারণ তার লোম বেশি নেই।

সুকুমার রায়ের হুলো প্রজাতিতত্ত্বে সংকর শ্রেণীভুক্ত। শ্যামদেশ ও পারস্যে এর পিতৃকুল-মাতৃকুলের পূর্বপুরুষদের খবর পাওয়া যাবে। হিমালয়ের আরণ্যমার্জারের সামান্য স্পর্শ আছে বলেই তার মধ্যে ঈষৎ বৈরাগ্যও লক্ষ্য করার মত। তবে আমাদের অপার হুলো-সংসারে বহু দেশাগত অতিথি যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছে। সুদূর আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে প্রতিবেশী

ব্রহ্মদেশ—কেউ বাদ যায় নি। অনেকে শুনলে একটু চমকে উঠতে পারেন—উজ্জ্বল সবুজ চোখবিশিষ্ট, ধূসর নীল পুরু লোমের কোট গায়ে কিছু রুশ মার্জারও নিঃশব্দে ভারত মার্জার-মহাসিন্ধুতীরে উপস্থিত হয়েছে—দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।

প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন করি সারমেয় নিয়ে পুরুষরা যতই আদিখ্যেতা করুন এবং প্রদর্শনীতে ট্রফি জিতুন, নারীকুলই হুলোসমাজের পৃষ্ঠপোষক। খোদ মার্কিন মুলুকে সাতটি হুলোলাভার্স সংস্থা আছে—ক্যানাডায় একটি ও বৃটেনে একটি। অনুরূপ একটি সংস্থার প্রয়োজন কলকাতা শহরে আছে কিনা হুলোমনস্করা ভেবে দেখতে পারেন।

হুলোগ্রাফি

শিল্পসাহিত্যে হুলোরা খুব নিঃশব্দে আসে। বাঁকানো এবং ধারালো নখ নরম থাবার ভিতর লুকিয়ে রেখে, সেন্‌সিটিভ গোঁফজোড়াকে সক্রিয় ক'রে এরা খবর রাখে, কে কি করছে না-করছে। এই জাতীয় হুলোদের মধ্যে প্রথম যার সাক্ষাৎ পাই সে হচ্ছে হিতোপদেশের সেই প্রসিদ্ধ ধুরন্ধর। নিজেকে নিরামিষাশী চান্দ্রায়নব্রতী ব'লে পরিচয় দিয়ে অন্ধ এবং বৃদ্ধ শকুনের বাসায় আশ্রয় নেন। বৃদ্ধের উপর শকুনের বাচ্চাদের তত্ত্বাবধানের ভার ছিলো। হুলোটি সমস্ত বাচ্চা উদরস্থ ক'রে গদাইলস্করী চালে বেরিয়ে গেল, শকুন জানতেও পারলো না। শকুনিরা ফিরে এসে ভাবলো পুরো ব্যাপারটাই বুড়ো শকুনের কাজ। তারা, খুব স্বাভাবিকভাবেই, নির্দোষ, হতভাগ্য বৃদ্ধ শকুনটিকে হত্যা করল।

ভারতীয় সাহিত্যে এই হুলোটি প্রাচীনতম কিনা জানা নেই, তবে চাতুর্যে অভিনয়-দক্ষতায় এবং নৃশংসতায় এর জুড়ি নেই। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যে শক্তিশালী হুলোক্রেসীর উদ্ভব তা এই ভণ্ড বদমাশটি থেকেই সম্ভব হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বেড়াল অবশ্যই হুলো। কমলাকান্ত আফিং-এর নেশায় স্তিমিত প্রদীপে তাকে মার্জারসুন্দরী ব'লে সম্বোধন করলেও, জন্ স্টুয়ার্ট মিল-এর ভাবশিষ্য এই সুতার্কিক আত্ম-প্রত্যয়ী মার্জার যে মেনি বেড়াল নয়, হুলো—এটা সবাই জানেন। মেনিরা বেশিক্ষণ একটানা তর্ক করতে পারে না, ল্যাজের জরুরী ঝাপটায় প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করে দেয়। অবশ্য ইতিমধ্যে উনিশ শতকের নিওক্ল্যাসিকাল হুলোরা সাহিত্য থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিয়েছে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে পরি-বর্তিত হুলোগ্রাফিতে সুকুমার রায়ের নায়কটির আবির্ভাব ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্প প্রদীপালোকিত সায়াহ্ন থেকে মধ্যরাত্রির রহস্যময়তায় চলে গেছে এই হুলো—তার চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আত্মবিশ্বাসবর্জিত আত্মবাদে সে ইতি-মধ্যে, ঐতিহাসিক কারণেই, ডুবে গেছে। সমাজতন্ত্রের বুলি ছেড়ে ঝুলি ঝেড়ে সে বের ক'রে এনেছে মালপোয়াবিলাসীর হতাশ আর্তনাদ।

হুলোক্লাস

জাতিতত্ত্ব থেকে ক্রমশ শ্রেণীতত্ত্বে এলে আমরা দেখব, এই হুলোটির জন্ম হয়েছে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকপুঁজির মাচায়। শ্রেণীগতভাবে সে মুৎসুদ্দী চরিত্রের অধিকারী। গৃহস্বামীর (সে-সময়ে ভারতবর্ষের প্রতিটি গৃহের প্রকৃত মালিক ছিলো ইংরেজ শাসক) উদ্বৃ উচ্ছিষ্ট ভোজন-পারঙ্গম এই হুলো আধখানা মালপোয়া ফিক্স্‌ড্ ডিপোজিট্ করেছিলো—কিন্তু কানকাটা নেকী বাদ সাধলো। হুলোক্লাসে এই জিনিষ হামেশাই ঘটে। কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করার মত—নেকীকে হুলো আক্রমণ করে নি। করে না। কারণ পরস্পরের মধ্যে নন্-অ্যান্টাগনিস্টিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। নইলে বেশি চীৎকার চেঁচামেচি করলে গৃহস্বামীর হাতে লাঠিপেটা হবার আশঙ্কা আছে। আজকাল তাই হুলোরা নিজস্ব মালপোয়া সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। 'আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো' ব'লে যে অনান্তরিক নৈর্ব্যক্তিক আহ্বান সে নেহাৎই শ্রেণীগত পারিপাট্য বজায় রাখার জন্য। প্রকৃতপক্ষে হুলো মালপোয়া-সংক্রান্ত ব্যাপারে তার পরমবন্ধুকেও বিশ্বাস করে না। মালপোয়া ভাগাভাগির ইতিহাসে হুলোদের আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হচ্ছে।

হুলোক্রেসী

'বিদঘুটে রাত্তিরে' যদিও হুলোর অন্তরের ইতিহাস রচিত হয়েছে, হুলোদের নিজস্ব সংগঠন অতি প্রাচীনকাল থেকেই সক্রিয়।

মেনিদের উপর অখণ্ড আধিপত্য বিস্তার, তাদের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রেখে প্রভুদের সাম্রাজ্য বিস্তার এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব যেহেতু হুলোদের উপর থাকে তারা নিজস্ব নিয়মেই একটা তন্ত্র গ'ড়ে তোলে। মালপোয়াকাঙ্ক্ষী এই উপশ্রেণীটি আপাতদৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধ ব'লে মনে হলেও পিঠে ভাগের দ্বন্দ্ব মশগুল। ভাগে কম পড়লেই চিত্তে হতাশা জাগে—'আর কেন সংসারে থাকি'—সংসারকে ভেল্কির ফাঁকি বলে মনে হয়– অন্তহীন শূন্যতায় ডুবে যায় চরাচর—'প্রাণফাটা সুরে' হুলোদের হৃদয়বিদারক নৈশসঙ্গীতে শিল্পসাহিত্য ভ'রে ওঠে—এই বিচ্ছিন্নতাবোধের দর্শনকে বলা হয় হুলোজফি।

উদ্বৃত্ত মালপোয়া আত্মসাতের সুযোগ যতদিন থাকবে ততদিন হুলোক্রেসীর অস্তিত্বও প্রকট থাকবে। তার রূপগত পরিবর্তন ঘটবে কালে কালে কিন্তু গুণগত দিক থেকে তার উদ্দেশ্য অটুট। 'মন-ভাঙা দুখ' কণ্ঠেতে পুরে' আর্তনাদ করলেও তার এই হাহাকারের পেছনে আগামী মালপোয়ার সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তাই এই শোকগাথা কৃত্রিম।

হুলোস্থেটিক্স্

মানুষের নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে হুলোর ক্রন্দনতত্ত্ব যুক্ত হয়ে যে অভিনব সৌন্দর্যতত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে তাকে হুলোস্থেটিক্স্ বলা হয়। হুলোর গান বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

প্রথমেই 'মিশমিশে মখমলে' গাছপালা ঢেকে দিয়ে অন্ধকারকে বেশ গাঢ় করা হয়েছে। তারপর সেই অন্ধকারকে আরও জমাট ক'রে জট বাঁধিয়ে বটের ঝুরি করে সমগ্র অঞ্চলে এক গা-ছম্ছম্-করা রুদ্ধশ্বাস অবস্থা তৈরী করা হয়েছে। তাতে ধক্ ধক্ করে ভৌতিক জোনাকি জ্বলে—অন্ধকারে হুলোর চোখের মতই তা রোমাঞ্চকর। তারপর গাঢ় কালো রঙের মধ্যে একপোঁচ লাল রঙ এক ফাঁকে ছড়িয়ে দিয়ে আধখানা চাঁদ যখন দিগন্ত থেকে টেনে তোলা হোলো তখন এক অতিপ্রাকৃত পরিমণ্ডল তৈরী হোলো হুলোর সঙ্গীতের জন্য——'চুপচাপ ঝোপঝাড়'গুলোতে সুরের শিহরণ জাগলো, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতার মধ্যে যেন সুরের প্রথম স্পন্দন অনুভব করা গেল।

এতক্ষণ চোখ এবং কানের ক্রিয়া চলছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হোলো এবার রসনার রসসিক্ত আলোড়ন। আস্ত মালপোয়াটিকে আধখানা কর'র জন্য সুকুমার রায় 'মালপোয়া আধখানা কাল থেকে আছে' এই অংশে 'আধখানা'কে মাঝখানে রেখেছেন—নইলে লিখতেন 'আধখানা মালপোয়া কাল থেকে আছে'। তাতে অর্থের কোনো হানি হোতো না। কিন্তু দু টুকরো মালপোয়াকে দুটো 'ল' এর ব্যবহারে সমানভাবে নরম করে দেবার জন্যই তিনি 'মাল' এবং 'কাল'-কে বিচ্ছিন্ন করে দু' দিকে দিয়ে 'আধখানা'কে মাঝখানে রেখেছেন। 'প্রাণপণে ঠোঁট চাটে কানকাটা নেকী'র মধ্যেও ঠোঁট চাটার শব্দই শোনা যায় 'ট'-এর বারবার ঠোক্করে। 'গালফোলা মুখে তার মালপোয়া ঠাসা' হুবহু ছবিটি উঠে আসে। আর সেই সর্বাধিক সকরুণ পংক্তিটি —'ধুক ক'রে নিভে গেল বুক ভরা আশা' যে কোনো মানুষের বুক ফেটে যায়—মার্জারকুল তো দূরের কথা। আশা যেন প্রদীপের মতই জ্বলছিলো এতক্ষণ—নেকী একটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলো-- এবং তারপরই জগৎসংসার অন্ধকার।

কিন্তু সুকুমার রায় কেন বললেন 'গীত গাই কানে কানে চীৎকার ক'রে'—ঠিক বোঝা গেল না। কারণ হুলোলজিস্টদের মতে- "Their sense of hearing is excellent and, can detect frequencies of up to 40,000 Hz or higher." অবশ্য শ্রোতার অনীহাকে বিদীর্ণ করার জন্যও আয়োজন কর্ণভেদী হতে পারে।

সঙ্গীতের সমস্ত সুর এবং সুরভি, সমস্ত বেদনা এবং বৈরাগ্য, সমস্ত শূন্যতার বুকে নিখিল আর্তনাদ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে একটিমাত্র পংক্তিতে 'গিন্নীর মুখ যেন চিমনির কালি।' হুলোস্থেটিক্স্-এ বলে, মালপোয়াবিহীন জগৎসংসার সৌন্দর্যবিবর্জিত এবং বর্জনীয়। কিন্তু নেহাৎই ভবিষ্যতের ভাগের আশায় বেঁচে থাকা। হুলোকেও তাই 'ভেল্কির ফাঁকি' জেনেও 'প্রাণফাটা সুরে' গান গাইতে হয়—কান্নার দর্শনে বিশ্বাসী হ'লে তার চলে না। এ'ও এক ধারাবাহিক আত্মরক্ষার করুণ সংগ্রাম।

পুলক চন্দ

সুকুমারের নাটক

যেমন তাঁর অন্যান্য শিল্পকর্মে, তেমনি নাটকেও সুকুমার সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় ঘটনাবলীর অসংগতিকে উন্মোচন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের স্ববিরোধিতা এবং ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের ভণ্ডামি তাঁর বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

দুষ্প্রাপ্য 'রামধন বধ' কে হিসেবের ভিতরে রাখলে সুকুমারের মোট নাটকের সংখ্যা আট। একটি ('হিংসুটে') স্কুলের মেয়েদের জন্য লেখা। আমরা সেটিকে বিবেচনার বাইরে রাখছি। 'ভাবুক সভা'র পরে সুকুমারের নাট্যকার জীবনে একটা সাময়িক যতি পড়েছিল। উচ্চশিক্ষার্থে তাঁর বিলেত-যাত্রার পূর্বকাল পর্যন্ত ঐ সময়ই আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব

প্রথম পর্ব

সুকুমারের সমস্ত নাটকের ভিতরে 'রামধন বধ' 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' আর 'ঝালাপালা'তেই ছিল সম-সময়ের ছাপ সবচাইতে বেশী।

বঙ্গভঙ্গের আমলে, ১৯০৫-০৬ সালে লেখা 'রামধন বধ'-এর কাহিনী-কাঠামোটুকু ছাড়া বিশেষ কিছু আজ জানবার উপায় নেই। সাহেবিয়ানায় র‍্যাম্সডেন অর্থাৎ রামধন, সাহেবদেরও ছাড়িয়ে যায় আর দেশের মানুষ 'নেটিভ নিগার'। তাকে দেখলেই ছেলেরা চীৎকার ক'রে বলে 'বন্দেমাতরম'। শুনে রেগে আগুন তেলে বেগুন সে তেড়ে যায় তাদের দিকে। গালপাড়ে, পুলিশ ডাকে। ঐ নাটকেই ছিল 'দেশী পাগলার দলের গান ঃ

> আমরা দেশী পাগলা'র দল
> দেশের জন্য ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল
> (যদিও) দেখতে খারাপ, টিকবে কম দামটা একটু বেশি
> (তা হোক) তাতে দেশেরই মঙ্গল।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার অভাব না থাকলেও তার হুজুগ ও স্ববিরোধিতার হাস্যকর দিকগুলো সুকুমারের খোলা চোখের নজর এড়ায়নি। এর পরের নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'।

লক্ষ্মণের শক্তিশেল

রামায়ণের বহুল পরিচিত কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে সরস নাটক লিখতে ব'সে সুকুমার গোড়াতেই টান মেরে তাঁর প্রধান চরিত্রদের নামিয়ে এনেছেন মহাকাব্যের অতিলৌকিক জগৎ থেকে। মহাকাব্যিক পরিচয়টুকু বাদ দিলে তারা সবাই পোষাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তায় নেহাৎই ছা-পোষা বাঙালী মধ্যবিত্ত।

নাটকে 'পুঁই শাক চচ্চড়ি আর কুমড়ো ছেঁচকি দিয়ে' 'চাট্টি' ভাত খায় রামের দূত। 'কৈলাস পাহাড়ের' নাম শুনে হনুমান বলে, 'কৈলেস ডাক্তার আবার কে?' যমদূতেরা এখানে চাকুরীগত-প্রাণ। যম গন্ধমাদনে চাপা পড়ে গেলে এই দূতেরাই 'তেরো আনা মাইনে বাকি' পড়ে থাকবার জন্য রীতিমতন মড়াকান্না জুড়ে বসে। গোটা নাটকটাতেই রয়েছে এমনিতর রংতামাশার অকৃপণ ছড়াছড়ি।

এর উপরে মজার সুরে মজার মজার গান। চরিত্রদের মুখে সুকুমার গুঁজে দিয়েছেন লৌকিক জগতের ভাষা। লঘু, অ-মহাকাব্যিক বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য গান ও মুখের ভাষায় এন্তার মিশেল করেছেন সংস্কৃতের সঙ্গে অ-সংস্কৃত শব্দ। যেমন 'ঠ্যাঙের' সঙ্গে 'পদ্ম'। 'পিলে' 'অক্কা' 'ততঃ কিম' এবং অবশেষে 'ইতি সমাপ্তেয়ং লক্ষ্মণের শক্তিশেলাভিধেয়স্য কাব্যস্য প্রথমো সর্গঃ'—মহাকাব্যের রীতি অনুসরণে এই গালভরা সংস্কৃতে সমাপ্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে নকল গাম্ভীর্যের নাটকীয় পরিবেশটুকু পৌঁছে যায় লঘুতার একেবারে তুঙ্গে। একই উদ্দেশ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও পরিমিত ব্যবহার সুকুমার করেছেন।

বহিরঙ্গের এই সমস্ত উপকরণ নাটকের উপভোগ্যতার একটা কারণ। কিন্তু প্রধান কারণ অবশ্যই নয়। মঞ্চে কাটকে বিভীষণ হিসেবে উপস্থিত ক'রে তার হাতে ব্যাগ ও ছাতা গুঁজে দিলে অনেকখানি কাজ হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও অনাবিল হাস্যরসের অপ্রতিরোধ্য প্রাথমিক আবেদনের অতিরিক্ত কিছু এ নাটকের কাছে সমসাময়িক মানুষের পাওনা ছিল।

লক্ষ্মণের শক্তিশেলের সুনির্দিষ্ট কোন রচনাকাল জানা যায় না। পুণ্যলতা চক্রবর্তীকে অনুসরণ ক'রে কল্যাণী কার্লেকার লিখেছেন "সম্ভবতঃ ১৯০৭ সাল", লীলা মজুমদারও অনুমান করেছেন 'ঝালাপালা' ও 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' সুকুমারের "বছর কুড়ি বয়সে লেখা।" কিন্তু 'ঝালাপালা'র যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তাতে রচনাকাল হিসেবে ১৯১১-র উল্লেখ আছে বলে জানা যায়। নাটকের আভ্যন্তরীন কিছু সমসাময়িক তথ্য-ও এর সমর্থন করে। তাহলে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেলই' বা কবেকার? 'ঝালাপালা'র কিছু আগে হওয়াই স্বাভাবিক, অন্তত ১৯১১-র পরে নয়। সীতা দেবী সে বছরই শান্তিনিকেতনে সুকুমারের মুখে এ নাটকের গান শুনেছিলেন। মোটকথা ১৯০৭ থেকে ১৯১০ যে বছরেই লেখা হ'য়ে থাকুক না কেন, আমাদের কাছে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হ'ল: সেই সময়টা ছিল 'স্বদেশী' আন্দোলনের অন্তপর্বের অন্তর্গত।

বিশ শতকের প্রথম দশকে নব-জাগ্রত দেশাত্মবোধের পরিপুষ্টিতে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের ভূমিকার কথা বিশেষ সুবিদিত। সাহিত্যিকরা তখন ইতিহাস কিংবা মহাকাব্যের পৃষ্ঠায় দেশপ্রেমের প্রেরণাই শুধু সংগ্রহ করেন নি, অতীতকে নিজের নিজের ক্ষমতা অনুসারে গড়ে-পিটেও নিচ্ছিলেন। অন্যদিকে সুকুমারের বাবা উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন ছোটদের জন্য গদ্যে পদ্যে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন যে, কোনো কিছু 'হিন্দু' হলেই ব্রাহ্মসমাজ তার রসগ্রহণে বিমুখ নয়। "রামায়ণ মহাভারতের ধর্মীয় সত্যকে ব্যাখ্যা ক'রে সমাজের লেখক লেখিকারা অনেক বই লিখেছেন। ইউ. কে. রায়ের ছোটদের জন্য লেখা রামায়ণ-মহাভারতের গল্পগুলো তার দৃষ্টান্ত" (History of the Brahmo Samaj, Vol. 2, P.-278)। অর্থাৎ মহাকাব্য নিয়ে লঘুতা সৃষ্টি করার সময় সেটা ছিল না। ফলে সুকুমারকে যথেষ্ট সমালোচনারও মুখোমুখি হ'তে হয়েছিল –"ঠাকুর-দেবতাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করা উচিত নয়" (সুকুমার রায় / লীলা মজুমদার)। তবে সুকুমার কাদের নিয়ে আসলে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'-এ 'ঠাট্টা তামাশা' করেছে? রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণ-ই কি প্রধান লক্ষ্য? এ বিষয়ে আন্দাজ করতে হলেও আমাদের ইতিহাসের পাতা ওল্টাতে হবে।

সমসময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে, বলাবাহুল্য সুকুমার কোনদিন উদাসীন ছিলেন না। সেই বিবরণ আছে পুণ্যলতা চক্রবর্তীর 'ছেলেবেলার দিনগুলি'তে। অল্প বয়সে কংগ্রেসের কোন এক অনুষ্ঠানে গানের দলেও তাঁর উপস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

অন্যদিকে 'স্বদেশী' আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মত ও পথ নিয়ে নরম ও চরম দলের ভিতরে কোন্দল ক্রমশঃ জোরাল হয়ে উঠেছিল। 'বয়কট'-র প্রশ্নেই মূলতঃ দানা-পাকিয়ে উঠেছিল বিরোধ। ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন চরমপন্থীরা পণ্ড করল। বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ

হ'ল। কার্যক্ষেত্রে দেশের রাজনীতিতে দেখা গেল চরমপন্থীদের প্রাধান্য।

নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলায় ইংরেজ সরকারও একে একে 'রাজদ্রোহমূলক-সভা-আইন' 'প্রেস আইন' 'বিস্ফোরক দ্রব্য আইন' ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধে নামল। ১৯০৭ এর ১লা নভেম্বর 'Seditious Meetings Act' জারী হবার পরের দিন অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখলেন 'How to Meet the Inevitable Repression'। তিনি বললেন, 'বয়কটে'র সাফল্যের প্রতিক্রিয়ায় ইংলণ্ডের রপ্তানীর পরিমাণ যখন কমতে লাগল তখনই এরা আন্দোলনের কোমর ভেঙ্গে দেবার সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে; "প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রতিপক্ষের চরম হৃদয়হীন শত্রুতামূলক কার্যকলাপের মুখে টিকে থেকে জয়লাভ করার মতন শক্তি দেশের অবশ্যই চাই।" কার্যত মাত্র কয়েক বছর সরকারী দমননীতির সাঁড়াশী প্রয়োগ অপ্রস্তুত সহজেই আন্দোলনকে স্তিমিত করে দিল। 'স্বদেশীযজ্ঞে'র অন্যতম পুরোহিত রবীন্দ্রনাথ যুবকদের উপদেশ দিলেন বাইরের উত্তেজনা উন্মাদনা থেকে নিজেদের সরিয়ে এনে পল্লীতে গঠনমূলক কাজে আত্মসমর্পণ করতে। এ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্য: "...উত্তেজনাবশে দুই বৎসর ধরিয়া ইংরেজের অনুগ্রহ লইব না, ইংরেজের শাসনযন্ত্র অচল করিয়া দিব বলিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া আসিতেছি, এবং ইংরেজরা যখন সেই আস্ফালনে ধৈর্যভ্রষ্ট হইয়া লগুড় তুলিয়া আমাদের গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন তখন আমাদের সেই অস্বাভাবিক আস্ফালনের নিষ্ফলতা প্রমাণে ব্যথিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—ওপথে চলিলে হইবে না'..." (প্রবাসী/আশ্বিন ১৩১৪)।

একদিকে স্বদেশীদের 'অস্বাভাবিক আস্ফালন' ও 'নিষ্ফলতা' অপরদিকে 'ধৈর্যভ্রষ্ট' ইংরেজের হাতের 'লগুড়'—ইত্যাদি, সব মিলিয়ে পরিস্থিতির একটা তিক্ত কৌতুকময় দিক কি সুকুমারের চোখে ধরা পড়েছিল? শক্তিশেলের সঙ্গে দমন-মূলক আইন বা অন্যকিছুর আপাত-সাদৃশ্য সম্ভবত প্রথমে তাঁর মনে এসেছিল। তারপরই সম্ভবত জেগেছিল সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাষ্য তৈরীর বাসনা।

রামায়ণের সুপরিচিত শ্লোক 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—স্বদেশীযুগে দেশাত্মবোধের প্রায় বীজমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এরকম একটা সময়ে রামকে স্বদেশী এবং রাবণকে বিদেশী কল্পনা করা ছিল সহজ ও স্বাভাবিক। উপস্থিত, এ-বিষয়ে নাটক থেকে দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দাখিল করব।

বিশল্যকরণী প্রয়োগের ফলে লক্ষ্মণ চেতনা লাভ করল। 'সবাই' বলে উঠল, '...কি সাফাই ওষুধ রে!' হনুমান বলল: "হাজার হোক স্বদেশী ওষুধ ত!" সকলে আশ্বস্ত হ'ল; 'তাই বল। স্বদেশী না হলে কী এমন হয়?' 'স্বদেশী'র প্রতি রামের দলবলের এই অনুরাগ, গভীর বিশ্বাস তাদের চরিত্রের রাজনৈতিক দিক সম্পর্কে সংশয়ের কোন অবকাশ রাখে নি।

রাম 'স্বদেশী' হলে রাবণ স্বভাবতই বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজ-পক্ষ সহজ এই সমীকরণের উপরেই অবশ্য বিষয়টা সুকুমার ছেড়ে দেন নি, দু-একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত তিনি নাটকের ভিতর রেখেছেন। যেমন, রাবণের দম্ভোক্তির কথাই ধরা যাক:

আমি পালোয়ান স্যাণ্ডো সমান

তুই ব্যাটা তার জানিস কি?

কোথায় লাগে বা কুরোপাট্‌কিন্‌

কোথায় রোজেদ্‌ভেনিস্কি।

প্রথমত, নামগুলো সব বিদেশী। দ্বিতীয়ত, বাহুবলের দম্ভ প্রকাশের জন্য পালোয়ান 'স্যাণ্ডো'র সঙ্গে শুধু নয় 'কুরোপাটকিন' ও 'রোজেদ্‌ভেনিস্কি'র সঙ্গেও রাবণ নিজের তুলনা করছে। এঁরা কেউই 'খেলার ছলে' 'যখন তখন' 'হাতি লোফেন' এমন কোন কাল্পনিক 'ষণ্ঠিচরণ' নন। দুজনেই ইতিহাসের মানুষ। পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের ভিতরে নতুন ভাবে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেবার যুদ্ধগুলোর অন্যতম প্রথম হল ১৯০৫-এর রুশ-জাপ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধেই মাঞ্চুরিয়ায় রুশ সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ছিলেন তৎকালীন যুদ্ধমন্ত্রী অ্যালেক্সি কুরোপাটকিন। এ্যাডমিরাল রোজেদ্‌স্তভেন্‌স্কি (Rozhedest Venski) ছিলেন বাল্টিক নৌবহরের কম্যাণ্ডার। সুতরাং কুরোপাটকিন ও রোজেদভেনিস্কির নামে তাল ঠোকাতে ও গলাবাজিতে রাবণের সাম্রাজ্যবাদী হুঙ্কার ধরা পড়ল। সঙ্গত কারণেই ইংরেজ সরকার ও রাবণকে তো বটেই, রাবণের হাতের

'লগুড়' বা শক্তিশেলকেও ক্রমশঃ 'Seditious Meetings Act', 'Press Act', 'Indian Criminal Law Amendment Act' ইত্যাদি থেকে অভিন্ন মনে হতে পারে। তা ছাড়া, অর্থনৈতিক লুঠতরাজ সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির সামগ্রিক পরিচয়ের এমনি একটি অপরিহার্য দিক যে রাবণ কর্তৃক লক্ষ্মণের 'পকেট লুণ্ঠনে'র ঘটনাটিকেও আর অবিমিশ্র মজা হিসেবে দেখে যেতে সাহস হয় না।

'রাবণ বুড়ো'র কথায় আর কাজে কোন বিরোধ নেই। দম্ভ করে যেমন, সেই মতন কাজও করে। 'ওরে পাষণ্ড, তোর ও মুণ্ড খণ্ড খণ্ড করিব'—সুগ্রীবকে একথা শুধু বলা নয়, কার্যক্ষেত্রে তার মাথাও সে ফাটায়। পাশাপাশি 'স্বদেশী' সম্পর্কে ইংরেজ রাজপুরুষদের একাংশের একটি হুমকি "...We shall try to break the back of it (swadeshi) in every possible way, we shall put the staying power of the Bengalee to the severest test before we allow them to develop their new nationalism" এবং অরবিন্দর মন্তব্য : "Thus spoke they and what happened since has certainly been singularly confirmatory of their frank avowal."

রাবণ সম্পর্কে রাম-শিবিরের প্রতিক্রিয়া গুলোও চমৎকার। প্রথমে, দল-নেতার স্বপ্নের বিবরণে সবার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর 'জান' স্বভাবতই 'খুব কড়া', স্বপ্নে তা যাবার মতন নয়। সুগ্রীব, বিভীষণ, জাম্বুবান সকলেই রাবণের সাথে মোলাকাতের সম্ভাবনার কথা ভেবে ভয়ে কেঁপে অস্থির। 'রাবণ আসছে' শুনে সুগ্রীব ও বিভীষণ আঁতকে ওঠে 'অ্যাঁ-কি?' এবং গান জোড়ে :

যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়
তবে তুই মরে যাবি—

নাটকে রাবণের হাতের অস্ত্র 'লগুড়' ও 'শক্তিশেল'। স্মরণ করা যেতে পারে দমনমূলক আইনকে 'লগুড়ে'র সাথে তুলনা করবার চল সে সময় ছিল। স্বদেশী 'লাফালাফি' ও 'ধৈর্যভ্রষ্ট' ইংরেজ প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের পূর্বোক্ত মন্তব্যে তার প্রমাণ মিলেছে।

যাই হোক, বিভীষণ জরুরী কাজের অছিলায় এক সময় রণস্থল থেকে পালাল। সুগ্রীব অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামল রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত এক সংগ্রামের পরে রাবণের অস্ত্রের দাপটের কথা না মেনে তার উপায় থাকল না : 'ওরে বাবা ইকী লাঠি/গেল বুঝি মাথা ফাটি'। তারপর সুগ্রীবের মুখে শোনা গেল সর্বকালের পৃষ্ঠপ্রদর্শকারীদের জীবনদর্শনের মর্মবাণী। রাবণও তার পলায়ণকারী প্রতিপক্ষ সুগ্রীবকে রাজনৈতিক মঞ্চের উপযুক্ত ভাষায় ধিক্কার জানিয়েছে : "ছি ছি ছি—এত গর্ব করে, এত আস্ফালন ক'রে, শেষটায় চম্পট দিলি? শেম্! শেম্!" 'স্বদেশী' আন্দোলনও প্রচুর 'আস্ফালন' গর্জনের সঙ্গে শুরু হলেও শেষ হয়েছিল কাতরাণীর শব্দে। 'Why did the movement begin with a bang and end with a whimper?" (The Extremist Challenge— P.139, Amales Tripathi) উত্তর যাই হোক, আধুনিক গবেষকের এই প্রশ্নেই আমরা প্রয়োজনীয় তথ্যের সমর্থন পাই। এর পর 'লক্ষ্মণের শক্তিশেলে'র প্রচ্ছন্ন সমসাময়িকতার প্রসঙ্গ আর শিথিল অনুমানের বিষয় সম্ভবত থাকে না।

'ননসেন্স ক্লাবের' অভিনয়ের জন্য হাসির নাটকটি লিখেছিলেন সুকুমার। কোন রাজনৈতিক প্রয়োজনের শাসন বা উদ্দেশ্য-পূরণের অভিপ্রায়ে নয়। মহাকাব্যের কাহিনী নিয়ে রঙ্গতামাশার আড়ালে নিজেরই খেয়ালে তিনি তুলে ধরেছেন সাময়িক রাজনৈতিক চালচিত্রের ব্যঙ্গরূপ। সকৌতুকে—কারণ কৌতুক তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, তাঁর সমালোচনার নিজস্ব ভাষা।

পটভূমি অপরিবর্তিত থাকলেও পরের নাটকেই সুকুমার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের উচ্চভূমি ও তার কুশীলবদের ছেড়ে সরাসরি নেমে এলেন অতি সাধারণ মানুষজনের ভিড়ে, তাঁর নিজের অর্থাৎ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে।

ঝালাপালা

প্রথমেই, 'পালা' কথাটির সরস ও অর্থচোরা প্রয়োগ দর্শক-পাঠকের মনে নতুন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশা জাগায়। 'পালা' হলেও এপালার জাত যে আলাদা তা আঁচ করা যায়।

যাত্রার রেওয়াজ অনুসারে প্রথমেই মঞ্চে হাজির হয় 'জুড়ি'র দল। তাদের প্রথম গানের প্রথম কলি 'সখের প্রাণ গড়ের মাঠ'-এর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পালার প্রধান যে কৌতুকের সুর তা বাঁধা হয়ে যায়।

আপাতভাবে 'শঠে শাঠ্যং সমাচারেৎ' অথবা 'বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য' নিয়ে গল্প। নাটকের শেষে কেদার সেটা বেশ বড় গলা করেই ঘোষণা করে দিয়েছে। চরিত্রগুলো সবই এক-মাত্রিক, ছকে বাঁধা। কৌতুকরসও সর্বত্র স্বতোৎসারিত নয়। অনেক ক্ষেত্রে চেষ্টাকৃত। সুকুমারের মৃত্যুর পরে 'সন্দেশ' ১৩২৪ সালে প্রকাশিত হবার সময়ে কেষ্টার পাঠ (প্রথম দৃশ্যে) ছাপা হয়েছিল ইংরেজীতে। পড়ার সময় সে একাধিকবার 'I go up you go down' পড়লেও প্রশ্ন করার সময় কিন্তু বলছে 'I go up we go down মানে কি?' (পরবর্তীকালে ইংরেজীতে প্রথমত, বাংলা হরফে ছাপা হয়েছে, দ্বিতীয়ত, we এর বদলে 'ইউ' ছাপা হয়েছে)। বোঝা যাচ্ছে পণ্ডিত এর পরে 'গুদোম ঘরে' 'উই পোকা' ধরনের মজাদার ব্যাখ্যা যাতে সহজে দিতে পারে, সেই জন্যেই এই আয়োজন।

এ নাটকের রচনাকাল ১৯১১। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'ঝালাপালা' একই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্গত। 'সিডিশন'-এর ফাঁদে ফেঁসে যাবার ভয়ে সন্ত্রস্ত মধ্যবিত্ত 'ভদ্রলোক'দের আতঙ্কের কৌতুকপূর্ণ ছবি সুকুমার এঁকেছেন। কেবলচাঁদ ও তাদের স্বদেশসংগীত : 'হায়রে সোনার ভারত'-এর শেষাংশে সে যখন আহ্বান জানায় 'জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!' অমনি সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল :

দুলি। এই সিডিশাস।

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কি বললে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?

খেঁটুরাম। তবে রে! সিডিশাস গান কচ্ছিস কেন রে?

দুলি। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেণ্টের চাকরি করে।

হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রতি সুস্পষ্ট কটাক্ষ 'ঝালাপালা'র আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। 'ন্যায়শাস্ত্র' নিয়ে পণ্ডিতের মুহুর্মুহু আস্ফালনের ভিতরে আপাত-কৌতুকের অতিরিক্ত কিছু অর্থ সহজেই পাওয়া যায়। কিংবা কেবলচাঁদের স্বদেশী সংগীতকেও ঠেকবে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শাস্ত্রবচন বা শাস্ত্রের অনুমোদনের সমারোহপূর্ণ উল্লেখ, এমনকি তার অপব্যাখ্যার সাহায্যেও যে-কোন বক্তব্যের ভিতর অভ্রান্ততার ভঙ্গি ও গাম্ভীর্য সঞ্চার করবার ঝোঁক হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের একাংশের মধ্যে প্রকট ছিল। আমাদের পণ্ডিত যেন তাদেরই অতিক্ষুদ্র এক কৌতুক-সংস্করণ। নাটকে অন্তত বারো বার পণ্ডিত বিভিন্ন উপলক্ষ্যে 'ন্যায়-শাস্ত্র'র কথা তুলেছে। কেবলচাঁদের প্রথম গানে 'কালের ফেরে' পড়া 'মনু'-'যাজ্ঞবল্ক্য'-র উত্তরপুরুষদের বিলাপ : 'আহা পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনুরে?' কী ভাবা হয়েছে, 'হনু' শব্দের ইঙ্গিতময় প্রয়োগে সেটা অস্পষ্ট থাকে নি।

'মস্ত গায়ক' কেবলচাঁদ স্বরচিত দ্বিতীয় সংগীতে 'দেশোদ্ধারে ব্রতী' হবার জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে থামল। তবে তার গানের ভাব-গর্ভ প্রথম পঙক্তি শুরু হত না হতেই একবার 'উচ্চহাস্য' শোনা গিয়েছিল। বাধা পেয়ে কেবলচাঁদ অভিমান করেছিল : 'দেখলেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কী কাণ্ডটা না কল্লে!' নিজের হাসিটুকু কেষ্টা ও ঘটিকে দিয়ে হাসালেও স্বাধীন ও বহুমাত্রিক চরিত্র হিসেবে সুকুমার তাদের গড়ে তুলতে পারেন নি। এই ব্যর্থতার শিক্ষা 'চলচিত্তচঞ্চরি'র অসামান্য ভবদুলালের সৃষ্টিতে পরোক্ষভাবেই তাঁকে সাহায্য করে নি তা হলফ করে নিশ্চয় বলা যায় না।

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক' শ্রেণীর স্বভাবগত অসংগতিতে চিরকাল সুকুমারের প্রবল কৌতুকবোধ। তার অজস্র নিদর্শন 'আবোল-তাবোলে'র বিভিন্ন কবিতায় ও তাঁর প্রায় প্রতিটি নাটকে গল্পে ছড়িয়ে রয়েছে। 'ঝালাপালা'তেও যা আছে, এতখানিই আছে যে তার পাশে নাটকের সাদামাটা মূল কাহিনী-অংশকে কখনো কখনো উপলক্ষ্য মাত্র মনে হয়।

প্রথমে নাটকের সেই ছোট্ট অথচ অনবদ্য মধ্যবিত্ত বৈঠকি আলাপে 'গরম' শব্দটির খেই ধরে জমিদার বললে 'এসব বোধ হয় সেই ধূমকেতুর জন্যে।' অতঃপর শোনা গেল 'ধূমকেতুর ন্যাজ' 'ওরেই [পণ্ডিতের] ন্যাজ হয়ত' এবং ফলাফল হিসেবে 'ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প' প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি, পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশান' ইত্যাদি। উল্লেখ করা যায়, 'ঝালাপালা' লেখার কিছুকাল আগেই হ্যালির ধূমকেতু নিয়ে ভীষণ সোরগোল উঠেছিল। গুজবের অন্ত ছিল না। প্রবাসী

(চৈত্র, ১৩১৬) লিখেছিল : "কয়েকমাস হইতে সংবাদপত্রে এক ধূমকেতুর উৎপাত সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। গণনায় নাকি আসিতেছে তাহার সহিত বসুন্ধরার সংঘর্ষণ হইবে, তাহার বিষাক্ত বাষ্পে প্রাণীকুল নির্মূল হইবে..."। সুকুমার তাঁর সমসময়ের গুজবপ্রিয় কুসংস্কারমগ্ন, আড্ডাপ্রিয় মধ্যবিত্তের অসংলগ্ন আলাপচারিতার যে জগৎ সুনিপুণ কৌতুকভাষ্যের মাধ্যমে 'ঝালাপালা'য় এঁকেছিলেন সেটা তখন যতখানি সত্য ছিল, আজও ততখানিই আছে। কিন্তু সেটুকুই সব নয়, মধ্যবিত্ত জীবন-যাপনের আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি সুকুমার এখানে উদ্ঘাটন করেছেন

নাটকের 'পরগাছা' প্রায় সবকটি চরিত্র নানা সময় নানা ভাবে দাবি জানিয়েছে, তারা 'ভদ্রলোক'। অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙার ব্যাপারে অথবা তোষামুদি খোশামুদিতে অবশ্য এ ওকে টেক্কা দিয়ে যায়। কিন্তু ভদ্রলোক হিসেবে পাওনা সম্মান সম্পর্কে তাদের হুঁশ ষোল আনা। আত্মসম্মানের নাড়ি টনটনে :

১ পণ্ডিত। যা! বাবুদের হটিয়ে দে।...
দুলি। সিকী! আমাদের গাঁয়ের লোক! হর্‌-গ্রামের অপমান!

২ কেবল। এইও, ইস্টুপিট বেয়াদব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস!

৩ দুলি। ভদ্রলোককে এমনি ক'রে ইনসাল্ট!

৪ খেঁটু। কী, ভদ্রলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!
দুলি। চাকর দিয়ে ইনসাল্ট!

ভদ্রলোকী সম্মান 'চাকর দিয়ে' এই 'ইনসাল্টে' ভীষণভাবে আহত। নাটকের বর্ণনা অনুযায়ী খেঁটু আর দুলির অন্তঃপর 'ডিগনিফায়েড একজিট'। 'ভদ্রলোক' হবার বিড়ম্বনা কম নয়। 'ঘাড় ধাক্কা' খাওয়া সত্ত্বেও 'মর্যাদাপূর্ণ প্রস্থানে'র ঠাট বজায় রাখতেই হয়। ভদ্রলোকী অস্তিত্বের অনেকখানিই যে ভঙ্গি-সর্বস্ব সেটা বুঝিয়ে দিতে সুকুমার একটুও ফাঁক রাখেন নি।

'ভদ্রলোক' প্রসঙ্গ নাটকে যে আদপেই আকস্মিক বা প্রক্ষিপ্ত নয় 'জুড়ির' গানের দিকে তাকালে তার সুনিশ্চিত প্রমাণ মেলে। জুড়িরা এখানে ভদ্রলোকশ্রেণীর বিবেকবান অংশের প্রতিনিধি। শুরুতে পরান্নভোজী 'নিষ্কর্মা'দের জন্য তাদের কোন সহানুভূতি নেই বরং জমিদারের পাশে দাঁড়ানো নিজেদের নৈতিক কর্তব্য বলে তারা বিবেচনা করেছে। স্বভাবতই, জমিদারের 'অনুরক্ত ভক্ত' হিসেবে নিজেদের ঘোষণা করতে অথবা 'চণ্ডী-বাবুর মস্তকে পুষ্প চন্দন বৃষ্টি'র কথা জানাতে জুড়িদের কোন দ্বিধা হয় নি। ক্রমশঃ তাদের সুর পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথমে 'খোশামুদে'দের আত্মমর্যাদাহীনতার জন্য তারা অস্বস্তি-বোধ করছে : 'কচ্ছে সবাই যাচ্ছে তাই/চোর ব্যাটা দিচ্ছে গালি হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই।' এরপর তৃতীয় দৃশ্যের শেষে চতুর্থ ও [illegible] মতন মঞ্চে এসে খোলাখুলি ভাবে জমিদারকে অভিসম্পাত দিয়ে গান ধরল : 'ওরে ও চণ্ডীচরণ/ তোমার কি নাই রে মরণ।'

[illegible] 'খোশামুদে'দের পক্ষে। [illegible] মোদের [illegible] বাস্তবে [illegible] মৌলিক অধিকার [illegible] হাত বাগানের দিকে জুড়িদের [illegible] না। হয়ত সাধুবাদই প্রাপ্য। [illegible] মতন ভয়-ঙ্কর রেজিমেন্ট [illegible]। 'খোশামুদে'দের [illegible] জুড়িরা [illegible] জমিদার [illegible]।

ভাবুকসভা

[illegible] জাতীয় [illegible] 'ভাবুকসভা'। [illegible] দ্বিধায় নাটক বলা যায় না। [illegible] নেই, ঘটনার পারম্পর্যপূর্ণ বিকাশ নেই [illegible] অসংগত ভাবের আতিশয্যই প্রধান উপজীব্য।

প্রকৃত রচনাকাল ১৯১১-১২ হলেও 'ভাবুকসভা'র প্রথম প্রকাশ 'প্রবাসী'তে, ১৩২২ (১৯১৫)-এর আশ্বিনে। সঙ্গে সুকুমারের নিজের আঁকা ছবি। চারিদিকে, আকাশের আধখানা বাঁকা চাঁদ। নদীর উপরে এসে পড়েছে গাছের সরু ডাল। সেই 'ভাবের গাছ'-এর ন্যাড়া ডালের ডগায় বসে 'ভাবুক'। তার মাথার চুল সামান্য এলোমেলো। চোখে চশমা, পরনে ধুতিপাঞ্জাবী। গায়ে প্যাঁচানো 'র‍্যাপার' বা চাদর। চাদরের

একদিক ডান কাঁধের ওপর হাওয়ায় উড়ছে। অন্যপ্রান্ত প্রায় জল ছুঁই ছুঁই। ভাবুকের বাঁ হাতে একটা খোলা খাতা বা বই। মলাটে লেখা 'চাঁদ'। ডান হাতে ধরা পেন্সিল চিবুকে ঠেকানো। 'ভাবের ঝোঁকে' ভাবুক 'একেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত' তাতে সন্দেহ নেই।

'হ য ব র ল' কিংবা 'আবোলতাবোলে'র ছবি বাদ গেলে অর্ধেকটাই মাটি। লেখায় যা বলা হল তারও অতিরিক্ত তিনি কখনো কখনো ফুটিয়ে তুলেছেন ছবিতে। সেই বিচারে 'আবোলতাবোলে'র 'খিচুড়ি' বা 'চোরধরা'র ছবিগুলির সঙ্গে সমান গুরুত্বে 'ভাবুকসভা'র অপরিচিত এই ছবিটিও স্মরণযোগ্য।

সুকুমারের ভাবুকদাদা ও ভক্তের দল কবি-শ্রেণীভুক্ত তাতে সন্দেহ নেই। নাটকে সাক্ষ্য আছে; দুই নম্বর ভক্ত বলছে, 'দিন নাই রাত নাই লিখে লিখে হাত ব্যথা—'। অর্থাৎ ভাবুক কবি তো বটেই, বহুপ্রসূ কবি। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সেকালে অসংখ্য কবিতা লিখতেন সত্যেন্দ্রনাথ ও প্রমুখ কবিরা। বলা বাহুল্য, তখনকার এক ঝাঁক ভাবুক নব্য কবিগোষ্ঠীর অবিসম্বাদী গুরু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই শিষ্য-পরিবেষ্টিত ভাবুক দাদা ও কবি-শিষ্য পরিবৃত রবীন্দ্রনাথের ছবির আপাত-সাদৃশ্য নজরে পড়ে।

অবশ্য গুরুর চাইতে হয়ত ভক্তদের ভাবের আতিশয্যই সুকুমারের কাছে বেশী কৌতুকজনক ঠেকে থাকবে। এবং রবীন্দ্রনাথের অনুসারী ভক্ত কবিদের ভিতর দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ থাকলেও, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই নিঃসন্দেহে প্রধান। ভাবুক হিসাবেও তাঁর পরিচয় ছিল সর্বজনবিদিত। 'প্রবাসী' ১৯১০-এর এক সংখ্যায় 'নব্য কবিতা' নামে প্রবন্ধে তিনি পরিষ্কার ভাষায় ভাবের জয়গান করেছিলেন এবং উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের। উল্লিখিত ছবিতে 'ভাবুক'কে দেখে তাই প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কথা মনে আসা অসম্ভব নয়। নাটকে ভাবুকের ছন্দোন্মাদনাতেও পরোক্ষ সমর্থনের সন্ধান পাওয়া যায়। একের পর এক ভাবের ধাক্কায় 'শৃঙ্খল টুটিয়া' ভাবুকের 'উদ্দাম চিত্ত' 'আঁকু পাঁকু ছন্দে' 'নৃত্য'-রত। 'নাচে ব্যাগ ব্যাগ তাণ্ডব তালে। ঝলক জ্যোতি জ্বলিছে ভালে।' অর্থের চাইতে ছন্দের তরল ঝঙ্কারের প্রতি 'ছন্দের যাদুকর' 'ছন্দ-সরস্বতী' সত্যেন্দ্রনাথের আকর্ষণ ছিল বেশী। হয়ত সম্পূর্ণই কাকতালীয়, তবু উল্লেখ করা যেতে পারে রুসো অবলম্বনে সত্যেন্দ্রনাথের রচনা 'ভাবুকের নিবেদন' প্রবাসীতে বের হবার (১৯১৯) কাছাকাছি কোন এক সময়ে সুকুমার তৈরী করেছিলেন 'ভাবুক সভা'র প্রথম খসড়া।

সুকুমার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য একান্ত অনুরাগী, তবে তিনি অন্ধ অনুসারী নন। প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখের মাত্রাছাড়া রবীন্দ্রভক্তি ছিল তাঁর অপছন্দের। এঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক যথেষ্টই ছিল। 'মানডে ক্লাব' প্রসঙ্গে অন্তত একবার হিজিবিজি খাতা'য় সত্যেন্দ্রনাথের নাম আছে। সত্যেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সুকুমার-সম্পাদিত 'সন্দেশ' পত্রিকায় শ্রদ্ধা নিবেদনেও প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর সাহিত্যকৃতির প্রতি সুকুমারের সশ্রদ্ধ মনোভাব। কিন্তু সুকুমারের তির্যক সকৌতুক দৃষ্টিতে কোন হাস্যকর ভারসাম্যহীনতা বা অসংগতি ধরা পড়লে তার রেহাই নেই। রবীন্দ্রনাথও সুকুমারের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটুকু ভালোমতন জানতেন, তাই 'শোনা যায়' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁকে 'মনে করে'ই 'নিশ্চয়' 'ভাবুক সভা' লেখা হয়েছে ('সুকুমার রায়'/লীলা মজুমদার)।

অবশ্য সুস্পষ্টভাবে এখানে বলা প্রয়োজন, সুকুমার শুধু সত্যেন্দ্রনাথকেই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ক'রে তুলেছেন এমন কোন সিদ্ধান্তে ভুলেও পৌঁছবার বাসনা বর্তমান আলোচকের নেই। তবে সমসাময়িক একশ্রেণীর কবির ভাববিলাসিতা তিনি উপহাসযোগ্য মনে করেছিলেন সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

দ্বিতীয় পর্ব

১৯১৫ থেকে ১৯২০ সালের ভিতরে লেখা হয়েছিল 'শ্রীশ্রী শব্দকল্পদ্রুম', 'চলচিত্তচঞ্চরি' ও 'অবাক জলপান'। মাঝখানে মাত্র তিনটি বছর অতিক্রম ক'রে এসে দ্বিতীয় পর্বে, সুকুমার যেন হঠাৎই বিস্ময়কর ভাবে পল্লবিত ও পরিপূর্ণ। স্মরণীয়, 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন ঐ ১৯১৫ সালে। এবং তার ঠিক আগের বছর 'সন্দেশ' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ

করেছিল 'খিচুড়ি'—'খেয়াল রসে'র বিচিত্র রসায়নে 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির গাম্ভীর্য' যেখানে অদ্ভুত 'বৈপরীত্যে' উজ্জ্বল— সেই 'আবোলতাবোল' কবিতাগুচ্ছের প্রথম কবিতা।

অন্তর্বর্তী তিনটি বছরে (১৯১২ ১৫) চিন্তা-ভাবনায়, জীবন-বোধে সুকুমার গম্ভীর ও আত্মস্থ হয়ে উঠেছিলেন শুধু নয়, তাঁর দৃষ্টির সামনে থেকে অনেক অস্পষ্টতা সরে গেছে। চার-পাশের অর্থশূন্য বড় কথা বড় ভাবের চোখধাঁধানো ধুলোর ঝড়ের ভিতরেও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের একটা মান বা norm-কে যেন তিনি খুঁজে পেয়েছেন। 'সবার চাইতে ভাল' যে-'পাঁউ-রুটি আর ঝোলাগুড়'—তার সরল বাস্তবতায়, প্রতীকী অর্থের ভিতরে। সদর্থক জীবনবোধের শক্ত জমির ওপর দাঁড়িয়েই সুকুমার লিখলেন 'জীবনের হিসাব' কবিতা (সন্দেশ, ১৩২৫)। সেখানে 'সাঁতার' না-জানা জ্ঞান-গর্বী 'বাবু'র—তথা সমস্ত মধ্যবিত্ত বাবু-শ্রেণীর 'জীবন'কে 'ষোল আনাই মিছে' বলে রায় দিয়েছে 'মূর্খ মাঝি'। প্রায় ঐ সময়ে লেখা (প্রবাসী / চৈত্র, ১৩২৪) একটি প্রবন্ধে (মজার কথা, তারও নাম 'জীবনের হিসাব') সুকুমার 'তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের তন্ত্রি বহিতে বহিতে মানুষ কেমন করিয়া জীবন্ত সত্যের মর্যাদা ভুলিয়া বসে'—সে কথা লিখেছিলেন। আর এক প্রবন্ধে ('যুবকের জগৎ'/তত্ত্ব-কৌমুদী/২৩ এপ্রিল, ১৯১৭) সুকুমার 'নিজস্ব', মুক্ত দৃষ্টি-ভঙ্গির সুস্পষ্ট ঘোষণা ক'রে বলেছিলেন, '...আমার চাইতেও কত বিচিত্র ভাবে কত নিবিড় ভাবে কত লোকে জগৎকে জানিয়াছে বুঝিয়াছে, আমি তেমন করিয়া বুঝি নাই—নাই বা বুঝিলাম। আমার জীবন যেটুকু দেখিয়াছে, সেই টুকুই আমার দেখা—একান্তভাবে নিজস্বভাবে বিচিত্রভাবে আপনার বলিয়া দেখা।' সহজ আন্তরিক জীবনযাপনের প্রতি সুকুমারের সশ্রদ্ধ মনোভাব ১৯১৫ সালে লেখা একটা ছোট্ট তাৎপর্যপূর্ণ 'শোক রচনা'তেও প্রকাশ পেয়েছিল। 'মংলি', অর্থাৎ সুকুমারের মামা প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন সমাজের আর পাঁচ দশ জনের বিচারে ছিল লক্ষ্যহীন, 'কেবল বাজে কাজে' 'নষ্ট'। কারণ, 'সে উচ্চ আদর্শের কথা' বলত না, 'ধর্মের বড় বড় তত্ত্ব' জানতনা, 'পাণ্ডিত্যের পরিচয়' তার মধ্যে পাওয়া যায়নি। 'শুধু আপন...অন্তরের প্রেরণায় সেবার অহেতুক আনন্দে...অম্লান বদনে আপনার সুখ দুঃখ বহন' ক'রে 'সহজ জীবনের পথ' ধরে 'সহজেই' 'সে' চলে গেছে। সুকুমারের মনে হয়েছিল '...এই ত জীবনের সার্থকতা ...যথার্থ জীবনের ৬৮স। জীবনের 'Fundamental Ideal' সম্পর্কে এই যে বোধ তা ছিল সুকুমারের একান্ত নিজস্ব, 'সমাজ' বা চারপাশের গড়পড়তা মানুষজনের থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র। বলাবাহুল্য, স্বতন্ত্র হলেও এই চেতনা স্বয়ং-সৃষ্ট ছিল না।

আমরা জানি, সর্ববিধ সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্রাহ্ম আন্দোলনের গঠনমূলক সদর্থক ভূমিকার প্রায় সবটুকুই নিঃ-শেষিত হয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে, মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে। এরপরও বিশ শতকে অতীত গৌরবের স্মৃতি বুকে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজ তার সাংগঠনিক অস্তিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপ অব্যাহত রেখে গেছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে স্পষ্টতই জীর্ণ হয়ে এসেছিল তার আদর্শের পুঁজি। বহুকাল যাবৎ ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজে গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্বের তীব্রতা বিশ শতকে এসে যদিও কিছু কম তবু হঠাৎ হঠাৎই ছোটখাট নানান আপাততুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চুলোচুলি বেধেছে। অবস্থা অবশ্য পড়ে গেছে সকলেরই। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ তো প্রায় নিরস্তিত্ব - তার টিমটিমে প্রদীপকে কোনক্রমে জ্বালিয়ে রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'কেশব কেন্দ্রিক' নববিধানও শক্তিহীন। যেটুকু দাপট তা ঐ শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজেরই। অবশ্য সংকট সেখানেও ঘনীভূত। 'সমাজে'র সদস্যদের ভিতরে অতীতের 'missionary spirit', 'Spirit of self sacrifice' আর নেই—১৯১২-তে এই আক্ষেপ করেছেন স্বয়ং শাস্ত্রী মশাই, তাঁর 'History of the Brahmo Samaj'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে (P. 274-75)।

যাই হোক, পরিবর্তনশীল সময় ও জীবনের সঙ্গে 'সমাজে'র গণ্ডিবদ্ধ ধ্যান ধারণার বিচ্ছিন্নতা যত প্রবল হল ততই বর্তমানের দাবি পূরণে অসমর্থ ব্রাহ্মসমাজের অস্তিত্ব কালাসঙ্গতিদুষ্ট (anachronistic) হয়ে উঠল। যে সমস্ত আদর্শের ঘোষণা, উচ্চভাবের কথা বা শব্দের সঙ্গে এক সময় সরাসরি কিছু না কিছু সম্পর্ক ছিল বাস্তব জীবনের—অবস্থান্তরে সে গুলোই অন্তঃ-সারশূন্য শব্দের খোলস মাত্রে পরিণত হল। বলা বাহুল্য, এই পরিমণ্ডলে, ব্রাহ্মসমাজের ভাঁটার সময়েই কেটেছে সুকুমারের শৈশব, কৈশোর। সংক্ষেপে বলতে গেলে, উৎসাহী ব্রাহ্ম

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলে সুকুমার, জন্মসূত্রে সমাজ-এর আপনজন। মাঘোৎসব, ভাদ্রোৎসব, নববর্ষোৎসব ইত্যাদি বাৎসরিক অনুষ্ঠান আর বাড়িতে, সমাজমন্দিরে নিত্যকার উপাসনা, ব্রহ্মসংগীতের ভিতর দিয়ে, হয়ত ছেলে সত্যজিতের মতনই উপাসনাকালে সুজনির নক্সা মুখস্থ করতে করতে ('যখন ছোট ছিলাম' পৃঃ ২০), এক সময় নিজের অজান্তেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন সক্রিয় সদস্য।

'সমাজে'র সঙ্গে তাঁর পরবর্তী আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের টানাপোড়েনের ইতিহাস কৌতূহলোদ্দীপক। স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ এক আলোচনার বিষয়। আমাদের কাছে এ মুহূর্তে প্রাসঙ্গিক তথ্য হল, প্রশ্নাকুল বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারপাশেই অসংগতির অর্থহীনতার এক চূড়ান্ত রূপ সুকুমার আবিষ্কার করেছিলেন। 'হিজিবিজ খাতা'য় তাই তিনি কে আমরা ?' এই প্রশ্নের দ্বিধাহীন উত্তরে লিখেছিলেন : 'ব্রাহ্মসমাজে জন্মিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের হাওয়ার মধ্যে বাস করিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়াছি কিন্তু জিজ্ঞাসার কোন উত্তর পাই নাই। ইহাই আমাদের পরিচয়।' সুকুমার বিশ্বাস করতেন, '...বর্তমানের মত এমন স্পষ্ট, এমন পরিপূর্ণ শুভ-মুহূর্ত আর কোথায় ?' 'যুবকের জগৎ'-এ তিনি মন্তব্য করেছিলেন, '...এই বর্তমান, যাহার মধ্যে পূর্ণ পরিণত ভবিষ্যতের সমুদয় সম্ভাবনা ও সার্থকতা নিহিত রহিয়াছে, এই বর্তমানই ত যথার্থ জীবন।' স্বভাবতই তাঁর মনে হয়েছিল '...যে নবীনতার উৎস একদিন ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবন সুধাসিক্ত করিয়া রাখিয়াছিল নবযুগের আবেষ্টনের মধ্যে আবার তাহাকে নূতন করিয়া অন্বেষণ করিতে হইবে।' সমস্যা তাতেও মেটেনি, কারণ 'জীবনের মধ্যে সে উৎসকে' তিনি আর খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশ্য তখনও 'আশা' ছিল, ভেবেছিলেন হয়ত 'তাহার সন্ধান পাওয়া কঠিন হইবে না।' কিন্তু শেষ এই 'আশা'-ও ধাক্কা খেয়েছিল রূঢ় বাস্তবে। 'বর্তমানতা'র উপাসক সুকুমারের কাছে ব্রাহ্মসমাজের সামগ্রিক অস্তিত্বই ক্রমশঃ অর্থহীন, সময়-বিরুদ্ধ প্রতিভাত হতে লাগল। তাই 'হিজিবিজি খাতা'য় তিনি, পুনশ্চ, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেন, 'প্রশ্ন এই যে, সে বস্তুটা কি, এবং সে বস্তু কোথায় যাহার জন্য ব্রাহ্মসমাজের এই সংগ্রাম ? প্রশ্ন এই যে, এই ব্রাহ্মসমাজ চক্ষের সমক্ষে যাহাকে স্পষ্ট দেখিতেছি—সে কোন্ বার্তা বহন করিতে চায়—তাহার সংগ্রামের সার্থকতা কোথায় ?' উদ্ধৃত অংশের নিম্নরেখটুকু, বলাবাহুল্য, সুকুমারের নিজের হাতে দেওয়া। বুঝতে অসুবিধা হয়না, তাঁর সমস্ত মোহ-মুক্তির পিছনে ছিল বিশ্বাসের, স্বাধীন স্বাভাবিক ও সঙ্গতিপূর্ণ জীবনবোধের, একটি-ই সাধারণ উৎসভূমি।

শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম

'অর্থ। অর্থ তো অনর্থের গোড়া।' 'ভাবুকসভা'তে ভাবুকদাদার এই বক্তব্যের ভিতরেই ছিল দ্বিতীয় পর্বের প্রথম নাটক 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে'র বীজ।

'প্রবাসী', ১৩২২, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়, 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে সুকুমার ভাষা সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে তাঁর বক্তব্য ব্যক্ত করলেন। বললেন, ভাষা চিন্তারই বাহন। কিন্তু আমরা প্রায়শঃ শ্রম সাপেক্ষ চিন্তার পথ পরিহার বা সংক্ষেপ করবার জন্য 'শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয়' নিয়ে থাকি। অনবদ্য ভাষায় সুকুমার মন্তব্য করলেন, 'ছাতার নিচে চটি চলিতেছে দেখিয়া লোকে বুঝিত বিদ্যাসাগর চলিয়াছেন। আমরা দেখি ভাষার ছাতা আর চটি, জীবন্ত বিদ্যাসাগরকে আর দেখা হয় না।' পুরাণে আছে 'গন্ধর্বরা বাক্যভোজী', তারা নাকি 'শব্দ আহার' করে থাকে। 'এক হিসেবে', সুকুমারের মতে, 'গন্ধর্ব শ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড় কম নয়। কিন্তু অর্থই যে বাক্যের সার এবং অর্থটাকে সম্যক রূপে পরিপাক' না করতে পারলে 'শব্দটা যে মনের পুষ্টি-সাধনের অন্তরায়' হয়ে উঠতে পারে 'এই সহজ কথাটা অনেকের মনে থাকেনা।' ফলে, 'চিন্তার কুপুষ্টি জনিত নানান রকম রোগের সৃষ্টি হয়।' অর্থাৎ, 'ভাষা যে নিজের অর্থ গৌরবেই সত্য' একথা ভুলে 'সে যখন কেবলমাত্র শব্দ গৌরবে' বা অর্থহীন ধ্বনি গৌরবে বড় হতে চায় তখন তার 'অত্যাচার অনিবার্য।' সন্দেহ নেই, এই প্রবন্ধেই আছে সুকুমারের দ্বিতীয় পর্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নাটকের বক্তব্যের মূল সুর। প্রাসঙ্গিক ও উল্লেখযোগ্য পরবর্তী তথ্য হচ্ছে, 'ভাষার অত্যাচার' ও 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' নাটক—দুটোই লেখা হয়েছিল ১৯১৫ সালে।

'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে'র প্রধান চরিত্র গুরুজি ও তার শিষ্যবৃন্দ।

শিষ্যদের দুটো দল। একদিকে হরেকানন্দ ও জগাই। অন্য-দিকে বেহারী ও পটলা।

আশ্রমে উপস্থিত বিশ্বম্ভর স্পষ্টতঃই Outsider, আগন্তুক। যেমন ভবদুলাল, 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে। নাট্যকারের প্রতিভূ-চরিত্র সৃষ্টির অপরিণত যে প্রচেষ্টার সূত্রপাত 'ঝালাপালা'য় কেষ্টা-ঘটিরামের ভিতরে, বিশ্বম্ভর তারই অপেক্ষাকৃত পরিণত ফসল। তবে পরিণততর ও উজ্জ্বলতর, বলাই বাহুল্য, হল ভবদুলাল।

বেহারীর স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে বিস্মিত বিশ্বম্ভর চোখ ছানা-বড়া করে বলে 'কি আশ্চর্য! আপনার গুরুজিকে জিজ্ঞেস করবেন ত—'। স্মরণ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'গুরুবাক্য' প্রহসনেও বদনের মনে 'রাত্রে' 'আহার নিদ্রা' ভোলানো প্রশ্ন জেগেছিল, "জটায়ু যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ম'ল তার অর্থ কী, তার কারণ কী···, যদি কোন অর্থ না-ই থাকে, তাই বা কেন?" সহজ যে উত্তর সকলেই জানে তাতে 'মন সন্তুষ্ট' হয়না বলেই শিরোমণি মশাইকে জিজ্ঞাসা। এবং শিরোমণিও গুরুসুলভ গাম্ভীর্যে তার গভীর ব্যাখ্যান করেছিলেন।

এক্ষেত্রেও গুরুজি আসতেই দু'দল উঠে পড়ে লাগল, কে কার আগে স্বপ্নের কথা পাড়তে পারে। পটলা যদি সাক্ষ্য দেয়, 'নাক ডাকতে ডাকতে সারে গামা পাধা নিসা···করে সুর খেলাচ্ছে', তবে বিশ্বম্ভর যোগ করে: 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আর সাতটে সুরের সঙ্গে রামধনুর সাতটে রং একবার ইদিকে আসছে, একবার উদিকে যাচ্ছে।' অগত্যা, নিজের স্বপ্নই বেহাত হয়ে যায় দেখে বেহারী তাকে ভেঙে দিল। এরপর বিপক্ষ অর্থাৎ হরেকানন্দর দলের দিকে, তাদের দিক থেকে এই 'স্বপ্ন' বিষয়ে সম্ভাব্য সমস্ত সন্দেহের বিরুদ্ধেই, চ্যালেঞ্জের ভয়ঙ্কর মুষল ছুঁড়ল বিশ্বম্ভর: 'যে বলে এটা বাজে স্বপ্ন, সে নাস্তিক'।

বিশ্বম্ভরের কৌশল ফলপ্রসূ হল। কারণ, 'তর্কস্থলে, প্রতিপক্ষের মুখ বন্ধ করা যখন আবশ্যক হয়, তখন এইরূপ ['অস্পষ্ট তত্ত্ব ও অনির্দিষ্ট সংস্কারের'] দু একটি জুজুকে অকস্মাৎ আসরে নামাইলে তাহার ফলটি হয় ঠিক চলন্ত রেলগাড়ির মুখে লালবাতি দেখাইবার অনুরূপ' ('দেবেন দেয়ম')। এখানেও তাই। 'নাস্তিক' শব্দের জুজু বাজিমাত করেছে।

গুরুজি সাগ্রহে স্বপ্নের বিবরণকে স্বাগত জানালেন। বললেন, 'শব্দই আলোক। শব্দই বিশ্ব—শব্দই সৃষ্টি—শব্দই সব।' সন্ন্যাসীর নাকের যে গম্ভীর গর্জন, '...এ সেই শব্দ।' শুধু 'একথাটুকু বলবার জন্যই এতদিন' তিনি 'দেহধারণ করে' আছেন।

এতক্ষণ বিশ্বম্ভর উস্কানী দিয়ে এসেছে অনেকটা এজেন্ট প্রভোকেটরের মতন। তত্ত্বকথার চাপে হাওয়া ভারী হয়ে ওঠা মাত্রই তার কাজ হয়ে দাঁড়াল গুরুগম্ভীর তত্ত্বের বেলুন চুপসে দেওয়া। গুরুজির কথায় হঠাৎই তার ভাব জেগে উঠল, মনে পড়ে গেল 'ছেলেবেলায়' লেখা এক 'পদ্য': 'ভবপান্থবাসে এসে/ভুগে ভুগে কেশে কেশে/···টাকা মেরে পালালি শেষে'।

কান না দিয়ে গুরুজি ব্যাখ্যা করেই চললেন: 'সৃষ্টির গোড়াতে প্রাণ, কারণ, আকাশ সব মিলে যখন হব হব কচ্ছিল তখন যদি 'ওম' শব্দ করে প্রণব ধ্বনি না হত, তবে কি সৃষ্টি হতে পারত? শব্দে সৃষ্টি, শব্দে স্থিতি, শব্দে প্রলয়।···যা ভাববে তাই শব্দ—শাস্ত্রে বলেছে 'শব্দ ব্রহ্ম'।' এ পর্যন্ত গুরুজির সব কথারই সমর্থন আছে ভারতীয় ভাববাদী দর্শনশাস্ত্রে। বক্তব্য ছাড়াও বাচনভঙ্গির কিছু সাদৃশ্য বোঝাবার জন্য বিবেকানন্দের 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' থেকে একটা উদ্ধৃতি: " সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্ম প্রথম শব্দাত্মক হন, পরে ওঁকারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কল্পের নানা বিশেষ বিশেষ শব্দ, যথা 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' বা, 'গো মানব ঘটপট' ইত্যাদি ঐ ঐ শব্দ ক্রমে এক একটা ক'রে হবা মাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তখনি বেরিয়ে এসে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার—বুঝলি শব্দ কি রূপে সৃষ্টির মূল?" (রচনাবলী ৯ম খণ্ড, পৃ ৪১-৪২)

নাটকে হাওয়া আবার যথেষ্ট ভারি ও গম্ভীর। সুতরাং বিশ্বম্ভর এবার 'শব্দব্রহ্ম'র সূত্র ধরে সোজা চলে গেল 'মতিলাল'-এর বানানো 'ভুঁই পটকা'র শব্দে এবং সেখান থেকে গুরুজির 'ন্যাজে'।

এ জাতীয় চাপল্যে গুরুজির অবশ্য বিকার নেই কোনো। শব্দ নিয়ে ছেলেখেলা করার জন্য ভক্তদের সামান্য সস্নেহ ভর্ৎসনা করলেন তিনি। তাঁর মতে, শব্দ অর্থের বাঁধনে বন্দী। 'এক একটি শব্দ এক একটি চক্র।...এই অর্থের বন্ধনটি ভেঙে

চক্রের মুখ যদি খুলে' দেওয়া যায় 'তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল যোগান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে উর্দ্ধমুখে উঠতে থাকে।' কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগিয়ে মূলাধার পদ্ম থেকে একের পর এক পদ্ম বা চক্র ভেদ ক'রে মস্তিষ্কস্থিত সহস্রার পদ্মে উপস্থিত হবার যে তান্ত্রিক তত্ত্ব, এখানে মনে হয় তারই ইংগিত।

শব্দচক্রে মন্ত্র ঠুকে অর্থের বাঁধন ঢিলে করবার সাধনায় বসলেন গুরুজি। অর্থবন্ধনমুক্ত শব্দশক্তির 'উর্দ্ধগতি কুণ্ডলী' আশ্রয় করে সশিষ্য গুরুজী স্বর্গপথে ধাবমান। গুরুজীর মতে 'শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ' তাকে ভাঙতে হলে প্রয়োজন অর্থ-হীনতার হাতুড়ি, 'নিবিশেষ মন্ত্র'– 'গৌ গাবৌ গাবঃ'।

পরিশেষে বিশ্বকর্মার উচ্চারণ ঃ 'শব্দযজ্ঞ হবিকুণ্ড অফুরন্ত ধূম এই মারি শব্দকল্পদ্রুম' এবং 'দ্রুম' শব্দে 'সশিষ্য গুরু-জি'র নিমেষে স্বর্গ হতে মাটিতে পতন।

সুকুমার লিখেছিলেন, 'অর্থগৌরব' ভুলে ভাষা যখন শুধু 'শব্দগৌরবে বড় হইতে চায়' তখন 'তাহার অত্যাচার অনিবার্য।' এই অত্যাচারকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর সময়ের মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে, ধর্মচর্চায়, রাজনীতির অঙ্গনে, সাহিত্যিক ও আরো নানান অভিব্যক্তিতে। অর্থহীন-তার উন্মাদ উপাসক 'গুরুজি'র তাণ্ডব সে সবেরই অতিরঞ্জিত রূপকভাষ্য, একথা বলা বাহুল্য।

'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'-এর আরো পাঁচ বছর পরে, ১৩২৭ সালে 'অবাক জলপান' নাটকটির প্রকাশ।

অবাক জলপান

সম্ভবত এটিই সুকুমারের সবচাইতে পরিচিত নাটক। এর পাকাপাকি আসন ইস্কুল বইয়ে বহুকালের। ফলে 'শিশু-সাহিত্যে'র ছাপটা একটু বেশি পরিমাণেই পড়েছে এর উপরে। অবশ্য ছোটোদের এতে ক্ষতি হয়নি। বরং আত্মবঞ্চিত থেকেছে বড়রাই।

'তৃষ্ণার্ত হইয়া চাহিলাম এক ঘটি জল / তাড়াতাড়ি এনে দিল আধখানা বেল'। 'কৌতুকহাস্যে'র উৎস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূতে'র ক্ষিতি মন্তব্য করেছিল, "তৃষিত ব্যক্তির প্রার্থনা মতে তাহাকে এক ঘটি জল আনিয়া দিলে সমবেদন-প্রবৃত্তিপ্রভাবে আমরা সুখ পাই, কিন্তু তাহাকে হঠাৎ আধ-খানা বেল আনিয়া দিলে, জানিনা কী প্রবৃত্তিপ্রভাবে, আমাদের কৌতুক বোধ হয়।' 'একটু জলপাই কোথায় ?'—এই আকুল প্রার্থনার উত্তরে ঃ 'এ তো জলপাইয়ের সময় নয়। কাঁচা আম চান তো দিতে পারি'—শুনে পথিকের যে প্রথম অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতা হয়, তারই ভিতরে এই সহজ কৌতুকের একটা অব্যর্থ ঝাঁকুনি সুকুমার সযত্নে মজুত রেখেছিলেন। তার অনায়াস টানেই অতঃপর আমারা ঢুকে পড়ি খাপছাড়া মানুষদের রাজত্বে।

'অবাক জলপানে'র (সন্দেশ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭) দু বছর আগে 'খাই খাই' কবিতায় (সন্দেশ, কার্ত্তিক, ১৩২৫) 'খাওয়া' —শুধু এই একটি ক্রিয়াপদকে নিয়ে মজার চূড়ান্ত করেছিলেন সুকুমার। আর 'অবাক জলপানে'র কাছাকাছি সময়ে, একই বছরে, তিনি লিখেছিলেন 'ফাজিলের ডিকসেনারী', যার অপর নাম 'শব্দকল্পদ্রুম' ('ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্...', সন্দেশ, আশ্বিন, ১৩২৭)। সেখানেও নিছক খেলার ছলে বাংলা ক্রিয়াপদের (ফুল 'ফোটা', গন্ধ 'ছোটা', হিম 'পড়া', রাত 'কাটা'...ইত্যাদি) কৌতুককর রূপ সুকুমার এঁকেছিলেন। পাশাপাশি 'অবাক জলপানে' জল 'পাওয়া' এবং 'মেলা'—এই দুই ক্রিয়াপদের দাপটে পথিকের হয়েছে প্রাণ যাবার উপক্রম। পূর্বাভাস অবশ্য নয়বছর আগেকার 'ঝালাপালা' নাটকেই ছিল ঃ

খেঁটু।...আজকাল মশাটা কেমন বল দেখি ?

রামকানাই। বরাবর যেমন থাকে, ছোট ছোট কালো মতন, উড়ে বেড়ায়...

খেঁটু। আহা, বলি লাগে কেমন ?

রামকানাই। তা কি করে বলব ? কখনও ভাজাও করিনি চচ্চড়িও খাইনি।

পার্থক্যও স্পষ্ট। 'নাছোড়বান্দা' পরগাছাদের তাড়ানোর উদ্দেশ্যে শব্দ নিয়ে সচেষ্টভাবে খেলা করেছিল রামকানাই। আর, 'অবাক জলপানে', শব্দের অর্থের এক একটা স্তরে আবদ্ধ অসচেতন চরিত্রদের ভিতরে সুকুমার ফুটিয়ে তুলেছেন এক গভীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাধির রোগ-লক্ষণ।

ক্ষুধার মতন তৃষ্ণাও মানুষের স্বাভাবিকতার, সুস্থতার এক সরলতম প্রকাশ। বাস্তবতা ও ভারসাম্যের এই অবস্থানেই

দাঁড়িয়ে আছে 'অবাক জলপানে'র পথিক ও তার অভিজ্ঞতার শরিক পাঠক/দর্শকেরা। নাটকের বাদবাকি আর সব চরিত্রই স্বাভাবিকতাবিচ্যুত, ভারসাম্যহীন, নিজের নিজের চিন্তার, ও স্বার্থের সংকীর্ণ বৃত্তে বন্দী। সেটা ভেঙে বেরিয়ে এসে মানুষের সুস্থ সংগত প্রয়োজনকে স্বীকৃতি জানাতে তারা অসমর্থ। দু-পক্ষের ভিতরে তৈরী হয়ে গেছে একটা ভাষা-সমস্যা, ভাব আদানপ্রদানের ক্ষেত্রে এক অনতিক্রম্য ফারাক। ফলের ব্যাপারী মুড়িওয়ালার কাছে 'জলপাই'-এর একটিই অর্থ। মামারবাড়ি ও স্বগ্রামের মিঠে জলের অনুরাগী বৃদ্ধের চিন্তায় জলের দ্বিতীয় কোন অনুষঙ্গ নেই। জ্ঞানাভিমানী দাম্ভিক বৃদ্ধ নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তাতেই বিভোর। ছন্দ-পাগল কবির কাছে কবিতার 'মিল'টুকুই হল একমাত্র ভাববার বিষয়। আর গ্রন্থকীট বৈজ্ঞানিকের মতে তৃষ্ণার্তের কাছে জলের চাইতেও জল সম্পর্কে জ্ঞান অনেক জরুরী। লক্ষণীয়, এরা কেউ-ই কিন্তু 'হাঁসজারু' বা 'বকচ্ছপে'র মতন দৃশ্যতই উদ্ভট নয়। সকলেই পুরোদস্তুর আমাদের চেনা জানা। এমনকি তাদের অসংগতির ছোট খাট চেহারাও আমাদের কাছে, নিজেদেরই অসংগতির অংশ হিসেবে, সুপরিচিত। অথচ সামান্য অতিরঞ্জন-এর ফলে মুহূর্তের মধ্যে তারা যেন ভিনগ্রহের প্রাণীর চাইতেও অপরিচিত ও দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে।

সঙ্গত কারণেই 'হাস্যকৌতুকে'র (১৯০৭) 'চিন্তাশীল', 'সূক্ষ্মবিচার' 'আশ্রমপীড়া' ইত্যাদি প্রহসনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। ক্ষিদে বা খাওয়া ব্যাপারটাকে রবীন্দ্রনাথও জীবনের একটা স্বাভাবিক ধর্ম হিসেবে দেখতেন। তাই অবাস্তবতার পাশে তিনিও বারবার তাঁর প্রহসনগুলোতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন। 'চিন্তাশীল' নাটকের শুরুতেই নরহরি চিন্তায় মগ্ন। "ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন।" নরহরি দিদিমার বক্তব্য শুধরে দিয়ে বলেছিল, "...সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উলটে যায়। রসো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।" তার উৎসাহে দিদিমা জল ঢেলে ছিলেন, 'নাও, আর আমায় বোঝাতে হবে না। এদিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন ভন করে।' 'আশ্রমপীড়া'তে 'প্রেম'-পাগল নবকান্ত 'ধরে' বেঁধে "প্রেমের কী মহান শক্তি" বোঝাতে শুরু করলে নরোত্তম বলেছিল, "খিদের শক্তি তার চেয়ে বেশী। আমি খেতে যাই, আমাকে ছাড়ো—।" 'সূক্ষ্মবিচারে'র চণ্ডীচরণ 'অবাক জলপানে'র খাপছাড়া মানুষদের সমগোত্রীয়। সোজা কথা সে-ও সোজা ভাবে বোঝে না। "মশায় ভালো আছেন" —তাকে এই এক প্রশ্ন ক'রে কেনারাম বিপাকে পড়ে। 'ভালো আছেন' মানে কি?" "স্বাস্থ্য কাকে বলে", "আমি কে?"—ইত্যাদি সূক্ষ্মবিচারের ধাক্কায় তার নাওয়া খাওয়া মাথায় উঠে যায়। হতাশভাবে সে এক সময় বলে, "মীমাংসা আপনিই করুন, আমার খিদে পেয়েছে।" তাতেও ছাড়া না পেয়ে কেবলরাম শেষে "পায়ে ধরে" রেহাই চায়: "আপনি কেমন আছেন' এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর করে দিতে পারবেন একটা দিন স্থির করে দিন।" 'অবাক জলপানে'র 'পথিক' অবশ্য 'পায়ে ধরে' কোন আপোস করেনি। সে জলের গ্লাস কেড়ে নিয়েই জল খেয়েছে এবং গাল দিয়েছে 'পাগল' আর 'জোচ্চোর' ব'লে।

সন্দেহ নেই, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার মতন প্রহসনগুলোর প্রভাবও সুকুমারের উপর যথেষ্ট। যদিও প্রভাবটুকুকে আত্মস্থ ক'রে নিয়ে যে সাফল্য তিনি দেখিয়েছেন তা তাঁর নিজস্ব; বস্তুতঃ, 'জল'-- এই একটি মাত্র শব্দকে অবলম্বন ক'রে জীবন ও সময়ের সুস্থ, স্বাভাবিক দাবির সামনে চোখ বুঁজে পিছন ফিরে দাঁড়ানো সমসাময়িক মানুষদের স্বভাবগত অসংগতির অমন অবিশ্বাস্য ও অমোঘ উন্মোচন আর ক'জনের পক্ষেই-বা সহজ ও সম্ভব ছিল?

চলচিত্তচঞ্চরি

সুকুমার রায়ের মৃত্যুর পর 'বিচিত্রা' পত্রিকার শ্রাবণ, ১৩৩৪ (১৯২৭) সংখ্যায় 'চলচিত্তচঞ্চরি' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই নাটকটিরও সঠিক রচনাকাল নিয়ে মতবিরোধ আছে। কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৯১১ সনে এর অভিনয় দেখেছেন ব'লে লিখেছেন 'বৈতানিক' (বৈশাখ, ১৩৭২) পত্রিকায় এক স্মৃতিচারণে। 'আনন্দ' ও 'এশিয়া' প্রকাশিত দু'টি 'সুকুমার রচনাসমগ্রে'র সম্পাদকই একে চিহ্নিত করেছেন 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম'-এর (১৯১৫) 'সমকালীন' হিসেবে।

প্রথমত, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। অন্য প্রসঙ্গে তাঁর স্মৃতিভ্রমের নজীর ঐ লেখাতেই আছে। তার চাইতেও বড়কথা—ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ ও

প্রয়োগের মধ্যকার সামঞ্জস্যহীনতা, তার 'নেতি'-মূলক সময়-বিরুদ্ধ ভূমিকা, নেতৃত্বের 'অব্যাহত নায়কতন্ত্র' ও নানান গোষ্ঠিগত কোন্দল—ইত্যাদি সম্পর্কে ১৯১১-তে সুকুমারের পক্ষে সচেতন থাকার বা হওয়ার কোন প্রমাণ নেই। স্বাভাবিকও ছিল না। অথচ এই সমস্ত নিয়ে তাঁর পরবর্তী মোহভঙ্গেরই সুনিশ্চিত ছাপ রয়েছে 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে। ইতস্ততঃ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোন অজ্ঞাতলোকে, এর আকস্মিক সূত্রপাত কিছু আগে থেকে হলেও হতে পারে। কিন্তু তার স্পষ্ট রূপ সুকুমারের চেতনায় ১৯১৫-র পূর্বে, ১৯১১তেই, দানা বেঁধেছিল এমন কথা অনুমান করা রীতি-মতন শক্ত।

সুকুমারের নিজস্ব ও নির্মোহ চিন্তাভাবনার বিকাশের ক্ষেত্রে, বিশেষত ১৯১৪-১৫-র পর থেকে, একটা তাৎপর্যপূর্ণ পরিণতির কথা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি। দ্বিতীয় পর্বের আলোচনার শুরুতে তার নজীর হিসেবেই এসেছিল 'ভাষার অত্যাচারে'র প্রসঙ্গ। 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম' নাটকটি ছিল, আমরা দেখেছি, ঐ প্রবন্ধের বক্তব্যের উদ্ভট ও নৈর্ব্যক্তিক রূপায়ণ। 'চলচিত্তচঞ্চরি'ও আমরা দেখব, মূলত একই তত্ত্বের বাস্তব-গ্রাহ্য, সামাজিক নাট্যরূপ। তাই এর রচনাকাল সম্পর্কে দুই 'সুকুমার রচনা সমগ্র'র সম্পাদকদের মতামতকেই মনে হয় সত্যের বেশী কাছাকাছি।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি ও বিশ শতকের গোড়ায়, এই কলকাতা শহরেই, নানান সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় আন্দোলনকে উপলক্ষ্য ক'রে তৈরী হয়ে উঠেছিল হরেক রকম 'সমাজ', 'দল', 'সভাসমিতি' 'ফ্র্যাটার্নিটি'। এদের অনেকের ভিতরকার সম্পর্কের তিক্ততা ও দলাদলি বহু সময়ই তখন পরিবেশকে আবিল ক'রে তুলেছিল। তৎকালীন ইতিহাসের সামান্য ঘনিষ্ঠ পরিচয় থেকেও সে কথা জানা যায়। তাদের অধিকাংশের মারামারি ছিল পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও অশ্রদ্ধা-প্রসূত। নিছক 'কথার মারামারি'। নিজের নিজের সংকীর্ণ মতামতের ক্ষেত্রে সদম্ভে অনড় থেকেও অপরপক্ষের নিন্দায় তারা ছিল পঞ্চমুখ। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট সুযোগ নিজের পরিচিত গণ্ডির ভিতরেই সুকুমারের ছিল। বলাবাহুল্য, সব চাইতে কাছে থেকে আজন্ম যাঁদের তিনি জেনেছিলেন তাঁরা হলেন ব্রাহ্মসমাজেরই তিন পরস্পরবিরোধী শাখা—আদি, সাধারণ ও নববিধানের মানুষজন। সন্দেহ নেই, 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে সুকুমারের আক্রমণ ব্যাপক ও নির্বিশেষ। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যক্ষ ও বিশেষ অভিজ্ঞতা থেকেই যে মূলত নাটকের প্রায়-রক্ত-মাংসের জ্যান্ত চরিত্রগুলোর সৃষ্টি তা অনস্বীকার্য।

ঈশানবাবুদের 'সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা' ও শ্রীখণ্ডদেবের 'আশ্রম'-এর ভিতরে সম্পর্ক আজ আদায় কাঁচকলায়। কিন্তু এক কালে 'লালাজি দেওনাথে'র আমলে, তাঁরা একান্নবর্তী ছিলেন। 'খণ্ড-সাধন'পন্থী শ্রীখণ্ডবাবু বিজ্ঞানের আগড়ুম বাগড়ুম' নিয়ে একদিকে গড়েছেন 'আশ্রম'। অন্যদিকে ঈশানবাবুদের 'সভা' অব্যাহত রেখেছে 'অখণ্ড-সাধনধারা'। প্রসঙ্গত এখানে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'জ্ঞান' ও কেশব সেনের 'ভক্তিমার্গে'র সামান্য তির্যক উল্লেখ থাকা হয়ত সম্ভব। কিন্তু 'ধাঁধা' তৈরীতে দক্ষ, রসিক সুকুমার একই সঙ্গে বিভিন্ন সাধনমার্গ, দর্শন ইত্যাদির আমদানি করে দু দলের পরিচয়কেই যথেষ্ট জটিল ও অনির্দিষ্ট করে তুলেছেন। উদ্দেশ্য, বলাবাহুল্য, আক্রমণের লক্ষ্যকে গোপন করা নয়, আক্রমণকে সর্বজনীন ক'রে তোলা। নাটকে উভয় পক্ষই নিজের মত ও পথকে একমাত্র, যথাযথ ও অভ্রান্ত ব'লে দাবী করেছে। যেমন সত্যবাহন 'তেজের সঙ্গে' শ্রীখণ্ডবাবুদের বলেছিলেন, 'অখণ্ড সাধনধারা...যদি কোথাও অক্ষুণ্ণ থাকে তবে সে হচ্ছে...সাম্য-সিদ্ধান্ত সভা।' বাস্তবেও এই রকম দাবি-পাল্টা দাবি বিরল ছিলনা। 'তত্ত্বকৌমুদী'র সম্পাদকীয়র একটা ঘোষণা, "...সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই ব্রাহ্মধর্মকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এখন একদিকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী, অপরদিকে মহাপুরুষবাদ", অর্থাৎ কেশব সেনের দলের হাত "হইতে ব্রাহ্মধর্মকে রক্ষা করুন" (২৫ মে, ১৯১[illegible])। যাই হোক এই দুই দলের সদস্যদের আত্মম্ভরিতা, হাস্যকর আচার আচরণ, বিরোধ বিসংবাদ ও বক্তব্যকে কেন্দ্র করেই শ্লেষে তীক্ষ্ণ, পরিহাসে উজ্জ্বল নাটক 'চলচিত্তচঞ্চরি'।

নাটকের শুরুতে, 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভাগৃহে' ব্যস্ততা। 'আলাভোলা বাবাজীর চেলা' ভবদুলালের সংবর্ধনার প্রস্তুতি চলছে। ঈশানবাবু গান লিখছেন। 'খুব মোটা মোটা' কয়েকটা বই নিয়ে তারই একটা মন দিয়ে পড়ে চলেছে ছাত্র সোমপ্রকাশ। শ্রীখণ্ডবাবুদের না আসার কারণ জানতে চাইলে নিকুঞ্জ বলে,

'ঈশানবাবু নাকি ওঁদের কি ইনসাল্ট করেছেন।'

একদিকে যেমন শ্রীখণ্ডবাবুদের আশ্রমের সঙ্গে 'দলাদলি', অন্যদিকে নিজেদের ভিতরেও এদের রেষারেষি প্রচুর। কবি-গায়ক ঈশানবাবুর সঙ্গে সভার আর এক সদস্য চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক সত্যবাহন সমাদ্দারের ঠোকাঠুকি তো কথায় কথায়। আজ মাননীয় অতিথির সামনে লম্বা চওড়া এক প্রবন্ধ পড়া তাঁর ইচ্ছে। অবশেষে রফা হল, 'গানটাও থাকুক, লেখাটাও পড়া হোক।' অর্থাৎ কোন মতে আপোস করে বজায় রাখা গেল 'সভা'র 'সাম্য-ভাব'। একটা সংকট আপাতত কাটল। এরপর এসে পড়ল বহুপ্রতীক্ষিত মহামান্য অতিথি ভবদুলাল।

অসংগতি ও ভণ্ডামির রাজ্যে ঢুকে পড়ে তাঁর হয়ে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাবে এমনই এক চরিত্রের সন্ধানে ছিলেন সুকুমার বহুদিন। চরিত্রটি কেমন হবে সেটা তাঁর কিশোর বয়সের একটি ছোট্ট ঘটনাতেই প্রকাশ পেয়েছিল। ছোটদের ম্যানার্স শেখানোর নামে এক 'স্টাইলিশ' মাসীর 'কড়া শাসন' শেষ অব্দি সুকুমারের বিচিত্র প্রতিবাদের ফলে বন্ধ হয়েছিল। বোকা সেজে সুকুমার কীভাবে 'বিদ্রোহ' করেছিলেন, তার বিবরণ দিয়েছেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী। অসংগতির বিরুদ্ধে সুকুমারের 'বিদ্রোহে'র এই একান্ত নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে নাটকের ক্ষেত্রে প্রথম দেখা দিয়েছিল 'শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুমে'র বিশ্বম্ভর। 'স্বর্গপথ' থেকে 'সশিষ্য গুরুজি'র 'দ্রুম' শব্দে পতনের পিছনে তার ভূমিকা নগণ্য ছিলনা। তবু চরিত্র হিসেবে বিশ্বম্ভর অসম্পূর্ণ। তার সচেতন ও বুদ্ধিমান ভাবটাও কখনো পুরোপুরি চাপা থাকেনি। সেদিক থেকে বিশ্বম্ভরেরই পূর্ণতর যথার্থ উত্তরসূরী হল এই অপরিণত-বুদ্ধি, নির্বোধচূড়ামণি ভবদুলাল। সে নিজে যেমন হাস্যকর হয়ে উঠবে তেমনি অব্যর্থভাবেই উন্মোচন করবে চারপাশের ততোধিক হাস্যকরতাকে।

যাইহোক, 'স্বাগত সংগীতে'র পরই সত্যবাহন খাতা হাতে নিলেন। প্রবন্ধ পাঠের আগে ভবদুলালের গুরু 'আলাভোলা বাবাজী'র প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন এক স্বর্গীয় দৃশ্যের কথা স্মরণ ক'রে: হাস্যোজ্জ্বল মুখে 'পরম নির্লিপ্তির সঙ্গে' বাবাজী পোষা চামচিকেটিকে জিলিপি খাওয়াচ্ছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'শহরে বাদুড় পোষা' শীর্ষক একটি ছোট সংবাদ ছাপা হয়েছিল শ্রাবণ ১৩২২-এর 'প্রবাসী'তে।

এরপর সমস্যা দেখা দিল: শ্রীখণ্ডবাবুদের সম্পর্কে ভবদুলালকে ওয়াকিবহাল করা জরুরী। প্রতিদ্বন্দ্বী সত্যবাহনকে সে-সুযোগ না দিয়ে ঈশানবাবু আগ বাড়িয়ে সোমপ্রকাশকে বলতে বললেন। সুকুমার-কথিত 'ভাষার অত্যাচারে'র এক মূর্তিমান দৃষ্টান্ত এই সোমপ্রকাশ। 'শ্রুতি' বা 'আপ্তবাক্য' ছাড়া সে এক পাও চলতে পারে না। কথায় কথায় অর্থহীন-ভাবে 'পাশ্চাত্য দার্শনিক' বা 'বড় বড় পণ্ডিত'দের কথা বলে সে, সুকুমারের ভাষায়, নিজের 'অভিজ্ঞতার উপর' 'পাণ্ডিত্যের রঙ' ফলায়। অপরদিকে 'আশ্রমে'র ছাত্রদের অশিষ্ট দুর্বিনীত আচরণ, ঔদ্ধত্য ইত্যাদি নিয়ে 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভা'র সদস্যদের নিরন্তর অভিযোগের হাস্যকরতার মধ্যে সম্ভবত যুবসমাজ সম্পর্কে প্রবীন ব্রাহ্মদের একাংশের অসহিষ্ণু মনোভাবই প্রতি-ফলিত। ব্রাহ্মসমাজের 'স্বাভাবিক নেতা' হিসেবে এ-বিষয়ে সুকুমারের অভিজ্ঞতার কোন অভাব ছিল না। আর তিনি নিজেও ক্রমশ আজন্ম যাঁদের স্নেহ পেয়েছেন—শ্রদ্ধেয় হিসেবে জেনে এসেছেন তাঁদেরই অন্যায়ের প্রতিবাদে নেমে, 'নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত' 'সমাজের' অনেকের চোখে হয়ে উঠেছিলেন একজন 'ব্যাঘাতকারী প্রতিপক্ষ' (সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহালানবীশের চিঠি, তত্ত্বকৌমুদী, মে ১৯২১)। যুবকদের নিয়ে 'সমাজে'র উপরমহলের দুর্ভাবনার নজীর হিসেবে দু'-বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত 'তত্ত্বকৌমুদী'র দুটি 'সম্পাদকীয়'র উল্লেখ করা চলে। 'আমাদের যুবকগণ'- এই শিরোনামে ২রা ডিসেম্বর, ১৯১৪তে 'তত্ত্বকৌমুদী' লিখেছিল, "অনেকে এই রূপ মনে করেন যে, ব্রাহ্মসমাজে যে-সকল যুবকের জন্ম হইয়াছে...তাঁহাদের দ্বারা আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে না। তাঁহারা যে শিক্ষা সাধনা, সংযম সেবা ও ধর্মভাব দ্বারা সমাজের সেবার উপযোগী হইবেন এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে না...।" 'ব্রাহ্ম যুবকগণের কর্তব্য' নামে আর একটি সম্পাদকীয় (১৬ই নভেম্বর, ১৯১৬) উপদেশ দিয়েছিল, "...গুরু-জনের-কার্য্যেরও সময় সময় প্রতিবাদ প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু তাহা অতীব বিনয় নম্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত করিতে হইবে।" পাশাপাশি 'আশ্রমে'র ছাত্রদের "শ্রদ্ধা গাম্ভীর্যাদি পরিপূর্ণ বিনয়াবনতির ঐকান্তিক অভাব" বিষয়ে সত্যবাহনের অভিযোগ স্মরণ করলে ছবিটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে যায়।

এরপরই আলোচনা গড়িয়ে এলো 'সাম্যসিদ্ধান্তসভা'র বিশেষ দর্শনের কথায়, সমীক্ষাচক্র, সমসাম্যসাধন আর মৌলিক খণ্ডাখণ্ডের প্রসঙ্গে। সন্দেহ নেই, 'সাম্যসিদ্ধান্তসভা'য় 'খণ্ড' 'অখণ্ড' এবং 'খণ্ডাখণ্ড মীমাংসা'র তত্ত্বগুলো কার্যত দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে নিয়েই ঠাট্টা। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শন ও সাধনাকে সুকুমার মূলত বিদ্রূপ করতে চেয়েছেন মনে হলেও তা হয়ত ঠিক নয়। আসলে সুকুমার তাঁর 'এই দুর্ভাগ্য' দেশকে জানতেন, যেখানে 'জীর্ণতার পরিত্যক্ত কঙ্কাল…প্রাণের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রীত' হয়ে থাকে। জানতেন সেই মানুষদেরও যারা 'ঝাপসা কথার ধোঁকা' দিয়ে 'আপন মনে এক একটা অস্পষ্টতার মোহ সৃজন করে এবং সেই মোহকে জীবনের মধ্যে সংক্রামিত' করে দিয়ে 'অকারণ আত্মতৃপ্ত বোধ' করে ('দেবেন দেয়ম্')। নিজের 'আত্মপ্রতারিত সমাজে'র (অপ্রকাশিত 'হিজিবিজি খাতা') গণ্ডির ভিতরে ও বাইরে পরিচিত অপরিচিত এই সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত মানুষই সম্ভবত এখানে সুকুমারের আক্রমণের লক্ষ্য। মজা হল, তন্ত্রসাধনা ইত্যাদিকে তিনি যেমন টেনে এনেছেন, তেমনি, ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বা অদ্বৈতবাদকে নিয়ে মস্করা করতেও তিনি পিছপা হননি। পরবর্তীকালের 'rampant…pessimism'-এর কোন পূর্বলক্ষণ এখানে পাওয়া যায় কিনা, তা ভেবে দেখা যেতে পারে। যাই হোক, 'খণ্ড', 'অখণ্ড', 'খণ্ডাখণ্ড', 'সমীক্ষা সাধন' ইত্যাদির সাহায্যে এমন এক মিশ্র ও নির্বিশেষ 'ভাষা' হয়ত তৈরী করতে চেয়েছিলেন সুকুমার যাতে একই সঙ্গে ধরা পড়বার কথা অনেকের।

দ্বিতীয় দৃশ্যে, সন্ধ্যাবেলায় সমীক্ষা-মন্দিরের ভাবগম্ভীর পরিবেশে চক্রাচার্যের আসনে ঈশানবাবুকে দেখতে পাই। তিনি বলে চলেছেন তাঁর 'আত্মাঘুড়ি উধাও হয়ে শূন্যে উড়ে পৌঁছে যাওয়া'র অভিজ্ঞতার কথা। '…অন্ধকার যতই জমাট হয়ে উঠছে, ততই আমায় আস্তে আস্তে ঠেলছে আর বলছে, 'আছ নাকি ? আছ নাকি ?' আমি প্রাণপণে চিৎকার ক'রে বললাম—'আছি', কিন্তু কোন আওয়াজ হল না—খালি মনে হল অন্ধকারের পাঁজরের মধ্যে আমার শব্দটা নিঃশ্বাসের মতো উঠছে আর পড়ছে।' ভবদুলাল শিহরিত, 'উঃ বলেন কি মশাই ?' ঈশান বলে চললেন, '…দেখলাম সৃষ্টির কারখানায় মালপত্রের হিসেব মিলছে না। ..আমি চিৎকার করে বলতে গেলুম সব নাশ! সব নাশ! সৃষ্টিতে ভেজাল পড়েছে — কিন্তু কথাগুলো মুখ থেকে বেরোলই না। বেরোল খালি হাহা হাহা একটা বিকট হাসি। সেই শব্দে সমীক্ষা বন্ধন ছুটে গিয়ে সমস্ত শরীর ঝিম ঝিম করতে লাগল।'

ঈশানের এই 'সমীক্ষা'র পেছনে কোন বাস্তব অবলম্বন সুকুমারের কাছে প্রকৃতই ছিল কিনা সেটা গবেষণার বিষয়। কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছিয়েও আপাততঃ পাশাপাশি দুটো উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমটি 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' থেকে : "…আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতরে প্রবেশ ক'ল্লে! আর ষট্‌পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল।…এই রূপে মূলাধার, সাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার সকল পদ্মগুলি ফুটে উঠল। আর নীচে-মুখ ছিল উর্ধ-মুখ হলো, প্রত্যক্ষ দেখলাম" (৩য় ভাগ, পৃঃ ১৯৮)। দ্বিতীয়টি 'স্বামী-শিষ্য সংবাদ' থেকে : "স্বামীজী আসনে বসিবার অল্পক্ষণ পরেই একেবারে স্থির শান্ত নিস্পন্দ হইয়া সুমেরুবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন…প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে…শিব শিব বলিয়া ধ্যানোত্থিত হইলেন। (বলিলেন)…ধ্যান গভীর হইলে কত কি দেখতে পাওয়া যায়। বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ইড়া পিঙ্গলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিলুম" (বিবেকানন্দ রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৪২)। এই রকম কোন আসরে উপস্থিত থাকলে ভবদুলাল কি করত আমরা জানি না, তবে নাটকে ঈশান থামতে না থামতে সে সোৎসাহে বলতে শুরু করেছে, তারপর '…সেই যে লোকটা ভেজাল দিয়েছে সেই ভেজাল ক্রমাগতই ঠেলে উপরে উঠতে চাচ্ছে। উঠতে পারছে না, আর গুমরে গুমরে ফেঁপে উঠছে। সব কে যেন ফিস ফিস করে বলছে—'শেক দি বট্‌ল্, শেক দি বট্‌ল্'—সত্যি।'

সোমপ্রকাশ হঠাৎ একবার 'একদিকে হেরিডিটি আর একদিকে এনভাইরণমেণ্ট—এই দুয়ের প্রভাব' নিয়ে 'খুব বিজ্ঞের' মত স্বগতোক্তি করেছিল। 'শ্রুতি বা আপ্তবাক্যের আশ্রয়টুকু নিয়ে সে নিশ্চিত ভেবেছিল 'ঐ সকল তত্ত্বের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইল' ('ভাষার অত্যাচার')। তারপর

আশ্রমের 'নিরাবলি' আলাপের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার বিপদটা কোথায় সেটা বোঝাবার জন্য সে হার্বার্ট স্পেন্সারের ভারী একটা মতের উল্লেখ ক'রে ভবদুলালকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি হার্বার্ট স্পেন্সারকে জানেন তো?' সোমপ্রকাশের কাছে 'জানা'র অর্থই চিন্তাহীনভাবে 'মানা'। তার প্রশ্নের সুরেও সেটা ছিল। তাই ভবদুলাল বলল, শুধু হার্বার্ট বা স্পেন্সার কেন, 'হাঁচি টিকটিকি ভূত প্রেত'- সব কিছুই সে 'মানে'। এই প্রসঙ্গে একটা কৌতুহলোদ্দীপক তথ্য এখানে উল্লেখ করা যায়। স্পেন্সারের যে মন্তব্য সোমপ্রকাশ উল্লেখ করেছিল তা হল, "...বিপদ মারাত্মক হয় সেখানে, যেখানে তার অন্তর্গূঢ় ভাবটিকে তার বাইরের কোন অবান্তর রূপের দ্বারা আচ্ছন্ন করে রাখা হয়।" অন্যদিকে সুকুমারের 'হিজিবিজি খাতা'র এক পৃষ্ঠাতেও চোখে পড়ছে একটা অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি, 'Fundamental ideal obscured by false analogies'। এবং তার পরেই, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ক্ষেত্রেও যে এটা সর্বতোভাবে প্রযোজ্য এই মর্মে, বন্ধনীর ভিতরে ছিল তাঁর নিজের মন্তব্য, 'This is true of practically all the various ideals of the S.B.S'।

তৃতীয় দৃশ্যে, শ্রীখণ্ডদেবের আশ্রমে সত্যবাহন-সমভিব্যাহারে ভবদুলাল এসে হাজির। আশ্রমে তখন 'সেমি সার্কল' হয়ে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে। শ্রীখণ্ডদেব টেবিলের উপরে বড় বড় বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ঘরের একপাশে অদ্ভুত যন্ত্র, অর্থহীন চার্ট। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে একটা বিজ্ঞান-বিজ্ঞান গন্ধ।

সত্যবাহন ছাত্রদের একজনকে পাঠ্যসূচী জিজ্ঞেস করায় সে গড়গড়িয়ে বলতে থাকে, '...শব্দার্থ খণ্ডিকা, আয়স্কন্ধ পদ্ধতি, লোকাণ্ড প্রকরণ, সিয়েকস কসমোপেডিয়া, পালস একস্ট্রা-সাইক্লিক ইকুইলিব্রিয়াম অ্যাণ্ড দি নেগেটিভ জিরো—।' ১৯১৫ সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মবিদ্যালয়ে'র পাঠ্যসূচী বা ঐ জাতীয় কিছু এখানে সুকুমারের ভাবনায় আদৌ ছিল কিনা জানা নেই। তবে 'তত্ত্বকৌমুদী' (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯১৫) থেকে আংশিক উদ্ধৃতি হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না: সিনিয়র ক্লাসের পাঠ্য ছিল: "(১) ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, ঐতরীয়, তৈত্তরীয় উপনিষদ...(২) ভগবদ্গীতা (৩) New Testament (৪) Philosophy of Brahmoism (৫) Two Essays on General Philosophy and Ethics (৬) ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা (৭) History of the Brahmo Samaj' ইত্যাদি। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের এক প্রশ্নের জবাবে সুকুমার একবার বলেছিলেন 'জীবনের আদর্শ' হল 'সিরিয়াস ইনটারেস্ট ইন লাইফ' ('পরিচয়ের কুড়ি বছর', হিরণকুমার সান্যাল)। স্বভাবত তাঁর মতন একজন সুস্থ জীবনবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে 'ব্রহ্মবিদ্যালয়ে'র ঐ জীবন-বিমুখ পাঠসূচী যদি কখনো কায়ত শ্রীখণ্ডদেব-দের আশ্রমের পাঠ্যসূচীর মতনই কৌতুকপ্রদ, উদ্ভট মনে হয়ে থাকে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই।

লক্ষণীয়, 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভা'র চাইতে যে বিশেষ কারণে শ্রীখণ্ড শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্তির দাবিদার সেটা হল তাঁর 'বিজ্ঞান'-সম্মত সাধনপ্রণালী। 'আশ্রমে'র পাঠ্যসূচীতেও তার প্রকাশ ছিল। আমরা জানি এক সময় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের কাছে হিন্দুধর্মকে গ্রহণযোগ্য ক'রে তোলার জন্য শশধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ নব্যহিন্দু-আন্দোলনের নায়কেরা প্রায় প্রতি পদক্ষেপে, এমনকি 'টিকি-তত্ত্ব ও গঙ্গাজল-মাহাত্ম্যের সমর্থনেও' ('দেবেন দেয়ম'—সুকুমার রায়) টেনে এনেছিলেন বিজ্ঞানকে। দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার প্রসঙ্গে 'হাঁচি টিকটিকি' 'মানা' নিয়ে ভবদুলালের ঘোষণায় এর প্রতি কটাক্ষ ছিল। এসব নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা বিদ্রূপ আছে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রহসনে, কবিতায়। ১৯১০ সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'নবীন সন্যাসী' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবার সময় পাঁচটি সংখ্যায় ছবি এঁকেছিলেন সুকুমার। সেখানেও ছিল এক 'Society for the Propagation of Electrical Hinduism'-এর কাহিনী। আতপ চালের দাম বেড়ে যাবার জন্য বাচস্পতি মশাইকে বাধ্য হয়ে সিদ্ধচাল ধরতে হ'তে পারে শুনে 'Society'-র কয়েকজন সভ্য 'সমস্বরে' ব'লে উঠেছিল, "সর্বনাশ। সর্বনাশ। তা করবেন না বাচস্পতি মহাশয়, আপনার শরীরের ইলেকট্রিসিটি কমে যাবে" (প্রবাসী, কার্তিক, ১৩১৭)। যে ভঙ্গিতে শ্রীখণ্ড 'বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী'র কথা বলেছেন তার ভিতরে সুকুমারের কথায় বলতে গেলে রয়েছে একটা 'চূড়ান্ত মীমাংসার ভড়ং'

('ভাষার অত্যাচার')। 'ভাষার অত্যাচারে' সুকুমার লিখেছিলেন, 'এক একটা কথার ধুয়া আমাদের স্বাভাবিক চিন্তা শক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া দেয়।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলেছিলেন, লোকে "সনাতন ধর্মের নজীরকে অর্থাৎ ঐ "সনাতন' শব্দটার নজীরকে এমন অকাট্যভাবে মনের সম্মুখে দাঁড় করায়, যেন ইহার উপর আর কথা বলা চলে না।" এখানেও তাই। 'প্রণালী' নয় 'বিজ্ঞান' শব্দটিকেই শ্রীখণ্ড 'অকাট্য' করে তুলতে চেয়েছে। যেমন করেছে 'হ য ব র ল'-র কাক্কেশ্বর কুচকুচে। তার বিজ্ঞাপন-পত্রে 'সকল প্রকার গণনার কার্য বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন' হবার দাবির কথা নিশ্চয় মনে পড়ে যাবে।

চতুর্থ দৃশ্যে, সত্যবাহন, ঈশান, সোমপ্রকাশ মিলে যখন শ্রীখণ্ডবাবুদের দলে ভবদুলালের ভিড়ে-যাবার কথা আলোচনা করছে সেই মুহূর্তে 'আশ্রমে' তুলকালাম বাধিয়ে, আসার আগে 'একটা ছেলের কান মলে' দিয়ে 'টুইঙ্কল্ টুইঙ্কলে'র সুরে ঈশানের এক গান গাইতে গাইতে স্বয়ং ভবদুলাল ফের হাজির। লক্ষ্যণীয়, আগের তিনটি দৃশ্যেই ভবদুলালের ভূমিকা ছিল পরোক্ষ, শুধুই উন্মোচনের। জিজ্ঞাসু মানুষ হিসেবে সে ঢুকে পড়েছিল দুই বিবদমান দলের ভিতরে এবং নেহাৎই হাঁদা-গঙ্গারামের মতন একটি দুটি মন্তব্য বা প্রশ্ন ক'রে তাদের বড় বড় অন্তঃসারশূন্য ভাব, তত্ত্ব ও পণ্ডপাণ্ডিত্যকে অনায়াসেই চুপসে দিয়েছিল। কিন্তু চতুর্থ দৃশ্যে তার ভূমিকা, এক কথায় বলা যায়, বিধ্বংসী। এর আগে একটু আধটু করে আঁচ করা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু এখানেই প্রথম তার 'madness'-এর ভিতরে সুস্পষ্ট 'method'-এর আভাস পাওয়া গেল।

ভবদুলাল আশ্রমে এক দূরবীণ দেখে এসেছে, "তার এমন তেজ যে চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের গায়ে সব ফোস্কা ফোস্কা ...পড়ে যায়।" সোমপ্রকাশের মতে, ওরা ভালোমানুষ পেয়ে সাপ বোঝাতে ব্যাং বুঝিয়েছে। এই 'ব্যাং'-এর সূত্র ধরে ভবদুলাল কাউকে 'কোলাব্যাং', কাউকে 'হাঁ-করা বোয়াল মাছ', কাউকে 'ডাবাহুঁকো' বলে চিহ্নিত করেছে ; সহ্য করতে না-পেরে সত্যবাহন বলে ওঠে : 'মশায় আপনি ওখানে ছিলেন—বেশ ছিলেন। আবার আমাদের হাড় জ্বালাতে এলেন কেন?' 'This is not altogether Fool, my lord'—কিং লিয়ার নাটকে 'Fool' সম্পর্কে কেন্টের এই মন্তব্যই হয়ত সত্যবাহনের মনের কথা।

পরিস্থিতি এর পর আরো ঘোরালো হল যখন ভবদুলালের 'চলচিত্তচঞ্চরি'র পাণ্ডুলিপি চোখে পড়ল সবার। 'চলচিত্তচঞ্চরি'র আয়নায় যা ধরা পড়েছে সেটাই সত্যবাহন ও শ্রীখণ্ডদেব-দের আসল রূপ। নিজেদের অস্তিত্বকে এমন উদ্ভট ও অর্থহীন বলে স্বীকার করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবির সমান ভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে আয়নাটাকেই ভেঙে ফেলতে চায়। আগেই এর তেইশটা পাতা ছিঁড়ে দিয়েছিলেন শ্রীখণ্ডবাবু। এবার 'সাম্যসিদ্ধান্ত সভা'র সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খাতার উপর। বাকী পাতাগুলোও গেল। তবে "খাতা ছিঁড়ে দিয়েছেন তো কী হয়েছে"। সে আবার লিখবে 'চলচিত্তচঞ্চরি'। সত্যবাহনদের "সাম্যঘন্ট আর সিদ্ধান্ত-বিসূচিকা' তখন 'কোথায় লাগে' দেখা যাবে।

আমরা অবশ্য জানি, কোনদিনই শেষ অব্দি লেখা হবেনা 'চলচিত্তচঞ্চরি'। সর্বত্র ও সর্বসময়ে ছড়িয়ে থাকা সত্যবাহন আর শ্রীখণ্ডের দল বারবারই একে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে চাইবে। তবুও অদম্য ভবদুলাল আবার সত্য উন্মোচন করবে। 'আবার' লিখবে। 'আবার।'

অপ্রকাশিত 'হিজিবিজি খাতা'র অংশবিশেষ ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। তাঁর কাছে লেখক কৃতজ্ঞ

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

অর্থ-অনর্থ

শব্দের একদিকে অর্থ অন্যদিকে অনর্থ—এই দুই বিপরীতের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট সুকুমার-শিল্পের বিশ্ব। মৃত ও ফসিল শব্দ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, শব্দকে আক্রমণ করে, শব্দের অন্তঃসার ছুঁতে চেয়েছিলেন সুকুমার।

'ভোম্বায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।' শেষ কবিতার এই আঁটো লাইনে সুকুমার রায় নিজেই যেন তাঁর স্বরচিত বিশ্বের পরিচয়-লিপি লিখেছেন। এক দিকে নিরর্থ (ননসেন্স), অন্য দিকে প্যাটার্ন—এই দুই বিপরীতের অবিরত টানাপোড়েন দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর শিল্পের বিশ্ব। মূলগত এই যে দ্বান্দ্বিক সংযোগ, এর পশ্চাদ্ভূমিতে রয়েছে আরও নানান বিপরীতের ঐক্য-সংঘাত, যার চাপ আমরা লক্ষ করি তাঁর শিল্পের স্তরে-স্তরে। এক আজগুবি কল্পলোক আর এক আজগুবি বস্তুলোকের টানটান ভারসাম্যের ওপর উচ্ছ্রিত হয়ে ওঠে তাঁর সহাস্য, অসম্ভব ভুবন। এই সব কারণে তাঁর বিকীর্ণ রসিকতা বহুকৌণিক; একাধারে সরল আর তির্যক। অনাবিল (ইনোসেন্ট) এবং উদ্দেশ্যপ্রবণ (টেনডেনশাস): রসিকতার এই দুই শ্রেণীভাগ করেছিলেন সিগমুণ্ড ফ্রয়েড। কিন্তু এই শ্রেণীভেদ সুকুমার রায়ের ক্ষেত্রে অবান্তর। কারণ, এ-রকম দেওয়াল তুলে তাঁর ভুবনকে দ্বিখণ্ডিত করা সম্ভব নয়। তাঁর ননসেন্স একটা স্তরে হালকা, অনাবিল লীলাহসিত। আবার, অন্য স্তরে তাঁর এই হাসিই হয়ে ওঠে তীর: তীক্ষ্ণ, লক্ষ্যভেদী। এই প্রসঙ্গে 'স্তর' কথাটা হয়তো যথার্থ হলো না। এমন নয় যে ওপরের স্তরে রয়েছে তাৎপর্যহীন, তীব্রতাহীন, লক্ষ্যহীন হাসি; আর, খানিকটা তফাতে, নিচের স্তরে, গূঢ় ব্যঙ্গ। আসলে, এ যেন পিঁয়াজের খোশা; পর-পর খোশা ছাড়িয়ে গেলে আস্তরণের তলায় কোনও শাঁসালো লক্ষ্যের নাগাল পাবো না আমরা। খোশা আর শাঁস এখানে এক। শব্দসৃজিত এই খোশারই কোষে-কোষে বেমালুম মিলে-মিশে আছে ননসেন্স আর লক্ষ্যময় শ্লেষ।

এক

'শব্দসৃজিত' বলতে বোঝাতে চাইছি: সুকুমার রায়ের এই সৃষ্টি শব্দ দিয়ে এবং শব্দ নিয়ে। শব্দের-পাশে-শব্দ গেঁথে, বুনে, তাঁর রঙ্গ; আবার শব্দ নিয়েই তাঁর পরিহাস। এই উভবল্লতার কারণে তাঁর লেখার অন্যতম থীম হিসেবে শব্দ-কল্পদ্রুমের (শব্দ আর অর্থের সম্পর্ক/নিঃসম্পর্ক নিয়ে রসিকতার) আবর্তন হ'তে থাকে। অর্থের অনুষঙ্গঘটিত যোগ আছে, 'শব্দকল্পদ্রুম'-এর সঙ্গে 'অভিধান'-এর। অভিধান বিষয়ে লুইস ক্যারল আর সুকুমার রায়ের দুটি চরিত্রের মন্তব্য এতই আলাদা যে তা থেকে আঁচ পাওয়া যায়, এই দুই লেখকের

শরসন্ধানের লক্ষ্যও কতটা পৃথক। ক্যারলের লাল রানিবিবির কাছে অভিধান হচ্ছে অর্থবহতার প্রতিমান। সে ব'লে ওঠে : 'as sensible as a dictionary'। অন্য পক্ষে, সুকুমার রায়ের ভাবুকদাদা ফতোয়া দেয় : 'অভিধান…গঞ্জিকা'।

এই লক্ষ্যের তফাৎ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে মতান্তরের আরেকটা উদাহরণ থেকে। শব্দ আর অর্থের সম্পর্ক নিয়ে হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টির সঙ্গে অ্যালিসের এই রকম কথাবার্তা হয় :

'I don't know what you mean by "glory",' Alice said.

Humpty Dumpty smiled contemptuously. 'Of course you don't—till I tell you. I meant "there's a nice knockdown argument for you!" '

'But "glory" doesn't mean "a nice knock-down argument",' Alice objected.

'When *I* use a word', Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 'it means just what I choose it to mean—neither more nor less.'

'The question is,' said Alice, 'whether you *can* make words mean so many different things.'

'The question is,' said Humpty Dumpty, 'which is to be master—that's all.'

এ-বিষয়ে সুকুমার রায় ঠিক বিপরীত বক্তব্য সরাসরি নিজের জবানিতেই পেশ করেন 'ভাষার অত্যাচার' প্রবন্ধে। গুরুত্বময় এই প্রবন্ধ; সাহিত্যে উনি যা করতে চেয়েছেন, এখানে তার অনেকটা বিবৃতি পেয়ে যাচ্ছি, মননের গদ্যে। দুঃখের বিষয়, 'বর্ণমালাতত্ত্ব'-এ এর যে-পাঠ ছাপা হয়েছে, তাতে রয়ে গেছে গুরুতর প্রমাদ। এখানে 'ভাষার অত্যাচার' থেকে কয়েকটি লাইন তুলে দিচ্ছি : 'এক-একটা কথা আসে অতি নিরীহভাবে চিন্তার বাহনরূপে। কিন্তু চিন্তার আদর তো চিরকাল সমান থাকে না; সুতরাং তাহার আসনচ্যুতি ঘটিতে কতক্ষণ? বাহনটা কিন্তু অত সহজে হটিবার নয়; সে তখন একাই চিন্তার ক্ষেত্রে দাপাদাপি করিয়া আসন জমাইয়া রাখে। ইহাকেই বলি ভাষার অত্যাচার। ভাষা ভাববাহন কার্যেই নিযুক্ত থাকুক; সে আবার চিন্তার আসরে নামিয়া আপনার জের টানিতে থাকিবে কেন?…শব্দঘটার সাহায্যে …গাম্ভীর্য সঞ্চয়ের জন্য অনেকেই সচেষ্ট, কিন্তু শব্দের মধ্যে যে-ভাবটুকু ছিল, সে কোনকালে খোলস ছাড়াইয়া পলাইয়াছে কে তাহার খবর রাখে?'

শব্দকে দিয়ে যথেচ্ছ অর্থ বওয়াতে চাইছে ক্যারলের এই চরিত্র-পাত্র; অন্য পক্ষে, সুকুমার রায় চাইছেন শব্দের নির্দিষ্ট অর্থের নিষ্কাশন। যেখানে হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টি ভাঙতে চাইছে অর্থের বেড়ি, সেখানে সুকুমার রায় ঘটাতে চাইছেন, শব্দের দাসত্ব থেকে মনের মুক্তি। হাম্‌প্‌টি ডাম্‌প্‌টির কাম্য, শব্দ-অর্থের বিয়োগ; অথচ এই দুইয়ের সংযোগই সুকুমার রায়ের অভীষ্ট।

ননসেন্স আর অ্যাবসার্ড-এর মধ্যে সারূপ্য আছে, আছে চলাচল। তবে কি সুকুমার রায়কে বুঝতে অ্যাবসার্ডের ব্যাকরণ কিছু সাহায্য করে? করে না; কারণ, লক্ষ্য আর পটভূমির দিক দিয়ে সুকুমার রায়ের সঙ্গে অ্যাবসার্ডবাদীর মিলের চেয়ে গরমিলই ঢের বেশি। দর্শনে সাহিত্যে নাটকে 'অ্যাবসার্ড' বলতে বোঝায় : অর্থহীন, উদ্দেশ্যরহিত। এ এক বোধ, যার উদ্ভব অস্তিত্বের তীব্রতম সংকট থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম জগতের বিশেষ পরিস্থিতি এই সংকট-বোধের অব্যবহিত পটভূমি। ঈশ্বরহীন অনাত্মীয় অবোধ্য এক ভুবনের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষ টের পেলো, সে আজ একেবারে হাঘরে নিঃস্ব উদ্বাস্তু; ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তার বিশ্বাসের শিকড়। সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে, এমন কি নিজের সঙ্গেও, তার ঘটে গেছে অপ্রতিকার্য, চরম, বিচ্ছেদ। 'মুহূর্ত মুহূর্ত শুধু জন্মহীন মহাশূন্যে ঘেরা।' যে-মানুষ তার অস্তিত্বের চতুর্দিকে দেখছে সীমাহীন তলহীন শেষহীন 'না'; যে-মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে পিষ্ট হচ্ছে জগদ্দল অর্থশূন্যতায়, তার কাছে—স্বভাবতই —শব্দও অর্থহীন। 'শব্দ আর কোনও কথা বলে না,' বলেছেন আইয়োনেসকো। অ্যাবসার্ডপন্থী তাই ভাষার পরিবহন-সামর্থ্যে অবিশ্বাসী; শব্দ থেকেই সরে যেতে চান তিনি।

সুকুমার রায় যে-পরিস্থিতির মুকাবিলা করেছেন, তা সম্পূর্ণ পৃথক। কোথায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম জগৎ আর কোথায় ১৯১৪ থেকে ১৯২৩-এর বাংলাদেশ! আশমান-জমিনের ফারাক এই দুই পরিস্থিতির মধ্যে। দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বাংলাদেশে সংকটের রূপই ছিল অন্য জাতের। আর বিশ্বাসের সমস্যা? বিশ্বাসের জমিতে তখন এখানে-ওখানে ফাটল ধরলেও, আমূল ভ্রষ্ট হয়ে যায় নি সমস্ত অস্তিত্বের অর্থ। স্থানকালের সমস্ত বিক্ষোভ আর 'না'-এর দাপটের ঊর্ধ্বে, অমোঘ 'হ্যাঁ'-কে সমর্থন ক'রে তখন বিরাজ করছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, যাঁর সর্বাস্তিক বিশ্বাসের সৌরবিশ্বে সুকুমার রায়ের অবস্থান। ১৯১৪ সালে সুকুমার রায় লিখছেন: 'যখনই কোনো নৈতিক বা সামাজিক প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হই, "কি করিব?" "কেন করিতেছি?" এই প্রশ্ন যখনই মনের মধ্যে উদিত হয়, তখনই দেখি সঙ্গে-সঙ্গেই আর একটা প্রশ্ন ছায়ার মতো ঘুরিতেছে, "আমি কে?" "এই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি?"...মানুষের চিন্তা দ্বারে-দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছে, "এ প্রশ্নের সমাধান কোথায়?" এবং বারবার একই উত্তর পাইতেছে, "অন্বেষণ করিয়া দেখ" ('চিরন্তন প্রশ্ন')। আবার, ব্রাহ্মসমাজের এক প্রবীণ নেতার প্রশ্নের উত্তরেও সেদিনের যুব ব্রাহ্মনেতা সুকুমার রায় বলেছিলেন, জীবনের আদর্শ হচ্ছে, 'সিরিয়স ইন্টারেস্ট ইন লাইফ।' বহু হতাশা আর সংঘাত সত্ত্বেও আমরণ এই বিশ্বাস তাঁর নিষ্কম্প ছিল বলেই নিরর্থের মধ্যে থেকে প্যাটার্ন উদ্ভিন্ন করার রোখ কোনও দিন তাঁর থামে নি। হয়তো তোড়া বাঁধার সঙ্গে আইডিয়লজির বিন্যাসের কোথাও প্রতিসাম্য আছে।

অ্যাবসার্ডবাদীর থেকে সুকুমার রায়ের পরিস্থিতি আরও এই কারণে পৃথক যে এক পরাধীন দেশের লেখক ছিলেন তিনি। পরাধীনতাই সেদিন আমাদের দেশে সৃষ্টি করেছিল তীব্রতম সংকট। শৃঙ্খলিত অবস্থায় স্বাধীনতা জিনিশটাই জল-হাওয়ার মতো এমনই জরুরি শারীরিক সত্যি হয়ে ওঠে যে তা টানটান ক'রে দেয় সমস্ত চেতনাকে। তারই চাপে জোট বাঁধে সাধারণ্য; খুদে-খুদে আমি'র রেশমি গুটির মধ্যে থেকে খানিকটা বেরিয়ে এসে মানুষের মন খুঁজে পায় স্বাদেশিক ঐকাত্ম্যের কেন্দ্র, দেশের শহর-থেকে-গ্রামে, প্রান্ত-থেকে-প্রান্তে, বাক্-চলাচলের একটি সম্ভাবনা খুলে যায়। শব্দ তখন কথা বলে; তখন শব্দ হয়ে ওঠে হাতিয়ার, ক্রিয়া। স্বাধীনতার এই সংবিৎ সত্যি বলার, সত্যি হয়ে-ওঠার প্রবর্তনা জোগায়। চেতনার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট এই পরিস্থিতিতে, সুকুমার রায়ের মতন সাহিত্যিকের তাড়না আসতেই পারে আবর্জনা-শব্দ মৃত-শব্দ ফসিল-শব্দ ছুঁড়ে ফেলে দেবার; তাঁর আকাঙ্ক্ষা জাগতেই পারে শব্দের অন্তঃসার—মজ্জা—ছোঁবার।

শব্দ থেকে নিষ্ক্রমণ নয়, শব্দকে আক্রমণ—নিরর্থক শব্দের বিরুদ্ধে সহাস্য জেহাদ—তাহ'লে, এই টই হলো তাঁর প্রধান লক্ষ্য। শব্দকে শব্দ দিয়ে ঘা মেরে হাসির ফুলকি জ্বালানোর এই প্রক্রিয়াকে বলতে পারি: শব্দদ্বন্দ্ব। এই শব্দদ্বন্দ্ব বহু ক্ষেত্রেই হয়ে ওঠে নিরর্থ-কে নিরর্থ দিয়ে প্রত্যাঘাত (যেমন: 'গ্রিঘাংচু')। তাঁর সাহিত্যচর্চার মোট ফসল তো বহরে বা পরিমাণে খুব বেশি নয়; তবু, এই নির্বহুল পরিসরের মধ্যেই, ঘুরে-ঘুরে এতবার তিনি ফাঁপা শব্দের গ্যাস বেলুনকে সূচী-বিদ্ধ করতে থাকেন যে আমরা টের পাই, এইটেই হয়ে উঠে-ছিলো তাঁর দিনরাতের জরুরি ধ্যান-জ্ঞান-ক্রিয়া। তাঁর রচনার প্রায় যত্রতত্র থেকে এর কিছু নমুনা তুলে দিচ্ছি। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে নীচের এই দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে কোথায় যেন মৌলিক মিল আছে রবীন্দ্রনাথের 'হিং টিং ছট' (১৮৯২), 'তোতাকাহিনী' (১৯১৮), 'কর্তার ভূত' (১৯১৯) বা 'তাসের দেশ' (১৯৩৩); পূর্বপাঠ: 'একটা আষাঢ়ে গল্প', (১৮৯২)-জাতীয় রচনার। কী সেই মিল? এই মিল আইডিয়লজির। যা সমস্ত হাস্যব্যঙ্গের বনেদ।

১. বলছিলাম কি, বস্তুপিণ্ড সূক্ষ্ম হতে স্থূলেতে,
অর্থাৎ কিনা লাগ্‌ছে ঠেলা পঞ্চভূতের মূলেতে—
গোড়ায় তবে দেখ্‌তে হবে কোত্থেকে আর কি ক'রে,
রস জমে এই প্রপঞ্চময় বিশ্বতরুর শিকড়ে।
অর্থাৎ কিনা, এই মনে কর্ রোদ পড়েছে ঘাসেতে,
এই মনে কর্, চাঁদের আলো পড়লো তারি পাশেতে—
('বুঝিয়ে বলা')

২. তাইতে আছে 'দশমুখে চায়, হজম করে দশোদর,
শ্মশান ঘাটে শষ্পানি খায় শশব্যস্ত শশধর।'
এই কথাটার অর্থ যে কি, ভাবছে না কেউ মোটেও—

বুঝছে না কেউ লাভ হবে কি, অর্থ যদি জোটেও।

('অবুঝ')

৩. হ্যাঁ, মনে করুন গোরু। গো, রু। 'গো' মানে কি? 'গোস্বর্গপশুবাক্‌বজ্রদিঙ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে', গো মানে গোরু, গো মানে দিক, গো মানে ভূ—পৃথিবী, গো মানে স্বর্গ, গো মানে কত কি। সুতরাং এটা সাধন করলে গো বললেই মনে হবে পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র,সূর্য, ব্রহ্মাণ্ড। 'রু' মানে কি? 'রব রাব রুত রোদন' 'কর্ণেরৌতি কিমপিশ-নৈবিচিত্রং'; 'রু' মানে শব্দ। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অব্যক্ত মর্মর শব্দ বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখ ক্রন্দন—সব ঘুরতে ঘুরতে ছন্দে ছন্দে বেজে উঠছে—মিউজিক অভ দি স্ফীয়ার্স—দেখুন একটা সামান্য শব্দ দোহন করে কি অপূর্ব রস পাওয়া যাচ্ছে। আমার শব্দার্থ খণ্ডিকায় এই রকম দেড় হাজার শব্দ আমি খণ্ডন করে দেখিয়েছি। ('চলচিত্তচঞ্চরি')

৪. অর্থ। অর্থ তো অনর্থের গোড়া।

ভাবুকের ভাত-মারা সুখ-মোক্ষ চোরা; ('ভাবুকসভা')

৫. ওরে হতভাগা, শব্দ নিয়ে তোরা ছেলেখেলা করিস—শব্দ যে কি জিনিস আজও তোরা বুঝলিনে। কিন্তু এখন বুঝবার সময় হয়েছে। এই নাও আমার 'শব্দসংহিতা'—এইটে এখন পড়ে নাও। ওর মধ্যে আমি দেখিয়েছি এই যে—এক-একটি শব্দ এক-একটি চক্র, কেননা শব্দ তার নিজের অর্থের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। তাই বলা হয়েছে অর্থই শব্দের বন্ধন। এই অর্থের বন্ধনটিকে ভেঙে চক্রের মুখ যদি খুলে দাও, তবেই সে মুক্তগতি স্পাইরাল মোশান হয়ে কুণ্ডলীক্রমে উর্ধ্বমুখে উঠতে থাকে। অর্থের চাপ তখন থাকে না কিনা। ('শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম')

৬. পূর্বে-পূর্বে ঋষিরা এই শব্দমার্গকে ধরে-ধরেও ধরতে পারেনি। কেন? ঐ যে সন্নেসি অমাবস্যার অন্ধকার রাত্তিরে ঘড়ঘড় করে নাক ডাকছিল, কেন ডাকছিল? শব্দ-মার্গের সন্ধান পেয়েছে কিন্তু তার সঙ্কেতটুকু ধরতে পারেনি। ওরা যে ধরেছে সে-সব শব্দের অর্থ নেই এবং ছিল না—ভোঁতা শব্দ। তা করলে তো চলবে না। জ্যান্ত-জ্যান্ত শব্দ, যাদের চলৎশক্তি চাপা রয়েছে, ধরে-ধরে মট্‌মট্‌ করে তাদের বিষদাঁত ভাঙতে হবে। অর্থের বিষ জমে-জমে উঠতে থাকবে—আর ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচ করে তাকে কেটে ফেলব।

('শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম')

৭. শব্দের বিষদাঁত যে অর্থ, আগে তাকে ভাও।

('শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম')

সুকুমার রায়ের হাস্যবাণ প্রবল এবং বিশেষ-ভাবে বর্ষিত হতে থাকে ক্লিশে-র ওপর, যাকে উনি বলেন 'শব্দঘটা'। ক্লিশে হচ্ছে আমাদের ভাষার ঝালে-ঝোলে-অম্বলে মস্তিষ্কহীন অভ্যাসে অতি-ব্যবহৃত, অর্থের অন্তঃসার-শুষে-নেওয়া এঁটো তেজপাতা, যা এঁটো বলেই অব্যবহার্য। জ্ঞান মনন প্রত্যক্ষণের জড়ত্ব থেকে এদের উৎপত্তি; আবার, এই সব শব্দ, বোধ-চিন্তার পুরো প্রক্রিয়াকেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়। দশকে-দশকে এক-এক ঝাঁক শব্দ এইরকম এঁটো তেজপাতা হয়ে যায়। কোন্‌-কোন্‌ শব্দ সুকুমার রায়ের আমলে ক্লিশে ছিল, আর কোন্‌গুলো এখন ক্লিশে হয়ে যাচ্ছে, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতি-ভাষার হালচাল বোঝার জন্যে তা দরকারি। যে-সব শব্দকে তিনি ক্লিশে গণ্য করেছিলেন, তার কিছু দৃষ্টান্ত ওপরের উদ্ধৃতি-গুচ্ছে পাওয়া যাবে; এখানে আরোও কয়েকটা নমুনা দিই: ত্যাগ, সগুণনির্গুণ, পুরুষপ্রকৃতি, প্রাণ, কারণ, শব্দব্রহ্ম, সনাতন, মায়া, আত্মা, ধর্মলীলা, ইভোলিউশন। 'জাতীয় ভাব', 'ভারতীয় বিশেষত্ব' আর 'হিন্দুত্বের ছাঁচ'—এদের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এই সব নাম দিয়ে যে-জিনিসটাকে আমরা শিল্পে-সাহিত্যে অশনে-বসনে প্রয়োগ করতে ব্যস্ত হয়েছি, তার স্বরূপলক্ষণ বিষয়ে আমাদের ধারণা যত অস্পষ্ট, তার প্রতি আমাদের সম্ভ্রম ততই প্রগাঢ়। 'সেটা হয়তো ভালোই, কিন্তু দশদিক হইতে যথেষ্ট মাত্রায়, অথবা যথার্থভাবে আঘাত না খাওয়ায় জিনিসটা যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে বোধহয় যে ঐ শব্দগুলিকে একবার বিশেষ রকমে ঘাঁটাইয়া দেখা আবশ্যক।'

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক: এত যে অলীক শব্দ, এ-সব নিত্য গজাচ্ছে কোথা থেকে? আর ঠিক কিসের বিরুদ্ধেই বা তাঁর এই প্রতিক্রিয়া? ব্রাহ্ম সমাজের আচার্যদের আগড়ুম বাগড়ুম? ওরিয়েন্টাল আর্টের বাচাল প্রচারওয়ালাদের ক্লিশে? হয়তো এই সমস্তই, বা, এই ধরণের আরও কিছু অভিজ্ঞতা, তাঁর প্রতিক্রিয়ার সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু শব্দ-অর্থের সংযোগ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যাওয়া; বা, শব্দ ক্রমাগত মিথ্যে, এঁটো, হয়ে যাওয়া—

এ হলো একটা পুরো প্রক্রিয়া, বা দুষ্ক্রিয়া। সংস্কৃতির শিকড়ের তলায় যে-মাটি, সেখানেই ছড়ানো রয়েছে এর বীজ, এর বিষ।

এটা তো আমাদের প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতা যে কথা মিথ্যে হয়ে যায়, কাজের সঙ্গে তার যোগ ছিন্ন হয়ে গেলে। সমস্ত কাজের একটা মূল উৎস আছে: সামাজিক উৎপাদন। এই উৎপাদন আর শ্রমের উৎস থেকে ভদ্রলোক-জীবনযাত্রার সর্বাত্মক বিচ্ছেদ, প্রত্যেক মুহূর্তে মিথ্যা করে দিচ্ছে আমাদের বাগ্‌যন্ত্র আর কলমের ডগা থেকে উদ্‌গীর্ণ এই ফেনিল, অনর্গল শব্দস্রোতকে। এই বিচ্ছেদ, মুহূর্তে-মুহূর্তে মিথ্যের ঘুণ ধরিয়ে দিচ্ছে আমাদের অস্তিত্বে; আমাদের, ধর্মীয় রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক বা সামাজিক, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে। এই পুরো ব্যাপারটা সুকুমার রায় টের পেয়েছিলেন হাড়ে-হাড়ে। তিনি লিখেছেন: 'পুরাণে লেখে গন্ধর্বেরা বাক্যভোজী, তাহারা নাকি শব্দ আহার করিয়া থাকে। এক হিসাবে, গন্ধর্বশ্রেণীর জীব আমাদের মধ্যে বড় কম নয়।'

মিথ্যে, মৃত শব্দের অবিরাম প্রজনন ভোজন আর প্রচার, এই ভুঁইফোড় গন্ধর্বদের একমাত্র পেশা। অলীক শব্দের বিরুদ্ধে সুকুমার রায়ের আক্রমণ, অনিবার্যত হয়ে ওঠে, অলীক শব্দজীবীর বিরুদ্ধে আক্রমণ। তাঁর জগতে তাই গিজগিজ করে অকর্মা বাবুগোষ্ঠীর নানান টাইপ, যাদের জীবন 'ষোল আনাই মিছে।' তাদের কেউ হয়তো চেয়ার আলো ক'রে খোশমেজাজে প্রায়-সর্বক্ষণ ঝিমোয় আর হঠাৎ-হঠাৎ জেগে উঠে স্বপ্নে-বেহাত-হওয়া নিজস্ব গোঁফের পশ্চাদ্ধাবন করে, নিজের চতুর্দিকে বিস্তর শব্দের ফাঁকা আওয়াজ তুলে। কেউ-কেউ হয়তো ফূর্তির প্রাণে দিনরাত ঝেড়ে গিটকিরি দেয়: 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম্‌'। আর এই গন্ধর্বশ্রেণীর একটা বিশেষ টাইপ আছে, যাদের সঙ্গে আমাদের মুলাকাত হয় ঘুরে-ঘুরে। এদেরও পেটের কোনও ধান্ধা নেই, গতরও এদের খাটাতে হয় না। এদের একমাত্র 'কাজ' হচ্ছে: মাঝ রাস্তায় এক-একজন শ্যামাদাস বা জগমোহনকে বেমক্কা পাকড়াও ক'রে স্রেফ বাজে বকে যাওয়া, অন্তহীন বেবাক বাজে বকে যাওয়া। সুকুমার রায়ের এই অকর্মক গন্ধর্ব জগতের নির্ভুল বয়ান পাই বাউলের গানে: 'কথার চিঁড়ে হাওয়ার দধি/চলছে ফলার নিরবধি।'

সুকুমার রায়ের আমলে তাঁর চার পাশে এত যে অলীক শব্দের আকছার বেসাতি, তার একটি বিশেষ এবং অব্যবহিত কারণের উল্লেখ করা দরকার। কথাপ্রসঙ্গে আগে একবার বলেছি, পরাধীন দেশে স্বাধীনতার সংবিৎ সত্যি-হয়ে-ওঠার, সত্যি-বলার, প্রেরণা দেয়। এখানে, এই মুহূর্তে, যোগ করতে চাই, এর বিপরীতটাও সত্যি: পরাধীনতা আবার মিথ্যাচারী, মিথ্যাবাদী হবারও বিভ্রম, প্রলোভন, জোগায়। সাম্রাজ্যের যুগে বাংলা ভাষায় ইংরেজ শাসনের অশেষ সুফলের কী প্রগল্‌ভ প্রশংসা! মহারানির রামরাজত্বের কী মুক্তকণ্ঠ গুণকীর্তন! পরাধীন আমলে বাংলা ভাষার রক্তস্রোতে কীভাবে মিথ্যের বিষ ছড়িয়েছে, সেদিকে আমাদের ভাষাতাত্ত্বিকদের নজর পড়ে নি আজও। নিরর্থক শব্দের বিরুদ্ধে সুকুমার রায়ের এই যে যুদ্ধ, এ যুদ্ধ ঠিক ভাষাতাত্ত্বিকের নয়, সাহিত্যিকের। সাহিত্যিক বা কবিই পারেন ভাষাকে শুচি আর সত্য করে তোলার জন্যে এইভাবে যুঝতে। এই সূত্রে বিশেষভাবে মনে পড়ে, ইংরেজি সাহিত্যে জয়েস বা অরওয়েল-এর, আর ফরাসি সাহিত্যে ফ্লবেয়র-এর জঙ্গী কাজ। ৯৬১ প্রসঙ্গ-সংবলিত একটি ক্লিশে-কোষ সংকলন করেছিলেন ফ্লবেয়র। একটি ব্যাপার লক্ষ করলে অনেকে হয়তো কিঞ্চিৎ মজা পাবেন। ফ্লবেয়র-এর এই তালিকায় এমন একটি ক্লিশে আছে, যেটা নিয়ে সুকুমার রায়ও বিস্তর রঙ্গ করেছেন। সেটা হলো: 'অর্থই অনর্থের মূল।'

দুই

ওপরে দেখিয়েছি, শব্দের সঙ্গে শব্দের সংঘর্ষ ঘটিয়ে সুকুমার রায় কীভাবে মুহূর্তে-মুহূর্তে রসিকতাকে নিরর্থ থেকে অর্থের দিকে ঘুরিয়ে দেন। এখন দেখবো, তিনি নিরর্থ আর অর্থের বিনুনি তৈরী করেন আরেক ধরণের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে, যাকে বলতে পারি: নিয়ম আর বেনিয়মের দ্বন্দ্ব। যখন নিয়ম-মানার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তখন তাঁর রসিকতায় লক্ষ্য করি ননসেন্সের প্রাধান্য। আবার নিয়ম-ভাঙার উলটো বিন্দু থেকে দেখলে এই হাসি রূপ নেয় শ্লেষের। এইভাবে তাঁর সাহিত্যে একই সঙ্গে খেলা হয়ে ওঠে মার, আবার মার হয়ে ওঠে খেলা। কথাটা একটু খুলে বলি।

শব্দের যেখানে সীমান্ত, তার ওপারে নিঃশব্দ। এই সীমান্ত-রেখার গায়ে-গায়ে যে-প্রলম্বিত মধ্যভূমি, সেখানেই নিরর্থের এক্তিয়ার। অর্থাৎ, নিরর্থের এপারে শব্দের, ওপারে নিঃশব্দের এলাকা। মনে-মনে এই মানচিত্র ছ'কে নিলে বুঝতে পারি : নিরর্থ এক হাতে ছুঁয়ে আছে শব্দকে, অন্য হাতে নিঃশব্দকে। তবে, ননসেন্স সাহিত্যের অধিকাংশই গড়ে উঠেছে নিরর্থের সঙ্গে শব্দের টানাপোড়েনে, নিরর্থের সঙ্গে নিঃশব্দের টেনশন দেখি বিরল কয়েকটি ক্ষেত্রে।

ভাষা-খেলার কথা বলেছিলেন ভিট্‌গেনস্টাইন। ভাষা ঠিক খেলা নয়, কিন্তু এই নিরর্থের সাহিত্য সত্যি-সত্যি খেলার মতন, সাহিত্যের আর কোনও বিভাগ ঠিক এতটাই খেলার মডেল মেনে চলে কি-না সন্দেহ। দাবার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক চেস কোড বলছে : এই খেলায় 'আকস্মিকের কোনও স্থান নেই'। নিরর্থের জগৎ ঐ দাবার মতোই পূর্ণত নিয়মতান্ত্রিক। ঠিকই, নিয়মগুলো খামখেয়ালি, উদ্ভট, উল্টো-পাল্টা, কিন্তু নিয়ম। ফাঁক নেই, ব্যতিক্রম নেই, আকস্মিক নেই নিয়মের নীরন্ধ্র আবশ্যিকতায়। সুকুমার রায়ের ননসেন্স এই নিয়মতন্ত্রের মোক্ষম দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই 'একুশে আইন', কিন্তু তাঁর জগতের সর্বত্রই দেখা যাবে, এই ঈষৎ উদ্ভট আইনমান্য চাল-চলন। এই আবশ্যিকতার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলে তাঁর পদ্যের সু-শৃঙ্খল ছন্দ, অমোঘ মিল, নিপাট স্তবক (যেমন : 'ভাল রে ভাল')। লিয়ার, ক্যারল-টেনিএল, ভিল্‌হেল্‌ম বুশ-এর মতন সুকুমার রায়ও সূচীমুখ তীক্ষ্ণ লাইনের ড্রয়িং দিয়ে তাঁর এই আবশ্যিকতার বিশ্বকে স্থির নিরূপিত নির্দিষ্ট চেহারা দেন। এই দিক দিয়ে তাঁর ছবি, তাঁর কথার সম্পূরক।

এই নিয়ম-মানার পাশাপাশি ওতপ্রোতভাবে রয়ে নিয়ম-ভাঙা। অর্থাৎ, সময়ের একই বিন্দুতে, আরেক দিক দিয়ে দেখলে, এই নিয়মশাসিত নিরর্থ-বিশ্বই হয়ে ওঠে আমাদের এই আবোলতাবোল রিয়্যালিটির—এবং তার বেহেড আইন-কানুনের—প্রতিকল্প, ক্যারিকেচার ও রূপান্তর। তখন টের পাই, তাঁর রসিকতা বানচাল করতে চায় অমানুষিক নিয়ম-তন্ত্রকে। যারা কায়েমি আইডিয়লজির জিম্মাদার—ফ্রয়েডের ভাষায়, 'কালচারাল সুপার-ইগো'— তাদের বিঁধতে থাকে তাঁর তির্যক, শাণিত হাসি।

একটা মজার ব্যাপার এই সূত্রে লক্ষণীয়। নিয়মতন্ত্রের মুরুব্বিদের লিয়ার তাঁর লিমেরিকে সব'দা 'ওরা' ('দে') ব'লে চিনিয়ে দেন। লিয়ার-এর 'ওরা' সুকুমার রায়ের সংসারে বারংবার মামা-রূপে অবতীর্ণ—মামার জোরই তো খুঁটির জোর। সত্যবাহনের মতন দমবাজ ধর্মধ্বজীর সেজোমামা নামক খুঁটি থাকাই তো স্বাভাবিক। একটু অবাক হই, যখন খবর পাই, এমন কি, দুইলেজবিশিষ্ট বিমূঢ় বঙ্গবাসী হুঁকো-মুখো হ্যাংলারও মামার জোর আছে : শ্যামদাস মামা তার আফিঙের থানাদার।' সাধে কি, এত জুৎসই লাগে বিশ্বকর্মার অনর্থমারণ মন্ত্র থেকে লাফিয়ে-ওঠা এই স্লোগান : 'নেইমামা তাই কানামামা।'

'গন্ধ বিচার' কবিতায় দেখি : এক অলৌকিক মামা রাজ-বাড়ির ছাতের ওপর মনের সাধে হঠাৎ বেহাগ গেয়ে উঠতেই রীতি-নীতি-সহবতের যে-একচ্ছত্র মুরুব্বি তেড়ে আসেন, তিনি স্বয়ং রাজমাতুল। বিদ্যাভ্যাসের পাহারাদারিও মামাদের এক-চেটে। বোধ করি, এর সবচেয়ে স্মরণীয় উদাহরণ পাচ্ছি 'হ য ব র ল'-এর শেষাংশে :

'হুকুম হল—ন্যাড়ার তিনমাস জেল আর সাতদিনের ফাঁসি। আমি সবে ভাবছি এরকম অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপত্তি করা উচিত, এমন সময় ছাগলটা হঠাৎ "ব্যা-করণ শিং" বলে পিছন থেকে তেড়ে এসে আমায় এক ঢু মারল, তারপরেই আমার কান কামড়ে দিল। অমনি চারদিকে কি রকম সব ঘুলিয়ে যেতে লাগল, ছাগলটার মুখটা ক্রমে বদলিয়ে শেষটায় ঠিক মেজোমামার মতো হয়ে গেল। তখন ঠাওর করে দেখ-লাম, মেজোমামা আমার কান ধরে বলছেন, "ব্যাকরণ শিখ-বার নাম করে বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমানো হচ্ছে ?"'

ছিলো ছাগল, হয়ে গেল মেজোমামা। স্বপ্নাদ্য এই রূপান্তর-পুরাণের নিহিতার্থ ব্যর্থ হবার নয়। এইভাবে মামাতন্ত্রকে নির্ঘাত ব্যঙ্গে নাজেহাল করতে থাকেন সুকুমার রায়। ফিরিস্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। এই সূত্রে ধামাধরা গোষ্ঠমামার বাণবিদ্ধ হাল স্মরণ করাই আপাতত যথেষ্ট।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড বিদ্রোহে বা বিপ্লবে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না ; কিন্তু এর অন্তত একটি ব্যতিক্রম আছে তাঁর রচনাবলিতে। শ্বাসরোধক বিধিব্যবস্থা আর নৈতিক দণ্ডমুণ্ডের দাঁত-নখ-ইস্পাত-বর্ম দিয়ে সাজানো প্রহরীবৃন্দকে হাস্যরসিক যখন অতর্কিতে বেসামাল ক'রে দেন, তখন এতে ফ্রয়েড লক্ষ করেন, বিদ্রোহের সামর্থ্য, যা ইগো বা চৈতন্যের অপরাজেয়তার সূচক।

তিন

বাস্তবিক, এই প্রখর চেতনাই নিরর্থ-কবিতার সারাৎসার। কিন্তু সুকুমার রায়কে যা বিশেষত্ব দিয়েছে, তা শুধু তাঁর সচেতনতা নয়, আত্মসচেতনতা। এ হলো মনের সেই গুণ, সেই পরিপক্বতা, যার দ্বারা তিনি নিজের আমিকে সরিয়ে নিতেও পারেন, আবার আনতেও পারেন সামনে। তাঁর কবিতায় নিরন্তর চলতে থাকে নিজেকে গোটানো, নিজেকে ছড়ানোর এই দ্বৈত প্রক্রিয়া। যার জন্যে কবিতার নানান খাঁজ, নানান কোণ থেকে বিকীর্ণ হতে থাকে বোধ আর অর্থের অনেক মাত্রা। এই কবির হয়ে-ওঠার ইতিহাস তাঁর আত্মসচেতনতা বাড়িয়ে-তোলার ইতিহাস। এ ইতিহাসে একটি জ্বলজ্বলে মুহূর্ত নিশ্চয়ই তাঁর সেই আশ্চর্য কবিতা ঃ 'বাবুরাম সাপুড়ে'। যার স্বরভঙ্গিতে এমন কিছু আছে, যাতে আমরা টের পাই, কবি নিজেও তাঁর শ্লেষের লক্ষ্য। এ যেন একাধারে মাছের বঁড়শি আর মাছ হয়ে-ওঠা। কবির আত্মসচেতনতা জিনিশটাই সংক্রামক ; পাঠকের মনকেও তা উশকে দেয়। এক-একটা স্বচ্ছ মুহূর্ত আসে যখন আমরা আরশির সামনে খুব তন্ময়, একাগ্র চোখে তাকালে দেখতে পাই ঃ ঘাড়ের ওপরে আমাদেরই মুখ যেন ক্রমে-ক্রমে পাল্টে আদল নেয় রামগরুড় কি হুঁকো-মুখো কি কুমড়োপটাশের মুখের।

সমসময়ের সংকটকে স্পর্শ করার সামর্থ্য তাঁর আত্ম-সচেতনতার আরেক লক্ষণ। এইখানে তফাৎ হয়ে যায় তাঁর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের। 'খাতাঞ্চির খাতা' বেরিয়েছিলো সুকুমার রায়-সম্পাদিত 'সন্দেশ'-এর পাতায়। এই বইয়েরই অন্তর্গত একটি নিরর্থ-কবিতাকে যদি সুকুমার রায়ের একটি রচনার পাশাপাশি রাখি, তাহলে দুজনের বিশেষত্ব বুঝে নিতে পারবো আমরা ঃ

পালকের বগ দেখানো বালকের মাথায় টুপি, মোগলের কেল্ট চুড়ো দুগালে রোঁয়ার খুপি। রাধিকের অধিক শোভা গোঁফের আড়ে ঝুঁটি মতি, সখিদের মনো-লোভা মোজার উপর পাঁতোধোতি। [এই কথাগুলোকে সহজেই পদ্যের পঙ্ক্তি-বিন্যাসে ঢেলে সাজানো যায়]	হলদে সবুজ ওরাং ওটাং ইঁটপাটকেল চিৎ পটাং গন্ধ গোকুল হিজিবিজি নো অ্যাডমিশন, ভেরি বিজি নন্দী ভৃঙ্গী সারেগামা নেইমামা তাই কানামামা মুশকিল আশান উড়ে মালি ধর্মতলা কর্মখালি চীনে বাদাম সর্দি কাশি ব্লটিংপেপার বাঘের মাসি।

অবনীন্দ্রনাথের লেখায়, আভাসে, ছন্দের নাচে-নাচ দুলে উঠছে লোকায়ত যাত্রার চালচিত্র, সমকালের সংঘর্ষের সঙ্গে যার যোগ খানিকটা আলগা। প্রতিতুলনায়, সুকুমার রায়ের ননসেন্স নাগরিক এবং বিদগ্ধ। শহুরে সমকাল চকিতে ঢুকে পড়ে 'ধর্মতলা কর্মখালি'-র উল্লেখে। আর, 'নো অ্যাডমিশন ভেরি বিজি'—এই ইংরেজি বুকনি যেন মুখের ওপর স্প্রিঙ-দরজা মসৃণ বন্ধ-ক'রে-দেওয়ার প্রতিধ্বনি। ব্রিটিশ আমলাশাহির বড়ো-মেজো-ছোটো-সায়েবদের এই নিষেধাজ্ঞা স্মৃতিবিদ্ধ ক'রে রাখে সমস্ত জাতির অপমান আর যন্ত্রণাকে, যা সেদিনের ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন অপঘাত।

রোগশয্যায় যে-ভাবে তিনি 'আবোলতাবোল'-এর কবিতা-গুলিকে শুধরেছেন, তাতেও তাঁর আত্মসচেতন মনের ছাপ পড়েছে। 'গোঁফ চুরি'-র প্রথম পাঠ 'সন্দেশ'-এ বেরোয় ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে। তখন কবিতাটির শেষ দুই লাইন ছিলো এইরকম ঃ

> 'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো বোঝা ?
> "গোঁফের আমি গোঁফের তুমি এই তো বুঝি সোজা।' "

পরে এই পাঠ বদলে গিয়ে দাঁড়ালো ঃ

> 'গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা ?
> গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।'

মানের দিক দিয়ে নতুন কী ঘটছে শোধরানো পাঠে ? কে মালিক, আর কেই বা মাল—এই সম্পর্কটা ওলট-পালট হয়ে যাওয়ায় গোঁফই হয়ে ওঠে শনাক্তদার। কবিতাটি বহুমাত্রিক তাৎপর্য পেয়ে যায় এর ফলে। মূলত এই একই পরিস্থিতি ট্র্যাজেডির মাত্রা ছুঁয়েছে দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-এ। যেখানে জমির মালিক বারবার পালটে যাওয়ায় জলপাইগুড়ির এক হাভাতে ভাগচাষী কিছুতেই নিজেকে আর শনাক্ত করতে পারে না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, মরগেনস্টার্ন-এর সেই বীভৎস হাসির কবিতা, যেখানে মৃত-সৈনিকের বেওয়ারিশ হাঁটু পৃথিবীময় ঘুরপাক খেতে থাকে তার মালিকের সন্ধানে।

১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সালের মধ্যে 'প্রবাসী'-তে তাঁর খানকয়েক প্রবন্ধ বেরোয়, যার কোথাও-কোথাও প্রতিফলন পড়েছে তাঁর আত্মসচেতন মননের। মানুষের মনে-আচরণে, সমাজে, বস্তুবিশ্বে বিপরীতের দ্বন্দ্ব দেখা তো বরাবরই তাঁর রসিকতার উৎস। এ প্রবন্ধগুলির জায়গায়-জায়গায়, বিশ্লেষে আর চিন্তায়, স্পর্শ আছে এই দ্বান্দ্বিক দৃষ্টির। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই এখানে। যা বলতে চাইছি, তা বুদ্ধিগ্রাহ্য করার জন্যে আমি শুধু এখানে দুটো উদ্ধৃতি দেবো :

১। [বীজ আগে না গাছ আগে এই কূট প্রশ্নের জবাবে লিখছেন] জড় ও চেতনের সন্ধিমুখে জীবনের আদি উন্মেষ যেখানে, সেখানে বীজও নাই বৃক্ষও নাই, কেবল আকার বৈচিত্র্যহীন জীবকোষ পরিপুষ্টির আতিশয্যে ফাটিয়া দুখান হয়, 'এক' সেখানে সাক্ষাৎভাবে 'দুই' হইয়া বংশ বিস্তার করিতে থাকে। ক্রমে জীবন-রহস্যের জটিলতা যখন বাড়িয়া পরিণত ও অপরিণত জীবের প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া ওঠে, জীবাবস্থা ও বৃক্ষাবস্থার স্বাতন্ত্র্যকল্পনা যখন সম্ভব হয়, তখন সেই একই সম্ভাবনার যুগলচিহ্ন বৃক্ষ ও বীজের অবিচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বের মধ্যে যুগপৎ প্রকাশিত হয়। [নিম্নরেখ আমার দেওয়া]

'দৈবেন দেয়ম্'

২. এই একটা হস্তপদবিশিষ্ট জড়পিণ্ডই আমার শরীর নহে—ইহা আমার দেহের কেন্দ্রমাত্র, আসলে সমস্ত জগৎ নিখিলবিশ্ব আমারই বিরাট শরীর। 'চিরন্তন প্রশ্ন'

দ্বিতীয় উদ্ধৃতির সঙ্গে সামীপ্য আছে মার্ক্স-এর এই উক্তির :

'মানুষের বিশ্বজনীনতা বাস্তবে-ব্যবহারে অভিব্যক্ত হচ্ছে সেই বিশ্বজনীনতার মধ্যে, যা নিখিল প্রকৃতিকেই তার অজৈব শরীর ক'রে তোলে।' সুকুমার রায় ১৯১৪ সালে পাকাপাকি মার্ক্সবাদী হয়ে উঠেছিলেন, এরকম হাস্যকর প্রলাপ-বকা আমার সাজে না। আত্মসচেতনতা তাঁর মননেও কতখানি দ্বান্দ্বিক দৃষ্টি চারিয়ে দেয়, আমি আপাতত শুধু এইটুকুই দেখাতে চাইছি।

সুকুমার রায়ের আত্মসচেতনতার সমস্ত ঐশ্বর্য ধরা রয়েছে তাঁর শেষ কবিতায়। মৃত্যুর দিক দিয়ে ভালোবাসাকে দেখতে চেয়েছিলেন রিলকে—তাঁর কাছে মৃত্যু মানে সমাপ্তি নয়, সীমাছেঁড়া নিবিড়তা। সুকুমার রায় এই কবিতায় নিজের নিরর্থ ভুবনকে এবং নিজেকে—আর কোনও কবিতায় তাঁর আমি এমনভাবে অনুবিদ্ধ নয়—শেষবার দেখছেন মৃত্যুর ছায়ায়। ফলে এই লেখাটি হয়ে উঠলো সেই বিরল কাব্য যার সমস্ত অবয়বে নিরর্থ আর নিঃশব্দের নিবিড় বুনোনি। আসন্ন মৃত্যুর অভিজ্ঞতাজনিত সেই সীমাছেঁড়া নিবিড়তার চাপে, এখানে, এই শেষ কবিতায়, হাস্যরসিক রূপে তাঁর চরম উত্তরণ ঘটে যায়। শিবানন্দের ভাষায় একে বলতে পারি, বিপরীতের প্রত্যক্ষণ থেকে বিপরীতের অনুভবে উত্তরণ। কবিতাটির সমস্ত শরীর জড়িয়ে আছে জীবনের আলোতাপ উবিয়ে আসা এবং মৃত্যুর হিমহাত ছড়িয়ে পড়ার বিমিশ্র ধূসর বাতাবরণ। এই আবহাওয়ায় : এক দিকে ঘনিয়ে আসে মেঘ-মুলুকের ঝাপসা রাত্রি ; অন্যদিকে, বিচ্ছুরিত হতে থাকে রামধনুকের আবছায়া। যখন অন্ধকার ঢেকে যায় আলোয়, তখনই সুরভিত অন্ধকার থেকে বেজে ওঠে ঘণ্টা। অবশেষে, গান এসে থামে ঘুমের নিঃশব্দ সীমান্তে, আর, হাসির গঙ্গা এসে মিশে যায় বিষাদের যমুনায়।

সুভাষ চৌধুরী

সুরকার সুকুমার রায়

পিতার 'সংগীত-ব্যুৎপত্তির দ্বারা' প্রভাবিত সুকুমার সুরপ্রয়োগে সচেতন মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাট্যগীতির সুর সর্বতোভাবে নাটকের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে। তাঁর কবিতায় অন্য অনেকেই সুর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ-সুরারোপিত 'গানের গুঁতো' এবং সুকুমার-সুরারোপিত 'প্রেমের মন্দিরে তাঁর' এবং 'বিবাহের গান'-এর স্বরলিপি এখানে প্রকাশিত হলো।

সুকুমার রায় যে পরিবারে জন্মেছিলেন ভাগ্যক্রমে সেই পরিবারে শিল্প ও সংগীতের একটি পরিবেশ গড়ে উঠেছিল প্রধানত পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর উদ্যোগে। উপেন্দ্রকিশোর বেহালা বাজাতেন, শোনা যায় বাজাতে বাজাতে বহির্জগতকে ভুলে যেতেন। ভালো পাখোয়াজ বাজাতেন তিনি। কয়েকটি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তাঁর 'জাগো পুরবাসী' আজো ১১ই মাঘে অবশ্যগীত সংগীতগুলির অন্যতম। সংগীত বিষয়ে তাঁর যে কয়েকটি রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা দিয়েই তাঁর সাংগীতিক চিন্তাধারার একটি স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রচিত হারমনিয়ম-শিক্ষা ও বেহালা-শিক্ষা দুখানি মূল্যবান গ্রন্থ। উপেন্দ্রকিশোরের ভগ্নীপতি হেমেন্দ্রমোহন বসু ফোনোগ্রাফ রেকর্ড তৈরীতে মেতে থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের গান রেকর্ড করিয়েছিলেন স্বদেশী যুগে। এমনি একটা সাংগীতিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হন সুকুমার রায়। উপেন্দ্রকিশোরের সংগীতে ব্যুৎপত্তি সুকুমার রায়কে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

খুব অল্পবয়স থেকেই মুখে মুখে ছড়া বানাতেন তিনি। এই সঙ্গে ছিল আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে নাটক-অভিনয়ের ঝোঁক। এজন্য অল্পবয়সেই নাটক লিখতেন এবং নাটকের জন্য গান রচনা করতেন। গানের সুর দিতেন তিনি নিজেই। প্রথম নাটক 'রামধন বধ'-এর পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলেও পুণ্যলতা চক্রবর্তীর স্মৃতিকথায় জানা যায়, সে নাটকে গান ছিল। তিনি লিখছেন 'যেমন মজার অভিনয়, তেমনি মজার গান।'

সুকুমারের যে-কখানি গান পাওয়া যায় তার অধিকাংশই নাটকের জন্য রচিত। তাছাড়া দু-খানি ব্রহ্মসংগীত এবং দুখানি দেশাত্মবোধক গান।

১৯০৫ সালে যখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ তখন যে দুখানি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন তার পূর্ণ পাঠ পাওয়া যায়নি। প্রথম গান : টুটিল কি আজি ঘুমের ঘোর। এ গানটি সম্পর্কে আর কিছুই জানা যায় না। দ্বিতীয় গানটির সুর সম্পর্কে কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি, কিন্তু গানের কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায় :

আমরা দেশী পাগলার দল,
দেশের জন্যে ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল...
দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি।
তা হোক না, তাতে দেশেরি মঙ্গল...

ঝালাপালা, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, চলচিত্তচঞ্চরি, ভাবুকসভা ও শ্রীশ্রীশব্দকল্পদ্রুম নাটকে তাঁর গানের সংখ্যা যথাক্রমে ৬,১৪,৭, ১ ও ৬। মোট চৌত্রিশটি গান। তার মধ্যে ঝালাপালা ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকের গানগুলির সুর সংরক্ষিত হওয়ায় সুরকার সুকুমার রায়ের একটি পরিচয় আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়। প্রধানত লোকসংগীতের আধারে গানের সুর রচনা করেছেন। কখনো তা কীর্তনের কখনো বা পাঁচালি পাঠের সুরের আভাস দিয়ে যায়।

ঝালাপালার মোট ছ'টি গানের মধ্যে চারটি গান সুরে গাওয়ার নির্দেশ আছে। দুখানি জুড়ির গান। এখানে মাত্র চারটি স্বর ব্যবহার করেছেন। স ম প ধ এই চারটি স্বরের ওঠা নামার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে গানের সুর রচনা করেছেন। এখানে সুরের পুনরাবৃত্তি তে একটি পরিমণ্ডল রচিত হয়েছে। 'পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে'—গানটিতে ব্যবহার করেছেন পাঁচালি পড়ার সুর। সামান্য তফাৎ করেছেন গানের প্রথম ছত্রটি বারবার ফিরিয়ে এনে। পাঁচালিতে একটানা পড়ে যাওয়ার রীতির সঙ্গে এই টুকুই যা পার্থক্য। এই নাটকের 'হায়রে সোনার ভারত' গানটি বেসুরে গাওয়ার নির্দেশ আছে। এই গানটির দ্বিতীয় ছত্রে গোবিন্দচন্দ্র রায়ের 'কত কাল পরে—অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে' ছত্রের সংযোজন কৌতূহল জাগায়। এই গানটির প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকের একটি গানে তিনি এই গানের সুর ব্যবহার করেছেন। ঝালাপালা-র শেষ গান 'ওরে ও চণ্ডীচরণ। তোমার কি নাইরে মরণ!' এই গানে সুরপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শুদ্ধ ও কোমল রেখাবের পাশাপাশি ব্যবহারে একটি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এনেছেন। মুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থে এই গানটির চারটি ছত্র ঃ

ওরে ও চণ্ডীচরণ।
তোমার কি নাইরে মরণ।
কোন সাহসে চাকর ডেকে
ভদ্রলোকের কান মলাও।

মুদ্রিত স্বরলিপিতে গানটির আরো কয়েকটি ছত্র পাওয়া যায় ঃ

বলে কি না ঠাণ্ডা
দুর্দান্ত পাষণ্ড ভণ্ড, শয়তানেরি পাণ্ডা
তারেই বলে ঠাণ্ডা।
আণ্ডামানে পাঠিয়ে তারে মাথায় মারো ডাণ্ডা
তবেই হবে ঠাণ্ডা।
লাগাও চাঁটি অতি খাঁটি সাড়ে পঁচিশ গণ্ডা
তবেই হবে ঠাণ্ডা।

দ্বিতীয় অংশটিতে সুরান্তর ও ছন্দান্তর ঘটিয়ে একটি গতি এনেছেন যা নাটকের শেষ গান হিসাবে একান্তই প্রয়োজনীয় মনে হয়। লক্ষ্মণের শক্তিশেল নাটকের জন্য যে গানগুলি রচনা করে সুরারোপিত হয়েছে তার প্রথম গানটি সুরকার সুকুমার রায়ের একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। এই গানটিতে দূত রাবণ-আগমনের বিবরণ দিচ্ছেন। এখানে নয় মাত্রায় ২/৩/৪ মাত্রার ছন্দে ঃ

I সা সা | মা -া মা | মা -া মা -া I
আ সি ছে ০ রা ব ০ ণ ০

I মা মা | মা -া রা | মা -পা পা -া I
বা জে ঢ ০ ক্কো ঢো ০ ল ০

গানের শব্দবিন্যাসে এক আড়ম্বরপূর্ণ আবহ রচনা করেছেন। একই ছন্দে কেবল দুটি স্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে কথার বিন্যাসে অন্যান্য চরিত্রের জিজ্ঞাসার সুরটি ধরিয়ে দিয়েছেন ঃ

I সা সা | মা মা মা | মা মা মা মা I
ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্ ত তঃ কিম্

একই ছন্দ ও লয় বজায় রেখে কেবল কথার বিন্যাসে নাটকীয়তার পূর্ণ প্রকাশে সুরকারের কৃতিত্ব অবশ্যস্বীকার্য। সমস্ত গানটিতে স র ম প ণ মাত্র এই পাঁচটি র ব্যবহার করে প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আদায় করে নিয়েছেন। 'যদি রাবণের ঘুঁষি লাগে গায়' গানটির সুর অধিকাংশ সময়ে থাকে তার-সপ্তকে। এখানে সুগ্রীবকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য এই সুর বিন্যাস করেছেন। তার পরবর্তী গানটির সুর-পরিকল্পনা অপূর্ব। এখানে সুগ্রীব ও রাবণের বিবাদ-দৃশ্যটিতে গানের সুরে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন সুকুমার রায়। পাঁচালি পড়ার সুরে দ্রুতলয়ে চতুর্মাত্রিক ছন্দে সুগ্রীবের চঞ্চলতার নিখুঁত প্রকাশ—

I সা মা মা মা | মা -া মা গা I া -ধা ধা ধা | পা ধ পা পা
তু রে রে রা ব ণ্ ব্যা টা তা র্ মু খে মার্ বো ঝাঁ টা

I মা মা ধা ধা | পা ধা পা মা মা মা রা সা | র্ মা পা গা
তো রে এ খন বাঁধ বে কে গা এ বার তো রে গা চাস কে গা

I মা -া -া -া I···
ব ল্ o o

জবাবে রাবণের ত্রিমাত্রিক ছন্দের চলনে এসেছে গাম্ভীর্য।

I সা মা মা | মা -া গা I মা -পা পা | পা -মা গা I
ও রে পা ষ o ণ্ড তো o র মু o ণ্ড

I মা -ধা ধা | ধা -া ধা I পা ণা ধা | -া মা মা I
খ o ণ্ড খ o ণ্ড ক রি ব o য ত

I পা -া পা | পা -া পা I মা মা মা | -া মা -া I
অ o স্থি হা o ড় হ বে চু র্ মা র্

I গা গা গা | গা গা -মা I রা মা মা | -া -া -া I...
এ ম নি আ ছা ড় মা রি ব o o o

লক্ষণীয়, সুগ্রীব এবং রাবণের গানের কলির সুরে ন্যাসস্বর-মধ্যম। এখানে তিনি একটি সৌসাম্য বজায় রেখেছেন। সুগ্রীবের গানে সব শুদ্ধ স্বর কিন্তু রাবণের গানে কোমল ণ ব্যবহার করে একটি পার্থক্য রচনা করেছেন। এই নাটকে সুগ্রীবের কণ্ঠের 'আমার বচন শুন বিভীষণ' গানটিতে কীর্তনের ঢঙে সুর রচনা করেছেন। সার্থক প্রয়োগনৈপুণ্য। পরে বিভীষণের 'বিধি মোর ভালে' গানটিতে গোবিন্দচন্দ্রের 'কত কাল পরে' গানটির সুরের ছাপ সুস্পষ্ট। মূল সুর লক্ষ্ণৌ ঠুংরী। আর শেষ গান 'যমব্যাটা যে দিল ফাঁকি'-তে বৈচিত্র্যহীন একটানা সুরের পুনরাবৃত্তিতে বিরক্তিকর একঘেয়েমি পরিস্ফুট—নাটকের প্রয়োজনে যা ছিল নিতান্তই অপরিহার্য।

সুকুমার রায়ের অধিকাংশ গানগুলিই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের প্রয়োজনে রচিত। সেই প্রয়োজন-অনুবর্তিতার বিচারে তা সুসঙ্গত। বিশেষ করে যে কয়েকটি গানের সুর সংগৃহীত হয়েছে তা লক্ষ করলে দেখা যাবে সুরগুলির মধ্যে একটি স্বাভাবিক গতি আছে। বিচ্ছিন্নভাবে হয়ত তার স্বতন্ত্র মূল্য বিশেষ নেই, কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য অপরিসীম।

অনেক পরে আনুমানিক ১৯১৮ সালে সুকুমার দু-খানি ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। দুটি গানই বিবাহ-উৎসব উপলক্ষে রচিত। 'প্রেমের মন্দিরে তাঁর' গানটির সুর ভৈরবী। সুপ্রযুক্ত সুরটিতে রবীন্দ্রনাথের গানের ছায়া আছে। আর 'নিখিলের আনন্দ গান'-এ হুবহু রবীন্দ্রনাথের ধারায় সুর বসানো।

সুকুমার রায়ের কবিতা বিভিন্ন সময়ে সুরারোপিত হয়ে গীত হয়েছে। বিশেষ করে আবোলতাবোলের কবিতাগুলি। আগস্ট ১৯৩৫ সালে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'হৈহৈ সংঘে'র উৎসব উপলক্ষ্যে সুকুমার রায়ের 'গানের গুঁতো' কবিতাটিতে সুরারোপ করে সন্তোষকুমার ভঞ্জচৌধুরীকে শেখান। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই পথিকৃৎ। তারপর নলিনীকান্ত সরকার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ থেকে শুরু করে নানান ব্যক্তি এই পরীক্ষা করেছেন।

হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গধর্মী নাটকে সুর রচনায় সুকুমার রায়ের কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেখানে তাঁর সচেতন মানসিকতার পরিকল্পিত রূপ। তাঁর সমস্ত গানের সুর সংরক্ষিত হলে এ-বিষয়ে একটি নতুন পথনির্দেশ পাওয়া যেত বলে বিশ্বাস হয়।

প্রেমের মন্দিরে তাঁর আরতি বাজে

সুর ঃ সুকুমার রায়   স্বরলিপি ঃ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[ণধা মা]

II সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা -ঋা জ্ঞা I সা -া -ঋা | মজ্ঞা -জ্ঞা -া I
প্রে০ মে র ম ন্ দি রে ০ ০ তাঁ০ ০ র্

I ঋা ঋা ঋা | সঋা -জ্ঞঋা -সণ্া I সা -া -া | -া -া -া I
আ র তি বা০ ০০ ০০ জে ০ ০ ০ ০ ০

I সা সদা পা | পা পা প I পাঃ -দঃ -মপা | পাঃ -ণঃ -দপা I
মি ল০ ন ম ধু র রা ০ ০০ গে ০ ০০

I মা মা মা | মা -া -পা I মা -া -পা | -মা -া -ণা I
জী ব ন মা ০ ০ ঝে ০ ০ ০ ০ ০

I ণদা পা মা জ্ঞা -ঋা জ্ঞা I সা -া -ঋা মজ্ঞা -জ্ঞা -া I
প্রে মে র ম ন দ রে ০ ০ তাঁ০ ০ র্

I ঋা ঋা ঋা | সঋা জ্ঞঋা -সণ্া I সা -া -া | -া -া -া I
আ র তি বা০ ০০ ০০ জে ০ ০ ০ ০ ০

I দা দা মা | দা -া -ণা I ণা -ণর্সা র্সা | র্সা -া -া I
নী র ব গা ০ ০ নে ০০ গা নে ০ ০

I দা দা ণা | সা -র্জ্ঞা -র্ঋা I র্ঋা -র্ঋর্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া -া I
পু ল ক প্রা ০ ০ ণে ০ ০ প্রা ণে ০ ০

I র্সর্ঋা র্সা র্সা | ণা -া -দা I দা -পণা দা | পা -া -া I

চ০ লে ছে তাঁ ০ ০ রি ০০ পা নে ০ ০

I পা পা জ্ঞা | জ্ঞাঃ -পমঃ -মপা I পণা -দা -া | -া -া দপা I [ ] I

অ রূ প ধাঁ ০০ ০০ জে০ ০ ০ ০ ০ ০০

II দ্‌া -া ম্‌া | দ্‌া দ্‌া ণ্‌া I ণ্‌া -ণ্‌সা সা | সা -া -া I

প্রে ০ ম তৃ ষি ত সু ০ন দ র ০ ০

I দ্‌া দ্‌া ণ্‌া | সজ্ঞা -জ্ঞঋা -সণ্‌া I সা -া -া | জ্ঞা জ্ঞা ঋা I

অ রু ণ আ০ ০০ ০০ লো ০ ০ হৃ দ য়

I জ্ঞা জ্ঞা ঋা | জ্ঞা -া -ঋা I মজ্ঞা -জ্ঞা -ঋসা | ঋা ঋা ঋা I

নি ভৃ ত দী ০ ০ পে০ ০ ০০ আ লো রে

I সঋা -জ্ঞর্ঋা -সণ্‌া | সা -া -া I দা -া মা | মদা দা ণা I

আ০ ০০ ০০ লো ০ ০ পূ র্ ণ ম০ ধু র

I দণাঃ -ণঃ -র্সা | র্সা -া -া I দা -া -ণা | র্সা র্সা র্সজ্ঞা I

ভা০ ০ ০ তি ০ ০ পূ র্ ণ ম ধু র০

I ঋর্জ্ঞা -ঋর্সা -ণা | র্সা -া -া I র্সর্ঋা র্ঋা র্সা | ণর্সা ণা দা

রা০ ০০ ০ তি ০ ০ ম০ ধু র স্ব০ প নে

I পা -পা -পদা | পা -া -া I পা পা জ্ঞা | জ্ঞাঃ -পমঃ -পা I

রা ০ ০ তি ০ ০ ম ধু র রা ০০ ০

I পা -পদা -া | -া -া -দপা II [ ] II

জে ০০ ০ ০ ০ ০০

বিবাহের গান

[বিবাহের উদ্বোধন]

সুর ঃ সুকুমার রায় স্বরলিপি ঃ সুভাষ চৌধুরী

সা | গা গা -মা II র্সপা পা -র্সা | র্সা র্সনা -া I পঋা -ধপা পা | মা গা -া I

নি খি লে র্ আ ন ন্ দ গা ন্ এ০ ই প্রে মে রি ০

I গা গা -মা | ধপা -া মা I গা -া সা | গা গা -মা I

যু গ ল্ ব ন্ দ না য়্ ‍জী ব্ নে র্

I পা পা পা | পনা -নধা -নর্সা I র্সনা -া -া | -া -া -া I
আ কু ল স্রো০ ০ ০০ তে ০ ০ ০ ০ ০

I পা পা -া | পক্ষা ধপা -া I মা -া গা | গরা গা -া I
অ কু ল প্রে মে র্ কূ ল্ না হি পা য়্

I -া -া সা | গা গা -মা II
০ ০ "নি খি লে র্"

| পা | পা পনা -া II র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I পর্সা র্সা -া | র্সর্রা র্র্সা -া I
যে বি পু০ ল্ প্রে মে র্ বা ণী ০ নি০ খি ল্ প্রা০ ণে র্

I র্সনা না -নধা | ধপা না -া I -া -া | পা | পা পা -া I
পু ল ০ক মা ঝে ০ ০ ০ এ প্রা ণে র্

I পা পা -া | পক্ষা পা -া I পা -া ক্ষনা | নধা পা -া I
যু গ ল্ ধা রা য়্ সে ই প্রে০ মে রি ০

I মা মা -গা | গরা -া -গমা I সগা -া র্সা | র্সগা র্গা -া I
প র শ্ বা ০ ০০ জে ০ সে প্রে০ মে র্

I র্গর্মা -র্পা পর্মা | র্গা র্গা -া I র্গর্মা -র্গা র্গা | র্রা র্রা -না I
ঝ০ র্ ণা ঝ রে ০ এ ই প্রে মে রি ০

I নর্রা র্র্সা -া | সা না -া I -া -া সা | গা গা -মা II
স্র০ সে র্ ধা রা য়্ ০ ০ "নি খি লে র্"

| সা | সা ন্ -া II সা সা -া | সগা গা -া I গমা মা -া | গা গা -া I
আ কা শে র্ দি কে ০ দি০ কে ০ প্রে০ মে র্ আ লো য়্

I গা -া -মা | মপা -া মা I গা -া পা | পা পা -া I
প্র ০ ০ দী প্ জ লে ০ সে প্রে মে র্

I পক্ষা -পা পা | পক্ষা -পা -ক্ষা I পা -ক্ষনা না | নধা পা -া I
উ ৎ স জা গে ০ এ ০ই জী ব নে র্

I মা মা -গা | গরা -গা -মা I মগা -া | | পা | পা না -া I
স্ব প ন্ ত ০ ০ লে ০ সে প্রে মে র্

I নর্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I পর্সা র্সা -া | র্সর্রা র্র্সা -া I
ছ০ ন্ দ উ ঠে ০ প্রা০ ণে ০ প্রা০ ণে ০

I র্সনা না -ধা | ধপা না -া I -া -া } পা | পা পা -া I
আ ঘা ত্ লে গে ০ ০ ০ সে প্রে মে র্

I পা পা -া | পক্ষা পা -া I পা -া হ্মনা | নধা পা -া I
ত র ঙ্ গে তে ০ যা য়্ ভে০ সে যা য়্

I মা মা -গা | গমা -গা -মা I গা -া র্সা | র্গা র্গা -া I
ব্যা কু ল্ বে ০ ০ গে ০ না জা নি ০

I র্গর্মা র্পা র্পর্মা | র্গা র্গা -া I র্গর্মা -র্মর্গা র্গা | র্রা র্রা -র্না I
কো০ ন্ প্রে মি কে র্ প্রে০ ম্ জা গে রে ০

I নর্রা র্রর্সা -া | র্সা না -া I -া -া সা | গা গা -মা II II
এ০ ম ন্ লী লা য়্ ০ ০ "নি খি লে র্"

গানের গুঁতো

সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর   স্বরলিপি : বিশ্বজিৎ রায়

II পর্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I -র্সা -া র্সা | র্সা র্রর্সা -না I
গা ন্ জু ড়ে ছে ন্ গ্রী ০ ষ্ম কা লে ০

I না -া র্সা | না না -র্সা I ধা -র্সা না | -া পা -া I
ভী ০ ষ্ম লো চ ন্ শ র্ মা ০ তা র্

I পা না -া | ধা না -ধপা I পা -া ধা | পা ধা -পমা I
আও য়া জ্ খা না ০০ দি ০ চ্ছে হা না ০০

I মা -পা পা | ধা পা -ধপা I মপা -া মগা | -া গা মা I
দি ল্ লী থে কে ০০ ব০ র্ মা০ ০ ম রি

I পা -না -া | ধা -না -ধা I পা -া -া | -া -া -া I
হা য়্ ০ রে ০ ০ হা য়্ ০ ০ ০ ০

I সা সা সা | রা রা -া I রা গা -া | রা গা -া I
গা ই ছে ছে ড়ে ০ প্রা ণে র্ মা য়া ০

I সা সা সা | রা রা -গা I রা -মা -গা | -া -া -া I
গা ই ছে তে ড়ে ০ প্রা ণ্ পণ্ ০ ০ ০

I গা -মা মা | মা মা -া I মা -া পা | পা পা -া I
ছু টি ছে লো কে ০ চা র্ দি ক্ কে তে ০

I পা -া ধা | না ধা -না I নধা -া পা | -া -া -া I
ঘু র্ ছে মা থা ০ ভ ন্ ভন্ ০ ০ ০

I পর্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I নর্সা র্সা -া | র্সা রর্সা -না I
ম র্ ছে ক ত ০ জ খ ম হ য়ে০ ০

I না -া র্সা | না মা -র্সা I ধা -র্সা না | -া -া -া I
ক র্ ছে ক ত ০ ছ ট্ ফট্ ০ ০ ০

I পা -া না | ধা না -ধপা I | I
ব ল্ ছে হেঁ কে ০০ প্রা ণ্ টা গে ল ০

I পা -া ধা | না ধা না I নধা -া -ধপা | া -া -া I
গা ন টা থা মা ও ঝ ট্ পট ০ ০ ০

I সা সা -া | রা রা া I রা গা -া | রা গা -া I
বাঁ ধ ন ছে ড়া ০ ম হি ষ্ ঘো ড়া ০

I সা -া া | গা গা -মা I রা -মা গা | -া -া -া I
প থে র্ ধা রে ০ চি ৎ পাৎ ০ ০ ০

I গা -মা মা | মা মা -া I মা পা পা | -া পা পা I
ভী ০ ম লো চ ন গা ই ছে ০ তে ড়ে

I পা পা ধা | না ধা -না I নধা -া -পা | -া -া -া I
না ঃ কো ভা তে ০ দ্ ক পাত্ ০ ০ ০

I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I পর্সা -া সা | র্সা রর্স -না I
চ র্ পা তু লি ০ জ ন তু গু লি০ ০

I না -া র্সা | না না র্সা I ধা র্সা না | -া -া -া I
প ড়্ ছে বে গে ০ মু র্ ছায়্ ০ ০ ০

I পা না -া | ধা নধা -পা I পা ধা -া | পা ধা -পমা I
লা ঙ্ ল্ খা ড়া০ ০ পা গ ল্ পা রা ০০

I মা -া পা | ধা পা -ধপা I | I
ব ল ছে রে গে ০০ দূ র ছা ই ০ ০

I নর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I পর্সা র্সা -া | র্সা নর্সা -না I
জ লে র্ প্রা ণী ০ অ বা ক্ মা নি ০

I না না -র্সা | না না -র্সা I ধা -র্সা না | -া -া -া I
গ ভী র্ জ লে ০ চু প্ চা প্ ০ ০

I গা গা -মা | মা -া মা I মা -া পা | পা -া পা I
গা ছে র্ ব ঙ্ শ হ ০ চ্ছে ধ্ব ঙ্ শ

I পা -া ধা | না ধা -না I পধা -া পা | -া -া -া I
প ড়্ ছে দে দা র্ ঝু প্ ঝা প্ ০ ০

I সা -া সা | রা রা -া I রা -া গা | রা গা -া I
শূ ০ ন্যে মা ঝে ০ ঘু র পা লে গে ০

I সা -া রা | গা গা -মা I রা -মা গা | -া -া -া I

ভি গ্ বা জি খা য়্ প ০ ক্ষী ০ ০ ০

I গা গা মা | মা মা -া I | I

স বা ই হাঁ কে ০ আ র্ না দা দা ০

I | I পধা -া পা | -া -া -া I

গা ন্ টা থা মা ও ল ০ ক্ষী ০ ০ ০

I পর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I নর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -না I

গা নে র্ দা পে ০ আ কা শ্ কাঁ পে ০

I না না -র্সা | না না -র্সা I ধা -র্সা না | -া -া -া I

দা লা ন্ ফা টে ০ বি ল্ কু ল্ ০ ০

I পা -া না | ধা না -ধপা I পা পা ধা | পা ধা -পমা I

ভী ০ ষ্ম লো চ ন০ গা ই ছে ভী ষ ণ০

I মা -া পা | ধা পা -ধপা I মপা -া মা -গা -া -া I

খো স্ মে জা জে ০০ দি ল্ খু ল্ ০ ০

I সা -া সা | রা রা -া I রা -া গা | গা গা -া I

এ ক্ যে ছি ল ০ পা গ্ লা ছা গ ল্

I সা -া সা | রা রা -গা I রা -মা গা | -া -া -া I

এ ম্ নি সে টা ০ ও স্ তা দ্ ০ ০

I গা গা -মা | মা মা -া I মা -পা পা | পা পা -া I

গা নে র্ তা লে ০ শি ঙ্ বা গি য়ে ০

I পা -া ধা | না ধা -না I পধা -া -পা | -া -া -া I

মা র্ লো গুঁ তো ০ প শ্ চা ত্ ০ ০

I পর্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I নর্সা -া র্সা | র্সা র্র্সা -না I

আ র্ কো থা যা য়্ এ ক্ টি ক থা য়্

I না না -র্সা | না না -র্সা I ধা -র্সা না | -া -া -া I

গা নে র্ মা থা য়্ ডা ন্ ডা ০ ০ ০

I | -া মা মা I মা -া পা | পা পা -া I

বাপ্ ০ রে ০ ব লে ভী ০ ষ্ম লো চ ন্

I পা -া -া | -া -া ধা I না -া ধা | -া -না -া I

এ ০ ০ ০ ০ কে বা ০, রে ০ ০ ০

I পধা -া -া | -া পা -া II

ঠা ০ ন ০ ডা ০

বাংলা গানের মধ্যে অনেক সময় আবৃত্তির অংশ থাকে। “কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি” গানটিতে “কালো” কথাটি সুরে বসানো নয়, আবৃত্তি করতে হয়। এই গানটিতেও মাঝে মাঝে এই রকম আবৃত্তিমূলক অংশ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয় বলে এখানে এই অংশগুলির তাল এবং মাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র, স্বরের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। গানের মেজাজ এবং প্রসঙ্গ অনুযায়ী আবৃত্তির সুরটি গায়ক ঠিক করে নেবেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের সৌজন্যে, স্বরলিপিকারের সম্মতিক্রমে মুদ্রিত হলো।

ক্রোড়পত্র

সুকুমার রায়ের ডায়রি

সুকুমার রায়ের বিভিন্ন বয়সের ফোটোগ্রাফ

'সন্দেশ'-এ আবোলতাবোল

PREY FOR ME (ভয় পেয়ো না)

ABRACADABRA (হ য ব র ল)

হিজিবিজি খাতা

বাবার পাণ্ডুলিপি বলতে কয়েকটি নাটক ছাড়া আর কিছু আমি কোনোদিন চোখে দেখিনি। বাবার সবচেয়ে ভালো লেখা ও ছবির রচনাকাল হল তাঁর জীবনের শেষ একটা বছর। এর মধ্যে পড়ে হ-য-ব-র-ল, অতীতের ছবি, হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রি ও আবোলতাবোলের অনেক কবিতা। এ সবের পাণ্ডুলিপি ও মূল ছবিগুলি যে কোথায় গেল তা অনেক অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি।

যেটা সব সময়েই আমাদের কাছে ছিল সেটা হল একটা জীর্ণ খেরোর খাতা। এর প্রথম পাতায় খাতাটির পাঁচ রকম নামকরণ করেছেন বাবা—এমনি খাতা, জাবেদা খাতা, হিজিবিজি খাতা, বাজে খাতা ও ফালতু খাতা। নিচে ইংরিজিতে লেখা—সুকুমার রায়, ১৯১৮। এই খাতায় রয়েছে কিছু ছড়া ও কবিতার খসড়া—যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'খাই-খাই'; ব্রহ্মসংগীতে অন্তর্ভুক্ত দুটি বিয়ের গানের খসড়া; মাণ্ডে ক্লাবের কয়েকটি অনুষ্ঠানের কর্মসূচির খসড়া; সন্দেশের জন্য ধাঁধা ও হেঁয়ালির খসড়া; কিছু চিঠির খসড়া; মুদ্রণসংক্রান্ত কিছু যন্ত্রপাতির বর্ণনা ও নকসা, আর অজস্র ছোট ছোট খামখেয়ালি স্কেচ ও কার্টুন।

সব মিলিয়ে তাঁর শেষ জীবনে বাবা কতরকম কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন তার একটা চেহারা এই খেরোর খাতা থেকে পাওয়া যায়।

সত্যজিৎ রায়

২১.৮.৮২

ডায়েরির প্রথম পাতা

এই লাইনগুলি সম্পর্কে লীলা মজুমদার বলেছেন, "এই চিন্তাটাই ছিল এই অসাধারণ মানুষটির মনের মূলে।"

'খাই-খাই'-এর খশড়া
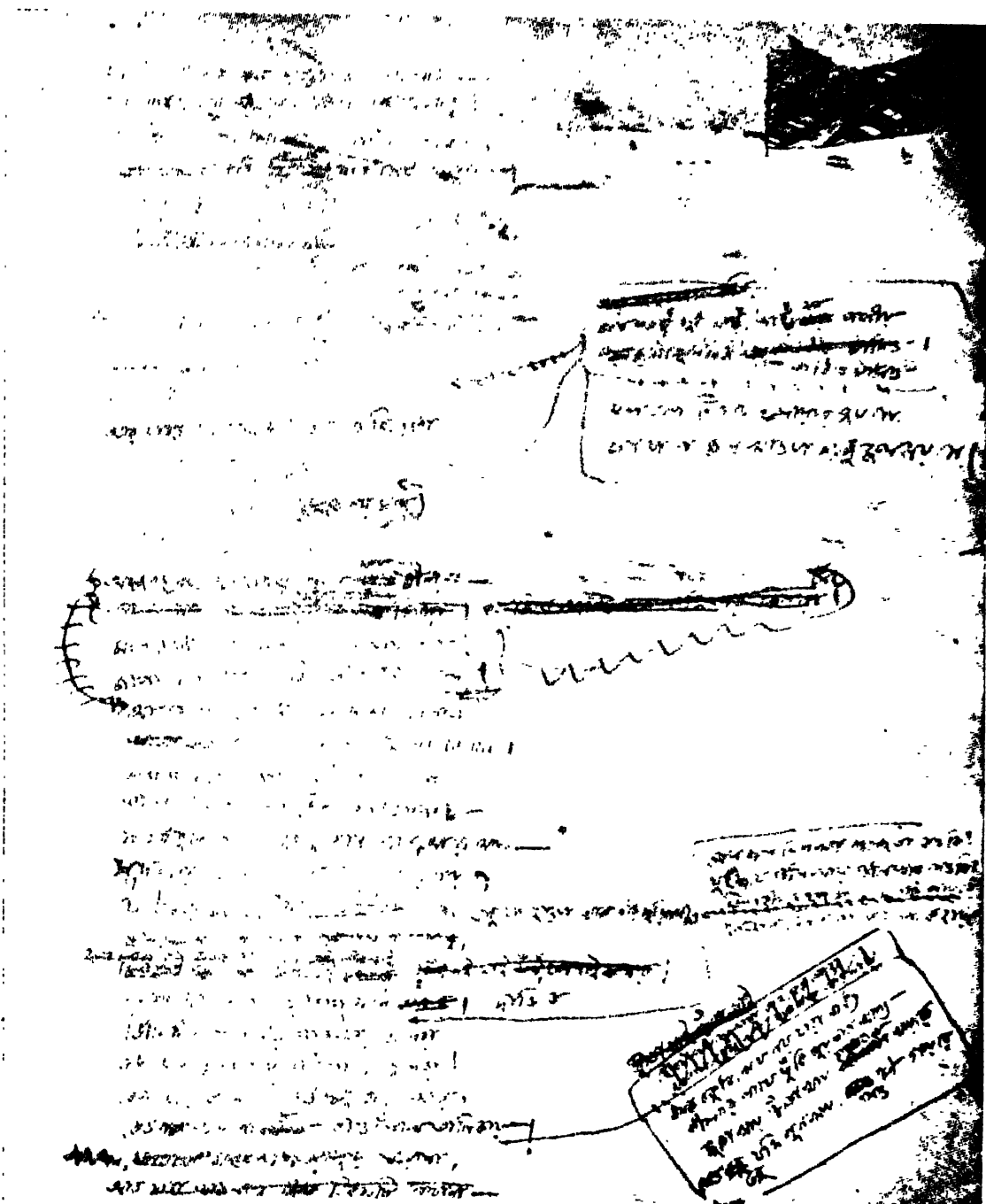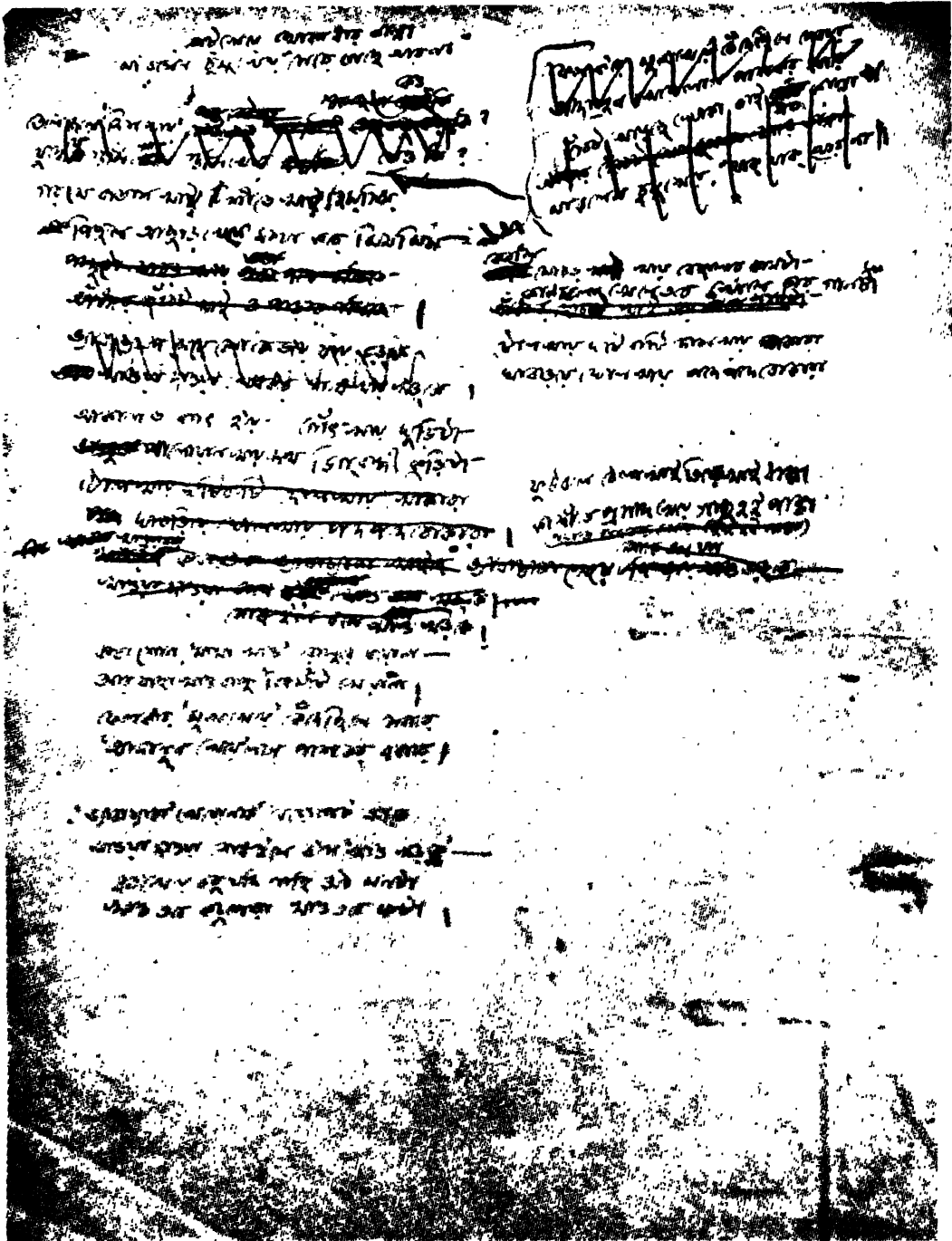
'মণ্ডা' (Monday) ক্লাবের চিঠিপত্র, অধিবেশনের কার্যবিবরণী ইত্যাদির খসড়ার মধ্যে দু'পাতা জুড়ে 'খাই খাই'-এর এই খসড়া। ক্লাবের খাই-খাই ভাবই কি কবিতাটির প্রেরণা?

নামপরিচিতি ঃ [১] S. N. M. (সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র) [২] D. N. M. (দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র) [৩] K. S. Roy (কিরণশঙ্কর রায়) [৪] বড়কু (হিমাংশুমোহন গুপ্ত) [৫] ছোটকু (ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত) [৬] চারুবাবু (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) [৭] N. Siddhanta (নির্মল সিদ্ধান্ত) [৮] Suniti Ch. (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়) [৯] গিরীশ শর্মা [১০] অজিতকুমার চক্রবর্তী [১১] Khodan (শিশিরকুমার দত্তদাস, সম্পাদক) [১২] Myself (সুকুমার রায়) G.S R.C. (গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী) Jibon Babu (জীবনময় রায়)। Habul Babu (হিরণকুমার সান্যাল)।
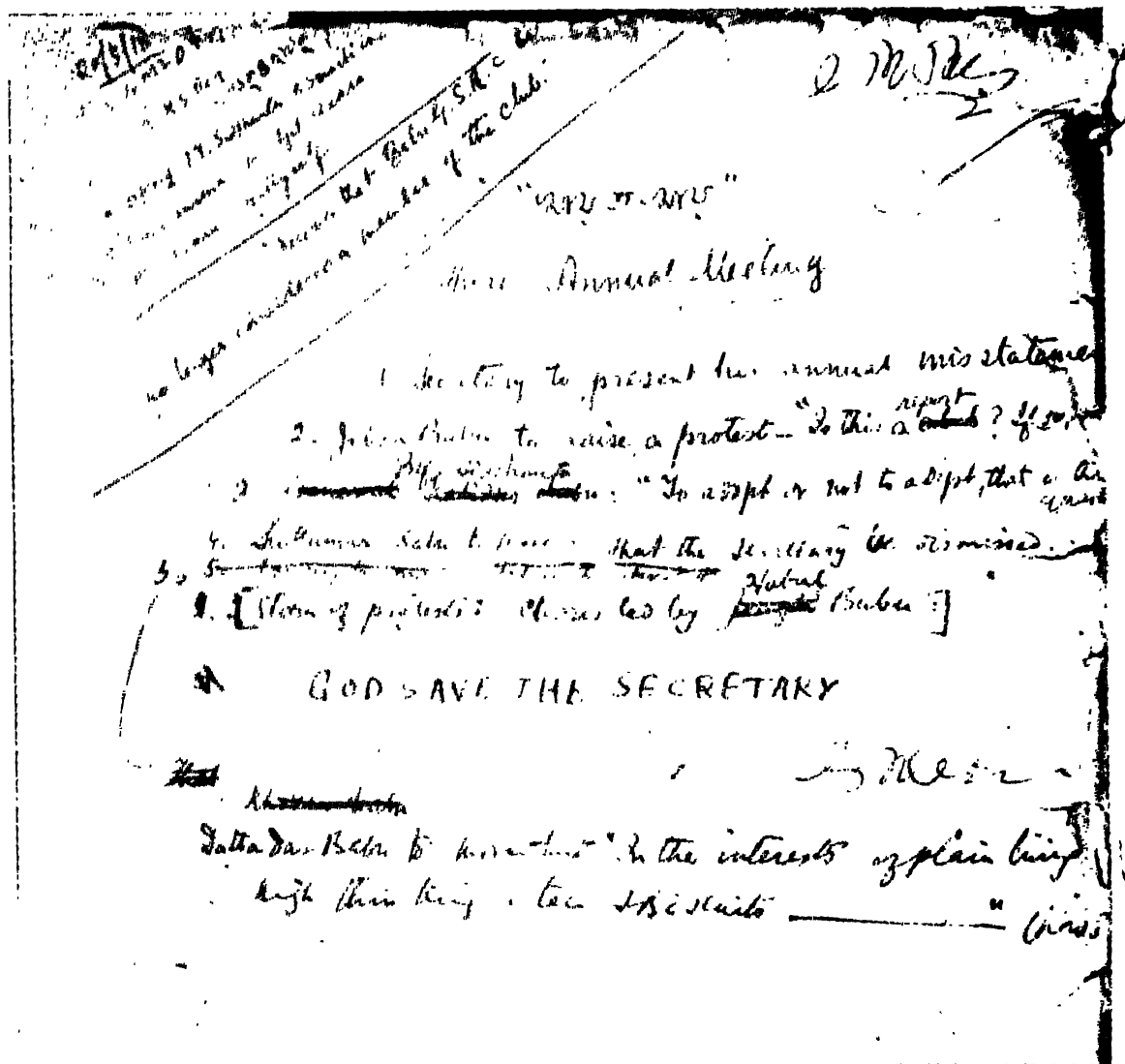
Annual Meeting

1. Secretary to present his annual mis-statement

2. Jibon Babu to raise a protest — "Is this a report?"

3. ... "To adopt or not to adopt, that is the question"

4. ... that the Secretary be dismissed

5. [Storm of protests: Cheers led by Habul Babu]

GOD SAVE THE SECRETARY

Dattadas Babu to move that "In the interests of plain living & high thinking, tea & biscuits ——" (Cries)

'মণ্ডা'ক্লাবের তৃতীয় জন্মোৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। উৎসব উপলক্ষ্যে 'আমাদের শান্তিনিকেতন'-এর সুরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আঠারো লাইনের মস্ত গান বেঁধেছিলেন: 'আমাদের মণ্ডাসম্মেলন!' নিমন্ত্রণপত্রটি সম্পাদক শিশিরকুমার দত্তদাস স্বাক্ষরিত হলেও দেখা যাচ্ছে, তার খসড়াটি সুকুমারেরই তৈরি।

বাঁদিকের অংশ ঃ দ্বিঃ মৈত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র। তৃতীয় জন্মোৎসব এই "ইষ্টক-কুণ্ডে"ই পালিত হয়েছিল। মেঝেতে সুজনীর ওপর পা ছড়িয়ে বসে 'মহাপ্রসাদ' খাওয়ার চিত্ররূপ। স্কেচগুলি সম্ভবত কোনো কোনো বিশিষ্ট সভ্যের!

'রংমশাল' অগ্রহায়ণ ১৩৫১ সংখ্যায় কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে-চিঠিকে 'সম্পাদক-স্বরচিত" বলেছেন তার সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাচ্ছে এই খাতায়, অর্থাৎ এটিও সুকুমার-রচিত। সম্পাদক ছিলেন শিশিরকুমার দত্তদাস।

5.13 A	36.37 B	14 C	3 D	7.30 38 E
F	1.11.22 26.42 G	H	15.20.28 40 I	J
19.39 K	23.27 L	M	21.25.34 41 N	2.8.16 24.31 35 O
P	Q	10.12.33 R	4.18 S	T
.17.32 U	6.29 V	X	Y	Z

W

একটা ক্রিপ্টোগ্রাম (গুপ্তলিপি) তৈরি হচ্ছিল। বোধহ
'সন্দেশ'-এর জন্য। মাঝখানের খোপকাটা বর্ণক্ষেত্র
বাঁদিকে স্পষ্ট করে ছাপা হলো। A, B, C, D প্রভৃ
খোপের মধ্যে যে অঙ্কগুলো দেওয়া আছে সেগুলো
যথাক্রমে গুপ্তলিপিতে ঐ বর্ণগুলোর স্থানাঙ্ক। A-র
খোপে আছে ৫ এবং ১৩—অর্থাৎ গুপ্তলিপির
পঞ্চম ও ত্রয়োদশ স্থানে A বর্ণটি আছে

ওপরে বাঁদিকে দাঁড়িয়ে : উপেন্দ্রকিশোর। বসে : (বাঁদিক থেকে) সুখলতা, সুষমা (প্রমদারঞ্জনের স্ত্রী), বিধুমুখী (সুকুমারের মা), পুণ্যলতা। সামনে বসে : সুকুমার ☐ ওপরে ডানদিকে সামনের সারি : (বাঁদিক থেকে) সুবিনয় ও পুণ্যলতা। পিছনের সারি : শান্তিলতা, সুখলতা ও সুকুমার (বসে) ☐ নিচে : বাঁদিকে বসে প্রথমজন সুকুমার। বিলেতে তোলা গ্রুপ ছবি। অন্যদের পরিচয় জানা যায় নি। ছবিগুলি সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

'সন্দেশ'-এ আবোল তাবোল

সুকুমার-অঙ্কিত 'সন্দেশ'-এর মলাট

হেড অফিসের বড়বাবু লোকটি বড় শান্ত

গান জুড়েছেন গ্রীষ্মকালে ভীষ্মলোচন শর্মা

খিচুড়ি।

'সন্দেশ'-এ (মাঘ, ১৩২১) প্রকাশিত খিচুড়ি'র পাতায়
সুকুমারের সংশোধন, সংযোজন ও 'সন্দেশ'-এ ছাপা ছবি

আবোলতাবোল

ওই আমাদের পাগ্‌লা জগাই, নিত্যি হেথায় আসে ;
আপন মনে গুণ্‌গুনিয়ে মুচ্‌কি হাসি হাসে।
চল্‌তে গিয়ে হঠাৎ যেন থমক লেগে থামে,
তড়াক্‌ ক'রে লাফিয়ে যায় ডাইনে থেকে বামে।
ভীষণ রোখে হাত গুটিয়ে সাম্‌লে নিয়ে কোঁচা,
"এইয়ো" ব'লে ক্ষ্যাপার মত শূন্যে মারে খোঁচা।
চেঁচিয়ে বলে "ফাঁদ পেতেছ ? জগাই কি তায় পড়ে !
সাত জার্ম্মান জগাই একা তবুও জগাই লড়ে।"
উৎসাহেতে গরম হ'য়ে তিড়িং তিড়িং নাচে,
কখনও যায় সাম্‌নে তেড়ে কখনও যায় পাছে।
এলোপাতাড়ি ছাতার বাড়ি চর্কীবাজির মত !
চক্ষু বুজে ধুপুস্‌ ধাপুস্‌ বাহাদুরি খেলায় কত।
[illegible] গায়েতে ঘাম ঝরে
"দুড়ুম" ক'রে মাটির পরে লম্বা হ'য়ে পড়ে।
গড়াগড়ি চেঁচায় খালি চোখ দুটি ক'রে ঘোলা,
"জগাই মোলো,—এইসা [illegible] কামানের এক গোলা"।
এই না ব'লে মিনিট খানেক ছট্‌ফটিয়ে খুব
মড়ার মত শক্ত হ'য়ে একেবারে চুপ।
তার পরেতে সটান্‌ ব'সে চুলকে খানিক মাথা
পকেট থেকে বেরুল তার হিসেব লেখার খাতা ;

লিখ্‌ল তাতে "ওরে জগাই, ভীষণ লড়াই হ'লো
দুই ব্যাটাকে খতম ক'রে জগাই দাদা মোলো।
আর দুটো লোক কৈ যে গেল, ভয়েতে দেশছাড়া -
তিন জার্ম্মান জখম হ'ল জগাই গেল মারা"।

সন্দেশ/বৈশাখ ১৩২২

কাতুকুতু বুড়ো

আর যেখানে যাওনারে ভাই সপ্ত-সাগর পার,
কাতুকুতু বুড়োর কাছে যেও না খবরদার ;
সর্ব্বনেশে বুড়ো সে ভাই যেয়ো না তার বাড়ী—
কাতুকুতুর কুল্‌পী খেয়ে ছিঁড়্‌বে পেটের নাড়ি।

কোথায় বাড়ী কেউ জানে না, কোন্‌ সড়কের মোড়ে,
একলা পেলে জোর ক'রে ভাই গল্প শোনায় পড়ে।
বিদ্‌ঘুটে তার গল্পগুলো না জানি কোন্‌ দেশী —
শুন্‌লে পরে হাসির চেয়ে কান্না আসে বেশী।
না আছে তার মুণ্ডু মাথা না আছে তার মানে,
তবুও তোমায় হাস্‌তে হবে তাকিয়ে বুড়োর পানে।
কেবল যদি গল্প বলে তাও থাকা যায় স'য়ে,
গায়ের উপর সুড়্‌সুড়ি দেয় লম্বা পালক ল'য়ে।
বলে "এক যে যোদ্ধা রাজা—হোঃ হোঃ হোঃ হি হী,
"তার যে ঘোড়া -হাঃ হাঃ হা— ডাক্‌ত সেটা চীঁহি,
"ছুট্‌ত যখন হে হেঃ হে—সবাই বল্‌ত বাহা
হোঃ হোঃ হো হী, হী হি হেঃ হেঃ হে হাহা"।
হঠাৎ বলে "আর বোধ। যাও কাতুকুতু ময়না,
ভাত খাবি ত আয় না দেখি আর ত দেরী সয় না"।
এই না ব'লে কুট্টুস্‌ ক'রে চিমটি কাটে ঘাড়ে,
খ্যাংরা মতন আঙুল দিয়ে খোঁচায় পাঁজর হাড়ে।
তোমায় দিয়ে কাতুকুতু আপনি লুটোপুটি,
যতক্ষণ না হাসবে তোমার কিছুতে নাই ছুটি।

সন্দেশ/জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

আবোলতাবোল

কল ক'রেছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো—
সবাই শুনে 'সাবাস' বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।
চণ্ডীদাসের নাম শোননি ? যাওনি তাদের বাড়ী !
দেখনি তার মেশোর মুখে বিকট রকম দাড়ি ?
নাই বা দেখ, তবু যদি খুড়োর কথা শোন
অবাক্ হ'য়ে থম্‌কে যাবে, সন্দেহ নাই কোন।
খুড়োর যখন অল্প বয়স—বছর খানেক হবে—
উঠ্‌ল কেঁদে 'গুংগা' ব'লে ভীষণ অট্ট রবে।
আর ত সবাই 'মামা' 'গাগা' আবোল তাবোল বকে
খুড়োর মুখে 'গুংগা' শুনে চম্‌কে গেল লোকে।
পাড়ার যত প্রাচীন বুড়ো অবাক্ হ'য়ে চায়
এমন বুদ্ধি আর কোথাও দেখাই নাহি যায়।
সেই খুড়ো আজ কল করেছেন আপন বুদ্ধি বলে
পাঁচ ঘণ্টার রাস্তা যাতে সওয়া ঘণ্টায় চলে।

দেখে এলাম কলটি অতি সহজ এবং সোজা,
ঘণ্টা দশেক ঘাঁট্‌লে পরে আপনি যাবে বোঝা।
বল্‌ব কি আর কলের ফিকির, বলতে না পাই ভাষা,
ঘাড়ের সঙ্গে যন্ত্র জুড়ে একেবারে খাসা।
সামনে তাহার খাদ্য দোলে যার যে রকম রুচি
(মণ্ডা মিঠাই চপ্ কাট্‌লেট্ খাজা কিম্বা লুচি)।
মন বলে তায় 'খাব খাব' মুখ চলে তায় খেতে,
মুখের সঙ্গে খাবার ছোটে রঙ্গরসে মেতে।
এম্‌নি ক'রে লোভের টানে খাবার পানে চেয়ে,
উৎসাহেতে হুঁশ্ রবে না চলবে কেবল ধেয়ে।
হেসে খেলে দু দশ যোজন চল্‌বে বিনা ক্লেশে,
খাবার গন্ধে পাগল হয়ে জিভের জলে ভেসে।
সবাই বলে সমস্বরে ছেলে জোয়ান বুড়ো,
অতুল কীর্তি রাখ্‌ল ভবে চণ্ডীদাসের খুড়ো।

সন্দেশ/ফাল্গুন, ১৩২২

আবোলতাবোল

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ নাচে—
খবরদার কেশ'না কেউ আস্তাবলের কাছে!
চাইবেনাকো ডাইনে বাঁয়ে চাইবেনাকো পাছে—
চার পা তুলে থাকবে ঝুলে হট্টমুলার গাছে!

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ কাঁদে—
খবরদার! খবরদার! যেয়ো না কেউ ছাদে!
উপুড় হ'য়ে মাচায় শুয়ে লেপ কম্বল কাঁধে
বেহাগ সুরে গাইবে খালি "রাধে কৃষ্ণ রাধে"।

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ হাসে—
থাক্‌বে খাড়া একটি ঠ্যাঙে রান্না ঘরের পাশে
ঝাপ্‌সা গলায় ফার্সি কবে নিঃশ্বাসে ফিস্‌ফাসে;
তিনটি বেলা উপোস রবে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে।

(যদি) কুম্‌ড়োপটাশ ডাকে—
সবাই যেন শাম্‌লা এঁটে গাম্‌লা চ'ড়ে থাকে
ছেঁচ্‌কিসাগের শেকড় বেটে মাথায় মলম মাখে
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষ্‌তে থাকে নাকে।

তুচ্ছ ভেবে এসব কথা কর্‌ছে যারা হেলা,
কুম্‌ড়োপটাশ জানতে পেলে বুঝবে তখন ঠেলা।
কুম্‌ড়োপটাশ চট্‌লে পরে ঘট্‌বে তখন কি যে,
বল্‌ব কি ছাই বুঝাই কারে বুঝ্‌তে না পাই নিজে।
দেখ্‌বে যখন কোন্‌ কথাটি কেমন ক'রে ফলে,
আমায় তখন দোষ দিওনা আগেই রাখি ব'লে।

হেস’ না !

রাম গরুড়ের ছানা হাস্‌তে তদের মানা
হাসির কথা শুন্‌লে বলে
“হাসব না না-না না” ।

সদাই মরে ত্রাসে ঐ বুঝি কেউ হাসে
এক চোখে তাই মিটমিটিয়ে
তাকায় আসে পাশে ।

ঘুম নাহি তার চোখে আপনি ব’কে ব’কে
আপনারে কয় “হাসিস্‌ যদি
মারব কিন্তু তোকে” ।

যায় না বনের কাছে কিম্বা গাছে গাছে
দখিন হাওয়ার সুড়সুড়িতে
হাসিয়ে ফেলে পাছে ।

সোয়াস্তি নেই মনে,- মেঘের কোণে কোণে
হাসির বাষ্প উঠ্‌ছে ফেঁপে ।
কান পেতে তাই শোনে ।

ঝোপের ধারে ধারে রাতের অন্ধকারে
লাখ জোনাকির চক্ষুঠারা
হাস্‌তে শেখায় কারে

হাসির গন্ধ পেয়ে স্বপন তাদের মেয়ে
“হাঁসছ ?” বলে চম্‌কে ওঠে
চাঁদের পানে চেয়ে ।

হাসতে হাসতে যারা হ’চ্ছে কেবল সারা
রামগরুড়ের লাগছে ব্যথা
বুঝছেনা কি তারা ?

রামগরুড়ের বাসা ধমক দিয়ে ঠাসা
হাসির হাওয়া বন্ধ সেথায়
নিষেধ সেথায় হাসা ।

সন্দেশ/জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫

দুঃখের কথা

আহাহাহা! শুনবি যদি--সেকথাটা শুনবি যদি
শুনে তোর চক্ষু বেয়ে, ওরে ওরে, ঝরবে নদী।
ও পাড়ার নন্দগোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো;
ছিল সে যে, শোন্‌রে বলি—ছিল সে যে মনের সুখে
দেখা যেত সদাই তারে, হুঁকো হাতে হাস্যমুখে
ছিল না তার অভাব কিছু, ছিল না তার ভাবনা কোন,
ছিলনাক অসুখ বিসুখ—তবু হায়! তবুও শোন -
একদাঃ—বল্‌ব কি আর, ভেবে মোর কান্না আসে
হ'ল তার কি দুর্ম্মতি, আহাহাহা, ফাগুন মাসে—
গেল খুড়ো হাত দেখাতে--হেসে হেসে হাত দেখাতে—
ফিরে এল, শুক্‌নো সরু, ঠকাঠক্ কাঁপছে দাঁতে।
মুখে আর নাই সে হাসি, হুঁকো তার রইল পড়ে।
ভয়ে তার কপাল বেয়ে, ঝরে ঘাম দারুণ তোড়ে।
শুধালে সে কয় না কথা, আকাশেতে রয় সে চেয়ে,
মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে, পড়ে জল চক্ষু বেয়ে।
শুনে লোক দৌড়ে এল, ছুটে এল বদ্যিমশাই
বলে তারা "কাঁদছ কেন, কি হয়েছে নন্দ গোঁসাই"?
বুড়ো বলে "বছর বছর ভুগে মরি ব্যারাম হ'য়ে
এতদিন কেউ বলে নি, না জেনেই আস্‌ছি সয়ে।
হাড়ে হাড়ে সর্দ্দি কাশি, গাঁটে গাঁটে বাতের বাসা—
চারিদিকে জ্বরের হাওয়া মগজেতে ব্যারাম ঠাসা।
একথাটা বল্লিনে কেউ, হেসে হেসে আস্‌তি ফিরে,
এদিকে মোর প্রাণটা গেল, সে কথা কেউ ভাবলি নি রে"।
এই ব'লে সে উঠ্‌ল কেঁদে, ছেড়ে ভীষণ উচ্চ গলা
মিথ্যে হ'ল সান্ত্বনা সব, মিথ্যে তারে বুঝিয়ে বলা
দেখে এলাম আজ সকালে গিয়ে ওদের পাড়ার মুখো'—
বুড়ো আছে নেইকো হাসি, হাতে তার নেইকো হুঁকো।

হুলোর গান

বিদ্‌ঘুটে রাত্তিরে ঘুটে্‌ঘুটে ফাঁকা
গাছপালা মিশ্‌কালো মখ্‌মলে ঢাকা।
জট্‌বাঁধা ঝুল্ ঝোলে বট্‌গাছ তলে
ধক্‌ধক্ জোনাকির চক্‌মকি জ্বলে।
ঝাপ্‌সাটে ঘর বাড়ী আব্‌ছায়া মত
নিঝ্‌ঝুম নিভে গেছে পীদ্দিম্ যত।
চুপ্‌চাপ্ চারদিকে ঝোপ্‌ঝাড় গুলো
আয় ভাই গান গাই আয় ভাই হুলো।
গীত গাই কানে কানে চীৎকার ক'রে,
কোন্ গানে মন ভেজে শোন্ বলি তোরে—
পূব্‌দিকে মাঝরাতে ছোপ্ দিয়ে রাঙা
রাতকানা চাঁদ ওঠে আধখানা ভাঙা।
চট্ ক'রে মনে পড়ে মট্‌কার কাছে
মাল্‌পোয়া আধখানা কাল থেকে আছে।
দুড়্ দুড়্ ছুটে যাই দূর থেকে দেখি
তোফা ব'সে ঠোঁট চাটে ওপাড়ার নেকী।
ছল্ ছল্ করে মোর জল্‌জল্ আঁখি
মন বলে সংসারে সব জেনো ফাঁকি।
বিল্‌কুল পৃথিবীটা ভুল দিয়ে ঠাসা
স্যাঁৎসেঁতে ছ্যাপ্‌ছেপে শ্যাওলার বাসা।
সব যেন বিচ্ছিরী সব যেন খালি
গিন্নীর মুখ যেন চিম্‌নির কালি।

শব্দকল্পদ্রুম

সব যেন ধোঁয়া ধোঁয়া ছায়া-ঢাকা ধুলোতে,
চোখ কান খিল-দেওয়া গিজ্-গিজ্ তুলোতে।
বহেনাকো নিঃশ্বাস, চলেনাকো রক্ত—
স্বপ্ন না জেগে দেখা, বোঝা ভারি শক্ত।
মন বলে, "ওরে ওরে আক্কেল-মন্ত,
কানদুটো খুলে দিয়ে এই বেলা শোন্ত।"—

ঠাস্ ঠাস্ দ্রুম্ দ্রাম্, শুনে লাগে খট্কা,—
ফুল ফোটে? তাই বল! আমি ভাবি পট্কা!
শাঁই শাঁই পন্ পন্, ভয়ে কান্ বন্ধ—
ওই বুঝি ছুটে যায় সে ফুলের গন্ধ?
হুড়্মুড়্ ধুপ্ধাপ্—ওকি শুনি ভাই রে!
দেখছনা হিম পড়ে—যেও নাকো বাইরে।
চুপ্ চুপ্ ঐ শোন্! ঝুপঝাপ ঝপা-স্!
চাঁদ বুঝি ডুবে গেল?—গব্ গব্ গবা-স্!
খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ ঘ্যাঁচ্ ঘ্যাঁচ্, রাত কাটে ঐ রে!
দুড়্ দাড়্ চুরমার্—ঘুম ভাঙে কই রে!
ঘর্ঘর ভন্ ভন্ ঘোরে কত চিন্তা!
কত মন নাচে শোন্—ধেই ধেই ধিন্তা!
ঠুংঠাং ঢংঢং, কত ব্যথা বাজেরে—
ফট্ ফট্ বুক ফাটে তাই মাঝে মাঝে রে!
হৈ হৈ মার্ মার্, 'বাপ বাপ' চীৎকার,
মালকোঁচা মারে বুঝি?—সরে পড়্ এইবার।

সন্দেশ/আশ্বিন ১৩২৭

ভাল রে ভাল!

দাদা গো! দেখ্ছি ভেবে অনেক দূর—
এই দুনিয়ার সকল ভাল, আসল ভাল নকল ভাল,
সস্তা ভাল দামীও ভাল, তুমিও ভাল আমিও ভাল,
ওদের গানের ছন্দ ভাল, এদের ফুলের গন্ধ ভাল,
মেঘ মাখান আকাশ ভাল, ঢেউ জাগান বাতাস ভাল,
গ্রীষ্ম ভাল বর্ষা ভাল, ময়লা ভাল ফরসা ভাল,
পোলাও ভাল কোর্ম্মা ভাল, মাছপটলের দোল্মা ভাল,
চাল কুম্ড়োয় চাল্তা ভাল, ঝিঙের টকে পল্তা ভাল,
কাঁচাও ভাল পাকাও ভাল, সোজাও ভাল বাঁকাও ভাল,
কাঁসিও ভাল ঢাকও ভাল, টিকিও ভাল টাকও ভাল,
খেলাও ভাল পড়াও ভাল, মিঠেও ভাল কড়াও ভাল,
কালও ভাল আজও ভাল, ফাঁকিও ভাল কাজও ভাল,
লাঠিও ভাল ছাতিও ভাল, ঘুঁষিও ভাল লাথিও ভাল,
ঠেলার গাড়ী ঠেল্তে ভাল, খাস্তা লুচি বেল্তে ভাল,
গিট্কিরি গান শুন্তে ভাল, শিমুল তুলো ধুন্তে ভাল,
ঠাণ্ডা জলে নাইতে ভাল, কিন্তু সবার চাইতে ভাল,
—পাঁউরুটি আর ঝোলা গুড়।

সন্দেশ/জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩০

প্রসঙ্গত

'সন্দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন কবিতা, কবিতার নাম এবং ছবি 'আবোলতাবোল' গ্রন্থভুক্ত করার আগে সুকুমার "আবশ্যকমত সংশোধন ও পরিবর্তন...এবং নানাস্থলে নূতন মালমশলা যোগ" করেছিলেন। শুধু আবোলতাবোল পর্যায়ের কবিতা নয়, আমরা দেখেছি আরো কিছু কবিতা ও গল্প 'সন্দেশ'-এর একটা বাঁধানো ফাইলে কালির কলমে সযত্নে কাটাকুটি করে সংশোধন করেছিলেন সুকুমার। জীবনের শেষ এক দেড় বছরের মধ্যে এগুলো করা। এই সময়ের অন্যান্য লেখা 'হ য ব র ল', 'হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়েরী', 'ভাল রে ভাল', শেষ-'আবোলতাবোল' প্রভৃতি লেখায় গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যে সুকুমারকে পাওয়া যায়, মনে রাখতে হবে সেই পরিণত শিল্পীর কলম-তুলিতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়েছিল মাত্র কয়েক বছর আগের লেখাগুলো। এবং মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে লেখা কবিতাটিতে যে দুটি মাত্র শব্দ পরিবর্তন করেছিলেন সেটা বিশেষ ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। ছন্দ কিংবা কবিতাকে 'শুদ্ধ' করার উদ্দেশ্যে নয়, কবিতায় বলার কথাটিকে অনির্দিষ্ট করে দেওয়ার জন্যে। 'সন্দেশ'-এর উল্লিখিত ফাইলটা থেকে সংশোধিত 'খিচুড়ি' কবিতার ফ্যাক্সিমিলি, 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত ছবি ছাড়াও আবোলতাবোল পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি কবিতার 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত পাঠ এখানে অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করা হ'ল। কেবল কয়েকটি ছাপার ভুল শুদ্ধ করা হ'ল। 'গানের গুঁতো'র ছবিটি রঙিন ছিল। 'আবোলতাবোল' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছবিটি তিন রঙেই ছাপা হয়েছিল। পরবর্তীকালে 'সিগনেট' সংস্করণে এটিকে বাদ দেওয়া হয় এবং বর্তমানের অন্যান্য প্রকাশকরা সেই ধারা বহন ক'রে চলেছেন। 'গোঁফচুরি'র 'সন্দেশ'-এ প্রকাশিত ছবিটি বিভিন্ন লেখকের কাছে বিশেষ অর্থবহ মনে হওয়ায় প্রকাশিত হ'ল। 'দুঃখের কথা' ও 'হুলোর গান'-এর ছবি অপরিবর্তিত থাকায় প্রকাশ করা হ'ল না। 'সন্দেশ'-এ সুকুমার অঙ্কিত প্রচ্ছদচিত্র ও ফ্যাক্সিমিলি সত্যজিৎ রায়ের সৌজন্যে এবং অন্যান্য ছবিগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অনুপম মজুমদার

PREY FOR ME

(Sukumar Ray's '*Bhoy Peyo Na*')

Translated by Satyajit Ray

Don't be scared, my little man—
Think I'm going to bite you ?
Silly notion ! Don't you know
I have no strength to fight you ?

My heart is full of kindness
With no anger underneath,
And all the biting that I do
Is seldom with my teeth.

I know the horns upon my head
Must seem a trifle shocking,
But butting pains my head, and so
They're seldom used for knocking.

Come into my lair, little man
And live with me a while
I'll treat you as a dear friend
And put you up in style.

The club I'm holding in my hand—
Now, does that cause you panic ?
It's light as feather, take my word,
It only looks titanic.

Well, well—I see you're not convinced
By all that I have said,
It's time I grabbed you by your legs
And knocked you on the head.

My wife and dozen kids and I
Believe it's downright silly
To let escape a stupid man
Who's scared, willy-nilly.

I ABRACADABRA

(Sukumar Ray's *Ho Jo Bo Ro Lo*)
Translated by Arany Banerjee

It was sizzling hot ! Thought it would be nice and cool out here under this tree, but even here I've been sweating like nobody's business. I thought I'd wipe my face. But just as I was about to pick up my handkerchief, it said : 'Miaow !'

Good Heavens ! It wasn't my hanky any more but a plump red cat. It looked me straight in the eye, twitching its whiskers.

'Hullo !' I said, 'Weren't you my hanky a moment ago ? And now you seem to have turned into a cat. Strange !'

'What's so strange about it, pray ?' demanded the cat. 'What was a smooth, white egg a moment ago suddenly turns into a lovely quaking duckling. Nothing to it. It is happening all the time.'

Quite, I thought and said, 'Well, what do I call you now, Pussy or Hanky ?'

'Either will do. Or you can even call me Zero if you wish.'

'Zero ? How d'you mean ?'

The cat grinned from ear to ear. Then said mischievously, 'But don't you know ? Really.' That made me feel rather put out. I supposed it was silly of me not to have got that part about the Zero. So I quickly said : 'Oh yes, of course.'

'It's quite simple, actually,' the cat continued, 'Z as in Zero, A as in Cat, N for Hanky and Y for You What does that make ? Zany. Right ?'

That was Zany, of course, but not quite right. But lest he should give me that mocking grin again, I said, 'Of course, of course.'

He stared at me for a while and said, 'If you think it's so hot out here, why don't you go to Tibet ?'

'Easier said than done.'

'What's stopping you ?'

'How d'you suppose I'd get there ?'

'Quite easy,' he replied with a broad smile, 'Calcutta, Diamond Harbour, Ranaghat, Tibet It's a straight road. Takes you about an hour and a quarter to get there.'

'Think you could make yourself a bit more clear ?'

He put on a very serious face and replied, 'That's asking a bit too much. But had my Cousin Treeman been here, he could have helped you '.

I asked where his cousin lived and he answered : 'Wherever can Cousin Treeman live but on a tree ?'

'How can I find him ?'

The cat shook his head decisively and said, 'You can't.'

'Why ?'

'You see it's this way. Say you went to Uluberia to see him, he would then be at Motihari. Suppose you went to Motihari, he'd probably be at Ramkissenpur. If you went to Ramkissenpur, chances are that he'd be at Kassimbazar at the time. You just cannot get hold of him.'

'Don't you ever go to see your cousin, then ?'

'Of course I do !' he retorted.

'But how ?'

'It takes some doing. First I must find out by arithmetic where he will *not* be. Then I have to work out the places where he *might* be. Then I've got to make sure where he *would* be when I got to some of these places. Then...'

'What sort of arithmetic is that ?', I put in.

'Oh, very hard', he said. 'Want to see ?' He tried to look important and drew a line on the ground with a stick, saying : 'Suppose this is Cousin Treeman.' He drew another line, cocked his head and said, 'Let this be you.'

After this, he went on drawing line after line, rushing about all over the place and from time to time saying : 'Let this be Zero', 'Let this be Tibet', 'Let this be my cousin's tree-trunk,' 'Let this be Cousin Treeman's wife, in the kitchen,' 'Let that be a hole in the tree-trunk' and so on, until I cut in : 'What rot you talk. You make me sick !'

The cat's voice became more friendly. 'All right', he said, 'I'll make it easier for you. Close your eyes and add up in your mind what I say'.

I shut my eyes but the cat said nothing. I waited and waited. Still nothing happened. I smelt a fish, so I opened my eyes to see the cat climbing up a stile with its tail erect and with that mocking laugh of his ringing all the time. When he got to the top of the stile, he gave me a last dirty look and disappeared.

Just then, a thick, cracked voice said from somewhere : 'How much is twice seven ?'

I looked to the right and I looked to the left and I was looking behind me when the voice said : 'Hey you ! Can't you hear me ?' The voice was coming from above. A raven was sitting on the tree with its neck arched. He was writing something on a slate. He threw me a quick glance and said : 'How much is twice seven ?'

'Seven twos are fourteen', I replied.

The raven swayed from side to side, shook his head and cried : 'Wrong. Wrong again ! Failed !'

'Of course not. Seven ones are seven, seven twos are fourteen, three sevens are twenty-one', I said.

He said nothing and went on sucking his pencil and thinking hard. Then he said: 'Seven twos are fourteen. Put down four and carry the pencil.' 'Carry what ?' 'The pencil. Carry it in your hand.'

'But I just said seven twos are fourteen and you told me I was wrong !'

'You did. But it was not quite fourteen at the time. It was then only thirteen rupees, fourteen annas and three pies. And had I not put it down pat just on the tick of time, it would have been fourteen rupees, one anna and three pies.'

'Never heard such rot in my life', I said. 'If seven twos are fourteen, what difference does it make whether it's an hour early or three months late ?'

The raven looked surprised. 'But', he said, 'Doesn't time have any value in your country ?'

'How do you mean ?' I said, 'The value of time ?'

'Stay here for a few days and you will understand. Time is in great demand here these days. Not a jot to spare. There's even black-marketing going on in it. And you ! Here I'd been working at it so hard for the last few days (not that I'd always been honest, though) and saved up some very precious time, and look what you've done ! Wasted nearly half of it through your stupid jabbering.' He got back to his slate. I started feeling guilty and sat leaning against the tree.

There was a hole in its trunk that I had not noticed until now. Suddenly something slipped out of it and rolled on to the ground. I couldn't believe my eyes, but there it was ! An old man, about a cubit and a half tall, and sporting a green beard that reached down to his toes. His bald pate was smooth as a billiard-ball and someone had scribbled something on it in coloured chalk. In his left hand he had a hookah that had no tobacco, not even a bowl.

The chap took a couple of puffs at his hookah and blurted out: 'Ready ? My accounts ready ?'

The raven looked around him nervously and sheepishly said : 'Almost.'

'What d'you mean, almost ! Nineteen days gone by and not done yet ?' The raven gave the old man a superior look and said : 'How many did you say ?'

'Nineteen.'

'Going, going—going for twenty.'

'Twenty-one !'

'Twenty-two !'

'Twenty-three !'

'Twenty-three and a half !'

They went on as if they were bidding at an auction.

All of a sudden, the raven looked at me and said : 'You there ! Aren't you bidding ?'

I had no idea about what I should bid for. I said as much.

The old man now noticed me for the first time. He spun round on his heels and stood there staring at me.

He then put his hookah to his eye, as if it were a telescope, and peered at me through it. After this, he took out a few bits of coloured glass from his pocket and looked at me through each one of them in turn. At last he brought out a tailor's measuring tape and started measuring me.

He shouted : 'Height, twenty-six inches. Sleeves, twenty-six inches. Wrist, twenty-six inches. Neck, twenty-six inches. Chest, twenty-six inches—'

'Neck and chest both twenty-six ? Nonsense', I protested. 'What d'you take me to be ? A hog ?'

Calmly the old man said : 'Don't you believe me ? Take a look for yourself'

I took the tape from his hand. The other numbers were all worn out through use. All that remained was 26.

I was still looking at the tape when the old man asked : 'How much do you weigh ?'

I told him I didn't know. He felt my arm with his thumb and forefinger, and came out with : 'Two and a half pounds.'

'But that's impossible !' I protested, 'Little Potla is a year and a half younger than me and even he is twelve pounds.'

The raven barged in : 'The weights and measures must be different in your part of the world.'

The old man ordered the raven : 'Well then, write this down. Weight—two and a half pounds, age—thirty-seven years.'

'Thirty-seven ! But I'm only eight years and three months old.'

'Going up or coming down ?'

'Whatever d'you mean ?'

'I mean, is your age getting more or getting less ?'

'Whoever heard of age getting less ?'

'Doesn't it just ! What tough luck it would be if it didn't ! One would have grown older and older and older. Got be sixty, seventy, eighty. Doddering ! That way, one could even pop off one day, you know.'

'Of course you'd be old at eighty,' I said, 'It is natural, isn't it ?'

'Aren't you clever !' barked the old man, 'But why should you let your age touch eighty at all ? Why not put it in reverse gear at forty. That way, you'd again be thirty nine, thirty-eight, thirty-seven and so on until you are ten. After that you could let yourself grow older again. My age, for example, has been on the rise so many times and on the fall as many. Now I'm thirteen'

I couldn't help bursting out laughing. But the raven scolded : 'Less noise out there. Give me a chance to finish my accounts.'

The old man walked briskly up to me and whispered : 'I'll tell you a story. A lovely story. Just let me get the plot right first.' And he closed his eyes and started to think. Suddenly he blurted out—

'And the chancellor swallowed the princess' ball of thread. So no one knew where it was. The ogre, on the other hand kept shouting "Fee, fi, fo, fum" and rolled out of his bed on to the ground. The drums thundered out and the trumpets blundered out and there was a deafening racket. Sailors and soldiers and officers and guards were all out on the streets, bellowing out orders. Everybody was shouting at everybody else. In the midst of all this, the king cried out : "If this really be the magic steed, then where is its tail ?" And the whole court, with the doctor and the proctor and the client and the pliant, shouted : "True enough, where's the tail ?" And they all

looked pretty silly because no one could find an answer to this wise question. So they slipped quietly out '

The raven cut in : 'Do you have a copy of the notice ?'

'What notice ?' I asked. He brought out a whole sheaf of printed sheets and handed one to me. It ran like this :

"Glory be to the Protector of All Ravens"
"Raven Jetblack Esquire
41 Arboreal Park
Ravensville.

"We deal in all sorts of accounts—thrifty and extravagant, wholesale and retail. Our methods are strictly scientific and our costs, Rs 1/5/- per inch. (Children half price.) Send us important details about yourself like the size of your shoes, the colour of your skin, whether you have an earache, and whether you are dead or alive. As soon as you do this, you will get a copy of our catalogue by return of post.

YOU HAVE BEEN WARNED !

We have a long ravelineage. Ours is an ancient family We have of late noticed that a number of common crows and jack-daws rooks and crooks are trying to pass off as ravens. We hereby warn all concerned that they should not be taken in by their advertising gimmicks. Their only interest in life is to make money. So don't let them hoodwink you."

The raven stopped and said : 'How d'you like it ?'

I hesitated : 'I couldn't get the point.'

'Naturally, it's meant only for classy people. I remember we had a customer once, a chap with a bald head—'

'Shut up, Jetblack !' barked the old man, 'If you say bald again, I'll smash your slate with this hookah. Clear ?'

The raven looked puzzled, but only for a moment. Then he said : 'Sorry. I didn't mean to hurt you. What I really wanted to say was—a bowled head. A head bowled over by too much tapping on it.'

But that didn't seem to be good enough for bald-pate, because he went on grumbling and muttering to himself.

So the raven asked : 'Would you like to go through the accounts ?'

The old man's face brightened up. 'Are they ready ? Let me have a look, then.'

'Here you are !' said the raven, and gave him a crack on the head with his slate.

Bald-pate plonked himself on the ground and, pouting his lips like a little boy, started throwing his arms and legs about, crying : 'Oh Mamma, help ! Oh auntie, help ! Oh brother Shibu, help !'

The raven was taken aback. 'Poor dear,' he consoled, 'are you hurt ? Upset by my fortitude ?'

The old man jumped up . 'Did you say forty-two ? Here goes, then. Forty-three, forty-four.'

The raven caught up the spirit with 'Forty-five !' Old man : 'Forty-six !'

Lest they started bidding again, I quickly pointed out that the accounts had not yet been checked. 'But of course !' hollered the old man, 'the accounts. Let me go through them.'

The raven handed him the slate. I took a peep at it and found, written in tiny letters :

'Whereas we are hereby informed of the warranty of Ravensville that it has been decided on this day at the Office of the Collector of Rents that, whether the

documents and papers pertain to buildings or damage suits, or whether they do not, the heirs and assignees, the executors and administrators will be passed down from hand to hand and hence therefore will be provisionally leased out on a permanent basis at a fixed rate of interest.

And whereas it has been decided, in truth or in falsehood, in a civil district court or by the accused committed to sessions, that the plaintiffs, witnesses and all concerned, come to a compromise, by initiating a prosecution, or substituting an execution, this should be by decree or by auction, the latter being permissible either in the form of quo vadis or homo sapiens. The proclamation of sale for all forms of work as mentioned above is—'

The old man burst in impatiently : 'What does all this gibberish mean ?'

The raven was serious. 'But you've got to have all that,' he said, 'It's called the preamble. The law says you've got to have it.'

'But where's the real stuff ?' asked the old man.

'It's coming,' the raven replied and, turning to me, said : 'I say, read out the last part, will you ?'

I read out : 'Seven twos are fourteen. Age twenty-six inches. Debit thirty-seven years. Credit two-and-a-half pounds.'

The raven then assumed an official tone : 'Hence it is quite obvious that this is neither LCM nor GCM. So it has to be a sum either in fractions or in the rule of three. My calculations have brought me to the conclusion that since the half-pound is in fractions, the rest must be in the rule of three. Now tell me how you'd like your accounts presented, in fractions or in the rule of three.'

'Just a minute,' the old man said, 'let me consult my partner.' He bent down, put his mouth to the hole in the tree-trunk as if it were a speaking-tube, and shouted : 'Hey Budho ! I say, Budho !'

Out of the hole came the answer in a funny rumbling voice : 'Whaddy want ?'

'Come up and listen to what Jetblack has to say.'

'Whatsee say ?'

'Wants to know whether we'd like to have the accounts in the rule of three or in fractions.'

Now the voice became quite rough : 'Who did he say was factious, you or me ?'

'Not factious, fractions. Are the accounts to be in fractions or the rule of three ?'

Short silence. Then : 'The rule of three.'

The old man kept running his fingers through his beard as if he was in deep thought. At last he shook his head and said : 'What brains ! The rule of three indeed ! Why, what's wrong with fractions ? I say, Jetblack, I think you'd better give it to me in fractions.'

Said the raven : 'In that case, take the whole number two from $2\frac{1}{2}$ lb. and what remains ? Half a pound. That is the amount of accounts I owe you. The price of this $\frac{1}{2}$ lb is Rs 2/14/- if undiluted and Re—/1/6 if toned down with water'

'When I was crying,' said the old man, 'three tear-drops fell in. That means, it was toned down. So here's your Re—/1/6'

He counted out the money and Jetblack was so happy that he started dancing, keeping time with the slate and pencil, and singing : 'Out he came and bawled : Tara-rum, tara-rum, tara-ra' !

The old man was furious. 'Did you say bald again ? Now this is the last straw. I'll teach you a lesson. Say Budho, hurry up and

come out. Jetblack is calling us names again.' And before you could say 'sneeze', out rolled something from the hole again. It was another old man, who looked so much like the first that they could have been twins. Only, this second one was panting under the weight of a huge packet that he carried on his back. And the other one, instead of helping him out, jumped on his back and started hammering him with his hookah and shouting : 'Up, you scoundrel, get up !'

The raven winked at me and whispered : 'Get what's going on here ? This chap here is Udho and the other fellow, Budho. They always seem to get mixed up over their own names and fight over that packet'

Hardly had the words left his lips when Budho got up, gnashed his teeth and said : 'Udho, you stupid ass, mind your manners !' And Udho rolled up his sleeves and threatened : 'Budho, you idiot, you'd better watch your step.'

And Jetblack the rascal, egged them on with : 'Carry on, gentlemen, fight it out, fight it out !'

Udho and Budho stopped fighting as suddenly as they had begun. Udho lay on his back, gasping for breath, while Budho kicked the air and stroked his bald pate.

There were tears in Budho's eyes as he wailed : 'Udho, dear little brother, I hope they haven't hurt you !'

And Udho whined : 'My poor Budho, have they been bullying you ?'

Then they got up and fell on each other's neck and walked back to their hole in the tree-trunk, holding hands like children.

Just as I was thinking of slipping quietly away, I heard the sound of laughter from a bush behind me. I peered into it and saw something that seemed to be a cross between a man and an owl and a spook and an ape. In fact, it looked like nothing on God's earth. It was choking with laughter and saying : 'Oh, that's too much. I'll die laughing. I'll split my sides laughing !'

He walked out of the bush and seemed to be relieved when he saw me. He took deep breath and exclaimed : 'What a stroke of good luck you came along, or this laughter would surely have been the death of me.'

'But what's so funny ?' I asked.

'I'll tell you what. Can you imagine what would have happened if the earth were flat ? All the water would have spilt over dry land and the whole place would have been slushy and slimy and everybody would have slipped and fallen and then—oh, ho ho, ha ha ha !'

'But is that all the reason for your crazy fits of laughter ?'

'No, not just that. Suppose there was a man coming your way carrying an ice-cream cone in one hand and a mud-cake in the other. And suppose he wanted to take a bite at the ice-cream cone and swallowed the mud-cake instead. Oh, ho ho, ha ha ha !'

'But why d'you imagine such impossible things if it only makes you suffer ?' I asked.

He replied : 'Not impossible, really, because he could have had pet lizards, you know. And suppose he fed his pets and washed them every day, and every day he'd hang them out to dry, and suppose one fine morning there came

along a billy-goat and gobbled up all the lizards and—oh, ho ho, ha ha ha !'

It was getting a bit too thick. 'What's your name ?' I demanded.

'They call me Hiji-bij-bij. And my father's name is Hiji-bij-bij too. And so is my uncle's name Hiji-bij-bij and my—'

'You mean your whole family is called Hiji-bij-bij ?'

'No, not really. My uncle is called Tockai. And so is my father-in-law called Tockai and—'

'Sure you're not fibbing ?'

'Oh sorry', he said, 'Actually, my father-in-law's name is Doughnut.'

I told him I didn't believe a word of what he was saying when suddenly a billy-goat stepped out of the bush. He was wearing a goatee and some sort of a certificate was dangling from his neck. He asked : 'Were you talking about me ?'

I was just about to say : 'Why should we ?' when he rattled off in bookish language : 'For all your vehement remonstrances and protestations, I insist that there are a great many things that we goats do not consider edible. Allow me, therefore, to declaim on the subject of the range of things that we feel are comestibles. That is, what we do eat and what we don't.'

He stepped forward and started to make a speech—'Dear children and beloved Hiji-bij-bij. As you can all see by this certificate hanging from my neck, my name is Pundit Horner, B. A., Gastronomist. The significance of my name is obvious. I have a pair of lovely horns. I am a bleating expert and can say bah beautifully. Hence my B.A. degree. The reason why I have been awarded the title of gastronomist is that it is on record that I have made many very thorough experiments on what can be eaten and what cannot. For your information and appropriate action, we goats do not eat everything. Now take what this nitwit said a moment ago about goats eating lizards. That is an absolutely cooked-up (but not edible) story. I have tasted many lizards and found them completely unsuited to our taste. There are of course things that we eat which other creatures would not touch—paper bags, for example, or coir or a nice, juicy magazine. But that does not mean that we ever go in for a hard-cover book. Off and on, we don't mind nibbling tid-bits like a blanket or a feather quilt. But we never let ourselves get addicted to them. And those who say we eat bedsteads or tables are confirmed prevaricators. They lie. They malign us. True, at times we don't mind munching things like pencils, erasers, cork stoppers, old shoes or canvas bags, but that's just for the heck of it. We never make a meal of such things. My grandfather once polished off nearly half of an army officer's tent. But even he never touched knives or scissors or glass bottles. Some of us like soap, but they confine themselves only to the cheap and low-

'grade varieties. In fact, my little brother once swallowed an entire cake of it.' And he gazed at the sky, tears rolling down his cheeks, and crying : *'Bah-bah-bah !'* I gathered the soap handn't quite agreed with the little brother.

Hiji-bij-bij was all this time sleeping like a log. Pundit Horner's wailing woke him and he jumped up and started coughing like mad. This time I thought the fool would die not laughing but coughing. But he got over it and began to laugh like mad again.

I scolded him : 'What's it this time ?'

He rattled off : 'And once upon a time, there was a man who snored terribly loud and so no one could stand him and one day, there was a thunder-storm and lightning struck his house and everybody rushed out and started giving him a thrashing and—oh, ho ho, ha ha ha !'

I'd had enough of all this nonsense and thought I'd go home when I saw a chap wearing a long black coat, white pyjamas and an oily smile. He was staring at me. When our eyes met, he gushed : 'Oh please don't ask me to sing. Please don't, I'm not in form today.'

'But what a nuisance !' I said 'Who *is* asking you ?'

The thick-skin ! Instead of going away at once, he whined : "Don't be offended, my dearest friend. All right, if you insist, I'll give you a few lines. Just for your sake.'

And before anybody could say a word, Pundit Horner came out with : 'Good, let there be music, let there be music ' The fellow took a huge roll from his pocket and started humming softly. Suddenly, he sang out in a loud, shrill voice ;

'The song is red, its tune is blue,
Sniff and you will smell a snigger.'

He sang this line once, he sang it twice, five times, ten times, until I had to stop him with : 'What a bore ! Are these the only lines your song has ?'

'Oh no !' he replied. 'There are lots more. But they are from different numbers Take this, for example :

Go straight along the zig-zag route,
Where whitened walls are washed with soot,

But my favourite number now is that one about the fresh potatoes from Naini Tal. Has to be sung *sotto voce*. I'm not up to it any more. Now, I find this one great fun :

Peacocks rock their locks and talk
to the sky,
Crocks are stopped with caulks of cork.
But why ?
Narrow songs can burrow through your
marrow,
Crooked light can harrow you tomorrow.
Today, let greying day still play the fool
And stacks of songs in black hot sacks
get cool !'

'You call that a song !' I shouted, 'Makes no head or tail.'

Hiji-bij-bij defended him meekly : 'Well,

it *is* a bit hard, I suppose.'

'Nonsense !' shouted Horner, 'It was only that part about the crocks that was a bit hard. But the caulks of cork were quite tender.'

Our songster's voice sounded hurt. 'If you want simpler songs,' he said, 'all you have to do is to say so, instead of being so nasty about it. Here, how d'you like this one:

The bat said to to the porcupine :

"Tonight we'll have a swell timine—"'

I interrupted : 'You mean swell time.' 'No, I mean timine.' 'But there's no such word as timine !' 'Why not', said the singer. 'If you can say fine, pine, porcupine, then why not timine ?' Horner came out with : 'We'll see about that later. Now get on with the song'. So the song continued :

The bat said to the porcupine,
'Tonight we'll have a swell timine.
Tonight they'll all be here. From bat
To owl. Pray for the poor old rat.
The frogs and tadpoles will, in fright
Shake and quake and take to flight.
Teeth a-chatter, moles will run.
Ha ha, will that not be fun !'

I wished he'd stop but didn't have the heart to tell him to. So the song continued :

'But in the bush', said Porcupine,
'There sleeps my wife in peace divine.
And look you, Owl and Mrs Owl,
If by chance your vulgar howl
Annoys her, then by God, you will
Feel the point of my sharp quill.'
Said the bat : 'The Owls, my friend,
Care just two hoots, so don't contend.
Sleeping on such a sooty night ?
She must be mad. Or is she tight ?
That fussy hussy's a bumptious bully
And you are getting to be woolly.'

There was a wild uproar behind me. I turned and looked. Quite a crowd had gathered there. Right in the middle of it was a porcupine screeching away at the top of his voice. A turbaned crocodile was patting him gently on the back with a big fat book and whispering : 'Calm down, calm down. I'll see to it that everything's put right.' A liveried toad appeared from somewhere, brandished a baton and proclaimed : 'This is a defamation suit.' A dignified owl then walked in, dressed in a black gown. He sat down on a big boulder right in front of me and promptly started dozing. An anxious-looking mole scurried in and started fanning the owl with a shoddy, dirty fan.

Presently the owl blinked, opened his eyes and skimmed the scene with his dull, leaden eyes. 'What's the complaint ?' He asked, and promptly closed his eyes again.

The crocodile wore a sad look on his face, scratched his eyes with a claw and managed to coax out a couple of tear-drops. He then started in a husky voice : 'M'lord this is a defamation suit. Hence, our duty is to define fame. I shall do so. If you want fame, you've got to be famished.'

The porcupine was about to say something but the crocodile stopped him with a bang on his head with his big fat book. He then asked him : 'Do you have all the papers ? Do you have any witnesses ?' The porcupine said : 'Of course I do'. Then, pointing to the songster shouted : 'He has them all'. The crocodile rudely snatched a sheaf of papers from the songster's hand and started reading :

'Two 'pon one I'd like to try
So on my cosy cot I lie.
But when I put my luggage by
Near rose or jasmine or cacti,
What'll you have ? A nice fish fry ?

Cemented floors will amplify
The sound of grey on khaki dye.
But tell me, why on earth d'you cry ?'

'No no,' interrupted the porcupine, 'not that one.'

'No ? just a minute then', and the crocodile started reading again :

'Mrs Spook is such a sight
Up on the tree in bright moonlight !
She likes to dine off babies' bones
Munching them with all her might.
If Mrs Ghost you want to see,
Look up at another tree.
Her ear-rings will be glaring bright
And she will say : "You wanting me ?"
The headless witch with flowing hair
Will soon entice you to her lair.
Your soft and tasty flesh will be
A treat to her that's, oh, so rare !'

The porcupine flared up with : 'No, you blockhead !' The crocodile apologised : 'Which one, then ? This ?—

Wrinkled sheets and crumpled clothes,
Scrambled curds and bramble pickles ;
That is all that Bhombal has.

'No ? How about this, then ?—

Black and eerie moonlight night
I sit alone and bolt upright,
I'm famished, longing for a bite.

'Something about your wife ? Why didn't you say so all this time ? Now I can't go wrong. Here you are :

You know our poor Ram Bhajan's wife ?
She's quite a vixen, on my life !
When she scrubs her dishes here
She drums upon her silverware.
And when she gets down to her washing,
Gives her clothes a darn good thrashing.

'You mean it's not even this ? Then how about ;

There's a cold in your chest
And a hole in your lung—'

The porcupine's voice gurgled out through a flood of tears : 'Oh poor me ! All my money gone down the drain. What a useless advocate ! Doesn't even know where to look for the papers.'

The songster was all this time sitting quietly in a corner. Now he sheepishly said : 'Which one is it that you want ? The one about the bat and the porcupine ?'

The porcupine got excited : 'Yes, Yes ! that's the one I mean '

The fox jumped up : 'Did he say bat, M'lord ? The bat has to be summoned as witness, then.'

The toad's neck swelled out and he yelled out : 'Ba-a-at prese-e-ent !'

They looked all over the place but the bat was nowhere to be seen. 'He isn't here, M'lord', said the fox, 'and so, if it please Your Lordship, let there be a death sentence for the whole bang lot.'

The crocodile intervened : 'Certainly not, M'lord. Shall we appeal ?'

The owl still had his eyes shut but he ordered : 'Proceed with the appeal. Get all the witnesses ready.'

The crocodile looked cautiously about him and asked Hiji bij-bij whether he would like to appear on the witness stand. 'You'll get paid for it', he whispered into his ear, 'four annas.' Hiji-bij-bij jumped up at the very mention of money and started guffawing again.

'What are you laughing at ? Demanded the fox

Hiji-bij-bij reeled off : 'And I knew a chap who had been briefed to bear false witness. To say : "The book has a green jacket and is

marked with a blue pencil and it is dog-eared and it has a red stain on the spine." But during cross-examination, he said; "He wears a green jacket and his dog has blue marks on its ears and his spine is stained with red ink" —oh, ho ho, ha ha ha.'

The fox asked him whether he knew the porcupine, to which he replied: 'Of course I do. I know the porcupine and I know the crocodile and I know the whole bang lot of them. The porcupine lives in a hole in the ground and has long quills covering his body. The crocodile's body is covered with square marks. He eats goats and things.'

Horner burst into hysterical tears and said: 'Half of an uncle of mine was once swallowed by a crocodile, the other half died.'

I said: 'Good riddance! Now, will you shut up?'

The fox asked him whether he knew anything about the case and Hiji-bij-bij replied: 'Don't I just! I know all about it. To start with, there is a plaintiff and he has an advocate. Then there is an accused and he has an advocate too. Then there are ten witnesses on either side, but only one judge. The judge's job is to sit and doze.'

The owl shook himself straight. 'Of course not. I am not a-dozing. I'm keeping my eyes closed because I have eye trouble.'

'I've seen other judges too, and they all seem to have eye trouble.' And he exploded into another fit of laughter.

'Now now, what's wrong this time?' asked the fox.

Hiji-bij-bij began: 'There was one balmy chap I knew who had a passion for naming things. He called his shoes 'Impetuosity' and his umbrella, 'Presence of Mind' and his jug, 'All best wishes'. But as soon as he gave

the name of 'Distracted Perplexity' to his house, there was a violent earthquake and the house toppled down and—oh, ho, ho, ha, ha, ha!'

The fox's voice was serious: 'Hmm... really? What's your name?'

'At the moment, Hiji-bij-bij.'

'What d'you mean, at the moment?'

'You see, in the mornings, it's P. Cocoanut and—'. 'What does the 'P' stand for?' 'Mister Potato Cocoanut and in the evenings, I'm called Ramtaru.'

'Where do you reside?'

'I can't recite too well. Not as well as Srinivas that is. And he's gone home.'

Udho and Budho shouted out together: 'Then he must have kicked the bucket.' 'They all do when they go home', said Udho.

'Too much noise out there!' shouted the fox.

And Budho said to Udho, 'I'll give you a hammering if people start talking again.' And Udho retorted, 'I'll thrash you within an inch of your life if these chaps start making a row.'

The fox pleaded: 'M'lord, these fellows are a bunch of crazy idiots. Their evidence is worth nothing at all.'

'Of course it is,' barked the crocodile lashing his tail, 'This particular witness was worth four annas in cash,' and he counted out four annas to Hiji-bij-bij.

A voice said from somewhere : 'Witness No. 1, petty cash expenses, four annas.' It was Raven Jetblack up on his branch. At his accounts again. The fox asked Hiji-bij-bij : 'Do you know anything about the case ?'

'I know a song about a certain fox.'

'Let the court hear it.'

Hiji bij-bij began :

'Come and save our egg-plants, for
The fox is gobbling them all up—'

Tho fox cut him short with : 'No no. That was another fox. That'll be all for the time being.'

Just as you would have thought it was all over, there was a rush for the witness-box. They all thought they'd get paid for standing there. But before anybody could get to it, down hopped Jetblack from his branch, settled himself comfortably in the witness stand and started rattling off : 'Glory be to the Lord of all Ravens. I, Raven Jetblack, of 41 Arboreal Park, Ravensville, deal in all sorts of accounts—thrifty and extravagant, wholesale and retail. My methods are—'

'Don't talk nonsense', cut in the fox, 'answer my questions. What is your name ?'

'What a bore ! That's exactly what I just told you. Raven Jetblack.'

'Address ?'

'But isn't that also what I said ? 41 Arboreal Park, Ravensville.'

'How far is it from here ?'

The raven thought for a while and said : 'I'm afraid that's a bit of a tricky question. It's four annas by the hour and two-and-a-half annas by the mile. There is a discount of half an anna for cash payment. If you add up, it comes to ten annas and subtracting will leave you with three. Dividing will give you twenty-one pies and multiplying will amount to twenty-one rupees.'

'Don't try to fox me,' said the fox, 'is there a short-cut to your place ?'

'There it is, right in front of you. It's a straight road, as the crow flies.'

'Where does the road lead you ?'

'The road is not a leader.'

'Don't be insolent. Where does this road go ?'

'Doesn't go anywhere. Stays put. Just where it is. A road doesn't go grazing like a cow Nor does it go to Darjeeling for a change of air.'

'This is my first warning. Don't get cheeky, just answer my questions. Do you have any idea what this case is all about ?'

'I should say so ! I've been working at its accounts right from the very beginning. So I have all the clues.

'Here you are. Our primary duty is to define fame. Cash expenditure for witness, four annas. The skin behind his ears turned blue. Then there was a chap who used to call people names. He called the fox a thief and the owl, Pop-eye.'

This caused a terrible uproar and, in the confusion, the crocodile got hold of the toad and gobbled him up. When the mole saw this, he started squeaking at the top of his voice. The fox picked up an old umbrella and tried to shoo Jetblack away.

Presently, the owl proclaimed : 'Silence in Court. I shall now deliver judgment', and he turned to a rabbit who stood behind him with a penholder stuck behind his ear and ordered : 'Write this down ; "Defamation

Suit No. 24. Plaintiff, porcupine. Accused—just a minute ! Where's the accused ?'

They all shouted : 'There isn't any. What a shame !'

Someone asked the songster to be the accused and, fool that he was, he agreed. He must have thought he'd get paid for it.

The owl delivered judgment : 'The accused is to hang by the neck for seven days and then serve a jail sentence of three months.'

This was very unjust, and I was about to protest, when Pundit Horner rushed up and butted me. Then he bit me in the left ear. I saw stars. Everything went hazy.

Gradually, as the haze lifted, the goat's face turned into my uncle's. He was boxing my ear. 'So this is what you're doing out here, eh ?' he said. 'Snoring instead of reading your horn-book !'

But I had not been dreaming at all because, right in front of me, on the wall, there sat a cat twitching its whiskers. And a goat bleated from somewhere, too. What better proof did uncle want ? But he just said : 'Shut up !'

সুকুমার রায়-বিষয়ক আলোচনাপঞ্জী

অজিত দত্ত

বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস (অংশ)

অজিতকৃষ্ণ বসু

রঙ্গরস বা কৌতুক এবং সাহিত্য

('বাংলা সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গ ও আজগুবি রচনা'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সুকুমার রায়—'দেশ', ১.১০ (১১ ?).'৪৭

কল্যাণী কার্লেকর

সুকুমার রায়—ভূমিকা, সুকুমার সমগ্র রচনাবলী (এশিয়া)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সুকুমার রায় ও Monday club-'রংমশাল', সুকুমার রায় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

কালিদাস নাগ

সুকুমার রায়—'রংমশাল', অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯

কুমারেশ ঘোষ

বাংলা সাহিত্যে আজগুবি রচনা

('বাংলা সাহিত্যে রঙ্গব্যঙ্গ ও আজগুবি রচনা'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী

সুকুমার রায় : মনন ও শিল্প (অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র)

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

সুকুমার রায়—'বৈতানিক', বৈশাখ ১৩৭২

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

সুকুমার স্মরণে—'রামধনু', অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

জীবনানন্দ দাশ

সিগনেট প্রেসকে লিখিত পত্র ৩০.১০.৪৩, জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, রবিবাসরীয়, জনতা / নীলকণ্ঠ ১৯৭৮

দিলীপ রায়

দুটি সুকুমার গ্রন্থ—'দৈনিক কবিতা' (সুকুমার সংকলন), ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

দিলীপকুমার গুপ্ত

সুকুমার রায় (পুস্তিকা), সিগনেট প্রেস, ৩০.১০.১৯৪৩

(পুস্তিকায় লেখকের নাম ছিল না। শ্রীমতী নন্দিনী গুপ্তের সৌজন্যে লেখকের নাম জানা গেল)

দীপংকর দাশগুপ্ত

সম্ভব অসম্ভবের কবি—'দৈনিক কবিতা', ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

দীপংকর সেন

সুকুমার রায়ের মুদ্রণচর্চা—রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ১২ চৈত্র, ১৩৮৪

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

সুকুমার রায়ের প্রবন্ধ—'দৈনিক কবিতা', ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অসম্ভবের ছন্দতে— 'দৈনিক কবিতা,' ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

নীলিমা দেবী

সুকুমার রায়ের ছবি—'রংমশাল', অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

অভিভাষণ—সিগনেট প্রেস, ৩০.১০.১৯৪৩

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

সুকুমার রায়—'নববাণী' ১৩৫৪ (?)

পরিমল গোস্বামী

সুকুমার রায় বিষয়ে মদীয় আবোলতাবোল—'দৈনিক কবিতা' ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

ছেলেবেলার দিনগুলি (অংশ)

প্রেমেন্দ্র মিত্র

উল্টোপাল্টা ছড়া—'রংমশাল', অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

ভূমিকা—সুকুমার সাহিত্য সমগ্র (১ম খণ্ড), নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি ১৩৮২

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

ভাবের চাপে জমাট—'দৈনিক কবিতা', ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতিতর্পণ—'রংমশাল', অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

বিমলাংশুপ্রকাশ রায়

সুকুমার রায়ের স্মৃতি—'দৈনিক কবিতা', ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

বুদ্ধদেব বসু

কবি সুকুমার—'কল্লোল' চৈত্র ১৩৩২

বাংলা শিশুসাহিত্য (অংশ)

ভারতী সেন

অসম্ভবের ছন্দ—'সমকালীন', জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২

মনীশ ঘটক (শ্রীযুবনাশ্ব)

'আবোলতাবোল'—কল্লোল, চৈত্র ১৩৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা, 'পাগলা দাশু', (এম্‌ সি সরকার) ;

ভাষণ, ২৬শে ভাদ্র ১৩৩০—'শান্তিনিকেতন' ২য় খণ্ড ১৩৪২, পৃ. ৬৩২-৩৭

রাজলক্ষ্মী দেবী

বাঙালীর কবি, লেখক—'দৈনিক কবিতা', ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

লীলা মজুমদার

সুকুমার রায়—'রংমশাল', অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

সুকুমার রায়—রচনাবলী ৩য়

অন্য কোনোখানে (স্মৃতিচারণ)

শচীন ভৌমিক

সুকুমার রায়—('হাউসফুল' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

সুকুমার রায় ও রাজশেখর বসু—'পশ্চিমবঙ্গ', রাজশেখর বসু শতবার্ষিকী সংখ্যা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শিশু সাহিত্য—'পূর্বাশা', অগ্রহায়ণ ১৩৫৪

সত্যজিৎ রায়

ভূমিকা, সুকুমার সমগ্র (আনন্দ);

রেডিও ভাষণ

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

সন্দীপনের সুকুমার স্মৃতি—'দৈনিক কবিতা', ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

সমীর মৈত্র

ভূমিকা, সুকুমার সমগ্র রচনাবলী (এশিয়া)

সীতা দেবী

পুণ্যস্মৃতি (অংশ)

সুধীরকুমার চৌধুরী

তাতাবাবু—'দৈনিক কবিতা', ২৫শে বৈশাখ ১৩৮০

সুশোভন সরকার

রবীন্দ্রস্মৃতি (অংশ), ১৯৮২

সুবিমল রায়

সুকুমার রায় ('প্রেতসিদ্ধের কাহিনী ও অন্যান্য রচনা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রেডিও ভাষণ

হিরণকুমার সান্যাল

পরিচয়ের কুড়ি বছর (অংশ)

? (লেখকের নাম জানা যায় নি)

হাসির কবি সুকুমার রায়—'বর্তমান', ১৩৫৪

পঞ্জীটি অসম্পূর্ণ, কারণ অনেকগুলি পত্রপত্রিকা ও বই সংগ্রহ করা গেল না।

ভ্রম সংশোধন

পৃঃ	কলম	লাইন	শুদ্ধ পাঠ
২	২	১	'আর' হবেনা
১৬	১	১৬	'প্রথম ভারতীয়' হবেনা
৪৫	২	১৪	চলচ্চিত্রচর্চারি
৫৫	১	১৮	'।' হবে না
৫৯	২	৬	সূক্ষ্ম
৬১	২	২৪	সংগীতচর্চার
৬১	২	২৬	গুঁতো
৬৭	২	৭	"নিদেন পক্ষে"
৬৮	১	৮	কলেজ স্ট্রীটে
৬৮	১	৩২	ভারতবর্ষীয়
৬৯	১	২৭	চিঠি[২]
৭০	১	৩৩	'আর' হবেনা
৭৩	১	১২	মূল্য
৭৩	১	২৭	প্রসঙ্গে
১০৫	২	২৫	পরের
১১৮	১	২৩	স্বতন্ত্র
১২৭	২	সাবহেডিং	'হিন্দু-ব্রাহ্ম'
১৩৮	১	১	কর্মখালি
১৪০	১	৭	আর্কিটেক্ট
১৪৭	২	১৩	কিন্তু
১৫৯	২	১৫	উদ্ধৃত
১৮১	২	১৯	ধর্ম, লীলা

With Best Compliments from

Phone : 77-2409
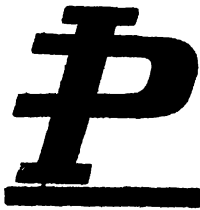
Power India

Manufacturers & Repairers of all kinds of Transformer, Battery Charger, D. C. Power Supply Units, Electroplating Sets, Welding Transformer and Control Panels.

4, Satyen Roy Road, Calcutta-700 034

With Best Compliments from

EAST INDIA METAL AND ENGINEERING WORKS

Founders and Engineers
Manufacturers of Non Ferrous Quality
Castings, Fabricators and
Precision Machinist

39A Dum Dum Road, Calcutta-700074

Phone : 57-5971
57-5048

With Best Compliments from

M/s SARAF OIL UDYOG LTD.

53, Chowringhee Road
Calcutta-700071

Factory : Budge Budge, 24-Parganas

তুষারাবৃত আলাস্কার পটভূমিকায় লেখা অসামান্য পশু কাহিনীর বাংলা অনুবাদ। বয়স্ক এবং কিশোরদের পড়বার উপযোগী।

জ্যাক লণ্ডন—**দি কল অফ দি ওয়াইল্ড** ৯.০০

অনুবাদ : শক্তি বসু

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়-কৃত

সেই অবিস্মরণীয় অনুবাদের পুনর্মুদ্রণ।

হাওয়ার্ড ফাস্টের উপন্যাস—**স্পার্টাকাস** ২৫.০০

আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের গল্পসংগ্রহ ১৮.০০

সংকলন ও সম্পাদনা : রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

রাহুল সংকৃত্যায়ন-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস

জয় যৌধেয় ১৬.০০

রাহুল সাংকৃত্যায়ন : **নতুন মানব সমাজ** ৯.০০

অনুবাদ : শম্ভুনাথ দাস ॥ রাহুল জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সংবলিত

ফণিভূষণ ভট্টাচার্য—**নৌ বিদ্রোহের ইতিহাস** ১৪.০০

বুক্‌স অ্যাণ্ড পিরিয়ডিক্যাল্‌স

৭/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯
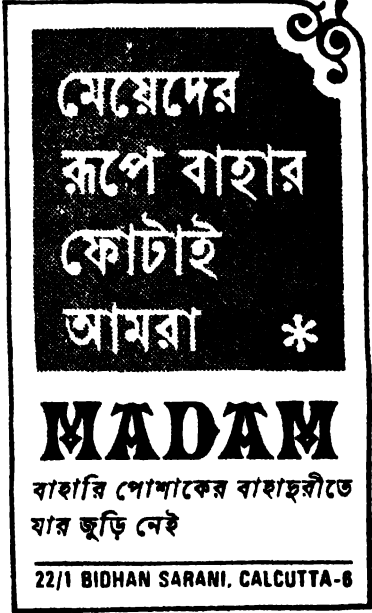
'মনে করো, জুতো হাঁটছে
পা রয়েছে স্থির.................
Bata understands shoes
সে বড়ো সুখের সময় নয়'
লেখক বলেন, আমরাও বলি।
কারন, জুতোর সঙ্গে পায়ের
কোনরকম ঝগড়াই আমরা হতে
দিতে পারিনা। সেজন্যেই আপনার
মনোমত, রুচিমাফিক, হালফ্যাশানের
জুতোর জন্যে সর্বদা বাটায় আসুন।
Bata

মেয়েদের
রূপে বাহার
ফোটাই
আমরা
MADAM
বাহারি পোশাকের বাহাদুরীতে
যার জুড়ি নেই
22/1 BIDHAN SARANI, CALCUTTA-6

স্বগৃহে বা প্রবাসে
যেখানেই থাকুন
উৎসবের দিনগুলি
আনন্দোচ্ছল ও
শান্তিময় হয়ে উঠুক
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
UCO/CAS-117/82 BEN

THE 640-MILLION QUESTION
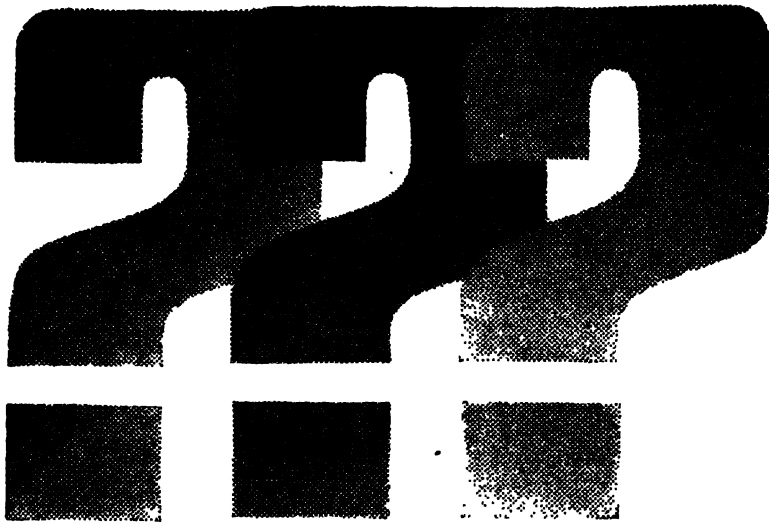
Is any need greater than the people's need
Any welfare greater than the people's welfare

Inserted in public interest

Adcon Services

9 Queens Mansions 5th Floor Room No 509
12 Park Street Calcutta 700 071 Phone 24 0161